পরিচায়িকা

এক

দীনেশচন্দ্র সেন সাহিত্যের ইতিহাসকার এবং সাহিত্যিক। তিনি নানা জায়গা থেকে বহু পরিশ্রমে অজস্র পুঁথি অবিষ্কার করে ১৮৯৬ সালে বঙ্গভাষা ও সাহিত্য রচনা করেন। ধারাবাহিকভাবে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে তিনি সাহিত্যের ইতিহাস রচনা করে বাঙালী জাতি ও তার রচিত সাহিত্যের পরিচয় দিয়েছেন। বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় (১ম খণ্ড ও ২য় খণ্ড, ১৯১৪) তাঁর আর-এক অসামান্য কীর্তি। তিনি ছিলেন রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক। উভয়ের মধ্যে মধুর ও সৌহার্দ্যের সম্পর্ক ছিল। তিনি একদিকে যেমন বাংলা সাহিত্যের নিরলস গবেষক ও রসগ্রাহী সমালোচক ছিলেন তেমনি অন্যদিকে বহু মৌলিক রচনা ও গ্রন্থ সম্পাদনা করে গেছেন। তিনি ছিলেন সাহিত্যের সাধক ও যুগপুরুষ।

দীনেশচন্দ্রের জন্ম ৩রা নভেম্বর ১৮৬৬ সাল। তাঁর পিতা ঈশ্বরচন্দ্র সেন ঢাকা জেলার ধামরাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। দীনেশচন্দ্র পিতা-মাতার আদরের সন্তান ছিলেন। মাত্র বারো বছর বয়সে বিনোদিনী দেবীর সঙ্গে দীনেশচন্দ্রের বিয়ে হয়।

সুয়াপুরের গ্রামের পাঠশালায় দীনেশচন্দ্রের লেখাপড়া শুরু হয়। এরপর মাণিকগঞ্জের মাইনর স্কুলে তিনি ইংরেজি শেখেন। এখান থেকে ছাত্রবৃত্তি পাশ করে তিনি ঢাকায় চলে আসেন। ছাত্রপাঠ্য বই বিশেষতঃ গণিতের ওপর তাঁর ভীতি ছিল। আর সাহিত্যের বই ছিল তাঁর পরম আদরের। ইংরেজি সাহিত্য তিনি সাগ্রহে পাঠ করেছিলেন। বি.এ. পড়ার সময় তাঁর পিতা-মাতার মৃত্যু হয়। তাই আকস্মিকভাবে তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক পড়াশোনায় ছেদ পড়ে এবং সংসারের দায়িত্ব তাঁর স্কন্ধে এসে পড়ে। তাই শ্রীহট্ট জেলার হবিগঞ্জে এসে তিনি ৪০ টাকা

বেতনে একটি স্কুলে শিক্ষকতার চাকুরি গ্রহণ করেন। এখানে শিক্ষকতাকালে তিনি বি.এ. পাশ করেন। পরে তিনি কুমিল্লার ভিক্টোরিয়া স্কুলে যোগদান করেন। তাঁর দক্ষতায় এই স্কুলের সুখ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। এ সময় তিনি 'ঢাকাপ্রকাশ', 'অনুসন্ধান', 'জন্মভূমি', 'সাহিত্য' প্রভৃতি নানা পত্রিকায় প্রবন্ধ লেখেন। সেই সঙ্গে তিনি গ্রামে ঘুরে ঘুরে প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহ করতে থাকেন। শরীরের দিকে তিনি অমনোযোগী ছিলেন। সে কারণে হঠাৎ তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। চিকিৎসার জন্যে অতঃপর কলকাতায় আসেন। কিন্তু কলকাতায় তখন প্লেগের প্রাদুর্ভাব। ফরিদপুরে তাই তিনি ফিরে গেলেন। এ সময় তিনি গ্রীয়ার্সন সাহেবের পরামর্শে মাসিক বৃত্তির জন্যে সরকারের কাছে আবেদন করেন। তাঁর আবেদন বিবেচনা করে মাসিক পঁচিশ টাকা বৃত্তি মঞ্জুর করা হয়। তা ছাড়া নানা পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখে তিনি মাসে দেড়-শ থেকে দু-শো টাকা উপার্জন করে আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য ফিরিয়ে আনেন।

১৯০০ সালে দীনেশচন্দ্র কলকাতায় এসে তৎকালীন উপাচার্য স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সুনজরে পড়েন। তিনি প্রথমে বাংলা পরীক্ষার পরীক্ষক নিযুক্ত হন। পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের রীডার হন; অতঃপর 'রামতনু লাহিড়ী-অধ্যাপক' পদে তিনি ১৯১৩ সাল থেকে ১৯৩২ সাল পর্যন্ত অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৯২১ সালে বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডি. লিট্ উপাধিতে ভূষিত করেন। সরকার তাঁকে 'রায় বাহাদুর' খেতাব প্রদান করেন। বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ১৯৩১ সালে 'জগত্তারিণী-পদক' দেন।

দীনেশচন্দ্র হাওড়ার মাজুতে ১৯২৯ সালে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের মূল সভাপতি ছিলেন। ১৯৩৬ সালে রাঁচিতে অনুষ্ঠিত প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতিও তিনি নির্বাচিত হন। এ সময় তাঁর পত্নী বিয়োগ ঘটে। ১৯৩৯ সালের ২০ নভেম্বর বেহালার 'রূপেশ্বর' ভবনে তাঁর প্রয়াণ হয়।

দীনেশচন্দ্রের রচিত গল্প-উপন্যাস-পৌরাণিক আখ্যায়িকা-কাব্য-প্রবন্ধ-শিশুপাঠ্য রচনা ইত্যাদি নানা শ্রেণীর গ্রন্থ-সংখ্যা ৪০ খানি। এছাড়া তিনি নিজে অথবা অপরের সহযোগিতায় প্রাচীন গ্রন্থ সম্পাদনা করেছেন এমন গ্রন্থের সংখ্যা ১২ খানি। তাঁর ইংরেজি গ্রন্থের সংখ্যা ১২টি। এই পরিসংখ্যান ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রদত্ত (সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা, ৮ম খণ্ড)।

দীনেশচন্দ্রের প্রধান প্রধান রচিত ও সম্পাদিত গ্রন্থ উল্লেখ করা হল : বঙ্গভাষা ও সাহিত্য (১৮৯৬), রামায়ণী কথা (১৯০৪), বেহুলা (১৯০৭), সতী (১৯০৭), ফুল্লরা (১৯০৭), জড়ভরত (১৯০৮), গৃহশ্রী (১৯১৬), মুক্তা চুরি (১৯২০), রাখালের রাজগি (১৯২০), রাগরঙ্গ (১৯২০), ঘরের কথা ও যুগ-সাহিত্য (১৯২২), পৌরাণিকী (১৯৩৪), বৃহৎবঙ্গ (১ম ও ২য় খণ্ড, ১৯৩৫), পুরাতনী (১৯৩৯), বাংলার পুরনারী (১৯৩৯), প্রাচীন বাঙ্গলা সাহিত্যে মুসলমানের অবদান (১৯৪০), ছুটিখানের মহাভারত (১৯০৫), শ্রীধর্ম্মমঙ্গল (১৯০৫), কাশীদাসী মহাভারত (১৯১২), বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় (১ম ও ২য় খণ্ড, ১৯১৪), কৃত্তিবাসী রামায়ণ (১৯১৬), গোপীচন্দ্রের গান (১ম খণ্ড ১৯২২, ২য় খণ্ড ১৯২৪), ময়মনসিংহ গীতিকা (১ম খণ্ড, ২য় সংখ্যা ১৯২৩), পূর্ব্ববঙ্গ গীতিকা (২য় খণ্ড, ২য় সংখ্যা ১৯২৬, ৩য় খণ্ড, ২য় সংখ্যা ১৯৩০, ৪র্থ খণ্ড, ২য় সংখ্যা ১৯৩২), কবিকঙ্কণ-চণ্ডী (১ম ভাগ ১৯২৪, ২য় ভাগ ১৯২৬), গোবিন্দদাসের কড়চা (১৯২৬), কৃষ্ণকমল গ্রন্থাবলী (১৯২৮), বৈষ্ণব পদাবলী (১৯৩০)। দীনেশচন্দ্রের ইংরেজি গ্রন্থ : History of Bengali Language and Literature (1911), Sati (1916), The Vaisnava Literature of Mediaeval Bengal (1917), Chaitanya and his companions (1917), The Folk-Literature of Bengal (1920), The Bengali Ramayanas (1920), Bengali Prose Style (1921), Chaitanya and His Age (1922),

Eastern Bengali Prose style (1921), Chaityana and His Age (1922), Eastern Bengal Ballads Mymensing (vol I, Pt I, 1923, Vol II, pt I, 1926, Vol III, pt I, 1928, Vol IV, pt I, 1932), Glimpses of Bengal Life (1925)।

দুই

নিজেকে জানার আকূতি মানুষের প্রবল। এই আকূতি থেকে মানুষ শুধু নিজেকেই জানে না, সেই সঙ্গে দেশ-কালকেও সে চিনে নেয়। কবির কাজও তাই। তিনি নিজেকে দেশ-কালের প্রেক্ষাপটে প্রতিষ্ঠা করে ইতিহাসের সত্যকে নিরীক্ষণ করেন। তাই আপন রচনার সঙ্গে আত্মপরিচয় জ্ঞাপন কবির কাছে অনিবার্য হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানে বলেছেন—

> আপনাকে এই জানা আমার ফুরাবে না।
> এই জানারই সঙ্গে সঙ্গে তোমায় চেনা।।

প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে আত্মবিবরণী রীতি গড়ে উঠেছিল। কৃত্তিবাস-মুকুন্দ-রূপরাম তাঁদের আত্মবিবরণীতে আপন-আপন জীবন সংগ্রামের পরিচয় দিয়েছেন। সেই সঙ্গে তাঁদের রচনায় দেশ-কালের পটটিও সমুজ্জ্বল হয়েছে।

উনিশ শতকে বাঙালি ইংরেজি মাধ্যমে নবদীক্ষা গ্রহণ করেছেন। লেখকের মানস দিগন্তে ঋতুবদল ঘটে গেছে। লেখক নিজেকে দেখেছেন দেশ-কালের পটভূমিতে। তাঁর আত্মমুখী জিজ্ঞাসা দেশ-কালের মাত্রায় প্রসারিত হয়ে বিশ্বজনীন হয়ে উঠেছে। লেখকের মানবিক আকূতির অন্যতম ফসল হল আত্মকথা।

আত্মকথা লেখকের আপন হাতের দর্পণ। এই দর্পণে তিনি নিজেকে দেখেন এবং অন্যকে দেখান। স্মৃতির চক্‌মকি ঘষে নানা কৌণিক আলোয় জীবনের পূর্ণাঙ্গ চলচ্ছবি তৈরি করেন আত্মকথার লেখক। তাঁর আপন জীবনের আলোক বর্তিকায় দেশ-কাল উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে।

ইংরেজিতে Diary, Memoirs, Reminiscense অনেক লেখা হয়েছে কালে-কালে। বাংলা সাহিত্যে আত্মকথা, আত্মজীবনী, আত্মস্মৃতি, স্মৃতিচারণা ইত্যাদি রচনার প্রসার ঘটেছে উনিশ শতকে। লেখকের আত্মচেতনার ফসল এ জাতীয় রচনা। যথা—দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'আত্মজীবনী', শ্রীমতী রাসসুন্দরী দেবীর 'আমার জীবন', সারদাসুন্দরী দেবীর 'আত্মকথা', ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের 'বিদ্যাসাগর চরিত', গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্নের 'বাল্যজীবন', রামনারায়ণ তর্করত্নের 'আত্মকথা', রাজনারায়ণ বসুর 'আত্ম-চরিত', দেওয়ান কার্তিকেয়চন্দ্র রায়ের 'আত্ম-জীবনচরিত' প্রভৃতি। এই ধারার আর-এক বিশিষ্ট রচনা দীনেশচন্দ্র সেনের 'ঘরের কথা ও যুগসাহিত্য'।

তিন

দীনেশচন্দ্রের 'ঘরের কথা ও যুগসাহিত্য' ১৩২৯ বঙ্গাব্দের ১লা বৈশাখ প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটি 'কাত্যায়নী মেসিন প্রেস'-এ মুদ্রিত হয় এবং কলকাতার শিশির পাবলিশিং হাউস থেকে শ্রীশিশির কুমার মিত্র কর্তৃক প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটির আকার : ১২১/২ × ১৭১/২ সে.মি. এবং মোট পৃষ্ঠা ৪৪৯। গ্রন্থটিতে মোট ২৮ টি অধ্যায় এবং ১৯ খানি ছবি আছে। আমাদের প্রকাশনায় এই প্রথম সংস্করণের গ্রন্থটির পুনর্মুদ্রণ করা হয়েছে। শ্রীবিমান বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর সংগ্রহ থেকে এই গ্রন্থের এক কপি পুনঃপ্রকাশের জন্যে আমাদের দিয়েছেন। এজন্যে আমরা তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানাই।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে বিশ শতকের প্রথমার্ধের দেশ-কালের প্রেক্ষাপটে দীনেশচন্দ্রের 'ঘরের কথা ও যুগসাহিত্য' রচিত। এটি আত্মজীবনীমূলক রচনা। দীনেশচন্দ্র তাঁর নিজের কথা এবং কালের কথা একই সঙ্গে এ গ্রন্থে বিবৃত করেছেন। রচনাটি উপন্যাসের রসে সিঞ্চিত হয়েছে। তাই পাঠক এক মহৎ সাহিত্য সাধকের জীবনচরিত পাঠ করে সাহিত্যের রস আস্বাদন করতে পারেন। নিছক তথ্যের ভারে ন্যুব্জ হয়ে পড়ে নি গ্রন্থখানি। অবশ্য সন-তারিখের কিছু প্রমাদ ঘটে গেছে।

দীনেশচন্দ্র তাঁর গ্রন্থের প্রারম্ভে তাঁদের একখানি বংশলতিকা দিয়েছেন। জ্যেষ্ঠ পিতামহ রমানাথ সেন, পিতামহ রঘুনাথ সেনের কথা পর-পর দুটি অধ্যায়ে তিনি বলেছেন। পূর্বপুরুষদের হস্তলিপির আলোকচিত্র ভূষিত করে দীনেশচন্দ্র তাঁর স্মৃতিচারণার গ্রন্থটিকে আকর্ষণীয় করে তুলেছেন। ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি সুয়াপুর গ্রামের প্রাচীন ইতিহাস লিখেছেন। ভাষাতাত্ত্বিক কৌতূহলের পরিচয় দিয়ে তিনি 'কোটপালক', 'নাণ্ডামুণ্ডা', 'নান্না-মুন্না', 'দাসগুপ্ত' প্রভৃতি শব্দের ব্যুৎপত্তি করেছেন। তিনি তাঁর পিতৃদেব ও পিতৃদেবের আত্মীয়গণের কথা সবিস্তারে বলেছেন। এরপর তাঁর শিক্ষা-দীক্ষা, তাঁদের বাড়িতে হিন্দু-ব্রাহ্মমতের সহাবস্থান, খেলাধূলা, পড়াশোনার বিবরণ তিনি দিয়েছেন। দীনেশচন্দ্র সে কালের শিক্ষা ও পাঠ্যগ্রন্থের চমৎকার পরিচয় দিয়েছেন। রামায়ণ-মহাভারত, অক্ষয়কুমার দত্তের চারুপাঠ, বৈষ্ণবগ্রন্থ, চণ্ডীমঙ্গল, শিশুবোধক প্রভৃতি নানা গ্রন্থের উল্লেখ তিনি করেছেন। মাত্র ১০ বছর বয়সে রচিত 'জলদ' নামক কবিতা 'ভারত-সুহৃদ্' পত্রিকায় ছাপা হলে বালক কবি দীনেশচন্দ্রের আনন্দের সীমা ছিল না। তাঁর সাহিত্যপাঠ ও লেখালেখির নানা কথা তিনি স্মৃতিচারণায় বলেছেন। তাঁর কালের কালীপ্রসন্ন ঘোষ, দীনেশচরণ বসু, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, কৈলাসচন্দ্র সিংহ প্রভৃতি নানা গুণীজনের কথা এই গ্রন্থে আছে। বাংলা পুঁথির প্রতি দীনেশচন্দ্রের বিশেষ আকর্ষণ ছিল। 'মৃগলুব্ধ' পুঁথিখানি হাতে পেয়ে তাঁর আনন্দের সীমা ছিল না। বহু গ্রামে ঘুরে ঘুরে তিনি অজস্র পুঁথি সংগ্রহ করেছেন এবং সেগুলির সাহায্যে তিনি পরবর্তীকালে 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' রচনা করেন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তাঁকে এ কাজে উৎসাহিত করেন। দীনেশচন্দ্র তাঁর কলকাতায় আগমন এবং বিদ্যাসাগর-বঙ্কিমচন্দ্র-রামদয়াল মজুমদারের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎকারের চমৎকার বিবরণ দিয়েছেন। হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, বিপিনচন্দ্র গুপ্ত, ব্যোমকেশ মুস্তফি, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, গগনেন্দ্রনাথ-অবনীন্দ্রনাথ, সমরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর,

শরৎকুমার রায়, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, নগেন্দ্রনাথ বসু, ক্ষেত্রনাথ চূড়ামণি, শিবু কীর্তনিয়া, জ্যোতিশ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সারদাচরণ মিত্র, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি সে কালের বিখ্যাত মনীষী-লেখক-শিল্পী ও গুণীজনের স্মৃতিচারণার অধ্যায়গুলি খুবই মূল্যবান। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দীনেশচন্দ্রের সৌহার্দ্যমূলক সম্পর্কটির বিবরণ দীর্ঘ। এটি গ্রন্থের অন্যতম আকর্ষণীয় বিষয়। ভারতী-বঙ্গদর্শন-প্রদীপ প্রভৃতি পত্রপত্রিকার নানা সংবাদ দীনেশচন্দ্র দিয়েছেন। ভগিনী নিবেদিতা প্রসঙ্গে তিনি একটি স্বতন্ত্র অধ্যায় লিখেছেন।। কলিন, সি, গ্যালিল্যাণ্ড এবং জে,ডি, এণ্ডারসন প্রমুখ ইউরোপীয় মনস্বী ও সুহৃদদের স্মৃতিচারণাও দীনেশচন্দ্র করেছেন। তিনি তাঁর ইংরেজি লেখার নানা কথাও বলেছেন। প্রফুল্লচন্দ্র রায়, কান্তকবি রজনীকান্ত, শিবনাথ শাস্ত্রী, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, অমৃতলাল বসু, শিশিরকুমার ঘোষ, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ কবি-লেখক-মনীষীদের কথা ঘুরে-ফিরে তাঁর স্মৃতিকথায় উঠে এসেছে। দীনেশচন্দ্র বেহালায় বসবাসের কথা বলেছেন। তখন বেহালা ছিল গ্রাম। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তদানীন্তন সহ-উপাচার্য স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সান্নিধ্যলাভ এবং এই বিশ্ববিদ্যালয়েয় তাঁর নিযুক্তি, প্রতিষ্ঠা, পদোন্নতি ও গবেষণার দীর্ঘ বিবরণ দীনেশচন্দ্র তাঁর গ্রন্থের শেষ অধ্যায়ে দিয়েছেন।

সমাজ, ধর্ম, শিক্ষা, লোকাচার, সাহিত্য জগতকে নিয়ে সেকালের বাংলার একখানি বিরাট ক্যানভাস দীনেশচন্দ্রের 'ঘরের কথা ও যুগ-সাহিত্য'। শুধু দীনেশচন্দ্রের কথা নয়, সেকালের বহু কথা জানতে এই গ্রন্থ আমাদের সাহায্য করে।, এ গ্রন্থটিকে পুনঃপ্রকাশের জন্য প্রকাশককে ধন্যবাদ জানাই।

নিমাইচন্দ্র পাল

ঘরের কথা ও—
—যুগ সাহিত্য

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন প্রণীত

উৎসর্গ

এক সময়ে যাঁহাদের কাছে সুখ দুঃখের কথা
না বলিলে হৃদয় জুড়াইত না,
তাপ-দগ্ধ জীবনের অকথিত
কথাগুলি সেই আমার স্বর্গীয়
পিতামাতাকে স্মরণ করিয়া
বলিয়া গেলাম।
তাঁহারা স্বর্গ হইতে তাঁহাদের প্রাণ-প্রিয়
পুত্রকে আশীর্ব্বাদ করুন, এই
কামনা

শ্রীদীনেশ চন্দ্র সেন

সূচীপত্র

ভূমিকা—একটা লিখিতে হয় বলিয়াই লিখিতেছি, নতুবা বক্তব্য বিশেষ কিছু নাই। দুইটি কথা বলিব, তাহা হইলেই পালা শেষ। এই পুস্তকে বহু লোক সম্পর্কে বহু কথা লিখিয়াছি, সাময়িক ভাবে ভাল মন্দের বিচার করিয়া গিয়াছি, কিন্তু আমার বিচার শক্তি অল্প, এজন্য ভ্রমবশতঃ যদি কাহারও মনে ব্যথা দিয়া থাকি, তাঁর কাছে করজোড়ে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি; হয়ত অনেকবার ভ্রম হইয়াছে,যতবার হইয়াছে, ততবার আমি মাথা নোওয়াইয়া ত্রুটি স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছি; সর্ব্বাপেক্ষা আমার লিখিবার বিপদ গিয়াছে যেখানে আত্ম-প্রশংসার বাড়াবাড়ি হইয়াছে, সেই অপরাধের জন্য যদি চাবুক খাইতে হয়, তাহা আমার প্রাপ্য বলিয়াই স্বীকার করিয়া লইব।

দ্বিতীয়তঃ, ছাপা ও বানানের ভুল এত হইয়াছে যে তাহা একবারে অমার্জ্জনীয়, একে ত আমি ৪০ বৎসর যাবৎ প্রুফ দেখিয়াও প্রুফ দেখা শিখিলাম না, ভুলগুলি আশ্চর্য্যরূপে আমার চোখ এড়াইয়া যায়। তারপর কাত্যায়নী প্রেসের অধ্যক্ষ মহাশয় পীড়িত থাকায়, সমস্ত প্রুফ আমাকে একা দেখিতে হইয়াছে, এবং অর্ডার দেওয়া প্রুফে যে সকল ভুল কাটিয়া দিয়াছি, ছাপা হইলে দেখিতে পাইয়াছি সেই ভুলের অনেকগুলি রহিয়া গিয়াছে। পাঠকগণ অবশ্য আমাকেই দায়ী করিবেন, এবং সেই দায়িত্ব অস্বীকার করার পথও আমি দেখিতেছি না। ১০৯ পৃষ্ঠায় প্রথম ছত্রে ১০এর জায়গায় ১৫ হওয়াতে যে মারাত্মক অবস্থা দাঁড়াইয়াছে, শত শত ভুলের মধ্যে সেই একটির উল্লেখ না করিয়া পারিলাম না।

৭নং বিশ্বকোষ লেন বাগবাজার

কলিকাতা — শ্রীদীনেশ চন্দ্র সেন

১লা বৈশাখ, ১৩২৯।

বংশলতা

* এই বংশলতার বিস্তারিত বিবরণ পণ্ডিত উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন প্রণীত "জাতিতত্ত্ব-বারিধি"তে দ্রষ্টব্য।

শক্তি
⋮
শ্রীবৎস
|
পুণ্ডরীক
|
ধোয়ী (কবি, পবনদূত প্রণেতা)
|
কুশলী
|
হিঙ্গু
|
অনন্ত
|
আদিত্য
|
ধরাধর
|
কাম
|
শ্রীহর্ষ
|
শঙ্কর
|
রঘুনাথ
|
গোবিন্দ
|

রতিরাম
|
হরিশ্চন্দ্র
|
দুর্গাচরণ
|
রাজচন্দ্র
|
রঘুনাথ
|
ঈশ্বরচন্দ্র
|
দীনেশচন্দ্র
|

১। মাখনবালা দেবী ২। কিরণ ৩। অরুণ ৪। ফুলবালা (মৃত)
৫। ব্রজবালা (মৃত) ৬। বিনয় ৭। সুনীতিবালা দেবী ৮। বিনোদ
৯। শ্রীচন্দ্র ১০। সাবিত্রী দেবী ১১। সুধীর ১২। প্রতিভা দেবী

নির্ঘণ্ট

অ

আ

ই

ঈ

উ

এ

(ও)

(ক)

খ

গ

চ

জ

ঝ

ট

ড

ঢ

ত

দ

ধ

ন

প

ফ

ব

(য)

(র)

(ল)

(শ)

(স)

(হ)

চিত্র-সূচী

গ্রন্থকারের ছবি, ১২ বৎসর পূর্ব্বেকার।

ঘরের কথা ও যুগ-সাহিত্য

(১)

জ্যেষ্ঠ-পিতামহ রমানাথ সেনের অপমৃত্যু।

জয়দেবোক্ত পবনদূতের প্রসিদ্ধ কবি ধোয়ীর বংশে আমার জন্ম। একখানি প্রাচীন গীতগোবিন্দের টীকায় "ধোয়ী"—"ধূয়ী" বলিয়া উল্লেখিত হইয়াছেন। এই "ধোয়ী" বা "ধূয়ী" কবিকে জয়দেব দুইটি বিশেষণে বিশেষিত করিয়াছেন, একটি হইতেছে "শ্রুতিধর" আর একটি "কবিক্ষ্মাপতি।" দ্বিতীয় বিশেষণটি দ্ব্যর্থবাচক, ইহাতে কবি যে রাজতুল্য বৈভবশীল এবং ভূম্যধিকারী ছিলেন—তাহার প্রতি ইঙ্গিত আছে। পবনদূতে দৃষ্ট হয়, তিনি মহারাজ লক্ষ্মণসেনের বন্ধু ছিলেন। হস্তী, স্বর্ণছত্র প্রভৃতি নানা মূল্যবান রাজযোগ্য উপহার দ্বারা লক্ষ্মণসেন ধোয়ী-কবিকে অভিনন্দিত করিয়াছিলেন। বৈদ্যকুল-পঞ্জিকায় ভরতমল্লিক উল্লেখ করিয়াছেন যে এই "ধোয়ী" শুধু মহাকুলীন ছিলেন এমন নহে, তিনি পাণ্ডিত্য, অর্থপ্রতিষ্ঠা প্রভৃতিতেও এত বড় ছিলেন যে সমস্ত শক্তি-গোত্রের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছিলেন। ঐ গোত্রের ভিন্ন ভিন্ন শাখায় বিবিধ বীজপুরুষ ছিলেন,

কিন্তু প্রতিভা ও পদগৌরবে শ্রেষ্ঠ থাকায় শক্তি গোত্রীয় বৈদ্য-মাত্রেরই তিনিই "বীজী" বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন। বৈদ্যকুল-পঞ্জিকাগুলিতেও ইঁহার নাম কোথায়ও "ধোয়ী" কোথাও "ধূয়ী" এবং কোথায়ও "দুহী" রূপে উল্লিখিত হইয়াছে। চন্দ্রপ্রভায় এই তিন নামই দৃষ্ট হয়। রাঘব কৃত বৈদ্যকুল-পঞ্জিকায় দৃষ্ট হয়, ধোয়ীর পিতার নাম ছিল পুণ্ডরীক এবং পিতামহের নাম ছিল শ্রীবৎস।

ধোয়ীর দুই পুত্র, কাশী ও কুশলী। কুশলীসেনের পুত্র হিঙ্গুসেনকেই আমরা নিজেদের পূর্ব্বপুরুষ বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকি। রাঘব-কৃত পঞ্জিকায় লিখিত আছে, হিঙ্গুপুত্র অনন্তের উপাধি ছিল "ঠাকুর", সুতরাং এই সূত্রে আমাদের কৌলিক উপাধি "সেন ঠাকুর"। ধোয়ীর সন্তান-গণের মধ্যে হিঙ্গুই কৌলিন্যে মণ্ডিত হইয়াছিলেন। ধোয়ী মহাকুলীন হইলেও তাঁহার বংশের অপরাপর শাখা কতকটা নিষ্প্রভ হইয়া গিয়াছেন। এখন আমরা আর নিজদিগকে ধোয়ীর সন্তান বলিয়া পরিচয় দেই না, হিঙ্গুর নামেই এখন আমাদের পরিচয়। কিন্তু এই শাখার যাঁহারা কুল রক্ষা করিতে পারেন নাই, তাহারা এখনও "ধোয়ী," "ধূয়ী" বা "দুই'র সন্তান বলিয়া আপনাদিগকে পরিচয় দিয়া থাকেন।

আমার প্রপিতামহ রামচন্দ্রসেন মহাশয় হিঙ্গুবংশীয়দের সর্ব্বপ্রধান কেন্দ্র খুলনা জেলার পয়োগ্রাম ছাড়িয়া ঢাকা জেলার সুয়াপুরগ্রামে আসিয়া বাস করেন। এই গ্রামে আসিবার অব্যবহিত পরেই ৩৪ বৎসর বয়সে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। একান্ত নিঃসহায় অবস্থায় জ্ঞাতিগণের ষড়যন্ত্রে বিতাড়িত ও জমিদারীর অংশ হইতে বঞ্চিত হইয়া রামচন্দ্র সেনের পত্নী দুইটি শিশুপুত্র ও কন্যা লক্ষ্মীকে লইয়া পূর্ব্বোক্ত সুয়াপুর গ্রামে তাঁহার পিতা ভবানী প্রসাদ দাশগুপ্ত মহাশয়ের বাড়ীতে আশ্রয় লাভ করেন।

বহু কষ্টে এই বিধবা রমণী তাঁহার পুত্রদ্বয় ও কন্যাকে লালনপালন করেন। কন্যাটি আবার বিবাহের অব্যবহিত পরেই বিধবা হন। দুই পুত্রের মধ্যে রমানাথ জ্যেষ্ঠ ও রঘুনাথ কনিষ্ঠ ছিলেন। ইঁহারা উভয়েই সংস্কৃত বাঙ্গালা ও পার্শীতে ব্যুৎপন্ন হন। রঘুনাথ সেন জাতীয় বৈদ্য-ব্যবসা অবলম্বন করেন, এবং তাহা ছাড়া বাড়ীতে মক্তব খুলিয়া ছাত্রদিগকে বাঙ্গালা ও পার্শী শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন।

রমানাথ সেন ছিলেন সেকালের পুলিশের দারোগা। কিন্তু পুলিশে কাজ করিলেও তাঁহার এমন অনেকগুলি গুণ ও প্রবৃত্তি ছিল, যাহা আদবেই পুলিশের কাজের সঙ্গে খাপ খাইত না। তিনি অতি সুদক্ষ চিত্রকর ছিলেন। ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার হস্তলিখিত "কামিনী-কুমার" পুঁথি বহুদিন আমাদের গৃহে ছিল; অক্ষরগুলি ঠিক মুক্তার মত, ও তাহার মধ্যে শুধু কালীতে আঁকা অনেকগুলি এমন সুন্দর চিত্র ছিল, যাহা দেখাইয়া এখনও আমি গৌরব করিতে পারিতাম। একখানায় কামিনী, পুরুষবেশে ঘোটকারূঢ় হইয়া স্বামীর অন্বেষণে গৃহত্যাগ করিয়া যাইতেছেন। সঙ্গে সখী, তিনিও পুরুষের ছদ্মবেশে অশ্বারোহণে চলিতেছেন। আর একখানায় পুরুষবেশী 'কামিনী' রাজকুমারীকে বিবাহ করিয়া তাঁহার সঙ্গে মৃদঙ্গ, বীণা প্রভৃতি বাদ্যের সহ-যোগে সখী-কণ্ঠোদ্ভূত একতান সঙ্গীত শুনিতেছেন। এই সকল চিত্র আমার স্মৃতিপটে এখনও উজ্জ্বল রহিয়াছে। পুরুষবেশী কামিনীর গণ্ডদ্বয়ে যুবতী-সুলভ কমনীয়তা ফুটিয়া বাহির হইয়াছে; তাঁহার উষ্ণীষের কোমলতা যেন শাড়ীর শোভা আড়াল করিয়া রহিয়াছে; মধুর কোমল দেহযষ্টি অশ্বের বেগে যেন লতিকার ন্যায় কাঁপিতেছে। ঘোড়ার মুখের লাগাম তিনি কোমল করে ধরিয়া আছেন; সেইভাবে আকৃষ্ট হইয়া ঘোড়া মুখ বাঁকিয়া পায়ের খুরে অসহিষ্ণু গতি সূচনা করিয়া চলনোন্মুখ

হইয়া আছে। এই মহামূল্য পুঁথি খানি আমি বহু যত্নে রাখিয়াছিলাম,—১৮৯১ খৃষ্টাব্দে কুমিল্লায় আমাদের বাসাবাড়ীতে আগুন লাগায় এত সাধের বইখানি দগ্ধ হইয়া গিয়াছে। এই ত্রিশ বৎসরেও আমার সেই পুস্তক নষ্ট হওয়ার শোক কমিয়া যায় নাই। রমানাথ সেন মহাশয়ের স্ত্রী এবং আমাদের গ্রামের বৃদ্ধদের নিকট শুনিয়াছি রমানাথকৃত বহু সুরঞ্জিত চিত্র ঐ গ্রামের অনেকের বাড়ীতেই ছিল। আমি তাহার একখানিও সংগ্রহ করিতে পারি নাই। কেবল তাঁহার হস্তলিখিত আমাদের একখানি কুল-পরিচয় ও বংশাবলী এখনও আমাদের নিকট আছে, সেই বংশাবলীর চারিদিকে তাঁহার চিত্রাঙ্কন নৈপুণ্যের একটু আভাস আছে।

রমানাথ চিত্র-বিদ্যা দ্বারা অবসর রঞ্জন করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন না; তিনি নানারূপ তান্ত্রিক অনুষ্ঠান দ্বারা নিজে আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভের প্রয়াসী ছিলেন। এই প্রচেষ্টাই তাঁহার শোচনীয় মৃত্যুর কারণ হইয়াছিল। ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দের শীতকালে তিনি তাঁহার বন্ধু স্বগ্রামবাসী এক ব্রাহ্মণের সঙ্গে গাজিখালী নদীর ধারে শব-সাধনা করিতে গিয়াছিলেন। রমানাথের দ্বিতীয় পক্ষের পত্নী গৌরমণি দেবী তখন অষ্টাদশ বর্ষীয়া। আমি তাঁহার নিকট যেরূপ শুনিয়াছিলাম, তাহাই লিখিতেছি। রমানাথের বন্ধুর নাম মনে পড়িতেছে না, কিন্তু তাঁহার পুত্র শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে আমি বৃদ্ধাবস্থায় দেখিয়াছি। গৌরমণি ঘটনাটী এইভাবে বর্ণন করিয়াছেন:—

"তখন শীতকাল, কর্ত্তা (রমানাথ) তাঁহার বন্ধুর সঙ্গে সন্ধ্যাকালে বাহির হইয়া গেলেন। সেদিন শনিবার অমাবস্যা, কোথা হইতে দুইটী চণ্ডালের মৃতদেহ তাঁহারা সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহার উপর উপবিষ্ট হইয়া ইঁহারা সাধনা করিবেন।

"আমাদের বাড়ীতে তখন অনেক লোকজন; খাওয়া শেষ করিতে প্রায় রাত্রি দ্বিপ্রহর হইত। সেইরাত্রি তখন দ্বিপ্রহরের কাছা-

কাছি ; বাড়ীর খাওয়া দাওয়া তখনও শেষ হয় নাই। আমি বাড়ীর বৌ, আমার খাওয়ার ডাক পড়ে নাই। আমি ঘোম্‌টা টানিয়া উনুনের পাশে বসিয়া শীতকালের আগুন পোহাইতে ছিলাম। আমার বড়ই ঘুম পাইতেছিল, চক্ষে তন্দ্রা আসিয়াছিল। সেই তন্দ্রার ঘোরে স্পষ্ট দেখিলাম, একটা কালো বুড়ী আমার কাছে একটা থ'লে হাতে করিয়া আসিল এবং থ'লেটার মুখ খুলিয়া আমার মাথার উপর ঝাড়িতে লাগিল এবং বলিল—"আজ হ'তে পৃথিবীর যত দুঃখ তা' এই থ'লে শূন্য ক'রে তোর মাথায় দিয়ে গেলাম।"

"আমার তন্দ্রার ঘোর ছুটিয়া গেল। যেমনই চোখ মেলিয়া চাহিয়াছি, অমনই বাড়ীতে একটা ভয়ানক গোলমাল শুনিলাম, তারপর জানিলাম আমার কপাল পুড়িয়াছে। লোকজনেরা একটা বাঁশের দোলায় আমার স্বামীকে বহন করিয়া লইয়া আসিয়াছে। তিনি গোঁ গোঁ শব্দ করিতেছেন, তাঁহার বামগণ্ডে ভয়ানক থাপরের দাগ, পাঁচটা আঙ্গুলের আঘাত যেন ফুটিয়া বাহির হইয়াছে,—ঘাড়ের হাড় বোধ হয় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, যেহেতু সমস্ত মুখখা'ন ডানদিকে বাঁকিয়া আছে।

"এই অবস্থায় তিনি তিন দিন জীবিত ছিলেন। ইহার মধ্যে মাঝে মাঝে গোঁ গোঁ শব্দ করিয়াছেন, কোন জ্ঞান ছিল না, কোন কথা বলিতে পারেন নাই। সকলেই বলিল, শবের উপর বসিয়া জপ করিতেছিলেন—ভুতের চড়ে এই দুর্দ্দশা হইয়াছে। শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তীর পিতা ও তাহাই বলিলেন।" *

* এই ঘটনা সম্বন্ধে গ্রামের সপ্ততিবর্ষ বয়স্ক বৃদ্ধ মদীয় খুল্লতাত দেবীচরণ দাশ মহাশয় লিখিয়াছেন ,—"রমানাথ শ্মশান-ক্ষেত্রে চিতায় বসিয়া তপস্যা করিতে-ছিলেন, প্রকাশ আছে তিনি তপস্যায় স্খলিত হওয়ায়ই মৃত্যুর কারণ সংঘটিত হইয়াছিল।"

সাধ্বী গৌরমণি দেবী, সুদীর্ঘ বৈধব্য-জীবন কর্ত্তন করিয়া ১৮৯২ সনে ৭২ বর্ষ বয়সে কুমিল্লায় প্রাণত্যাগ করেন।

রমানাথ পুলিশের দারোগা ছিলেন—সুতরাং ভূতে মারিয়াছে কিংবা কেহ একাকী তাহাকে নির্জ্জন স্থানে সুবিধায় পাইয়া প্রাণান্তকর আঘাত করিয়া পালাইয়াছে—সে সম্বন্ধে আমি নিঃসন্দেহ হইতে পারি নাই, যদিও গ্রামের সকলেরই বিশ্বাস, ভূতের হাতেই তাঁহার প্রাণ গিয়াছে।

---

(২)

পিতামহ রঘুনাথ সেন।

রামনাথ সেন ছিলেন, আমার পিতামহ রঘুনাথ সেনের জ্যেষ্ঠ সহোদর।

পূর্ব্বেই লিখিয়াছি পিতামহ এদিকে কবিরাজী করিতেন, আর তা ছাড়া বাড়ীতে একটি মকতব খুলিয়াছিলেন। ইহাঁরা দুই ভ্রাতাই যৌবনের অনেকটা মাতামহ ভবানীপ্রসাদ দাশের বাড়ীতে কাটাইয়াছিলেন এখনও সুয়াপুর গ্রামে উক্ত দাশ মহাশয়ের বাড়ীর উত্তরে ৮।১০ কাঠা জমি খালি পড়িয়া আছে; ঐখানেই কয়েকখানি ঘর তুলিয়া রামনাথ-রঘুনাথ, তাহাদের মাতা ও বিধবা ভগিনী সহ বাস করিতেন। সেখানে একটি দেবদারুগাছ আমরা শৈশবে দেখিয়াছি, তাহা আমার পিতামহ রঘুনাথ সেনের হস্ত-রোপিত ছিল।

কিন্তু রমানাথ সেনের আয় বৃদ্ধির সঙ্গে ইহাঁরা ঐ গ্রামের ভিন্ন স্থানে বাড়ী করিবার সংকল্প করিলেন। সুয়াপুর গ্রামের যে প্রান্তে ইতিহাস-বিশ্রুত বাজাসনের ভিটা এখনও বর্ষায় বন্যাপ্লাবিত সমস্ত পারিপার্শ্বিক ভূখণ্ডের মধ্যে মাথা জাগাইয়া থাকে—যে ভিটা খনন করিয়া মৃন্ময় বুদ্ধ-মূর্ত্তি ও প্রাচীন অট্টালিকার ভিত্তি সম্প্রতি আবিষ্কৃত হইয়াছে, সেই বাজা-সনের পশ্চিমে ও সুয়াপুরের পূর্ব্ব সীমান্তে ৯।১০ বিঘা পরিমিত ভূমির মৌরসী স্বত্ব লাভ করিয়া রমানাথ-রঘুনাথ স্বীয় আবাস নির্ম্মাণের পরিকল্পনা করেন।

উভয় ভ্রাতাই খেয়ালী ছিলেন। রমানাথের খেয়াল ছিল চিত্র-বিদ্যা ও যোগসাধন। রঘুনাথের খেয়ালের মাত্রা আর একটু বেশী ছিল, বৃক্ষ রোপণই তাঁহার জীবনের সর্ব্ব প্রধান ব্রত ছিল। পূর্ব্বোক্ত ৯।১০ বিঘা ছিল একটি চতুষ্কোণ জমি। এই জমির চতুর্দ্দিকে ঘিরিয়া তিনি আম্র-বৃক্ষ রোপণ করিয়াছিলেন। আমাদের সে অঞ্চলে নেংড়া, ফজলী, বোম্বাই প্রায় কোথাও দেখা যাইত না। রঘুনাথ দূর হইতে সেই সকল আমের কলম আনিয়া এই বৃক্ষ-বাটিকা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন! তাঁহার রোপিত আমগাছের সংখ্যা প্রায় ৪০০ শত ছিল; আমগাছের নীচে সেই বাটিকার চারিদিক বেষ্টন করিয়া তিনি গড়খাই করিয়াছিলেন, তাহা বর্ষায় জলে ভরিয়া যাইত। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠমাসে আমাদের বাড়ীর যে শোভা হইত, তাহা একটা বিশাল চিত্র-পটের ন্যায় আমার স্মৃতিতে দেদীপ্যমান আছে। সিন্দুর, হলুদ, কালো, কত রকম বর্ণের সহস্র সহস্র আম শাখায় শাখায় দুলিতে থাকিত। ঝড় হইলে সেই গড়খাইএর মধ্যে সেগুলি ঝরিয়া পড়িত—সেই দৃশ্য দেখিয়া আমার বাল্মীকির "অনেকবর্ণম্ পবনাবধুতম, ভূমৌ পতত্যাম্রফলম্ বিপক্বম্।" (সুন্দর) শ্লোক মনে পড়িত। বাড়ীর উত্তরদিকে একটি উৎকৃষ্ট বোম্বাই আমের এবং পশ্চিমে, কয়েকটি সিন্দুরে ও ফজলির গাছ ছিল; পড়ন্ত সূর্য্যের আলো জ্যৈষ্ঠমাসে সেই সিন্দুরে আমের উপরে পড়িলে কি সুন্দর দেখাইত! এমন গাছ ছিল না যাহার শাখায় চড়িয়া আমি কখনও প্রাণের আশা ত্যাগ করিয়া—আম না পাড়িয়াছি, এমন শাখা ছিল না, যাহার সঙ্গে আমার আনন্দ, চাঞ্চল্য, ও মৃত্যুভয়ের কোন না কোন স্মৃতি জড়িত না ছিল। যখন ঝড় হইত, তখন বৃক্ষতলে শত শত আম পড়িয়া সেই সুদীর্ঘ পরিখা পূর্ণ করিয়া ফেলিত। সুয়াপুরের ত কথাই নাই, নান্না, রোওয়া প্রভৃতি নিকটবর্ত্তী গ্রাম হইতে ও সেই ঝড়ের

পিতামহ রঘুনাথ সেনের হস্তলিপি,—তাং ১৬ই কার্ত্তিক,

১২৬২, বাং সন।

সময় বৃষ্টিতে ভিজিতে ভিজিতে সিক্তবস্ত্রে গা ঢাকিয়া মেয়ে-পুরুষেরা থলিয়া ভরিয়া আম কুড়াইয়া লইয়া যাইত। আমাদের অঞ্চলে কোন ভদ্রলোক আম বিক্রয় করিতেন না। আমরা অধিকাংশ আম গ্রামে বিলাইয়া দিতাম। সুতরাং যাহারা আম কুড়াইত বা গাছে চড়িয়া পাড়িত, আমরা তাহাদিগকে বাধা দিতাম না। কেবল ফজলী ও বোম্বাই গাছে কাহাকে চড়িয়া আম পাড়িতে দেখিলে বারণ করিতাম।

সেই সকল দিনের স্মৃতি আমার কাছে মধুময়। আমার ভগিনীরা খোলা চুলে অসম্বৃত বস্ত্রে বিপুল উৎসাহে আম কুড়াইয়া উঠান ভর্ত্তি করিত। তাহাদের সর্দ্দার ছিল কর্পূরাদিদি। সে আমাদের বাড়ীর পরিচারিকা হইলেও আমরা তাহাকে জ্যেষ্ঠা ভগিনী বলিয়াই জানিতাম। কোথায় ছিল তখন ম্যালেরিয়া-প্লীহা-লিভার,—রেলগাড়ীতে চড়িয়া এই সকল পীড়া এদেশে আসিয়াছে। আমাদের শৈশবাবস্থায় ইহারা সুয়াপুরের ধারে কাছেও উঁকি মারিত না। কত যে জল ঝড় সহিয়া আমরা আম কুড়াইয়াছি,—কত ভেজা কাপড় যে গায় শুকাইয়াছে—ঘন ঘটাচ্ছন্ন আকাশে সূর্য্যের সঙ্গে অনেক সময় সাক্ষাৎ হইত না, দীর্ঘকেশী ভগিনীদের ভেজা চুলে বালিস আর্দ্র হইয়া থাকিত। কই, কাহার ত কখনও মাথাটি ধরিতে দেখি নাই। আজ ছেলেদের ছাতামাথায় সত্ত্বেও যদি বর্ষার জলবিন্দু দুই ফোটা মাথায় পড়ে, তাহা হইলেইত ইনফ্লুয়েঞ্জা, নিমুনিয়ার আশঙ্কায় আমরা অস্থির হইয়া পড়ি। এখন ছেলেরা ব্যারামের ভয়ে পেট ভরিয়া খাইতে পায় না, ভগবানের দান রৌদ্রবৃষ্টিকে জুজুর মত ভয় করে!

এখনও বর্ষাকালে দেখিতে পাই, বৃক্ষের শাখায় বসিয়া পক্ষিকুল বর্ষার জলে ভিজিয়া ভিজিয়া পক্ষপুট হইতে জল ঝাড়িতেছে। আমরা যে শৈশবে সেই রকম করিয়া বর্ষার অজস্র জল শরীর হইতে ঝাড়িয়া ফেলিয়া

মুক্ত স্থানে বিচরণ করিতাম। বাড়ীতে আসিলে মা খিচুড়ী ও দশ রকম ভাজা রাঁধিয়া দিতেন। আমাদের পল্লী-লক্ষ্মী এখন অন্তর্হিত হইয়াছেন, আমাদের বাড়ীর 'সিন্দুরে' আমে তাঁহার কপালের যে সিন্দুর-রাগ ফলিয়া উঠিত, সেই কি তাহার শেষ চিহ্ন দেখিয়াছিলাম।

আমি পিতামহের কথা ছাড়িয়া অনেক দূর আসিয়া পড়িয়াছি। তিনি এই চারি শত আমগাছের প্রত্যেকটি নিজ হাতে রোপণ করিয়াছিলেন। ভক্ত যেরূপ নিজহস্তে মন্দিরটি সাফ্ করেন, অপরকে সে কাজ করিতে দেন না,—পিতামহ সেইরূপ গাছের কাজ মজুর দিয়া করিতে দিতেন না। কেমন করিয়া মাটি গুড়ো করিতে হইবে, কতটুকু জল দিতে হইবে, সূর্য্যের কিরণ প্রখররূপে আসিয়া পড়িলে গাছের কোন দিকটায় একটু ঢাকা দিতে হইবে—এসকল বিষয়ের সূক্ষ্মবিচার তাঁহার ছিল। যদি মজুরেরা সেই কাজ করিত, তাহারা দুদিনের মধ্যে মারপিট খাইয়া পলাইয়া যাইত, কারণ এই ব্যাপারটিতে পানের থেকে চুণ খসিলে আর রক্ষা ছিল না। এই জন্য অপরে ঐ কাজ করিলে তিনি তৃপ্তি পাইতেন না, এবং তাঁহার মনের মত কাজ করিতে গেলে বহু ত্রুটি থাকিয়া যাইত। তিনি গৃহের নিকটে কমলানেবুর চারা ও গোলাপ জাম, পেয়ারা প্রভৃতি রোপণ করিয়াছিলেন, সারি সারি গুবাকপংক্তি প্রহরীর ন্যায় বাড়ীর ধারে ধারে দণ্ডায়মান থাকিত। এমন বৃক্ষ ছিল না, যাহা আমাদের এই বৃক্ষ-বাটিকাকে শোভাসৌন্দর্য্যমণ্ডিত করে নাই।

এই বৃক্ষগুলির উপর পিতামহের যে যত্ন ছিল, সদ্যোজাত শিশুর উপর তাহার মাতার ততোধিক যত্ন থাকে না। একদা তিনি মৃৎ-পাত্রে কমলানেবুর ছোট চারা পুতিয়া রৌদ্রের দিকে রাখিয়া দিয়াছিলেন,

ইচ্ছা ছিল, সেগুলি একটু বড় হইলে যথা স্থানে লাগাইবেন। আমাদের বাড়ীতে লক্ষ্মী নাম্নী এক পরিচারিকা ছিল, সে ছোট বেলা আমাকে "মানুষ" করিয়াছিল। সেই দাসী ঐ কমলানেবুর চারা-সম্বলিত মৃদ্‌ভাণ্ডগুলির উপর কাপড় শুকাইতে দিয়াছিল,—তখন পিতামহ বেড়াইতে বাহির হইয়া গিয়াছিলেন, আসিয়া যখন ঐ দৃশ্য দেখিলেন, তখন তিনি ক্রোধে উন্মত্তবৎ হইলেন। তাঁহার একখানি খড়্গ ছিল, উহা সুতীক্ষ্ণ ও সুদীর্ঘ, উহার নাম "রামদা"। এই "রামদা" খানি হাতে করিয়া তিনি লক্ষ্মীকে কাটিয়া ফেলিতে ছুটিয়া গেলেন। ইতিপূর্ব্বে অশ্ব হইতে পড়িয়া গিয়া পিতামহ এমনই চোট পাইয়াছিলেন যে প্রৌঢ় বয়সে তাঁহার একটা পা খোঁড়া হইয়া গিয়াছিল। এই পঙ্গুত্বই লক্ষ্মীর প্রাণ-রক্ষার হেতু হইয়াছিল। লক্ষ্মীর পশ্চাতে পশ্চাতে "রামদা" হস্তে ছুটিয়া তিনি আমাদের বৃক্ষবাটিকা কয়েকবার প্রদক্ষিণ করিয়াছিলেন, তারপর একটি বলিষ্ঠ লোক লক্ষ্মীকে তুলিয়া লইয়া খুব দ্রুতবেগে অন্যত্র চলিয়া গেল। পিতামহ খড়্গ হাত হইতে ফেলিয়া নিজ গৃহে বসিয়া উষ্ণ দীর্ঘনিশ্বাস ও চোখের জল ফেলিয়া নিজের ক্রোধ উড়াইয়া—ভাসাইয়া দিলেন।

আমি আর একদিন তাঁহার এই উন্মত্ত ক্রোধ স্বচক্ষে দেখিয়াছি। তখন আমার বয়স সাত। কে যেন কোন্ গাছের উপর কি অত্যাচার করিয়াছিল,—পিতামহ তাঁহার "রামদা" হস্তে করিয়া উন্মত্তের ন্যায় ছুটি-লেন এবং আমাদের বাড়ীর দক্ষিণ দিকে এক সার (প্রায় ১৫।১৬টা) সুপুরী গাছ ছিল, এক এক চোটে এক একটি গাছ কাটিয়া যখন শেষ গাছটার উপর আঘাত পড়িল, তখন আমাদের ভৃত্য জগা-গয়লা যাইয়া তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া ধরিয়া হাত হইতে খড়্গ ছাড়াইয়া লইল। সেদিনও দেখিলাম তিনি জগার কাঁধে মুখ লুকাইয়া অজস্র অশ্রুপাত করিতে-

ছেন।* আমাদের পরিবারে কেহ রাগ করিলে তাহাকে রঘুনাথ সেনের সঙ্গে তুলনা করা হইত—বস্তুতঃ তাঁহার ক্রোধপ্রবণ স্বভাব আমাদের পরিবারে প্রবাদ বাক্যের মত হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

আমাদের সেই বৃক্ষ-বাটিকার কথা আর কি বলিব? আমার মানসপটের উজ্জ্বলতম চিত্র—সেই সকল বৃক্ষের পাতায় পাতায় শিশির-বিন্দু মুক্তার মতন দেখাইত! সূর্য্যের কিরণ কত রং দিয়া তাহা সাজাইত! রাত্রির আঁধারে যাহা জীবনের অব্যক্ত প্রহেলিকার মত গাঢ় ভাবে আমার কল্পনাকে প্রবুদ্ধ করিত, দিনের বেলায় যাহা ফুল-ফল লইয়া হাসিয়া উঠিত, সেই আম্রবাটিকার উপর ১৮১৯ সনের নিদারুণ শারদীয় ঝড় প্রবাহিত হইয়া—আমার পিতামহের স্নেহ-অধ্যবসায়ের সেই অপূর্ব্বকীর্ত্তি উৎপাটিত করিয়া লইয়া গিয়াছে। সন্ধ্যাকালে যখন নান্নারের মাঠে বেড়াইয়া বাড়ীতে ফিরিতাম, তখন দেখিতাম, সূর্য্যাস্তের আলোকে পক্ষপুট মণ্ডিত করিয়া অসংখ্য পাখী কলরব করিতে করিতে আমাদের বাড়ীর পশ্চিমদিগের সুবৃহৎ তিন্তিড়ী বৃক্ষটির উপর আসিয়া পড়িতেছে। কখনও দেখিতাম আমাদের পুকুর-পাড়ের কালো জামগাছে শত শত ফল ফলিয়া আছে, তখন বাল্মীকির সেই "অঙ্গার চূর্ণোৎকর সন্নিকাশৈঃ ফলৈঃ সুপর্য্যাপ্ত রসৈঃ সমৃদ্ধৈঃ॥ জম্বু দ্রুমাণাং প্রবিভান্তি শাখাঃ। নিপীয়মানা ইব ষট্‌পদৌঘৈঃ।" শ্লোকটী মনে পড়িয়াছে।

* দেবীচরণ দাশ মহাশয় লিখিয়াছেন, "রঘুনাথ একজন উৎকৃষ্ট শিকারী ছিলেন, তিনি প্রায়ই সজারু প্রভৃতি শিকার করিয়া আনিতেন, একদিন অভয়শঙ্কর সেনের বাড়ীর একটা বাতাবি বৃক্ষের শাখায় জড়ানো একটা প্রকাণ্ড ময়াল সাপকে তিনি শূলীর আঘাতে মারিয়াছিলেন, আমি তখন উপস্থিত ছিলাম।"

আমার পিতামহের আর এক খেয়াল ছিল ঘুড়ি-উড়ানো। শুনিয়াছি প্রকাণ্ড 'চিলে'ঘুড়ি তৈরী করিয়া তিনি গুপ্তদের বাড়ীর বাবুদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিয়া ঘুড়ি উড়াইতেন। উভয় দলে বহুসংখ্যক লোক এই প্রতিযোগিতায় এ পক্ষ ওপক্ষের সহায়তা করিয়া দর্শকরূপে উপস্থিত থাকিতেন। ঘুড়ির সুতো তৈরী করিতে নাকি ধূনো, কাঁচের টুকরা প্রভৃতি অনেক মাল-মসলা বহুদিন ধরিয়া খরচ হইত। সেই সুতো খুব মোটা ও শাণিত তরাবারীর ন্যায় সুতীক্ষ্ণ হইত। ঘুড়িগুলিও এক একটা মানুষের মত উঁচু হইত। এই প্রকাণ্ডাকৃতি ঘুড়ি কোনটি চিলের মত, কোনটি সর্পাকৃতি, কোনটি বা ঠিক মানুষের মূর্ত্তির মতই নির্ম্মাণ করা হইত, সেই ঘুড়ির শব্দ এখনকার এবিওপ্লানের শব্দের মতই ভোঁ ভোঁ শব্দে গগনমণ্ডল আলোড়িত করিয়া উড়িয়া চলিত। গুপ্তপাড়ার ঘুড়ি গুলিও পিতামহের ঘুড়িগুলি দুই প্রতিপক্ষীয় সৈন্যের ন্যায় আকাশের উপর যুদ্ধ করিত, যাহাদের ঘুড়ি কর্ত্তিত হইয়া স্খলিত নক্ষত্রের ন্যায় আকাশ হইতে হেঁটমুণ্ডে ভূতলে পতিত হইত, তাঁহাদের ক্ষোভের সীমা থাকিত না—এবং অপর পক্ষের জয় জয়কার শব্দে পাড়া প্রতিশব্দিত হইত।

ইহা ছাড়া ঘোটকারোহণের কৃতিত্বও প্রতিদ্বন্দ্বিতার অপর এক বিষয় ছিল। আমি শিশুকালে আমাদের একটা প্রকাণ্ড সিন্দুক বোঝাই অস্ত্র শস্ত্র দেখিয়াছি। তাহা অনেক রকমের ছিল, কোনটি ব্যাঘ্র নখের ন্যায়, কোনটি শূলাকৃতি, কোনটি বল্লম, কোনটি বৃহৎ চক্ষু বিশিষ্ট ২½ ফিট লম্বা খড়্গ, ইহা ছাড়া পিতামহের প্রিয় "রামদাটি" ত ছিলই। শুনিয়াছি আমাদের ও অঞ্চলে প্রায়ই ডাকাতি হইত, তখন গ্রামের লোকরা অস্ত্র শস্ত্র লইয়া ডাকাতের সম্মুখীন হইতেন। বাগাসনের ভিটার নিকটে নাকি দস্যুদলের সঙ্গে গ্রামবাসীদের একবার একটা সম্মুখ সমর হইয়া গিয়াছিল, গ্রামের দলের নেতা ছিলেন আমার পিতামহ।

ধর্ম্ম সম্বন্ধে পিতামহ একেবারে উদাসীন ছিলেন। বোধ হয় ধর্ম্ম করিতে যাইয়া তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর শোচনীয় ভাবে মৃত্যু মুখে পতিত হওয়ার পর হইতে পিতামহের ধর্ম্মের প্রতি একটা বিদ্বেষ বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল! শুনিয়াছি আমাদের কুলগুরু একবার আমাদের বাড়ীতে পদ-ধূলি দিয়াছিলেন। পিতামহ ঠাকুর তাঁহাকে লগুড় লইয়া তাড়া করিয়াছিলেন। তদবধি আমাদের ইষ্টদেবতারা আর কেহ আমাদের বাড়ীর ত্রিসীমা মাড়ান নাই।

আমার পিতা যখন একান্ত শিশু, তখন আমার পিতামহীর মৃত্যু হয়। আমাদের বাড়ীতে একটি কোচ জাতীয় পরিচারিকা ছিল, তাহার নাম করুণা। যৌবনে সে রূপবতী ছিল—তাহার চোখ দুটি নাকি বড় সুন্দর ছিল। পিতামহ তাহাকে একটা বাড়ী করিয়া দেন। এখন অভয়শঙ্কর সেন মহাশয়ের বাড়ীর পশ্চিমে কালাচাঁদ সিংহের কন্যা কাশী যে জায়গাটা দখল করিয়া আছে, সেইখানে করুণার বাড়ী ছিল। এই করুণাও একটি অদ্ভুত রকমের জীব ছিল। আমি যখন ইহাকে দেখিয়াছি, তখন করুণা বিগত-যৌবন লোলচর্ম্মা বৃদ্ধা। আমি স্কুলে যাইবার পথে ইহার বাড়ীর নিকট দিয়া যাইতাম। আমার মাতা আমাকে সর্ব্বদা মানা করিয়া দিতেন, "তুই ঐ বুড়ীর বাড়ীতে কিছুতেই যাস্ না, এবং সে কিছু খেতে দিলে খাস্ না।" কিন্তু আমি ঐ পথ দিয়া যাওয়ার সময়, করুণা এমনই বিনয় সহকারে ক্লেশ জানাইয়া আমাকে অনুনয় করিতে থাকিত, যে আমি কিছুতেই তাহার অনুরোধ এড়াইতে পারিতাম না। আমি তাহার বাড়ীতে গেলে সে যেন হাতে হাতে স্বর্গ পাইয়াছে, এরূপ বোধ হইত। তখন আমার বয়স পাঁচ কি ছয়;—করুণা উৎকৃষ্ট চিড়ে, ক্ষীর, চাটিম কলা, ভাল দুধের সর, মাখন, ভাল আখি গুড় ও কদমা-তিলে প্রভৃতি আমাকে খাইতে দিত। সেই বয়সে কোন্ শিশু এরূপ লোভনীয়

দান প্রত্যাখ্যান করিতে পারিয়াছে? আমি মাতার নিষেধ ভুলিয়া যাইতাম, এবং দুই একবার "না, আমার ক্ষিধে নাই, পেটের অসুখ" প্রভৃতি মিথ্যা ওজুহাত দিয়া শেষে সেই উপাদেয় খাদ্য গুলির প্রতি সদ্বিচার করিতে লাগিয়া যাইতাম। করুণা আমাকে খাওয়াইয়া যে কি তৃপ্তিলাভ করিত, আমি একজন লেখকাভিমানী হইলেও তাহা বর্ণনা করিত আমার সাধ্য নাই।

করুণার একটি ঘর বহুবিধ মাটীর দেবদেবী-মূর্ত্তিতে পূর্ণ ছিল। ইন্দ্র, যম, ব্রহ্মা, কার্ত্তিকেয় প্রভৃতি দেবতার সুবৃহৎ মূর্ত্তি সে নিজে বিবিধ উপাচারে পূজা করিত। পূজা করিবার সময় যে তসর পরিত। তাহা ছাড়া তাহার বাড়ীর নিকট একটা অতি প্রাচীন পুকুর হইতে একখানি প্রস্তর নির্ম্মিত বাসুদেব মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছিল, সেটিও তাহার দেব-পংক্তিতে স্থান পাইয়াছিল। সে কোনো মূর্ত্তি পাইলে মাটী খুঁড়িয়া সাবধানে আবৃত করিয়া তাহা বৃক্ষতলে পুঁতিয়া রাখিত এবং একদিন ঘুম হইতে জাগিয়া বলিত যে সে স্বপ্ন দেখিয়াছে যেন অমুক দেবতা তাহার বাড়ীর কোন নির্দ্দিষ্ট দিকে ভূনিম্নে থাকিয়া তাঁহাকে তুলিয়া লইতে আদেশ করিয়াছেন। এইভাবে মূর্ত্তিখানি সে তুলিয়া খুব আড়ম্বরের সহিত পূজা করিত। ছোট লোকদের মধ্যে তাহার ভক্তের অভাব ছিল না।

আমার পিতামহের মৃত্যুর পর সে যে কয়েক বৎসর বাঁচিয়াছিল, তখন তাহার এই পূজার ঝোঁকটা তাহাকে একটা নেশার মত পাইয়া বসিয়াছিল। বয়স তখন তাহার সত্তর। শীর্ণ দেহ, লোল চর্ম্ম, স্খলিত দন্ত। তাহার বর্ণটা হয় ত এককালে ফর্সা ছিল, কিন্তু শেষটা এমন দাঁড়াইয়াছিল যে উহা শ্যাম কি গৌর তাহা বোঝা যাইত না। কোন কোন সন্ধ্যায় যেমন দিবালোক ও আঁধার মিশিয়া যাইয়া একটা

ঘোলাটে রঙে দাঁড়ায়—তার রঙটা সেই রূপ হইয়া গিয়াছিল। চৈত্র-সংক্রান্তিতে শিবপূজা উপলক্ষে সে ধুনচি হাতে বহু লোক পরিবৃত হইয়া মাথা দোলাইতে দোলাইতে ছুটিতে থাকিত। ধুনচি হইতে ধুনোর ধোঁয়াতে তাহার এলোচুলেও মুখ ঢাকিয়া গিয়া তাহাকে একটা কবন্ধের মত দেখাইত। বহু লোক তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইত। তাহার মাথার ঝাঁকুনি ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিত, তারপর একটা জায়গায় সে বসিয়া পড়িয়া যাইত; হাতের ধুনচিটা তখনও ছাড়িত না। কিন্তু একরাশ পাকা চুল শুদ্ধ মাথাটা এরূপভাবে ডাইনে বামে ঝাঁকিতে থাকিত যে, মনে হত ব্যাটের তাড়া খাইয়া বলটা একবার এদিকে তারপর অপরদিকে আছাড় খাইয়া পড়িতেছে। ইহার কিছু পরেই সে মুখে ফেনা তুলিয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িত। আমাদের দেশে একে "বাইল পড়া' বলে। আণ্ডারউড সাহেব 'কলিকাতা রিভিউ' পত্রিকাতে এই 'বাইল পড়া", যাহা খ্রীষ্টানদের কোন কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে অষ্টাদশ শতাব্দীতেও প্রচলিত ছিল, তাহা বৈষ্ণবের "দশা"য় পড়ার সঙ্গে গোল করিয়াছেন। কিন্তু "বাইল পড়া" ও "দশায় পড়া" দুই ভিন্ন বস্তু। একটা হচ্ছে বর্ব্বরদের শারীরিক প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন উত্তেজনার ফল; অনেক অসভ্য জাতির মধ্যে উহা দেখা যায়, আর বৈষ্ণবের "দশায় পড়া"—অই সাত্ত্বিক বিকারের ফল। বৈষ্ণবেরা ইহার বৈজ্ঞানিক প্রণালী তাঁহাদের ভক্তি গ্রন্থে সম্যক আলোচনা করিয়াছেন; এবং দশার প্রণালী বদ্ধ নানারূপ সূক্ষ্মভেদ আবিষ্কার করিয়া উহাকে সাধনার অঙ্গীয় করিয়াছেন।

করুণা এই সমস্ত ধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা ছোট লোকের মধ্যে একটা ভাল রকমের নেতৃত্ব পদ গ্রহণ করিয়াছিল। এমন কি শুনিয়াছি, এই বৃদ্ধ বয়সে সে গাছের উপর সন্ধ্যাকালে চড়িয়া পাতার আড়ালে লুকাইয়া থাকিত, এবং বিস্ময়াপন্ন ও ভীত পথিককে নানারূপ দৈববাণী শুনাইয়া

তাহার আবাস স্থলটিকে একটা সিদ্ধ পীঠে পরিণত করিবার প্রচেষ্টা করিত। দেবীচরণদাস মহাশয় ইহার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "ইতর লোকের নিকট করুণার খুব প্রতিপত্তি ছিল। হরি জেলে ইহার প্রধান শিষ্য হয়, তাহার প্ররোচনায় অনেক ইতর লোক ইহাকে গুরুর ন্যায় ভক্তি করিত। এমন কি গ্রামের সুপ্রসিদ্ধ জমিদার সবজজ কালীকিঙ্কর রায় মহাশয়ের বন্ধ্যা স্ত্রী অপত্য-কামনায় করুণার দেবদেবীর নিকট মহিষ বলি মানত্ করিয়া পূজা দিয়াছিলেন।"

কিন্তু করুণার এই সমস্ত বীভৎস আচারের মধ্যে প্রেমপিপাসু বাল-বিধবার সন্তপ্ত হৃদয়ের হাহাকারের পরিণতি আমার নিকট এখন দীপ্যমান হইতেছে,—সেই প্রেম-পিপাসা নিবৃত্তির জন্য সে যৌবনে আমার পিতামহের পক্ষপাতী হইয়াছিল এবং সেই হৃদয়ের ক্ষুধার খাদ্যস্বরূপ—নানারূপ দেবতার পূজা করিয়া সান্ত্বনা লাভ করিতে চেষ্টা পাইয়াছিল। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা তাহার মাতৃত্বের লোভ ফুটিয়া উঠিত, আমাকে খাওয়াইতে যাইয়া। তখন তাহার যে আনন্দ দেখিয়াছি—তাহা তাহার সর্ব্বপ্রকার বীভৎসতাকে ঢাকিয়া আমার নিকট তাহার অপূর্ব্ব অন্নপূর্ণামূর্ত্তি প্রকট করিয়া দেখাইত। প্রেম মানুষকে ভুলাইয়া শেষে কোন্ কূপে নিক্ষেপ করিতে পারে—করুণার জীবন আমার কাছে তাহারই নিদর্শন। তাহার গৃহত্যাগকে আমি কখনই কামুকতার প্রেরণার ফল মনে করি নাই; সে প্রাণের ক্ষুধা লইয়াই বিপথে বাহির হইয়াছিল।

করুণার মৃত্যুর পর তাহার সমস্ত ঠাকুর দেবতা আমি লইয়া আসিয়াছিলাম। যমরাজের মূর্ত্তিটিকে ফেলিয়া দিয়া আমি তাঁহার প্রকাণ্ড মহিষটার উপর চড়িয়া বসিয়াছিলাম। সেই ক্রোধেই বোধ হয় যমরাজ এখন আমার দিকে রক্ত-চক্ষে দৃষ্টি করিতেছেন। কয়েকদিনের জন্য এই ভাবে ইন্দ্রকে পদচ্যুত করিয়া আমি তাহার ঐরাবতকে দখল করিয়া

লইয়াছিলাম। ৮।১০ দিনের মধ্যে করুণা-পূজিত বহু দেবদেবীর মূর্ত্তিকে আমি এই ভাবে বিড়ম্বিত করিয়াছিলাম। বোধ হয়, কালাপাহাড়ের পরে ইংরেজী আমলে এরূপ আর কেহ করে নাই। কিন্তু সেই প্রস্তর-নির্ম্মিত বাসুদেব মূর্ত্তিটিকে যে আমি কত যত্নে পূজা করিতাম, এবং তাহার চাল-চিত্রের ছাপ লইয়া মাটী দিয়া কত প্রতিমূর্ত্তি গড়িতাম, তাহা আর কি বলিব! আমি যখন মুরাপুর ছাড়িয়া হবিগঞ্জ চলিয়া যাই, তখন রোয়াইল গ্রামবাসী একজন ব্রাহ্মণ-চোর এই মূর্ত্তি অপহরণ করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন এবং এই অপহৃত বিগ্রহকে পূজা করিয়া পুণ্য অর্জ্জনের চেষ্টা পাইয়াছিলেন। বাসুদেব তাঁহার পূজা গ্রহণ করিয়াছিলেন কিনা তাহা আমি সেই দেবতার দর্শন পাইলে জিজ্ঞাসা করিতাম।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমার পিতামহের এক বিধবা ভগিনী ছিলেন, তাঁহার নাম ছিল লক্ষ্মী দেবী। তাঁহাকে আমরা 'কালোঠাকুর মা' বলিয়া জানিতাম। তিনি বোধ হয় কালো ছিলেন, এই জন্যই তাঁহার ঐ নাম হইয়াছিল। এই বিধবা ভগিনীর সঙ্গে পিতামহের একবারেই সদ্ভাব ছিল না,—শুনিয়াছি, উভয়ের মধ্যে বাক্যালাপ ছিল না। 'কালো ঠাকুর মা' পিতামহকে 'কালাপাহাড়' উপাধিতে বিভূষিত করিয়াছিলেন, কিন্তু আমার পিতামহ কালো ছিলেন না।

আমার মাতা বড় মানুষের মেয়ে ছিলেন—সে কথা পরে লিখিব। শুনিয়াছি, পিতামহের নানারূপ কার্য্যকলাপে আমার পিতা বিরক্ত ছিলেন এবং আমার মাতাও নাকি তাঁর প্রতি সদ্ব্যবহার করিতেন না। বহুকাল পর্য্যন্ত পিতামহ শয়ন-ঘরে স্বয়ং রাঁধিয়া খাইতেন। আমি দেখিয়াছি, তিনি নিজের বাজার নিজে করিয়া বেলা একটার সময় উনুনে আগুন ধরাইতেছেন। দোষ যে পক্ষেরই থাকুক না কেন, তিনি যে একমাত্র পুত্র ও পুত্রবধুর সেবায় বঞ্চিত হইয়া বৃদ্ধ বয়সে কষ্ট পাইতেন—

তাহার সন্দেহ ছিল না। তিনি তেজস্বী ছিলেন, এজন্য অনিচ্ছা বা অব-হেলাকৃত সেবা গ্রহণে সম্মত ছিলেন না। কিন্তু তিনি কখনও তাঁহার পুত্র বা পুত্রবধূর নিন্দা কাহারও নিকট করেন নাই; গার্হস্থ্য-জীবনের অশান্তি তাহার বুকে চাপিয়াছিল, কিন্তু মুখে ফুটিত না। একান্ত অন্তরঙ্গ ব্যক্তিরাও তাঁহাকে এ সম্বন্ধে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি নীরব হইয়া যাইতেন।

বহু দোষ ও গুণ লইয়া তিনি যেদিন এই সংসার হইতে বিদায় লইলেন, সে দিনের কথা আমার স্পষ্ট মনে আছে। তখন আমার বয়স সাত কি আট। শীতকালের প্রত্যূষ, বোধ হয় ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দ হইবে। জগা-গয়লা (আমাদের চাকর) উৎকণ্ঠিতভাবে আসিয়া বাবাকে চীৎকার করিয়া ঘুম হইতে জাগাইল। আমরাও লেপের মুড়ি দিয়া জাগিয়া বসি-লাম। সংবাদটি এই, পিতামহ অতি প্রত্যূষে, (প্রভাতের বহু পূর্ব্বে) উঠিয়া প্রাতঃকৃত্যাদি সারিতেন। সেদিনও সেইরূপ যথারীতি মুখ ধাবণাদি সারিয়া নিজ গৃহে ঢুকিতেছেন, এমন সময় কাঁপিতে লাগিলেন এবং দুই এক মিনিট পরেই অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। আমার মনে আছে, বাবা এই সংবাদ শুনিয়া অসম্বৃত বস্ত্রে উঠিয়া বাহির হইলেন, আমি সঙ্গে সঙ্গে গেলাম। কামিনীফুলের একটা গাছের নীচে তিনি শায়িত, তাঁহার পাদমূল হইতে অনতিদূরে, তাঁহার সখের কমলালেবুর গাছটি। জ্ঞান নাই, চক্ষে পলক নাই। সংবাদ পাইয়া অতি দ্রুত গ্রামের বহু লোকজন তথায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদের মধ্যে ব্রাহ্মণ-জমিদার বৃদ্ধ তারিণীপ্রসাদ রায় এবং আমাদের আত্মীয় পরম শ্রদ্ধেয় ভারতচন্দ্র দাস গুপ্ত মহাশয়। ভারত দাস মহাশয়ের হাতে ঘৃত-কমল। কায়স্থ কবিরাজ দ্বারকনাথ অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু পিতামহের প্রাণ পূর্ব্বেই বহির্গত হইয়া গিয়াছে, ঘৃতকমল, লক্ষ্মীবিলাস ও স্বর্ণ সিন্দুরে কি করিবে?

পূর্ব্বের দিনও তিনি নিজে বাজার করিয়া নিজ হাতের রান্না খাইয়াছিলেন, একটি দিন রোগশয্যায় পড়িয়া সেবার ভিখারী হইলেন না। তেজস্বী সন্ন্যাসীকল্প বৃদ্ধ সন্ন্যাস রোগে আমাদিগকে ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন। এখনও মনে পড়ে, তাঁহাকে আমি কত বিরক্ত করিয়াছি। তাঁহার ঘরে সরু সরু বাঁশের চোঙ্গায় নানারূপ কবিরাজী ঔষধ থাকিত, তালা খুলিয়া ঘরে ঢুকিলেই আমি তাঁর সঙ্গে অলক্ষিতে প্রবেশ করিয়া সেই চোঙ্গার মধ্যে কি কি আছে, তাহা আবিষ্কার করিতে প্রয়াসী হইয়া তাড়া খাইতাম। তাঁহার মৃত্যুর পর আমি অবাধে তাঁর সেই চোঙ্গাগুলি দখল করিয়া বসিলাম। আমার মনে আছে, আমাদের বাড়ীর দক্ষিণ দিকের পুকুর পাড়ে বসিয়া আমি সেই চোঙ্গাগুলি খুলিয়া তাহার মধ্য হইতে লাল, কালো—নানারূপ ঔষধের বটিকা ছুড়িয়া পুকুরে ফেলাইয়াছিলাম। এই ভাবে কত পূর্ণচন্দ্র রস, মহালক্ষ্মী-বিলাস, কস্তুরী-ভৈরব, রামবাণ, মকরধ্বজ প্রভৃতি ঔষধ আমার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া পুকুরে পড়িয়া চরম শান্তিলাভ করিয়াছিল। পিতামহের ঋণ এই ভাবে শোধ করিয়া উত্তরাধিকার সূত্রে লব্ধ সেই বাঁশের চোঙ্গাগুলি আমি পুকুরঘাটের তক্তার উপর বাড়ি মারিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছিলাম এবং আমার পিতামহ সম্বন্ধে এই শেষ ব্যবস্থা করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বাটীতে প্রবেশপূর্ব্বক মায়ের আঁচলের নিকট ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম।

---

(৩)

সুয়াপুর গ্রামের প্রাচীন ইতিহাস।

সুয়াপুরের কথা ভাবিতে মন করুণ-রসে আর্দ্র হয়। শুনিয়াছি, সুখাবতী বৌদ্ধদিগের স্বর্গ, যেমন বৈকুণ্ঠ ও অমরাবতী হিন্দুদের। সমস্ত প্রাচীন কুলজী গ্রন্থে—সুয়াপুর গ্রামকে 'সুয়াপুরী' বলিয়া উল্লেখ আছে, সুয়াপুরী অর্থ সুখপুরী—ইহা 'সুখাবতীর'ই বোধ হয় নামান্তর। শুধু নামটি দেখিয়াই আমি মনে করিয়াছিলাম, এই গ্রাম অতি প্রাচীন ; কারণ যে কালে 'সুখ' শব্দটির স্থলে 'সুয়া' রূপ প্রাকৃত শব্দ ব্যবহৃত হইত, সে আজ কালকার কথা নহে। এক সময়ে 'সুয়ো রাণী' ও 'দুয়ো রাণী' কথায় প্রচলিত ছিল। তাহার অর্থ—'সুখী রাণী ও দুঃখী রাণী'। এখনও আমরা আমাদের শত্রুদিগকে 'দুয়ো' দিয়া থাকি। যে সময়ে গ্রাম পত্তন করিয়া তাহার নাম 'সুয়াপুরী' রাখা হইয়াছিল, তখন 'সুখ' শব্দ সাধারণ্যে 'সুয়া' রূপেই প্রচলিত ছিল। সেটি সংস্কৃত ভাষার পুনরুত্থানের পূর্ব্বে—প্রাকৃত ভাষার যুগে। অন্ততঃ ১৫০০ বৎসর পূর্ব্বে শব্দটির এইরূপ প্রাকৃতিক ব্যবহার থাকার কথা।

তার পর এই গ্রামের পুরাতত্ত্ব সন্ধান করিয়া আমি যাহা আবিষ্কার করিয়াছিবাম, তৎসম্বন্ধে একটি বিস্তৃত প্রবন্ধ প্রবাসীতে প্রকাশিত হইয়াছিল। ঐ গ্রাম বেষ্টন করিয়া যে একটা বৃহৎ পরিখা ছিল, তাহার নিদর্শন এখনও আছে। বেনে পাড়া হইতে আরম্ভ করিয়া দাসপাড়া ও ব্রাহ্মণপাড়া বেষ্টনপূর্ব্বক বিশ্বম্ভর সাহাদের বাড়ী অবধি এই পরিখা বিস্তৃত ছিল। বিশ্বম্ভর সাহাদের বাড়ীর পর সেই পরিখা শেষ হইয়া গিয়াছে।

বর্ষাকালে এই সীমা-চিহ্নিত স্থানটি এখনও একটি সুদীর্ঘ খালে পরিণত হইয়া যায়। বিশ্বম্ভর সাহার বাড়ীর পর হইতে গুপ্তপাড়া আরম্ভ, তাহা এখন খুব সমৃদ্ধ হইলেও উহা অপেক্ষাকৃত নূতন পত্তন। গুপ্তপাড়ার পশ্চিম প্রান্তে একটি দীঘি ছিল—তাহার নাম 'দিবাকর'। এই দীঘির পাড়ে শ্মশান ছিল। এখনও গ্রামের কোন কোন নিম্নশ্রেণীর বৃদ্ধা রাগিয়া গেলে "তোকে দিবাকরে দেব" এইরূপ অভিশাপ দিয়া থাকে। দিবাকর দাস ঐ দীঘি কাটাইয়া তার পাড়ে কালী স্থাপন করিয়াছিলেন। সে ৫।৬ শত বৎসরের কথা।

পূর্ব্বোক্ত পরিখার দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে একটা জায়গা আছে, তাহা এখনও 'রাজার বাড়ী' নামে বৃদ্ধদিগের নিকট পরিচিত, এবং তাহার অনতিদূরে রেবতী চক্রবর্ত্তীর বাড়ীর নিকটবর্ত্তী স্থানটির নাম ছিল 'হাতীর পিলখানা'। রাজবাড়ীর পূর্ব্ব দিকে একটা উঁচু জায়গা এখনও আছে, তাহার নাম 'কোটবাড়ী'! প্রাচীনকালে পূর্ব্ববঙ্গে 'কোটবাড়ী' বলিতে দুর্গ বুঝাইত *। দাসদের পাড়ায় রাধাকান্তের মন্দির হইতে সুরু করিয়া অভয় সেন মহাশয়ের বাড়ী ছাড়িয়া আরও খানিকটা দূর পর্য্যন্ত ৫।৭ হাত মাটী খুঁড়িলে সর্ব্বত্র একটা সুদীর্ঘ প্রাচীরের শীর্ষ দেশ টের পাওয়া যায়। এই বৃহৎ সীমা জুড়িয়া ছোট ছোট লাল রঙ্গের ইষ্টক পাওয়া যায়। সমস্ত গ্রামটি প্রাকার-বেষ্টিত ছিল কিনা বলা যায় না। রাধাকান্তের মন্দির এখন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, তাহা প্রায় ১৭৫ বৎসর হইল নির্ম্মিত হইয়াছিল। বৃদ্ধদিগের মুখে শোনা যায়, ঐ মন্দির নির্ম্মিত

* কোন কোন প্রাচীন তাম্রশাসনে 'কোটপালক' শব্দ পাওয়া যায়। 'কোটপালক' অর্থ 'দুর্গপালক' এবং এই শব্দ হইতেই বোধ হয় কোটাল' শব্দের উৎপত্তি।

হইবার পূর্ব্বে দোচালা ঘরের মত একটা ইষ্টক-মন্দির তথায় ছিল, ফাগুর্সন সাহেব এই দোচালা ঘরের অনুকরণে নির্ম্মিত (culviliniar) ছাদযুক্ত ইষ্টকালয় বাঙ্গালাদেশের স্থপতি-শিল্পের বিশেষত্ব বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বঙ্গদেশেই এইরূপ স্থপতির জন্ম এবং ইহা বঙ্গদেশ হইতে পৃথিবীর সর্ব্বত্র অনুকৃত হইয়াছে। ইহাতে বীম-বড়গা-থাকে না, এবং এগুলি সচরাচর খুব টেকসই হয়। এইরূপ মন্দির ৬।৭ শত বৎসর স্থায়ী হইয়া থাকে। সুতরাং সেই পূর্ব্ব-নির্ম্মিত মন্দিরটি অন্তত ৮।৯ শত বৎসর পূর্ব্বে বিরচিত হইয়াছিল, এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। এই মন্দিরের নিকটবর্ত্তী পূর্ব্ব দিকে একটি অতি প্রাচীন পুকুর আছে, তাহার পঙ্ক উদ্ধারের সময় একটা প্রস্তর-স্তম্ভ পাওয়া গিয়াছে। আমাদের সেই অঞ্চল অতি নিম্নভূমি, বর্ষায় ভাসিয়া যায়, প্রস্তরময় পাহাড়—এই স্থান হইতে বহু দূরে;—এত দূরে প্রস্তর আনিয়া যাঁহারা আবাসস্থান বা মন্দির প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাঁহারা অবশ্যই সমৃদ্ধ ও ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তি ছিলেন। ঐ পুকুর হইতে করুণার পূজিত ভগ্ন বাসুদেব বিগ্রহ উঠিয়াছিল। দাসপাড়ার দাসগুপ্তেরাই গ্রামের প্রাচীনতম অধিবাসী। তাঁহাদের মধ্যে চিরন্তন প্রবাদ চলিয়া আসিয়াছে যে তাঁহাদের পূর্ব্ব পুরুষদিগকে বৈশ্বানর-গোত্রীয় কোন রাজা আনিয়াছিলেন। এদেশে কিম্বদন্তী এবং সর্ব্বত্র প্রচলিত ধারণা এই যে সেন রাজারা বৈশ্বানর গোত্রীয় ছিলেন।

দাসগুপ্তেরা পদ্ম হইতে উদ্ভূত। পদ্ম বল্লালসেনের প্রধান সেনাপতি ছিলেন। পদ্ম বালিনছী গ্রামের অধিবাসী ছিলেন এবং বল্লালসেন তাঁহাকে মহাকুল দান করিয়া প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। শ্রীখণ্ডবাসী নরহরি সরকার-প্রভু এই পদ্মদাস বংশসংভূত।

ইহা সকলেই অবগত আছেন যে বল্লালীকুল প্রথম প্রথম সর্ব্বত্র

স্বীকৃত হয় নাই; কিন্তু ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র এই কৌলিন্য সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কুলজী গ্রন্থে পাওয়া যায়, পদ্ম-দাস হইতে নবম স্থানীয় চণ্ডীবরের পুত্র বিষ্ণুদাস ফৌজদার প্রমুখ তিন ভ্রাতা সুয়াপুর গ্রামে বাস স্থাপন করেন। এই ঘটনা সম্ভবতঃ ১৩৪৫ খৃষ্টাব্দে ঘটিয়াছিল। বৈদ্যকুলের শ্রেষ্ঠ—মহাকুলীন এই তিন ভ্রাতা গঙ্গাতীরবর্ত্তী পশ্চিমবঙ্গের স্বীয় আবাসভূমি ত্যাগ করিয়া—কি জন্য এই অবজ্ঞাত পূর্ব্ববঙ্গের এক নিভৃত পল্লীতে আসিয়াছিলেন? স্বদেশে যাঁহাদের গৌরব, মান ও প্রতিষ্ঠার অভাব ছিল না, যাঁহাদের একজন উচ্চ সরকারী খেতাবে ভূষিত ছিলেন—এহেন ব্যক্তিরা কেন এই সুয়া-পুরে আসিয়াছিলেন? সম্ভবতঃ সেন রাজাদের এক শাখা এই সুয়াপুরে রাজত্ব করিতেছিলেন, তাহাদেরই আহ্বানে ইঁহারা আসিয়াছিলেন। বঙ্গদেশে যে যে স্থানে ৮।৯ শত বৎসর পূর্ব্বে বৈশ্বানর গোত্রীয় ব্যক্তিরা ছিলেন, সেইখানেই তাঁরা অতি প্রবল প্রতাপান্বিত ছিলেন বলিয়া বোধ হয়। বল্লভদি নামক গ্রামে (ফরিদপুর জেলায়) বৈশ্বানরদের বাড়ীর নিম্নে তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের কৃত প্রকাণ্ড তোরণের ভগ্নাবশেষ খুঁড়িলেই পাওয়া যায়, সেই তোরণের ইটগুলিতে নানারূপ দেবমূর্ত্তি ও ফুল ক্ষোদিত দেখা যায়। রাজতুল্য বৈভবশালী ব্যক্তি ভিন্ন এরূপ হর্ম্ম্য কেহ প্রস্তুত করিতে পারিতেন না।

সুয়াপুর রায়দের পাড়ায় শতদল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পরি-ত্যক্ত একটা বাড়ীতে মাটী খুঁড়িতে খুঁড়িতে একটা বড় ছাদ ভূনিম্ন হইতে বাহির হইয়া পড়িয়াছিল। তাঁহার মাতা সংস্কারবশতঃ ভয় পাইয়া সে জায়গা আর খুঁড়িতে দেন নাই। অনেকে বলেন, ঐ ছাদই সেই প্রাচীন রাজবাড়ীর একাংশ। উহার নিকটবর্ত্তী পুকুর হইতে বাসুদেব মূর্ত্তি ও প্রস্তর স্তম্ভ উত্তোলিত হইয়াছিল।

সুয়াপুরের কোন কোন স্থান হইতে অতি প্রাচীন মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে, যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহাদের মুখে আমি শুনিয়াছি, কিন্তু আমি নিজে দেখি নাই। পদ্মদাসের বংশধরেরা যে এককালে খুব বিক্রমশালী ভূম্যাধিকারী ছিলেন, তাহার বহু প্রমাণ এখনও পাওয়া যায়। ১৭৫ বৎসর পূর্ব্বে নির্ম্মিত রাধাকান্ত মন্দিরে স্থাপিত বিগ্রহের যে কাষ্ঠসিংহাসন ছিল, তাহাতে বিচিত্র দৃশ্য এ পৌরাণিক দেবদেবীর মূর্ত্তি খোদিত ছিল, তাহা প্রবাসীতে ছাপা হইয়াছিল। সেই সিংহাসন ভাঙ্গিয়া চুরিয়া গিয়াছে। সেই সুদর্শন খোদাই চিত্রসমন্বিত কাঠগুলি স্ত্রীলোকেরা উনুনে জ্বালাইয়া ধ্বংস করিয়া ফেলিয়াছেন। জ্বলন্ত অগ্নির মুখ হইতে অর্দ্ধ দগ্ধ দুই একখানি এবং নিতান্ত অবহেলায় রক্ষিত জীর্ণ শীর্ণ আর ৩।৪ খানি আমি রক্ষা করিয়াছি। সুপ্রসিদ্ধ ভারতীয় শিল্প-সমালোচক এ, কে, কুমারস্বামী ২০০৲ মূল্যে তাহাব তিন চারিখানি ক্রয় করিতে চাহিয়াছিলেন, আমি তাহা দেই নাই। ময়মনসিংহের ম্যাজিষ্ট্রেট ফ্রেঞ্চ সাহেব তাহার একখানি ধার লইয়াছিলেন, তাহা এখনও প্রত্যর্পিত হয় নাই।

সুয়াপুরের নিকটবর্ত্তী 'বাজাসনে' যে একটি বৌদ্ধবিহার ছিল তাহা প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে। সেখানে অনেক মৃণ্ময় বুদ্ধমূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। তাহার খনন-কার্য্য আরম্ভ হওয়ার পরই বন্ধ হইয়া গিয়াছে। সেই উচ্চ ভূমি খনন করিলে এখনও প্রাচীন ইতিহাসের কতক নিদর্শন পাওয়া যাইতে পারে। সুয়াপুরের নিকটবর্ত্তী নান্নাগ্রামে সম্ভবতঃ মুণ্ডিত-শীর্ষ বৌদ্ধভিক্ষুর আবাস ছিল। 'নান্না' শব্দ অর্থ মুণ্ডিত-মস্তক। এখনও সে অঞ্চলে কোন স্ত্রীলোকের চুল না থাকিলে তাহাকে 'নান্নী' বলা হয়। "নাণ্ডামুণ্ডা" "নান্না-মুন্না" প্রভৃতি শব্দ এখনও প্রচলিত আছে, ইহাদের অর্থ 'মুণ্ডিত-শীর্ষ'।

বস্তুতঃ সুয়াপুরও তৎসন্নিহিত বিস্তৃত জনপদ যে বহু প্রাচীন তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। সুয়াপুর হইতে ৬।৭ মাইল দূরে "ধামরাই" গ্রামে হয় ত অশোকস্তম্ভ বিরাজিত ছিল। সেই গ্রামে অনেক প্রাচীন চিহ্ন এখনও আছে। প্রাচীন দলিল পত্রে এই স্থানটির নাম "ধর্ম্মরাজিকা" রূপে দৃষ্ট হয়। অশোক সমস্ত ভারতবর্ষে ৮৪০০০ গ্রামে বৌদ্ধধর্ম্মের জয়-ধ্বজা উড়াইয়া তাহাতে কীর্ত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন—সেই গ্রামগুলির নাম 'ধর্ম্মরাজিকা।'

এই বাজাসন বিহারে সুপ্রসিদ্ধ দীপঙ্কর অধ্যয়ন করিয়াছিলেন কিনা বলিতে পারি না। কিন্তু সুয়াপুরের দাসবংশের আদি উপনিবেশকারী তিন ভ্রাতা যে বিক্রমপুরের দ্বিতীয় বল্লালের আত্মীয় ছিলেন, তাহার কোন সন্দেহ নাই। বল্লালসেন ও কাল্লু খাঁ—সেই ভ্রাতাদের পিসিদ্বয়কে বিবাহ করিয়াছিলেন। কপোতের আকস্মিক আগমনে উদ্ভ্রান্ত হইয়া বিক্রমপুরের রাজ-অন্তঃপুরের যে সমস্ত ললনা জহরব্রত পালন করিয়া অগ্নিতে আত্মবিসর্জ্জন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের অগ্রণী রাজমহিষী এই তিন ভ্রাতার পিসী ছিলেন।

সুয়াপুরের অদূরবর্ত্তী সাভারের নাম টলেমির ভৌগলিক বৃত্তান্তে পাওয়া যায়—সে খ্রীষ্টীয় ২য় শতাব্দীর কথা। তথায় সীমন্ত, রণধীর হরিশ্চন্দ্র, মহেন্দ্র প্রভৃতি বহু বৌদ্ধ নৃপতিরা রাজত্ব করিয়াছিলেন। হরিশ্চন্দ্র কুবেরের মত ধনশালী হইয়াও বৃদ্ধ বয়সে বৌদ্ধ-মঠ পরিদর্শন পূর্ব্বক ভিক্ষুকের ন্যায় বেড়াইতেন। তাঁহার উপাধি ছিল "রাজর্ষি"। সম্ভবতঃ এই হরিশ্চন্দ্রের দুই কন্যাকে ভারত-প্রসিদ্ধ বঙ্গের রাজা গোপীচন্দ্র (গোবিন্দচন্দ্র) বিবাহ করিয়াছিলেন।

সুয়াপুরের নিম্নে যে নদী বহিয়া যাইতেছে, তাহার নাম এখন গাজি-খালি। যে গাজিরা সুয়াপুরের হিন্দু রাজত্ব ধ্বংস করিয়াছিল এবং বাসু-

দেব বিগ্রহের নাক ও পদ্মহস্ত ভগ্ন করিয়া পুকুরে ফেলিয়া দিয়াছিল, সেই গাজিরাই কানাই নদীকে গাজিখালি আখ্যা প্রদান করিয়াছিল। গাজী আক্রমণের বহুদিন পরেও সম্প্রদায়-বিশেষের মধ্যে এই নদীর আদত নাম প্রচলিত ছিল। রেনল্ডসের মান-চিত্রে এই নদীর নাম 'কানাই' দৃষ্ট হয়। কানাই ও বংশাই দুই নদী সাভারের নিকট ধলেশ্বরীর সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে। বংশাই ধামরাই গ্রামের নিকট দিয়া ভাওয়াল ও ময়মনসিংহ পর্য্যন্ত ছুটিয়া গিয়াছে, কানাই মুসলামান নাম-লাঞ্ছিত হইয়া অর্দ্ধপথে শুকাইয়া গিয়াছে।

এই কানাই ও বংশাই সন্নিহিত বিশাল কায়া ধলেশ্বরী—অদূরবর্ত্তী জনপদ, সাভার, ধামরাই, সুয়াপুর, নান্না ও বাজাসন প্রভৃতি গ্রামসমূহকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া—এক সময়ে বৌদ্ধ কীর্ত্তিময় মন্দির ও স্তূপ বিভূষিত হইয়া শোভা পাইয়াছিল। পরবর্ত্তী যুগে তান্ত্রিকতা ও বামাচারে এই জনপদ ডুবিয়া গিয়াছিল। বাজাসন-বিহার তখন জ্ঞান-গরিমা হারাইয়া পঞ্চ মকারের দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিল। এজন্য এখন ও বাজাসনের সংশ্রব সুয়াপুরবাসীদের জুজুর ভয় উৎপাদন করে। 'বাজাসনে'র দাস বলিলে পঞ্চদাসেরা ক্ষুব্ধ হইয়া এই প্রবাদ অলীক বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চান এবং দুই এক ঘর ব্রাহ্মণ 'বাজাসনের ঠাকুর'—এই প্রাচীন প্রবাদের আরোপে উত্তেজনায় অসহিষ্ণু হইয়া গাল মন্দ দিতে থাকেন। অথচ বাজাসন যে কি বস্তু, এই নামের আড়ালে কি কলঙ্ক নিহিত আছে তাহার বিন্দু মাত্র ও তাঁহারা জানেন না। কিন্তু বাজাসনের প্রবাদ সেই অঞ্চল-ময় পরিজ্ঞাত। এখনও যদি আমি বলি আমার বাড়ী সুয়াপুর, তাহা হইলে সে অঞ্চলের লোক বলিবে "কোন সুয়াপুর? 'সুয়াপুর নান্না, মদে ভাতে পান্না' সেই সুয়াপুর নাকি?" বস্তুত—আমাদের গ্রাম যে একশত বৎসরপূর্ব্বে ভৈরবী, চক্রের একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল, তাহা ভালরূপ জানা আছে। তন্ত্র

ঘরের যে সকল মহিলা এই ভৈরবী চক্রে বসিতেন, তাঁহাদের দুই এক জনকে অতিবৃদ্ধাবস্থায় আমি আমার শৈশবে দেখিয়াছি। আমার পিতামহের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রমানাথ যে শবারূঢ় হইয়া প্রাণত্যাগ করেন, সেই ঘটনাও এই গ্রামের তান্ত্রিক অনুষ্ঠানের প্রাচুর্য্য প্রমানিত করিতেছে। *

* বাঙ্গাল পল্লী গুলির অনেক গুলি অতি প্রাচীন। বহু প্রাচীন পল্লীর মন্দিরাদির নিদর্শন মাটীর উপর না থকিবারই কথা। প্রাচীনত্ব নিরূপন করিতে হইলে নিম্নলিখিত পদ্ধতি অবলম্বন করিতে হইবে। (১) গ্রামের লুপ্ত ও চলিত পাড়াগুলির নামের লিষ্টকরা—'কোট', 'সদর খণ্ড', 'বাহির খণ্ড', 'পাট গাঁ, 'পাইকপাড়া' প্রভৃতি নাম পাইলে বুঝা যাইবে, সেখানে হয়ত পুরাকালে কোন রাজা ছিলেন। কোট বাড়ী—দুর্গ, পাট (পত্তন হইতে উদ্ভূত)—রাজ-সিংহাসন, পাইক পাড়া—সৈন্য—নিবাস, ইত্যাদি। (২) গ্রামে কোন পরিখার চিহ্ন আছে কিনা? (৩) বড় দীঘি ছিল কিনা, দীঘির কোনো পাড়ে মাটী খুঁড়িলে প্রাচীন মন্দিরাদির ভগ্নাবশেষ পাওয়া যায় কিনা? বাঙ্গালার পল্লীগুলির দীঘি সমুহে এখনও বঙ্গের অর্দ্ধেক পুরাতত্ত্ব লুকায়িত রাখিয়াছে, যে হেতু, মুসলমান দ্বারা আক্রান্ত হইয়া অনেক সময় হিন্দু রাজগন দীঘির মধ্যে তাঁহাদের সর্ব্বস্ব ফেলিয়া দিয়াছেন। (৪) মন্দির কোন্ দুয়ারি, দীঘি কোন্ দিক্ হইতে কোন্ দিকে খনিত। ইহাদ্বারা হিন্দু, জৈন বৌদ্ধ মুসলমান ইঁহাদের মধ্যে কাহারা সেই কীর্ত্তি নির্ম্মান করিয়াছিলেন, তাহা টের পাওয়া যাইবে। (৫) গ্রামে কোন জায়গা খুঁড়িলে প্রচুর খোলা পাওয়া যায় কিনা? ইতিহাস-পূর্ব্ব, বহু প্রাচীন গ্রাম ও নগর গুলিতে সেইরূপ প্রাচীন খোলা পাওয়া গিয়া থাকে। (৬) গ্রামের প্রাচীন কুলজি-পুস্তক ও অপরাপর হস্ত লিখিত প্রাচীন পুঁথির ভালরূপ অনুসন্ধান করা। (৭) বিগ্রহের নীচে, প্রস্তরে বা ইষ্টকে অনেক সময় এইরূপ ভাবের লেখা থাকে যে তাহা লেখা বলিয়াই মনে হয় না। সেই সকল লেখা বিশেষজ্ঞ ভিন্ন অপর কেহ সচরাচর পড়িতে পারেন না। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত ভাবের কোন নিদর্শন পাইলে তাহা ভাল করিয়া ধুইয়া মুছিয়া দেখা উচিত। (৮) তাম্র শাসন বা প্রাচীন দলিলাদি কিছু আছে কিনা অনুসন্ধান করা। (৯) গ্রাম্য ছড়া ও প্রবাদ

সংগ্রহ করা—তাহা যতই কেন অমার্জ্জিত ভাষায় থাকুকনা কেন—সেগুলি অগ্রাহ্য না করা। (১০) মুসলমান পাড়াতে যে সকল প্রবাদ পাওয়া যাইবে, অনেক সময় তাহাই সত্যের অধিক সন্নিহিত। কারণ হিন্দুরা সমস্ত প্রাচীন তত্ত্ব পৌরাণিক গল্পের আড়ালে ফেলিয়া দেন ; তাঁহারা রামায়ণ-মহাভারত বর্ণিত কথা দ্বারা সমস্ত ইতিহাস আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছেন। (১১) মুসলমান পাড়া যেদিকে সেই দিকেই সম্ভবত হিন্দুর প্রাচীন রাজধানী ছিল,কারণ বিজয়ীরা হিন্দুর উৎকৃষ্ট স্থানগুলিই প্রথম দখল করিয়া লইয়া তথায় বস-বাস স্থাপন করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয়। পুরা তত্ত্বের খোঁজ করিতে হইলে প্রথম মুসলমান-পাড়ার অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য। অনেক সময় হিন্দু মন্দিরের ইট পাথর দিয়া মস্জিদ তৈরী হইয়াছিল। সেই সকল ইট পাথরের উল্টা দিক খুঁজিলে দেবদেবীর মূর্ত্তি কখন কখনও দেখা যায়। (১২) সমৃদ্ধ গ্রাম গুলির সকলটিই কেনো না কোনো নদীর পাড়ে নির্ম্মিত হইয়াছিল। নদী শুকাইয়া গেলেও নদীর গতি কোন্ দিকে ছিল তাহা খুঁজিয়া বা হির করা (১৩) অনেক বৌদ্ধ দেবদেবী মূর্ত্তি হিন্দু দেবদবী বলিয়া পূজা পাইতেছেন। 'প্রজ্ঞা-পারমিতা, তারারূপে গৃহীত হইয়াছেন। স্বয়ং বুদ্ধ দেব কখনও কখনও শিব এমন কি কালী বলিয়া পূজা পাইতেছেন। পাণ্ডা বা পুরোহিতের কথা এবিষয় একবারেই বিশ্বসনীয় নহে। বাসুদেব মূর্ত্তি আর সূর্য্য মূর্ত্তিতে বিশেষ কোন প্রভেদ নাই, কেবল বাসুদেবের নিম্নে গরুড় ও সূর্য্যের নীচে সাতটি ঘোড়া এবং সূর্য্য মূর্ত্তির পায়ে বুটজুতা পরানো।

---

(৪)

পিতৃদেবের আত্মীয়গণ।

আমার পিতার শৈশব কি ভাবে অতিবাহিত হইয়াছিল তাহা জানিনা, কিন্তু মাতৃহারা বালকের শৈশব যে খুব সুখকর ছিল না, তাহার কোন কোন কথা আমি শুনিয়াছি। পিতৃদেবের মাতামহেরা বাসণ্ডা গ্রাম-নিবাসী ছিলেন, তাঁহাদের বিস্তৃত কারবার ছিল। কিন্তু সেই গ্রামে হটাৎ মড়ক লাগিয়া এই বৃহৎ পরিবার নষ্ট হইয়া যায়, এবং তাঁহাদের সম্পদ, গৃহ এবং বহু আস্‌বাব পত্র ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। ভগবান দাসগুপ্ত ও চন্দ্র মোহন দাসগুপ্ত—আমার পিতামহের শ্যালকদ্বয়—আশ্রয়-শূন্য হইয়া আমাদের বাড়ীতে প্রতিপালিত হন। তাঁহাদের ভগিনী অর্থাৎ আমার পিতামহী-ঠাকুরাণী তখন স্বর্গ-গতা। তাঁহাদের যত্ন নেওয়ার লোক বাড়ীতে বড় কেউ ছিলনা। ভগবান দাস মহাশয় আমাকে বলিয়াছেন,—"আমরা জীবনে অনেক কষ্ট সহিয়াছি! তোমার বাবার ও যে কষ্ট কম ছিল তাহা নহে, আমাদের মামা ভাগিনেয় তিন জনকে দেখিবার লোক বাড়ীতে কেউ বড় ছিল না। করুণার উনুনের জন্য আমাদের জঙ্গলে কাঠ কাটিতে হইত। করুণা তোমার বাবাকে এ সকল কাজে লাগাইতে দিত না, কিন্তু আমাদের দুই ভাইকে এই মজুরী করিতে হইত।"

কিন্তু এই দুই ভ্রাতার দুঃখ-নিবারণের ব্যবস্থা বিধাতা করিয়া দিলেন। আমার পিতামহের বিধবা ভগিনী লক্ষ্মীদেবী ক্রমশঃ এই দুই বালকের পক্ষপাতী হইয়া পড়িলেন—ইহারা উত্তরকালে তাঁহার এতটা স্নেহ আকর্ষণ করিয়াছিলেন—যে তিনিই শেষে ইহাদের মাতৃস্থানীয়া হইয়া-

ছিলেন। বিধবার- "নন্দদুলারেরা" এই ভাবে সুয়াপুর গ্রামে বর্দ্ধিত হইলেন। ঐ গ্রামবাসী রামকমল দাস মহাশয়ের চেষ্টায় দুই ভ্রাতা বাঙ্গালা ও পার্শী শিখিয়া পূর্ব্বাঞ্চলে চলিয়া গেলেন। ভগবান দাস নোয়াখালী জেলায় এক জমিদারের নায়েব হইয়া বেশ দুই পয়সা অর্জ্জন করিতে লাগিলেন। চন্দ্রমোহন দাস কুমিল্লা মুন্সেফী কোর্টের সর্ব্ব প্রধান উকীল হইয়া সেই সময়ে মাসে ৪।৫ শত টাকা রোজগার দ্বারা সম্পন্ন অবস্থা প্রাপ্ত হইলেন। এই দুই ভাইএর চেহারা বেশ একটা দর্শনীয় জিনিষ ছিল। ভগবানদাস ছিলেন লম্বা, দোহারা,—রাস্তায় যাইতে অন্য সকলের হইতে তাঁহার মাথা এক ফুট উঁচু দেখাইত। তাঁহার কথা বলিবার ভঙ্গী ছিল সরল—উদ্দীপনাময়। চন্দ্রমোহন দাস যেমন যেমন দীর্ঘ, তেমনিই স্থূলাকৃতি ছিলেন। বিশাল গোঁপ-জোড়া ক্ষুদ্র একটা পাখীর পক্ষপুটের ন্যায় কোঁকড়াইয়া বাঁকিয়া তাহার মুখশ্রীর শোভা বর্দ্ধন করিত; তাঁহার হাসি সেই গোঁপজোড়ার মধ্যে মেঘের ভিতর হইতে সূর্য্যাস্তের আলো যেরূপ ফোটে তেমনই ভাবে দেখা দিত। তিনি যখন চলিতেন, তখন তাঁহাকে সুমেরু-মন্দরের মত দেখাইত, দেখা মাত্র তিনি শ্রদ্ধার উদ্রেক করিতেন। তাঁহার স্বভাব ছিল চাপা, কিন্তু কথাবার্ত্তায় বেশ প্রসন্ন ভাব ও উদারতা দেখাইতেন। তিনি কুমিল্লায় ব্যয়কুণ্ঠ বলিয়া পরিচিত ছিলেন, কিন্তু তিনি সারা বৎসরের পর পূজায় যখন বাড়ীতে আসিতেন—সে একটা মাস বাড়ীতে খুব ধুমধাম করিয়া ব্যয় করিয়া নাম কিনিতেন, গ্রামের সব লোকজন নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইতেন। বাড়ীতে দুর্গোৎসব হইত। আমার মনে আছে, বন্যা-প্লাবিত গ্রামের কোন উঁচু জায়গায় দাঁড়াইয়া আমরা শৈশবকালে পূজো-পলক্ষে আগুন্তক প্রবাসী গ্রামবাসীদিগের পা'ল-সমন্বিত নৌকা আসিতে দেখিতাম। এক এক সম্পন্ন ব্যক্তির প্রকাণ্ড নৌকা দৃষ্টিপথে পড়িবার

পূর্ব্বেই আমরা বহু দূরাগত 'ভ্যা' 'ভ্যা' শব্দের ভেরিনিনাদ শুনিতে পাই-তাম। বুঝিতাম, শারদীয় উৎসবের মহা উপাচারস্বরূপ বহু ছাগল লইয়া গ্রামবাসী কেউ আসিতেছেন।

চন্দ্রমোহন দাসের জ্যেষ্ঠ পুত্র অবনীমোহন এণ্ট্রান্স পরীক্ষা পাশ করিয়া পাগল হন। তাঁহার উন্মত্ততার—কারণ প্রেমব্যাধি। তিনি একটি কন্যাকে পড়াইতেন। সেই কন্যাও কুমিল্লায় ছিলেন। তাঁহাকে বিবাহ করিতে ক্ষেপিয়া গিয়া তিনি যে সকল কাণ্ড করেন, তাহা এখন বলা সম্ভবপর নহে, কারণ কন্যাটী এখন একটি সম্ভ্রান্ত ঘরের গৃহলক্ষ্মী। ঐ কন্যা অবনীবাবুর উন্মত্ত প্রেমোচ্ছ্বাসের কোন সাড়া দিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু অবনী বাবু সমুদ্রে পড়িলে যেরূপ তৃণ আশ্রয় করিয়া লোক বাঁচিতে চায়, তেমনই সেই কন্যার অন্যত্র বিবাহ ঠিক হইয়া গেলে—তাহাকে আয়ত্ত করিবার জন্য একটা প্রাণান্ত চেষ্টা করিয়াছিলেন। বিধিলিপি! কিছুতেই কিছু হইল না। তার বিবাহ অন্যত্র হইয়া গেল, এবং ধরিয়া বাঁধিয়া যেরূপ লোককে বিষ খাওয়ায়, তেমনই অপর একস্থানে তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত ভগবানদাস তাহার বিবাহ ঠিক করিয়া ফেলিলেন। দুই বিবাহই যথারীতি হইয়া গেল। কিন্তু প্রণয়ের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা বোধ হয় একটু হাসিলেন। এই প্রেমভঙ্গে অবনীবাবু এত দূর ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন, যে তাঁর স্বাভাবিক প্রফুল্লতা আর ছিল না।

বিবাহ হওয়ার চার পাঁচ মাস পরে সেই কন্যাটির এক ভ্রাতা আমাদের গ্রামে আসিয়াছিলেন। সেই ছেলেটি সেবার এণ্ট্রেন্স পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে পাশ হইয়া সরকারী বৃত্তি পাইয়াছিল, তাহার নাম ছিল "ন"—। অবনীবাবু সেই বার তৃতীয় শ্রেণীতে এণ্ট্রান্স পাশ করিয়া-ছিলেন, এবং "ন"—এর সঙ্গে একত্র পড়িয়াছিলেন। "ন"—আমাদের গ্রামে আসিয়া আমাকে বলিল, "চল্,—অবনীর সঙ্গে দেখা করিয়া

আমি তাহাকে সঙ্গে লইয়া অবনীবাবুদের বাড়ীতে গেলাম। দেখিলাম অন্দরের এক ঘরে অবনীবাবু একখানি খট্টায় শুইয়া বই পড়িতেছেন, খট্টাটার চারদিকে কাষ্ঠের কারুকার্য্যময় একটা বেড়া। "ন"—এবং আমি যাইয়া সেই বেড়া ধরিয়া দাঁড়াইলাম। "ন"—জিজ্ঞাসা করিল—"অবনী, কেমন আছ?" অবনীবাবু মাথা গুজিয়া বই দেখিতে লাগিলেন, একটিবার মাথা উঁচু করিলেন না, একটি কথা বলিলেন না,—কিন্তু দেখিলাম তাঁহার চোখ দুটি জলে ভরিয়া আসিয়াছে।

এই ঘটনার অল্পকাল পরেই অবনীবাবু পাগল হইয়া গেলেন। কিন্তু পাগল মানে হাত-পা ছোড়া দৌড়-ধাপ, মার-ধর করা গোছের নহে; যেন বুদ্ধদেব নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইয়া সমাধিতে বজ্রাসনে বসিয়া আছেন—একবারে তুষ্ণীম্ভাব। কিন্তু তাঁহাদের বাড়ীর পার্শ্বের পুকুর পাড়ে যখন সদ্য বয়ঃ প্রাপ্তা মেয়েরা বাসন মাজিতে আসিত, তাহাদের হাতের চুড়ী ঠুন ঠুন করিয়া কাঁসার থালায় লাগিয়া বাজিয়া উঠিত, তখন যেন বুদ্ধদেবের হঠাৎ ধ্যান ভঙ্গ হইয়া যাইত, তিনি আস্তে আস্তে উঠিয়া আসিয়া পুকুরপাড়ে দাঁড়াইয়া নিশ্চল চক্ষে মেয়েদিগকে দেখিতেন, কিন্তু কোন উৎপাৎ করিতেন না। বলিতে ভুলিয়াছি—তাঁহার উন্মত্ত হইবার অব্যবহিত পরেই তাঁহার দুর্ভাগ্য পত্নী ইহধাম ছাড়িয়া গিয়াছিলেন।

চন্দ্রমোহন দাসের দ্বিতীয় পুত্র, যামিনীমোহন দাস প্রত্যেক পরীক্ষায় বৃত্তি পাইয়া এম, এ, তে গণিতে দ্বিতীয় স্থান লাভ করেন। তিনি "ল" পাশ করিয়া কিয়ৎকাল কুমিল্লায় ওকালতি করিয়া ডিপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট হন।

চন্দ্রমোহন দাসের মনের ভাব ছিল, ডিপুটি হইয়া যামিনীবাবু তাঁহার বেতনের টাকা সমস্তই তাঁহাকে পাঠাইয়া দিয়া নিজের খরচ বাবদ টাকা

চাহিয়া লইবেন। এই ছিল সেকালের দস্তুর। কিন্তু যামিনীবাবু আধুনিক ধরণের ছেলে, তিনি পিতাকে একটি কড়াও দিতেন না। ইহাতে চন্দ্রমোহন দাস বড়ই মনঃক্ষুণ্ণ থাকিতেন। কারণ বহুদিবস পূর্ব্বে তাঁহার পত্নীবিয়োগ হইয়াছিল, তিনি অনেক যত্নে অনেক কষ্টে মাতৃহীন শিশুদিগকে লালনপালন করিয়াছিলেন। তিনি মিতব্যয়ী এবং বৈষয়িক ছিলেন, তিনি স্নেহে প্রতিদান প্রত্যাশা করিতেন। আমি একদিন তাঁকে জিজ্ঞাসা করিলাম "ঠাকুরদাদা, ছোট খুড়া (যামিনীবাবু) কি আপনাকে কিছু দেন না ?" সেই বিরাট গোঁপের ব্যূহ ভেদ করিয়া একটা অতি দুঃখের, অতি ক্ষুদ্র চাপা "না" শব্দ বাহির হইল। আমি বলিলাম "ধরুন, এই জ্যৈষ্ঠমাস, তিনি কি দু'এক ঝুড়ি আম কিনিয়া ও আপনাকে খাইতে পাঠান না ?" দেখিলাম তাঁহার দুটি চক্ষু ছল ছল করিয়া উঠিল। তিনি আর কিছু না বলিয়া সুমেরু-কল্প বৃহৎ দেহখানি উঠাইয়া ডান হাতে পাখা খানি সঞ্চালন করিতে করিতে অন্দরের দিকে চলিয়া গেলেন। এর পরে তাঁকে আর অনুসরণ করিয়া প্রশ্ন-বাণ-বিদ্ধ করা নিষ্ঠুরতা মনে করিলাম।

এর পরে যামিনীবাবুর সহিত সাক্ষাৎ হইলে আমি তাঁহাকে বলিয়াছিলাম—"ঠাকুরদাদাকে আপনি একটি পয়সাও দেন না—এ ব্যবহার কি ভাল করেন ?" তিনি বলিলেন "আমার পিতা আমার মত চারটা ডিপুটি কিনিতে পারেন—তাঁহার এত টাকা আছে। ও সকল বৃথা ও অনাবশ্যক ভাল-মানুষী আমি কর্‌তে জানি না।"

উভয় পক্ষেরই ভাব দেখিলাম, কিন্তু যামিনীবাবুর কথায় মনে সায় দিল না।

যামিনীবাবু বহুদিন তাঁহার স্ত্রী ও কয়েকটি সন্তান তাঁহার বাপের নিকট ফেলিয়া রাখিয়াছিলেন। ৪।৫ বছর এই ভাবে চলিয়াছিল।

এমন কি যামিনীবাবুর প্রথমা কন্যার বিবাহের ও সমস্ত খরচ চন্দ্রমোহন বাবুকে দিতে হইয়াছিল। ইহার কারণ এই যে যামিনীবাবু ইত্যবসরে কিছু টাকা সঞ্চয় করিয়া লইবেন, এই সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। তিনি প্রথম সময়ে নোয়াখালীর সেটেলমেণ্ট আফিসরের কাজ করিয়াছিলেন। তখন আমাকে বলিয়াছিলেন "পাথেয় (travelling allowance) সমেত হিসাব করিয়া দেখিয়াছি, আমি ৫৩৩৲ টাকা মাসিক পাইব। সেখানে আমি একা প্রাণী। ৩৲ টাকায় রাস্তার খরচ শুদ্ধ আমার একার খরচ চলিয়া যাইবে; আর ৫০০৲ টাকা প্রতিমাসে সঞ্চয় করিব।" এই শেষ কথা বলার সময় তাহার চক্ষে একটা অপূর্ব্ব উদ্দীপনার ভাব দেখিয়াছিলাম।

আপনারা যামিনীবাবুকে চিনিবেন। ইনি হচ্ছেন সেই ডিপুটি, যিনি নিজ পুত্রের ডাকাতি ধরাইয়া তাহাকে জেলে পাঠাইয়াছিলেন। সেই ছেলেটিকে আমি জীবনে দেখি নাই। শুনিয়াছি সে 'এপ্রুভার' হইয়া অব্যাহতি পাইয়াছিল এবং বিলাতে বহু বৎসর কাটাইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। ইহাকে ধরাইয়া দিয়া যামিনীবাবু অতি উৎকৃষ্ট কাজ করিয়াছিলেন, তাহা না হইলে সমস্ত পরিবারকে জেলে যাইতে হইত। কিন্তু এই ঘটনায় পিতামাতা যে কষ্ট পাইয়াছিলেন, তাহা তাঁহাদের অকাল মৃত্যুর কারণ হইয়াছিল। যেমন বিশাল শাল্মলী তরুবরের ডাল ঝঞ্ঝায় ভাঙ্গিয়া পড়ে, সেইরূপ চোখের সামনে দেখিলাম,—সৌম্য-দর্শন, অপূর্ব্ব সহিষ্ণুতার মূর্ত্তি যামিনীবাবু এই ঘটনায় নীরবে শোকে ভাঙ্গিয়া পড়িলেন। আমার খুড়িমাকে আদালতে পুনঃ পুনঃ যাইয়া সাক্ষ্য দিতে হইয়াছে, এই অপমান যামিনীবাবু সহ্য করিতে পারেন নাই। তিনি আলিপুরের জয়েণ্ট ম্যাজিষ্টেট হইয়াছিলেন, কিন্তু এই সকল পদ-গৌরব তাঁহাকে শান্তি বা স্ফূর্ত্তি দিতে পারে নাই। প্রথম প্রথম গভর্ণ-

মেণ্টের উচ্চ কর্মচারীদের মধ্যে কেহ কেহ ইহাঁকে সন্দেহের চক্ষে দেখিয়াছিলেন, এই অপমান তাঁহার প্রাণে শেলের মত বিঁধিয়াছিল। তারপর নিজের প্রিয় পুত্রের বিরুদ্ধে সস্ত্রীক আদালতের সমক্ষে পুনঃ পুনঃ সাক্ষ্য দেওয়া যে কিরূপ মর্ম্মবিদারক কার্য্য তাহাও সহজে অনুমেয়। তাঁহার শরীর বেশ ভাল ছিল, তিনি কখনও স্বাস্থ্য-নীতি লঙ্ঘন করেন নাই। অথচ যে নিদারুণ কষ্টে তিনি ক্রমে হীনবল হইয়া মৃত্যুর কোঠায় পা দিয়ে চলিলেন, তাহা আর কি বলিব? আমি একদিন দেখিলাম, তিনি জ্বর গায়ে আলি-পুর কোর্টে যাইতেছেন—আমি বলিলাম, "ছোট খুড়া, আজ না হয় নাই গেলেন।" কিন্তু তিনি কুইনাইনের কৌটা দেখিয়া বলিলেন, "দ্যাখ্, রোজ ২০।৩০ গ্রেণ কুইনাইন খাই, এই ভাবে কাজ করি।" তিন মাস তিনি ঘুসঘুসে জ্বর লইয়া কাজ করিয়াছিলেন, কিন্তু যখন বিছানা হইতে উঠিতে পারিলেন না, তখন আর কি করিয়া যাইবেন? মৃত্যু সজোরে আসিয়া তাহার কর্ম্মোৎসুক দেহকে নিরস্ত করিয়া রোগশয্যায় কয়েকদিন আটকাইয়া রাখিয়া শেষে শেষ-মুক্তি দিয়াছিল।

ইতিমধ্যে কতদিন আমি তাঁহাকে বলিয়াছি, "ছোট খুড়া, আপনি আমার বেহালার বাড়ী দেখিলেন না, আলিপুরের এত কাছে!" কয়েক বার তিনি আমার এই সনির্ব্বন্ধ আমন্ত্রণের পাশ কাটিয়া অন্য কথা পাড়িতেন। শেষে আমি নাছোড়বন্দা হওয়াতে একবার বলিলেন, "আমার যাইতে ভয় হয়।" তখন বুঝিলাম, ডাকাতেরা অনেক ভয়ের চিঠি পাঠাইয়াছে; পাছে পথে হত্যা করে, এই ভয়ে তিনি কোথায়ও যাইতেন না। কিন্তু তিনি খুড়ীমাতাকে বেহালায় দু'তিনবার পাঠাইয়া দিয়াছিলেন।

মৃত্যুর একমাস পূর্ব্বে তিনি আমাকে তাঁহার পুত্রকে পাঠাইয়া দুতিন বার ডাকিয়া পাঠাইয়া ছিলেন,—কিন্তু তখন তিনি বাসা পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন, সে বাসা আমি চিনিতাম না, এবং তাঁহার ভ্রাতুস্পুত্র ধীরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত এম, এ, আমাকে তাঁহাব বাসায় লইয়া যাইবেন—এই ভরসা দেওয়ায় ও তাঁহার মৃত্যু যে এত সন্নিহিত তাহা বুঝিতে না পারিয়া আমি যথাসময়ে যাইতে পারি নাই, তজ্জন্য চিবসন্তপ্ত রহিয়াছি। শেষের দিন গিয়াছিলাম, তখন তাঁহার বিকার, আমি যাইয়া তাঁহার হাতখানি আমার হাতের মধ্যে রাখিলাম, তিনি "কেও?" বলিয়া একবার চাহিলেন, এবং "দীনেশ" এই বলিয়া চক্ষু বুজিলেন। তার পর ভয়ঙ্কর কষ্টসূচক কয়েকটি অসংলগ্ন কথা বলিয়া ১০মিনিট পরে প্রাণ ত্যাগ করিলেন। তাঁহার জীবনে পিতৃ অভিশাপের ফল যেন আমি স্পষ্টভাবে দেখিয়াছিলাম, কিন্তু তিনি বা তাঁহার পত্নী তাঁহাদের কষ্টের সঙ্গে যে পিতার মনে দুঃখ দেওয়ায় কোন সংশ্রব ছিল, তা একবারেই মানিতেন না, বরং সুয়াপুরের পাকা বাড়ীঘর এবং সঞ্চিত টাকার অংশ তাঁহাকে না দিয়া যাওয়ার দরুণ তাঁহাদের উভয়েই চিরদিন ক্রুদ্ধ ছিলেন।

চন্দ্রমোহন দাস মহাশয়ের চতুর্থপুত্র জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস এখন সব্‌জজিয়তী করিতেছেন।

কিন্তু তৃতীয় পুত্র কালীমোহন দাসের সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিতে ইচ্ছা হইতেছে। ইহাকে আমি "কাকা" বলিয়া ডাকিয়া থাকি। এবং কথাবার্ত্তায় খুল্লতাত যোগ্য কোন মর্য্যাদা স্বীকার না করিয়া "তুই" শব্দে ব্যবহার করি। কাকার মত কালো নিগ্রো-রাজ্যে পাওয়া গেলেও বঙ্গদেশে সুলভ নহে; চেহারা লম্বা, সর্ব্বদাই মুখে হাসিটুকু লাগিয়া আছে। লেখাপড়া চর্চ্চাটা বেশী হয় নাই—এণ্ট্রেন্স-ক্লাশে যাইয়াই

উপরে উঠিবার পথঘাট না পাইয়া বাড়ীতেই ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। ইনি চন্দ্রমোহন দাসের প্রিয়পুত্র ছিলেন, যেহেতু লেখা পড়া ভাল না শিখায় ইঁহার ভবিষ্যৎসম্বন্ধে পিতা নিরতিশয় দুর্ভাবনা ভাবিতেন। ময়াপুর গ্রামে যখন চন্দ্রমোহন দাস পাকা বাড়ী তৈরী করিতে ছিলেন, তখন সেই এমারত নির্ম্মানের ভার দিয়াছিলেন, কালী মোহনের উপর। সে টাকা ভাঙ্গিয়া গ্রামবাসীদিগকে পোলাও কোরমা খাওয়াইয়া বেশ যশঃ উপার্জ্জন করিয়াছিল। এই সংবাদ পাইয়া চন্দ্রমোহন বাবুর যে কষ্ট হইয়াছিল, বোধ হয় কালীমোহনেব মৃত্যু সংবাদ পাইলে তাহার ততটা হইত কি না সন্দেহ; কারণ তিনি ছেলে মেয়েদেরে ভাল বাসিতেন সত্য, কিন্তু সম্রাটের নামঙ্কিত গোলকের তুলনায় সে ভালবাসা দাঁড়াইতে পারিত না। যতই কেন রাগ না করুন, মরিবার সময় সঞ্চিত টাকার অনেকাংশ তিনি কালীমোহনকেই দিয়া যান, এবং চেষ্টা করিয়া উহাকে ৪০ টাকা মাহিয়ানার একটা কাজ কুমিল্লা কলেক্টরীতে দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া শেষবার চক্ষু মুদিত করিয়া ধরাধাম ত্যাগ করেণ।

মনে হইতেছে যেন কালীমোহন 'দাইল কোম্পানি' কিংবা অন্য কোন কোম্পানির নাম দিয়া একটা ব্যবসায় ফাঁদিয়া বসে,—সেটা একটা মস্ত বড় আড্ডার স্থান হয়,—বন্ধুরা কৃপা করিয়া সেই দোকানে সন্ধ্যায় পদধূলি দিতেন। কর্ত্তৃপক্ষগণ অভ্যাগতদিগকে অভ্যর্থনা-পূর্ব্বক প্রত্যেককে দোকানের মিশ্রি হইতে এক এক গ্লাস সরবৎ খাওয়াইতেন, শেষে এমন দাঁড়াইয়াছিল যে রোজ প্রায় ৬০।৭০ গ্লাস মিশ্রির সরবৎ খরচ হইত। এইভাবে সেই কোম্পানির লীলা অবসান হয়। তখন কি এক অপরাধে তাহার কাজটি যায়, এবং তিনি পিতৃদত্ত ২০০০০৲ টাকা লইয়া বাড়ী আসিয়া সখের নাট্য-

দলের প্রতিষ্ঠা করেন, বোধ হয় তিনি তাঁহাদের মধ্যে কৃষ্ণঠাকুর সাজিতেন, কারণ সেই বেশেই তাহাকে ভাল মানাইত। দলের প্রত্যেক লোককে এবং আগুন্তুকদিগকে পর্য্যন্ত তিনি প্রত্যহ ছাগ মারিয়া, পোলাও করিয়া দুই বেলা খাওয়াইতেন। এই অবস্থায় দুচারি বছর, তাহার বাড়ীতে এরূপ ধূমধাম চলিল, যেন জাহাঙ্গীর বাদসার বিবাহ হইতেছে। তারপর রৌপ্য চক্রগুলি ভগবানের সুদর্শন চক্রের ন্যায় আকাশে চলিয়া গেল, এবং এখন কালীমোহন দৈন্যের চরম দশায় পড়িয়া ছোট ভাই জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস সবজজের দত্ত মাসিক কয়েকটি টাকার উপর নির্ভর করিয়া কায়ক্লেশে বহু সন্ততিপূর্ণ পরিবার পালন করিতেছেন। তাঁহার হস্তের প্রসার এখনও কমে নাই। যে দিন ভাতৃ-দত্ত টাকা কয়েকটা আসে, সেই দিন রুইমৎস্য ও ভাল সন্দেশ খাইয়া বেজায় স্ফূর্ত্তির সঙ্গে বাগানে বেড়াইতে থাকেন, তার পরদিন হইতে ধার করিবার জন্য এখানে সেখানে ঘোরেন।

কিন্তু ইহার চরিত্র অতি বিশুদ্ধ। পরকে খাওয়াইয়াই ইহার আনন্দ, এবং তাহা না পারিলে যে ইনি কি কষ্ট বোধ করেন, তাহার একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। ভগবান এই নিরীহ উদার-প্রকৃতি লোকটির উপর নির্ম্মম হইয়া যেন শিক্ষা দিতেছেন কার্পণ্যই প্রশস্ত, মুক্ত-হস্ততা বিধেয় নহে। অবশ্য কাণ্ডাকাণ্ড-বুদ্ধি-রহিত্বতাটা ভগবানের নিকটও অমার্জ্জনীয়।

তিন বৎসর অতীত হইল, আমি শুয়াপুর গিয়াছিলাম। বহু দিন পরে মাতৃভূমি দেখিতে যাওয়া, প্রায় ৩৩ বৎসর পরে। আমার বাড়ীর ভিটার পথেই কালীমোহন দাসের বাড়ী। আমি ঘাটে নৌকা লাগাইয়া তাহাদের বাড়ীতে উঠিয়া ডাকিলাম, "কাকা বাড়ী আছিস্?" উত্তরে

শুনিলাম "বাড়ী নাই"। কিন্তু তথা হইতে ফিরিয়া যাইয়া শুনিতে পাইলাম, কাকা বাড়ীতে ছিল, কিন্তু তাহার হাতে একটা পয়সা ছিল না—যে আমাকে জল খাওয়াইয়া আদর করিতে পারে,—আমি এতদিন পরে বাড়ী আসিয়াছি—সেই ক্ষোভে ও শোকে সে আমার গলার আওয়াজ পাইয়া তাহার শয্যাগৃহের খট্টার নীচে লুকাইয়াছিল।

কালীমোহনের বাহিরটা যে পরিমানে কালো, মনটা সেই পরিমানে সাদা। সে যেরূপ অভাবগ্রস্ত, সেই পরিমানে ব্যয়শীল। জীবনের অনেক ভুল ভ্রান্তি সত্বেও এই সচ্চরিত্র অথচ দুঃস্থ ব্যক্তির প্রতি মনটা সহজেই অনুরাগী হয়, এবং ইহার সন্দ-সুখের জন্য চিত্ত লালায়িত হইয়া থাকে।

(৫)

পিতৃদেবের কথা।

আমার পিতৃদেব ঈশ্বরচন্দ্র সেন ১৮২৫-খৃষ্টাব্দে সুয়াপুর গ্রামে জন্ম-গ্রহণ করেন। তিনি শৈশব জীবনে তাঁহার মাতুলদ্বয় ভগবান দাস ও চন্দ্রমোহন দাসের সঙ্গে গ্রাম্য আমোদ প্রমোদ, যথা নৌকা লইয়া নদীতে "বাছ" দেওয়া, গাছে গাছে উঠিয়া আম পাড়া, প্রভৃতি করিয়া বেড়াই-তেন। রঘুনাথ সেন মহাশয় পুত্রটিকে স্বীয় মক্তবে বাঙ্গলা ও ফার্শী পড়াইয়াছিলেন। পিতা ছোটকাল হইতেই শান্ত-শিষ্ট বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। মাতৃহীন বালক; পিতা বৃক্ষ-বপন লইয়া ব্যস্ত, জ্যেষ্ঠ-তাত শব সাধনায় রত, কে তাঁহাকে দেখিবে? রঘুনাথ সেনেরা তখনও মাতুলের সংসারেই ছিলেন। তাঁহার মাতুল ভ্রাতা রামকুমার দাসের তখনও সন্তানাদি হয় নাই। শ্রীযুক্ত দেবীচরণ দাস লিখিয়াছেন, "রামকুমারদাসের পেয়ারের ছিল শিশু-ঈশ্বরচন্দ্র। তিনি তাহাকে জরির জুতা, সাটিনের চাপকান, ইজার ও জরিপাড় চাদর ও নানাপ্রকার মূল্যবান কাপড় পরাইয়া সুখী হইতেন।" বালকের বর্ণ গৌর ছিলনা, কিন্তু শ্যামবর্ণের হাত হইতে উদ্ধার পাইয়া রংটি প্রায় গৌরবর্ণকে ধরিবে ধরিবে করিয়াছিল, ইহার মধ্যেই আদি শিল্পীর নির্ম্মাণ কার্য্য শেষ হইয়া গেল। চুলগুলি কোঁকড়ান ছিল, আর এতবড় ডাগর পদ্মের পাপড়ির মত চোখ দুটি খুব কমই দেখা যাইত। গৌরবর্ণ না হইয়াও ছেলে দেখিতে এত চমৎ-কার হইতে পারে, লোকেরা তাঁহাকে দেখিয়া বলাবলি করিত। বুদ্ধি ও

কমনীয়তা পূর্ণ চেহারায় মুগ্ধ হইয়া পূর্ববঙ্গের তাৎকালিক সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি —ঢাকা জেলা কোর্টের সরকারী উকীল গোকুলকৃষ্ণ মুন্সী মহাশয় তাঁহার কন্যা রূপলতা দেবীকে ইঁহার সঙ্গে বিবাহ দেন ; তখন আমার পিতার বয়স ১৫।১৬। মুন্সী মহাশয়ের এই বিবাহে সম্মত হইবার অপর এক-কারণ—আমরা কুলীন ছিলাম।

এই বিবাহের পরে পিতৃদেব ঢাকা জেন্দাবহরের গলিতে তাঁহার শ্বশুরালয়ে আসিয়া বাস করিতে থাকেন। তখন রাজা রামমোহন রায়ের 'পৌত্তলিকতা নিরাসন' 'বেদান্তসূত্র' প্রভৃতি পুস্তক বাহির হইয়াছে। পিতৃদেব ঢাকায় আসিয়া ইংরেজী শিখিবার বিশেষ সুবিধা পান, এবং অল্প সময়ের মধ্যে ঐ ভাষায় পারদর্শী হইয়া উঠেন।

তখন ইংরেজী শিক্ষার ফলে যাহা হইত তাঁহার তাহাই হইল, তিনি নব ব্রাহ্মমতের পক্ষপাতী হইয়া পড়িলেন। এদিকে আমার মাতামহের আবাসে নিত্য কবিগান, যাত্রা, এবং দেবদেবীর উৎসব হইত। কিন্তু আমার পিতা শান্ত ও মৃদুস্বভাব হইয়াও তাঁহার প্রবল প্রতাপান্বিত শ্বশুরের অনুরোধ-উপরোধ এড়াইয়া একটা নির্জ্জন প্রকোষ্ঠে একাকী বসিয়া পড়াশুনা করিতেন। তিনি কোন ঠাকুর দেবতার নিকট মাথা নোয়াইতেন না, কোন যাত্রা বা কবিগানের আসরে উপস্থিত হইতেন না, কোন পূজা বা উৎসবে যোগ দিতেন না। কবির দলে স্ত্রীপুরুষ একত্র হইয়া গাইত। খেমটা নাচ ও বিদ্যাসুন্দরের যাত্রা তখন আসর মাৎ করিয়া দিত। সেই আসর কখনও ভক্তির বন্যায় ভাসিয়া যাইত, কথকতা ও কীর্ত্তন শুনিয়া লোকেরা যথাসর্ব্বস্ব দান করিয়া ফেলিত ; তখন এমনই প্রাণ ছিল, এমনই দান ছিল ! কিন্তু আবার কখনও অতি কদর্য্য বিকৃত রুচির গান—যাহার নাম ছিল "লাল" তাহা ছেলেতে বুড়োতে একত্র হইয়া

শুনিত। ভোলাময়রা ও গোপাল উড়ের কথা কে না শুনিয়াছে? এইতো যুগ! শিক্ষিত আধুনিক তন্ত্রী যুবকেরা কবি ও যাত্রার প্রতি যেরূপ বিমুখ ছিলেন, কীর্ত্তন ও কথকতার প্রতি ও সেইরূপই বিমুখ ছিলেন। তাঁহারা এ সমাজের ভালমন্দ উভয়ের কিছুই চাহিতেন না; আত্মনিষ্ঠ, স্বীয়শ্রেষ্ঠত্বে নিঃসংশয়,—ভাবের শুষ্ক এক ব্রহ্ম-ডাঙ্গায় বসিয়া —আত্মতৃপ্তি অনুভব করিতেন। আমার মাতুলেরা আমার পিতাকে কিছুতেই আমোদ উৎসবের আসরে টানিয়া আনিতে পারিতেন না, তাঁহাদের চেষ্টার বাড়াবাড়ি হইলে তিনি স্বীয় প্রকোষ্ঠে অর্গল বন্ধ করিয়া ফেলিতেন।

পিতার প্রতিষ্ঠা ঢাকার নব-প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্ম-সমাজে বাড়িয়া চলিল। আমার মতামহ এরূপ দুর্দ্ধর্ষ ছিলেন, যে তাঁহার কথার প্রতিবাদ তিনি কিছুতেই সহ্য করিতে পারিতেন না। বিশেষ নিজ পরিবারের মধ্যে তাঁহার অখণ্ড প্রতাপের কিছুমাত্র ব্যত্যয় ঘটিলে তাঁহার ক্রোধাগ্নি জ্বলিয়া উঠিত। অথচ মৃদু স্বভাবাপন্ন পিতা তাঁহার বাটীতে থাকিয়া কোন পূজার উৎসবে যোগ দিতেন না, কোন ব্রাহ্মণ পুরোহিত বা দেব-প্রতিমার নিকট মাথা নোয়াইতেন না। প্রকাশ্যে কোন বক্তৃতা করিয়া প্রতিবাদ তিনি করিতেন না, কিন্তু ঐরূপ কোনবিষয়ে আদিষ্ট হইলে তিনি তাঁহার বড় দুটি শান্ত চোখে আমার মাতামহের দিকে চাহিয়া বিনতি সহকারে বলিতেন "আমি পারিব না", ফুলদলে যেন শাল্মলীতরু কাটা যাইত; মাতামহ ভিতরে যতই কেন বিরক্ত না হউন, তাঁহার শান্তস্বভাব ধীর গম্ভীর জামাতার কাছে যেন নিতান্তই হীনবল হইয়া পড়িতেন, কারণ তিনি জানিতেন আমার পিতা যাহা বলিয়াছেন, তাহা অতি মৃদুভাবে বলিলেও সে কথার পশ্চাতে দুর্জ্জয় নৈতিক শক্তি লুকায়িত আছে। এ কথার উপর জোর করিলে তিনি জামতাটিকে

চিরদিনের জন্য হারাইবেন; তিনি সে বাড়ীতে আর তিলার্দ্ধকাল থাকিবেন না, এবং আমার মাতামহী তাহা হইলে অন্নজল ত্যাগ করিবেন এবং মাতামহেরও নিন্দার অবধি থাকিবে না, কারণ পিতৃদেবকে তাঁহার চরিত্রের গুণে, চাকর-বাকর হইতে আরম্ভ করিয়া সকলেই শ্রদ্ধা করিত ও ভালবাসিত।

ভিন্ন মতাবলম্বী হইলেও আমার পিতৃদেবকে মাতামহ অত্যন্ত বিশ্বাস করিতেন। কোন সাংসারিক বিষয়ে তাঁহার কথা শুনিলেই তাহা স্থির বিশ্বাস করিতেন। "ঈশ্বর ইহা বলিয়াছে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই ঘটনা এইরূপ।" সত্যবাদী বলিয়া তিনি পিতাকে জানিতেন এবং সমস্ত বিষয়ে তাঁহার মত লইয়া কার্য্য করিতেন।

আমোদপ্রমোদের বিরুদ্ধে স্বগৃহের অর্গল বন্ধ করিয়া তিনি কি ভাবে সময় কাটাইতেন, তাহা তাঁহার রচিত "সত্যধর্ম্মোদ্দীপক নাটকে" কবিতার ছন্দে লিখিত আছে।

বাসনা যদ্যপি হয় আলোক দর্শনে!
চল মন হেরি গিয়ে সুদৃশ্য গগনে॥
শুধেন্দু যথায় করে নিত্য বিচরণ।
লইয়া নক্ষত্র সব অনুচরগণ॥
নৃত্য সন্দর্শনে যদি হও আকিঞ্চন।
কেন মন নাহি যাও শিখির ভবন॥
সঙ্গীত শ্রবণে যদি হয় ব্যাকুলিত।
বিহঙ্গম গানে মন হবে প্রফুল্লিত॥
উচ্চাসন নিম্নাসন ভেদের কারণ।
নাহি ভেদাভেদ তথা করিতে দর্শন॥
অনায়াসে লভ তারা সবাকার ঠাঁই।
দুর্গতি হইবে কিন্তু বিভিন্নতা নাই।"

অবশ্য নৃত্য দর্শন করিতে হইলে যে রূপসীকে একবারে বর্জ্জন করিয়া ময়ুরময়ূরীর পেছন পেছন ছুটিতে হইবে এবং চন্দ্র-নক্ষত্র-ভূষিত আকাশ দেখিয়াই যে আমার দীপোজ্জ্বল হর্ম্ম্যরাশির উৎসবের প্রতি বিমুখ হইয়া বসিব—একথা আমি মানিয়া লইতে পারিব না। কিন্তু সেকালে ব্যভিচারের স্রোত এরূপ চলিয়াছিল, যে নৈতিক বলসম্পন্ন দৃঢ়চরিত্র ও পবিত্রচেতা যুবকদিগের এই সকল আমোদপ্রমোদের বিরুদ্ধে একটা প্রবল ভ্রূক্ষেপ শূন্য প্রতিকূলতা দেখাইবার প্রয়োজন হইয়াছিল। নৈতিক যুদ্ধক্ষেত্রে পিতৃদেব বীরের ন্যায়ই যুঝিয়াছিলেন।*

* ১৯১৩ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল সংখ্যা লণ্ডনের 'এসিয়াটিক রিভিউ' পত্রিকায় আমার একটি জীবতচরিত প্রকাশিত হয়—তাহাতে পিতৃদেব সম্বন্ধে এইরূপ উল্লিখিত আছে:—

Mr. Sen's maternal grandfather was a typical Bengali country gentleman, lavish in expenditure on the musical plays called yatras and other such amusements, which being performed before the family temple are held to give pleasure to gods as will as to mortals. All such dissipations were uncongenial to Mr. Sen's father who thought them at once frivolous and irreligious. He was something of an authority on the doctrines of Samaj and wrote books on the subject. He also composed hymns and spiritual songs, one of which is roughly translated, to the following effect, "My soul, if you would enjoy the sight of beautiful dancing, what need is there to frequent gaudily-dressed dancing girls? what is more entrancing than the dance of the peacock? What bayde're's dress can compare with his splendid attire? And if you love the brilliant midnight illumination of royal palaces, what can compare with the glorious firmament where the moon holds court among his minister stars? In courtly entertainments a petty question of precidence may cause jealosy and heart-burning, but here is an entertainment open to all, king and cowhard alike.

সম্ভবতঃ ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে এই পুস্তক রচিত হইয়াছিল—এই পুস্তকের ভাষা সেই আমলের ভাষার পক্ষে বেশ সরল রচনা, তখনও বঙ্কিমচন্দ্রের কোন উপন্যাস রচিত হয় নাই, তখনকার কবি ছিলেন রঙ্গলাল এবং দ্বারকা নাথ অধিকারী।

তাঁহার রচনাব উৎকৃষ্ট অংশ শেষের দিকে ছিল, তাহা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। যাহা হউক, যাহা পাইয়াছি—তাহা হইতেই কিছু নমুনা দিতেছি :—

"দুর্গানন্দ - ভাল, পূর্ব্বে যখন আপনার সহিত রাজা রামমোহন রায়ের সভায় বিচার হইয়াছিল, তখন ত আপনি শাস্ত্র ঈশ্বর প্রণীত বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। এক্ষণে যে তাহা সম্পূর্ণরূপে অবিশ্বাস করিতেছেন, এমন অকস্মাৎ পরিবর্ত্তন কি প্রকারে হইল?

"ব্রহ্মানন্দ—হাঁ, তখন ব্রাহ্মরা বৈদান্তিক ছিলেন, সুতরাং সে সময়ে আপ্ত বাক্যে বিশ্বাস ছিল। কিন্তু যেমন পৃথিবীর প্রাক্কাল হইতে সমুদয় বিষয়ই উন্নতি লাভ করিতেছে, তেমনই ধর্ম্মমতও এক্ষণ পরিশুদ্ধ হইয়াছে।

"দুর্গানন্দ—আশ্চর্য্য! আপনি যে সমুদয় বিষয়েই এককালীন বিপর্য্যয় ভাবাবলম্বন করিয়াছেন; কেন না পৃথিবীর কোন বিষয়েই এক্ষণে উন্নতি লাভ হয় নাই, বরং কুকর্ম্মেরই উন্নতি হইয়াছে। সত্য যুগে কিদৃশ সমতা ভাব ছিল, ধর্ম্ম যেন তৎকালে পৃথিবীতে মূর্ত্তিমান ছিলেন। দ্বিধা ভাব কাহাকে বলে, তখন তাহা জানিত ছিল না। তবে কি প্রকারে পৃথিবী উন্নতিশালিনী হইল?

"ব্রহ্মানন্দ—পৃথিবীর সকল বিষয়ে কি উন্নতি হয় নাই? দেখুন; পুরাকালে মানুষেরা বৃক্ষকোটরে এবং মৃত্তিকার নীচে গর্ত্ত খনন করিয়া অবস্থান করিত। এক্ষণে সুরম্য মনোহারী হর্ম্ম্যাবলী শিল্প-কার্য্যোন্নতি পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। লৌহের গুণ অপরিচিত থাকায় পূর্ব্বে কেবলমাত্র বাহুযুদ্ধ ও মল্লযুদ্ধই প্রচলিত ছিল, ক্রমে লৌহের গুণ প্রকাশিত হইলে অস্ত্রযুদ্ধ, পরে বাণযুদ্ধ প্রচলিত হয়, তৎপরে চীনদেশে বারুদের গুণ আবিষ্কৃত হওয়া অবধি বন্দুক দ্বারা যুদ্ধের কি অপূর্ব্ব উন্নতি হইয়াছে! ইলেক্‌ট্রিক-টেলিগ্রাফ, রেলরোড ও অর্ণবযান, পদার্থ বিদ্যা ও

বিজ্ঞান শাস্ত্রের উন্নতি পক্ষে * * * * * * সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। ঐতিহাসিক ও ভৌগলিক বিদ্যার প্রভাবে মনের ক্ষুদ্রত্ব দূর হইয়া কি পর্য্যন্ত প্রশস্ততা লাভ হইয়াছে, তাহা ক্ষণকাল চিন্তা করিলে সহজেই প্রতীতি হইতে পারে। সর্ব্বপ্রথমে বর্ণপরিচয় অপরিজ্ঞাত ছিল বলিয়াই একে অন্যের বাক্য শ্রবণ করিয়া স্মরণ রাখিতেন, তজ্জন্যই শ্রুতিশাস্ত্রের নামোদ্ভূত হয়। বর্ণজ্ঞান উপলব্ধি হওয়া অবধি অলক্তক দ্বারা তৎসমুদয় ভূর্জ্জপত্রে এবং তালপত্রে লিপিবদ্ধ হইত! তদুন্নতি পক্ষে এক্ষণে কাগজ, মসী ও মুদ্রাযন্ত্র সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। * * * সনাতন ব্রাহ্মধর্ম্মরূপ চন্দ্র কাল্পনিক পৌত্তলিক মত রূপ রাহু দ্বারা কবলিত হইয়া এক্ষণে ক্রমে ক্রমে অস্মদ্দেশে কি প্রকারে সেই গ্রাস পরিত্যক্ত হইয়া উহার বিমল জ্যোতিঃ প্রকাশ করিতেছে! * * * * যেমন কোন গ্রন্থ প্রচার সময়ে বিশেষ রূপ আদৃত হইবার জন্য কোন সুবিখ্যাত জগন্মান্য গ্রন্থকারের নাম দেওয়া হইয়া থাকে, ব্রহ্মার বেদ প্রকাশ করাও ঠিক সেইরূপ, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। যদি ব্রহ্মারই বেদ প্রকাশ করিবার ইচ্ছা হইত, তাহা হইলে চন্দ্র, সূর্য্য সদৃশ জ্যোতির্ম্ময় অক্ষরে সর্ব্বস্থানব্যাপক গ্রন্থ অবশ্যই প্রচার করিতে পারিতেন।"

ইহার পরে আছে যে ব্রহ্মা যে সেরূপ গ্রন্থ প্রচার করেন নাই—তাহা নহে, মানবের মনই সেই মহাগ্রন্থ।

পিতৃদেব দিনাজপুরের একখানি মৌলিক ইতিহাস লিখিয়াছিলেন, তাহা ছাপা হইলে ২।৩ শত পৃষ্ঠা হইত। সেই পুস্তকের পাণ্ডুলিপি আমারই অবহেলায় নষ্ট হইয়া গিয়াছে। তাঁহার মুদ্রিত দুইখানি বইএর বহু খণ্ড আমাদের বাড়ীতে ছিল, আমি যখন 'এলে' ক্লাসে পড়ি—তখনও সেগুলি ছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় তখন আমি সেগুলির প্রতি কোনরূপ যত্ন দেখাই নাই। পিতৃদেব কখনই ক্রোধ বা বিরক্তি প্রকাশ করিতেন না, কিন্তু এই সকল পুস্তক যখন আমারই অনবধানতায় প্রায় নষ্ট হইয়া গিয়াছিল, তখন একদিন বলিয়াছিলেন, "এগুলি নষ্ট করিয়া ফেলিতেছ, কিন্তু এক সময়ে হয় ত খুঁজবে—তখন

পাইবে না।" তাঁহার আশঙ্কা ফলিয়াছে, আমি অনেক অর্থব্যয় করিয়া বহু চেষ্টায় ও মুদ্রিত "ব্রহ্মসঙ্গীত রত্নাবলীর" এক খণ্ড পুস্তক এমন কি একখানি পত্রও সংগ্রহ করিতে পারিলাম না।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে ব্রাহ্মধর্ম্মে একান্ত অনুরাগী হইয়াও তিনি নবযৌবনে একটি সরস্বতীর স্তোত্র রচনা করিয়াছিলেন, তাহা সম্ভবতঃ ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে। স্তোত্রটি এই :—

"সারদে বরদে বাণী,নারয়ণী বীণাপাণি,
তার মাগো সর্ব্বপ্রাণী, ভবভয়ভঞ্জিনী।
মণ্ডিত মল্লিকামালা, দশদিক্ করে আলা,
ভুবনমোহিনী বালা, সর্ব্ব মনোরঞ্জিনী।
ত্বমাদ্যা প্রকৃতি সতী, অগতি জীবের গতি।
ত্বংহি মাতা ভগবতী, গিরিরাজনন্দিনী
কোমলাঙ্গী সিতচ্ছবি, উজ্জ্বলা জিনিয়া রবি,
চরণাবনত কবি, সুররাজনন্দিনী।
সরাগ রাগিণী রঙ্গে, তালমান সুপ্রসঙ্গে
অমরঅমরী সঙ্গে, নৃত্যগীতরঙ্গিণী।
আসরে আসিয়া উর, অজ্ঞানের আশা পূর,
সুরেশ্বরী মহাশূর হরিহর সঙ্গিণী।"

তখন ঢাকাজেলার তেঁতুলঝোরা নিবাসী ব্রজসুন্দর মিত্র মহাশয় সেকালের ডিপুটি ছিলেন, তিনি নব্যতন্ত্রী; ব্রাহ্মধর্ম্মে তাঁহার এরূপ আস্থা ছিল এবং সমাজসংস্কারে তিনি এরূপ উদ্যোগী ছিলেন যে, তিনি তাঁহার বিধবা কন্যার পুনরায় বিবাহ দিয়াছিলেন। এই ঘটনা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের হিন্দুসমাজে বিধবা-বিবাহ প্রচলনের অন্যতম ফল এবং সমাজের প্রাথমিক সংস্কার চেষ্টা। সম্প্রতি ব্রজসুন্দর মিত্র মহাশয়ের যে বৃহৎ জীবনী প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে তাঁহার বন্ধুবর্গের মধ্যে আমার পিতৃদেবের

নাম আছে এবং তাঁহার সহিত যে ব্রজসুন্দর বাবুর সর্ব্বদা পত্র-ব্যবহার চলিত, তাহারও উল্লেখ আছে। ব্রজসুন্দর বাবু ঢাকায় নবপ্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন। পিতৃদেবের আর একটি অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন.সাহিত্যক্ষেত্রে প্রসিদ্ধ 'সদ্ভাব শতকে'র কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার। ইনি আমাদের সুয়াপুর গ্রামের অভয়শঙ্কর সেন মহাশয়ের ভগিনীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। কৃষ্ণচন্দ্র জীবনের উত্তমকালে ব্রাহ্মমতাবলম্বী ছিলেন। 'সীতার বনবাসে'র কবি নবসমাজের বিশিষ্ট শ্রদ্ধেয় হরিশ্চন্দ্র বাবু পিতৃদেবের অন্যতম সুহৃদ্।

পিতৃদেব তাঁহার পিতার নিকট ফার্শী শিখিয়াছিলেন, আমার মাতামহের বাড়ীতেও ফার্শীবিদ্যার খুব প্রচলন ছিল। ঈশ্বরচন্দ্রের হাতের লেখা একখানি ফার্শী কাগজ আমার নিকট ছিল, তাহা হারাইয়া ফেলিয়াছি। ঐ কাগজখানি ধামরাই গ্রামবাসী ময়ুরভঞ্জ ষ্টেটের ডিপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত কামাখ্যাচরণ বসু বিএ, বিএল, মহাশয় আমাকে দিয়াছিলেন।

পিতৃদেব ইংরাজীতে বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। সে আমলে লোকে এডিসনের স্পেক্‌টেটাব, জন্‌সনের র‍্যামব্লার এবং রাসেলাস, লাইফ অফ এম্পারার চার্লস দি ফিফ্‌ত, এ্যালেকজাণ্ডার পোপ, গোল্ড-স্মিথ ও ড্রাইডেনের কবিতা—এই সব পুস্তক বেশী পড়িতেন। ঈশ্বরচন্দ্র এই সমস্ত পুস্তক খুব ভাল করিয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহার পুস্তকাগারে তাঁহার নিজ হাতের নোটশুদ্ধ এই সকল পুস্তক আমি ছোটকালে দেখিয়াছি।

তিনি ইংলিশম্যান প্রভৃতি পত্রিকায় সর্ব্বদা প্রবন্ধ লিখিতেন, এবং ইংরাজী ও বাঙ্গালায় দাঁড়াইয়া অনর্গল বক্তৃতা করিতে পারিতেন। সেকালের ব্রাহ্মসমাজে ততটা গোড়ামি ছিল না। এইজন্য ঈশ্বরচন্দ্র

সমাজে দীক্ষিত না হইলেও ঢাকার ব্রাহ্মসমাজে উপাচার্য্য হইয়া বেদীর উপর হইতে বক্তৃতা করিতেন। ঢাকার তখনকার প্রকাশিত কোন কোন সংবাদপত্রে তাঁহার বক্তৃতাগুলি প্রায়ই প্রকাশিত হইত। সেই পত্রিকাগুলি আমি শৈশবে ঘুড়ি বানাইয়া নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছিলাম। জীবনে একদিন তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়াছিলাম। মাণিকগঞ্জের একজন সর্ব্বজনপ্রিয় মুন্সেফ স্থানান্তরিত হওয়ার সময় তাঁহাকে বিদায় দেওয়ার উপলক্ষে মহতীসভার অধিবেশন হয়, তখন তিনি যেরূপ সুন্দর ও হৃদয়গ্রাহী ভাষায় তাঁহার বন্ধুর গুণগরিমা প্রচার করিয়াছিলেন, তাহাতে সকলেই মুগ্ধ হইয়াছিলেন। তাঁহার বক্তৃতা সহজ সরলভাবে কথা বলার মত ছিল না—তাহা বড় বড় সমাসবদ্ধ পদাড়ম্বরে উদ্দীপনাময় হইয়া উঠিত, কোন স্থানে যতিভঙ্গ বা তালভঙ্গ হইত না। সমানভাবে ওজস্বিতা রক্ষা করিয়া শ্রোতৃবর্গকে চমৎকৃত করিয়া শেষে সপ্ততন্ত্রীর তান যেরূপ ক্রমে ক্রমে মন্দীভূত হইয়া পড়ে, সেই ভাবে শেষ হইত।

পিতৃদেবের আর এক প্রিয়বন্ধু ছিলেন, নবকান্ত চক্রবর্ত্তী। ইনি বহুকাল ঢাকার ব্রাহ্মসমাজের নেতৃত্ব করিয়া কয়েক বৎসর হইল স্বর্গ লাভ করিয়াছেন। ইঁহার এক কন্যাকে শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বিবাহ করিয়াছেন। ধামরাই স্কুলে পিতা প্রধান শিক্ষক ছিলেন এবং নবকান্ত বাবু দ্বিতীয় শিক্ষকের কাজ করিতেন। পরম শ্রদ্ধেয় শিবনাথ শাস্ত্রীর মুখে আমি পিতার প্রশংসা-সূচক অনেক কথা শুনিয়াছি। ঢাকায় পিতৃদেব কয়েক বৎসর ওকালতি করিয়াছিলেন, কিন্তু বিশেষ পশার হয় নাই। তিনি সর্ব্বদা থিওডোর পার্‌কারের গ্রন্থ লইয়া থাকিতেন, মক্কেলের কাজের দিকে বিশেষ কোন দৃষ্টি ছিল না। তাঁহার আদর্শ-জীবন ছিল সচ্চরিত্র দরিদ্রের জীবন। বড় লোকদিগের ব্যাভিচার-দুষ্ট সংসর্গ তিনি ঘৃণা করিতেন। কিছুদিন পরে তিনি ধামরাই স্কুলের

প্রধান শিক্ষকের পদ গ্রহণ করেন, ১৮ বৎসর তিনি এই শিক্ষকতা করিয়াছিলেন।

এই শিক্ষকতাকালে তিনি ধামরাই স্কুলটি ঢাকা-বিভাগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যালয়ে পরিণত করেন। ইহাঁর ছাত্রগণের মধ্যে অনেকেই কৃতী হইয়া দেশের মধ্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। ষ্ট্যাটুটারী সিভিলিয়ান মিষ্টার অম্বিকাচরণ সেন মহাশয় আমার নিকট জ্ঞাতিত্ব সম্বন্ধে খুল্লতাত ছিলেন। ইনি পিতার আশ্রয়ে থাকিয়াই ধামরাইস্কুলে শিক্ষা লাভ করেন। পিতাই তাঁহাকে ব্রাহ্মধর্ম্মে মত লওয়াইয়াছিলেন। ইনি যখন পিতৃদেবের কথা বলিতেন, তখন মনে হইত, তাঁহারই চরিত্র ও সাধু জীবনের আদর্শ অনুকরণ করিতে তিনি প্রয়াসী ছিলেন। পিতার আর এক ছাত্র স্বনামধন্য ডাক্তার চন্দ্রশেখর কালী। আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, "পিতার প্রভাব তাঁহার সমস্ত ছাত্রের জীবনেই কোন না কোন রূপে লক্ষিত হইয়াছে, কিন্তু আপনি এরূপ গোঁড়া হিন্দু রহিয়া গেলেন কিরূপে?" তিনি বলিয়াছিলেন "আমিও তাঁহার প্রভাবে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি অনুরক্ত হইয়াছিলাম, শেষে মতি গতি ফিরিয়াছে।" তাঁহার আর দুই ছাত্র গৌহাটী জেলা কোর্টের সর্ব্বপ্রধান উকীল স্বর্গীয় দীননাথ সেন, এবং বাঁকিপুরের ভূতপূর্ব্ব উকীল ব্রজেন্দ্রকুমার দাস,—ইনি ওকালতিতে অনেক টাকা উপার্জ্জন করিতেছিলেন, হঠাৎ বৃন্দাবনে গিয়া সর্ব্বত্যাগী হইয়া সন্ন্যাস ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছেন। পিতার জীবনের প্রভাব যে তাঁহার উপর বিলক্ষণ পড়িয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। বহুদিন হইল তিনি আমাকে লিখিয়াছিলেন "তোমার পিতা আমারও পিতাই ছিলেন।"

সুয়াপুর বাসী স্বনাম ধন্য ষ্টাটুটারী সিভিলিয়ান স্বর্গীয় কেদার নাথ রায়—যিনি 'আলো ও ছায়া'র কবি শ্রদ্ধাস্পদা কামিনী সেনকে বিবাহ

করেন, এবং যাঁহার তিন পুত্র এখন সিভিল সার্ভিস অলঙ্কৃত করিতেছেন, তিনি ও পিতার নিকট শৈশবে পড়িয়াছিলেন এবং তাঁহারই প্রভাবে ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হন।

পিতৃদেব রচিত দ্বিতীয় পুস্তকের নাম 'ব্রাহ্ম-সংগীত রত্নাবলী', ইহাতে রাজা রাম-মোহন রায়ের ভাবে অনেকগুলি ব্রহ্ম-সংগীত বিরচিত হইয়াছিল। এই পুস্তকখানি আমার জন্মের অর্থাৎ (১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের) দুই তিন বৎসর পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল। 'ব্রহ্মসংগীত রত্নাবলী' হইতে কয়েকটি গান নবকান্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের ব্রহ্মসংগীত সংগ্রহের প্রথম সংস্করণে সঙ্কলিত হইয়াছিল। দুর্ভাগ্যবশতঃ প্রকাশিত দুইখানি পুস্তকই নষ্ট হইয়া গিয়াছে। সত্যধর্ম্মোদ্দীপক নাটকের কয়েকটী পত্র মাত্র আমার নিকট আছে।

অষ্টাদশ বর্ষকাল পিতৃদেব ধামরাই স্কুলে শিক্ষকতা করেন। মার্টিন, উড্রো ও অন্যান্য ইনস্পেক্টর সাহেবদের লিখিত তাঁহার সম্বন্ধে ভূরি ভূরি প্রসংসাপত্র আমাদের গৃহে ছিল। তাঁহারা এক-বাক্যে পিতৃদেবের শিক্ষাপদ্ধতি ও স্কুলের সাফল্যসম্বন্ধে প্রশংসা করিয়াছিলেন।

পিতৃদেব সম্বন্ধে মানিকগঞ্জের উকিল-সরকার আমার পূজনীয় শিক্ষক শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র সেন লিখিয়াছেন:—"ঈশ্বরচন্দ্র ধামরাই স্কুলের শিক্ষক ছিলেন, পরে কমিটি পাশ করিয়া এখানে উকীল হন। তাঁহার সময়ে তিনিই এক মাত্র ইংরেজী-জানা উকিল ছিলেন এবং বাঙ্গলা নবীশ উকিলেরা তাঁহাকে ঈর্ষা করিতেন এবং হাকিমেরা তাঁহাকে খুব সম্মান করিতেন। তাঁহার মক্কেলেরা তাঁহাকে খুব শ্রদ্ধা করিত।" বাঁকিপুরের প্রসিদ্ধ উকীল ৭৫ বৎসর বয়স্ক ব্রজেন্দ্র মোহন দাস এখন সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়া বৃন্দাবনে আছেন, তাহা পূর্ব্বেই লিখিয়াছি। তিনি

পিতৃদেবের সম্বন্ধে একখানি সুদীর্ঘ পত্র ইংরেজীতে লিখিয়াছেন। তিনি পিতৃদেবের ঋণ যে ভাবে স্বীকার করিয়াছেন তাহা পাঠ করিয়া স্বতই গৌরব বোধ করিতেছি—তাহা ভক্তের পুষ্পাঞ্জলী - কিন্তু তিনি যে সকল কথা লিখিয়াছেন—তাহার প্রায় সকল গুলি কথাই ডাক্তার চন্দ্রশেখর কালী মহাশয়ের পত্রে আছে; চন্দ্র-শেখর বাবু তৎসময়ের শিক্ষা দীক্ষার যে আনুসঙ্গিক চিত্র দিয়াছেন, তাহা, পূর্ব্ব-বঙ্গের অতীত সামাজিক-ইতিহাসের একখানি যথাযথ আলেখ্য, এই জন্য দীর্ঘ হইলেও পত্রখানি উদ্ধৃত করিতেছি।

স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র সেন মহাশয় ও ধামরাই স্কুল।

আমার শিক্ষার সময় উপস্থিত হইলে শালকাঠের পীড়ার উপর খড়িমাটী দিয়া পিতৃদেব মহাশয় 'ক' 'খ' লিখিয়া দিতেন, তাহার উপর খড়িমাটী দিয়া মক্স করিতে করিতে কতগুলি বর্ণের লেখা ও নাম অভ্যস্ত হইল। পরে তালপত্রে লৌহশলাকা দিয়া বর্ণগুলি লিখিয়া দিতেন। এইরূপ লেখাকে "আঁচড়া" বলিত। আমরা মসীদ্বারা ঐ সমস্ত 'আঁচড়ায়' লিখিয়া লিখিয়া মক্স করিয়া যাইতাম। শুষ্ক তালপত্র সহজে ফাটিয়া ভাঙ্গিয়া যায় বিধায় উহা ব্যবহারের পূর্ব্বে গরমজলে সিদ্ধ করিয়া লইলে বহুকাল স্থায়ী হইত। সিদ্ধ করা তালপত্রে প্রাচীন সমস্ত পুথিই লিখিত হইত। তাহা অনেকের ঘরেই এপর্য্যন্ত উৎকৃষ্ট অবস্থায় বর্ত্তমান আছে। তাল-পত্রে লিখা অভ্যাস হইলে কদলীপত্রে লিখিতে অভ্যাস করি। তৎপশ্চাৎ কাগজে লিখিতে আরম্ভ করিলাম। এই অবস্থায় শিশুরা বলিত "আমি কাগজে উঠিয়াছি" অর্থাৎ কাগজে প্রমোসন পাইয়াছি। ইহা একটী উচ্চশ্রেণী। সেকালে অনেক গ্রামে এবং অনেক পাড়ায় একজন 'গুরুমশাই' পাঠশালা করিতেন। প্রাতঃকালে এই পাঠশালা বসিত এবং ৮টার সময় ছুটি হইত। পরে বৈকালে ৩।০ টার সময় পাঠশালার কার্য্য হইত। প্রতিপদ এবং অষ্টমীতে এবং পর্ব্বদিনে ছুটি ছিল। সকল শিশুই বসিবার জন্য ছোট ছোট পাটী মাদুর 'ধাড়ি'—'মোলা' ইত্যাদি এবং নিজের লিখার জন্য তালপত্র, কলাপত্র এবং দোয়াত-কলম সঙ্গে লইয়া যাইত।

পূর্ব্বে বাঁশের কলমেরই অধিক ব্যবহার ছিল, তাহাতে একটি পয়সাও ব্যয় হইত না। পরে ক্রমে খাগ, 'ওয়াদ্বি-খাগ', ঢেকীলতা, ইত্যাদি কলম ক্রয় করিতে হইত। তন্মধ্যে 'ওয়াদ্বি-খাগে'র কলমই মূল্যবান; বড় বড় জমীদার এবং মহাজনেরাই ইহা ব্যবহার করিতেন, এবং এই কলম দেশী কর্ম্মকারের প্রস্তুতী ছুরী দিয়াই কাটা যাইত। পরে 'সোয়ানের পেন' 'রাজ হাঁসের পেন' এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে রজর্সে'র ছুরী (Rogers) আমদানী হইয়া পড়িল। তৎপর 'নিব' 'হোল্ডার' ইত্যাদি আমদানী হইল। ইহাতে সামান্য লেখনীর জন্য—যাহার জন্য একপয়সা ব্যয় ছিল না—তাহারই জন্য ভারতবর্ষ লক্ষ লক্ষ টাকা বিদেশের পায়ে ঢালিয়া দিতেছে। পূর্ব্বে জমিদারদের, মহাজনদের খাতা ও অন্যান্য দলিলপত্র ইত্যাদির লিখন সময় বালি দ্বারা 'ব্লটিং'এর কাজ চলিত এবং তাহাতে কালীর অক্ষর ঠিক থাকিত, এমন সহজ-লভ্য মূল্যহীন 'ব্লটিং'এর (বালির) পরিবর্ত্তে ব্লটিং কাগজ আসিয়া বহু টাকা নিয়া যাইতেছে।

গুরুমহাশয়ের পাঠশালা খোলা যায়গায় পত্রপূর্ণ বৃহৎ বৃক্ষতলে বসিত। আমাদের পাঠশালার স্বর্গীয় রামনাথ মালাকারদের বকুল তলার নীচে বসিত। আমরা মৃত্তিকার উপর ছোট ছোট পাটী বিছাইয়া লিখাপড়া করিতাম। এতাদৃশ খোলা বাতাসে শিক্ষা (open air teaching) অতি স্বাস্থ্যকর ও স্ফূর্ত্তিপ্রদ ছিল। তাহার সুফল আমরা এখনও ভোগ করিতেছি। প্রথম লর্ড হার্ডিঞ্জ অর্থাৎ এই লর্ড হার্ডিঞ্জের ঠাকুরদাদা এদেশে বড়লাট হইয়া আসিলেন। তিনি আসিয়াই বাঙ্গালার অনেক স্থানে বাঙ্গালা ও ইংরাজী শিক্ষার জন্য স্কুল স্থাপন করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। তাহাতে খামরাই একটী ছাত্রবৃত্তি স্কুল স্থাপিত হয়। তাহাতে শ্রীহট্টের হবিগঞ্জ নিবাসী স্বর্গীয় কৃষ্ণগোবিন্দ দে মহাশয় সর্ব্বাগ্রে শিক্ষক হইয়া আসিলেন। তাঁহাকে 'মাষ্টার মশাই' বলিয়া ডাকিতাম। ক্রমে রোয়াইলের শ্যামাচরণ গাঙ্গুলী মহাশয় এবং সুয়াপুরের ঈশ্বরচন্দ্রসেন মহাশয় এবং বিক্রমপুর আউটসাহীর আনন্দপণ্ডিত মহাশয় এবং অপসার প্রসিদ্ধ বৈদ্যসরকার-বংশোদ্ভব হাইকোর্টের উকীল প্রিয়নাথ সেন মহাশয়ের পিতা দীননাথ সেন মহাশয় আমাদের এই গ্রাম্য স্কুলের শিক্ষক হইয়া আসেন। এই খামরাই স্কুলটী ঢাকা জেলার মধ্যে প্রায়ই ১ম, ২য় ইত্যাদি ভাবে উচ্চ স্থান অধিকার করিত।

স্কুলের ছাত্রেরা শিক্ষক মহাশয়দিগকে বিশেষ ভক্তি ও ভয় করিত। শিক্ষক-মহাশয়েরাও ছাত্রদিগকে বিশেষ স্নেহ ও যত্নের সহিত তাহাদের উন্নতিকল্পে সদুপদেশ ও শিক্ষা দান করিতেন। অনেক সময় তাঁহারা সানন্দে ক্রীড়া কৌতুক এবং গল্প-চ্ছলে তাহাদের সহিত সময় কাটাইতেন। আমরা অসময়ে রাস্তায় খেলা আরম্ভ করিলে সেই সময় রাস্তায় কোনও শিক্ষক মহাশয়কে দেখিলে ছুটিয়া পালাইয়া যাইতাম। কৃষ্ণ-গোবিন্দ মাষ্টার মহাশয় একটু কড়া ছিলেন, কোনও ছাত্র তাঁহার নিকট পড়িলে তাহাকে ধমকাইয়া বা কান মলিয়া সকলকে সতর্ক করিয়া দিতেন।

প্রথমে ধামরাই স্কুলের নিজস্ব কোনও ঘর ছিলনা। ৺ঠাকুর মাধবের যাত্রা বাড়ী অর্থাৎ গুপ্ত বাড়ীতেই স্কুল স্থাপিত হইয়াছিল। ঈশ্বর বাবুর যত্নে পরে থানার পুকুরের উত্তর পাড়ে খড়ের ছাউনী সহ এক প্রকাণ্ড আটচালা প্রস্তুত হইল। তাহার মেঝে ও দেওয়াল কাঁচা মাটীর নির্ম্মিত ছিল। ভুইমালী নামক একজাতীয় লোক আছে তাহারা মাটী কাটে, ভিটা বাঁধে, দেওয়াল দেয়, ঘর নিকায়। ভুইমালী দ্বারাই মেঝে দেওয়াল ইত্যাদি নির্ম্মিত হইয়া ছিল। ঘরের মেজেতে সময় সময় অত্যন্ত ধুলা হইলে আমরা কথিত পুকুর হইতে ভাঁড়ে ভাঁড়ে জল আনিয়া মেঝে নিকাইয়া দিতাম, তখন আমাদের আনন্দ-স্ফূর্ত্তি কত! ঐ সময় মাষ্টার মহাশয়রাও একটু একটু উৎসাহ ও আনন্দ প্রকাশ করিতেন, তাহাতে আমাদের উৎসাহ আরও বর্দ্ধিত হইয়া যাইত। শ্রদ্ধাস্পদ ঈশ্বর চন্দ্র সেন মহাশয় তখন আমাদের হেড্ মাষ্টার হইয়া আসিয়াছেন। তিনি ইংরাজী বাঙ্গালা যেটুকু পড়াইতেন তাহা ছাত্রদিগের হৃদয়ে গাঁথিয়া থাকিত। ফুল ও ফল বাগান করিতে তাঁহার নিতান্ত সখ ছিল। স্কুলের চতুর্দ্দিকে অনেক জমি ছিল। তাঁহার উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া আমরা জঙ্গল কাটিয়া ঐ সমস্ত স্থান পরিষ্কার করিলাম। সেই স্থানে আবশ্যক মত বেড়া দিয়া তাহাতে অনেক প্রকার ফুলের গাছ রোপন করা হইল। ঈশ্বর বাবু সুয়াপুরে নিজের বাড়ীতেও আম লিচু ইত্যাদি অনেক প্রকার ফলের গাছ এবং ফুল গাছ রোপন করিয়াছিলেন। তাহাতে তাঁহার বাড়ীখানি সুস্নিগ্ধ ছায়াময় নির্জ্জন ছিল। যেদিন আমরা তাঁহার বাড়ীতে প্রথম প্রবেশ করিলাম, তখন মনে হইল যেন কোনও মুনি-নিকেতনে প্রবেশ করিয়াছি। ঈশ্বরবাবুর স্ত্রী অতি স্নেহময়ী ছিলেন। তাঁহার আদর ও স্নেহে যে কত পরিতৃপ্ত হইয়াছিলাম, তাহা এখনও

স্মৃতিতে উপস্থিত হইলে বিশেষ আনন্দ উদ্ভূত হয়। এস্থায় ভগবানের একটী আশ্চর্য্য খেলার কথা উল্লেখ যোগ্য। হেড মাষ্টার ঈশ্বরবাবুর একটী গাভী ছিল, গাভীটীর ষাঁড় বাছুরই প্রসব হইত। এবং তাঁহার স্ত্রীরও কন্যা সন্তানই জন্মিত। এইরূপে অধিক পরিমাণে কন্যা সন্তানই হইল, তখনও তাঁহার কোনও পুত্র সন্তান জন্মে নাই। এই রহস্যের মর্ম্মকথা বিধাতা পুরুষ ছাড়া কে বলিবে? গাভীটী যেবার মাদী বাছুর প্রসব করিল, সেইবারেই আমাদের স্নেহাস্পদ শ্রীমান দীনেশ চন্দ্র সেন ভায়ার জন্ম হইল। দীনেশ বাবুর চেহারা মুখের গঠন, বর্ণ, চক্ষু, চাহনি, হাস্য ঠিক পিতৃ অনুরূপ হইয়াছে। দীনেশবাবুর পিতা পূর্ব্বে বঙ্গের বৈদ্যদিগের মধ্যে বিশেষ মর্য্যাদাসম্পন্ন কুলীন। তিনি তৎকালীয় ঢাকার গভর্ণমেণ্ট উকীল বগজুরী নিবাসী ৺ গোকুল মুনসী মহাশয়ের কন্যাকে বিবাহ করেন। তাঁহার পত্নী পরমা সুন্দরী গৌরবর্ণা, ক্ষীণাঙ্গী ছিলেন। সর্ব্বদাই সস্মিত বদন ছিল; সংসারের গৃহ কার্য্যাদি নিজেই সমাধা করিতেন। তাঁহার শরীর আমরা বেশ সুস্থ দেখিয়াছি। সে কালে এমন কি ৪০।৫০ বৎসর পূর্ব্বেও পূর্ব্ববঙ্গে স্ত্রীলোকেরা কপালে এবং নাসিকায় গোধানী অর্থাৎ উলকী লইতেন। তখন উহা এক সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির একটী পাকা চিত্র মধ্যে গণ্য ছিল। তাঁহারও কপালে এবং নাসিকায় উল্‌কী ছিল। ঈশ্বর বাবু অনেকদিন সপরিবারে খামরাই রামগতি কর্ম্মকারের বাড়ীতে বাসা করিয়াছিলেন। তখন সর্ব্বদাই আমরা তথায় যাইতাম। আমার মা ছিলেন না বলিয়া তাঁহার স্ত্রী আমাকে অধিকতর স্নেহ করিতেন। একবার তাঁহাদের সুয়াপুরের বাড়ীর বাগানের নিচুফল আমাদিগকে খাইতে দিলেন। ইতঃপূর্ব্বে আমরা কখনও নিচুফল দেখি নাই। উহা খাইয়া অপূর্ব্ব পরিতৃপ্তি পাইলাম। আমাদের গ্রামে তখনও নিচুগাছ ছিল না। তিনি মাঝে মাঝে আমার মুখে রামায়ণ কীর্ত্তনিয়াদের ২।৪টী পদ শুনিতে বড় ভাল বাসিতেন এবং নাচিয়া নাচিয়া উহা গাহিতে বলিতেন। আমার কোনও কালেই সুর ও রাগিণী নাই। তবুও তিনি আমাকে নির্ব্বন্ধাতিশয়ে গাইতে বলিতেন। তাঁহার নাম ছিল রূপলতা, তিনি রূপে, গুণে ও স্নেহে, দেবী ও জননী বিশেষ ছিলেন। *

* চন্দ্রবাবু শ্রীপ্রভার সাঁ, তত্তা প্রভৃতি ব্যবহার করিয়াছেন, আমি সাঁ স্থলে 'তিনি' 'তত্তার' স্থলে 'তাঁহার' লিখিয়াছি।

ইহার পরে হেড মাষ্টারবাবু, আনন্দপণ্ডিত মহাশয় ও সেকেণ্ড মাষ্টার দীননাথ সেন মহাশয়ের সহিত বাজারের প্রান্তে বাসা করেন। উহা পূর্ব্বে বালিয়াটীর ৺জগন্নাথবাবুর কাছারী-বাড়ী ছিল। তাহার পাশেই গোয়ালাদিগের বাড়ী। আমরা পাঠ বলিয়া লইবার জন্য কয়েকটি বালক তথায় প্রাতে যাইতাম। এবং তাঁহাদের প্রাতের রান্নার অসুবিধা হইলে, কালীচরণ চক্রবর্ত্তী নামক একটী ব্রাহ্মণ বালক তাঁহাদের নিকট থাকিতেন, তিনিই রান্না করিতেন। তাঁহার অসুখ হইলে, আমরা রান্না বান্না করিয়া দিয়া আসিতাম। কথিত কালীচরণ চক্রবর্ত্তী সদ্বংশজাত এবং সৎস্বভাবান্বিত ব্রাহ্মণ বালক। ৺রাজেন্দ্র মল্লিক মহাশয়ের 'শিল্প-দর্শন' পাঠ করিয়া ভাল সোরা প্রস্তুত করিবার শিক্ষা পাইলাম। তাহাতে লিখা ছিল, গোয়াল ঘরের মেজেতে শীতকালে লবণের ন্যায় একপ্রকার পদার্থ জন্মে। উহা সোরা নামক পদার্থ (Solt setre) ইহা চাঁচিয়া সংগ্রহ করিয়া লইতে হয় এবং জলে কয়েক ঘণ্টা ভিজাইয়া রাখিয়া ধোপারা যেমন করিয়া ক্ষারের জল বস্ত্র মধ্যে বাঁধিয়া টেপাণ ফেলিয়া প্রস্তুত করে, সেইরূপে সোরার জল ও প্রস্তুত করিতে হয়। এই টেপান জল যত মাটী শূন্য ও পরিষ্কার হইবে ততই সোরা পরিষ্কার দেখাইবে। নিকটস্থ গোয়ালাদের গোয়াইল হইতে আমরা ঐ সোরা সংগ্রহ করিলাম। এবং তাহার জল কথিত প্রকারে টেপাণী ফেলিয়া প্রস্তুত করা হইল। রাজেন্দ্র মল্লিক মহাশয় লিখিয়াছেন, কাঠের পরিবর্ত্তে আম পাতার জ্বালে অতি উৎকৃষ্ট সোরা তৈয়ার হয়; সোরার কলমগুলি মোটা এবং সুদীর্ঘ হয় এবং বর্ণও পরিষ্কার হইয়া থাকে। আমরা তাঁহার উপদেশানুযায়ী আমপাতার জ্বাল দিয়া যে সোরা প্রস্তুত করিলাম তাহা ফলতঃ অতি উৎকৃষ্ট হইল। সোরা বিক্রেতারা বলিল এরূপ উচ্চাঙ্গের সোরা বাজারে কমই পাওয়া যায়। মাষ্টার মহাশয়েরা আমাদের এই কার্য্যে প্রবর্ত্তিত দেখিয়া আনন্দিত হইয়া বিশেষ উৎসাহ দিলেন। এই সোরা দিয়া যে বারুদ প্রস্তুত করিলাম তাহাও উৎকৃষ্ট হইল। ইহা বন্দুক-ব্যবহারে চীনা বারুদের ন্যায় কাজ করিত। মাষ্টার মহাশয়দের বাসায় অনেকপ্রকার ক্রীড়া কৌতুকের স্থানও ছিল, এবং সখের ভোজনের আড্ডাও ছিল। সে কালে আমাদের গ্রামে সন্দেশাদির দোকান ছিল না, গোয়াল বাড়ী হইতে মালাই' কিম্বা ক্ষীর আনিয়া চিড়াসহ ভোজন করিতাম। একদিন ঐরূপ ক্ষীর চিড়া মাখিয়া সকলকে পৃথক্ পৃথক্

ভাবে বণ্টন করিয়া দিয়াছি। ইতিমধ্যে আমাদের একটি ব্রাহ্মণ-সহপাঠীর তাহার ভাগেরটা খাইয়া ফেলিয়া, একটী শূদ্র সহপাঠীর ভাগ হইতে খানিকটা নিয়া খাইয়া ফেলিল। তখন আমরা তাহাকে বলিলাম "তুমি শূদ্রের পাতেরটা খাইয়াছ আমরা বাড়ী গিয়া বলিয়া দিব। ব্রাহ্মণ বালকটী তোতলা ছিল। সে রাগিয়া বলিল "যা-যা-যাও-ব-ব-ব-লে দিয়া কি-কি-কি-করবে? আ-আ-আ-আমি ব্রাহ্ম।" আমরা সকলেই তাহার বাক্যে হাসিয়া বিশেষ আমোদে পাইলাম। খাদ্যাখাদ্যের বিচার না থাকিলেই তাহাকে লোকে ব্রাহ্ম বলিত।

সেকালে কোনও ইংরাজী বইএর মানের বহি ছিল না। ইংরাজী বাঙ্গলা একখানা অভিধান বাহির হইয়াছিল তাহাতে ইংরাজী মানে পাওয়া যাইত না। জনসন পকেট ডিকসনারী নামক অতি ক্ষুদ্র লিখাযুক্ত একখানি অভিধান হইতে ইংরাজীর ইংরাজী মানে আমরা সংগ্রহ করিতাম। আমরা মানে লিখিয়া না নিলে মাষ্টার মহাশয়েরা পড়া বলিয়া দিতেন না। সুতরাং আমাদের সকলকেই ঐ প্রকার ডিক্‌সনারী হইতে মানে লিখিয়া প্রস্তুত হইয়া যাইতে হইত। মত্ত-নিবাসী অম্বিকাচরণ সেন নামক একটী বালক ঈশ্বরবাবুর সম্পর্কিত ভাই তাঁহার বাসায় ছিলে। সেই বালকটি ঐ মানে সংগ্রহ করিয়া লিখিতে বিশেষ আলস্য করিত না। আমরা তাহার দ্বারা মানে লেখাতে বিশেষ সাহায্য পাইতাম। অম্বিকা চিরদিনই সুনিপুণভাবে লিখা-পড়া করিত। এবং আমরাই স্কুল হইতেই অম্বিকা ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় ১ম হইয়া তিন টাকা বৃত্তি পাইয়া ঢাকা কলেজে ৪র্থ শ্রেণীতে ভর্ত্তি হইয়াছিল। এবং সেই ঢাকা কলেজ হইতে বি, এ, পাশ হইয়া কলিকাতায় বিজ্ঞানে এম, এ, পাশ করিল। পরে গবর্ণমেণ্ট তাহাকে ষ্ট্যাটুটারী সিভিলিয়ান করেন। অম্বিকাই এদেশে সর্ব্ব প্রথম ষ্ট্যাটুটারী সিভিলিয়ান। এই অম্বিকাবাবুর উন্নতির প্রকৃত মূলই আমাদের ঈশ্বরবাবু।

ঈশ্বরবাবু তত্ত্ববোধিনী নামক পত্রিকার গ্রাহক ছিলেন।*

ব্রাহ্ম ধর্ম্ম সম্বন্ধে তাঁহার বিশেষ টান ছিল। তখন বড় মানুষ মাত্রেই বিবাহাদি ক্রিয়া কর্ম্মোপলক্ষে বাই খেমটা নাচের জন্য বহু অর্থ ব্যয় করিতেন। শ্রদ্ধাস্পদ ঈশ্বর বাবু তাদৃশকার্য্যে বিশেষ ঘৃণা প্রদর্শন করিতেন এবং সেইজন্য একটী পুস্তিকা ছাপাইয়াছিলেন। পুস্তকখানির নাম আমার মনে নাই। তাহাতে বাঈ-খেমটা নাচের বৈঠকের যে একটী দৃশ্য বর্ণনা করিয়াছিলেন তাহা অতি সুন্দর ও শিক্ষাপ্রদ। তিনি লিখিয়াছেন—"নাচের বেলায় বাঁয়া তবলার "চাটিতে" যে বোল উঠে তাহা "ধিক্কার" "ধিক্কার" বলিতেছে, সারেঙ্গ 'কোন্' 'কোন্' জিজ্ঞাসা করিতেছে, খেমটাওয়ালী হাত নাড়িয়া বলিতেছে—"ইয়া বাবু লোককো," "বাবুলোককো।"

থামরাইর অনেকেই শ্রদ্ধাস্পদ ঈশ্বরবাবুর ছাত্র। পাটনার অন্যতম প্রধান উকিল ব্রজেন্দ্রমোহন দাস যিনি বহু টাকা উপার্জ্জন করিতে করিতে ব্যবসা ছাড়িয়া প্রায় ২৫ বৎসর হইল ৺ শ্রীবৃন্দাবন যোগী-জীবন যাপন করিতেছেন, তাহার ভ্রাতা ৺ মনোমোহন দাস (গাজীপুরের Civil Surgeon) ঢাকা জগন্নাথ কলেজের Superintendent শ্রদ্ধাস্পদ অনাথবন্ধু মল্লিক মহাশয় প্রভৃতি আমরা অনেকেই তাঁহার ছাত্র। তিনি আমাদিগকে ঢাকা কলেজের চতুর্থ শ্রেণীর Standard পর্য্যন্ত পড়াইয়া দিতেন। আমাদের সময় ছাত্রবৃত্তির সাহিত্যের অন্তর্গত রত্নাবলী নামে একখানা গ্রন্থ ছিল।

* তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইবার জন্য তিনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার খসড়টা তাঁহার কাগজ পত্রের মধ্যে পাওয়া গিয়াছে। তাহা এই—

মান্যবর শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

তত্ত্ববোধিনী সভার সম্পাদক মহাশয়েষু

সবিনয় নিবেদন মিদং—

তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্য হইবার মানস করিয়া প্রতিমাসে চারি আনা দাতব্য দিতে স্বীকার করিলাম। সভা প্রবেশ দক্ষিণা এক টাকা প্রেরণ করিতেছি। ইতি ১৩ই পৌষ ১৭৭৫" এই ১৭৭৫ অবশ্যই শকাব্দ, তাহা হইলে ইংরাজী ১৮৫৩ খৃঃ অব্দে এই চিঠি লেখা হইয়াছিল- গ্রন্থকার।

গ্রন্থখানি Self help নামক একখানি ইংরেজী গ্রন্থের স্বাধীন অনুবাদ। ঈশ্বর বাবু আমাদিগকে ঐ গ্রন্থখানি এমনভাবে পড়াইয়াছিলেন যে, তাহা হইতে সাহিত্য শিক্ষা নীতিশিক্ষা এবং কর্ম্মশিক্ষা যেরূপ পাইয়াছি তাহা আমাদের চির জীবনের সাথী হইয়া রহিয়াছে।

এই রত্নাবলী পুস্তকখানা পাঠ করিয়াই আমার নবজীবন উদ্ঘাটিত হইয়াছিল সন্দেহ নাই। বাল্যকালে পুস্তক পাঠ আদিতে আমার মন পড়িত না। শিল্প কর্ম্মের উপরই আমার মন বেশী যাইত। আমি দুই বার বাঙ্গালা ছাত্র বৃত্তিতে ফেল হই, পরে ৺লক্ষ্মী জনার্দ্দনের কৃপায় এবং ঈশ্বর বাবু এবং দীননাথ সেন মহাশয়ের যত্নে আমার মত মূর্খ সেবারকার বাঙ্গালা ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় ঢাকা সার্কেলের মধ্যে প্রথম হইয়া ৪ টাকা বৃত্তি পাইয়াছিলাম। তখন ঢাকা, ফরিদপুর, বরিশাল, চট্টগ্রাম, নওয়াখালী, ত্রিপুরা, শ্রীহট্ট, ময়মনসিংহ এবং পাবনা ইত্যাদি এই সার্কেলের অন্তর্ভুক্ত ছিল। দীননাথ সেন মহাশয়ের যত্নে আমরা ক্ষেত্রতত্ত্ব ও অঙ্ক যাহা শিখিয়াছিলাম তাহার পন্থা অতি সরল এবং আনন্দপ্রদ ছিল। অধিকাংশ স্থানে শিক্ষকের শিক্ষাপ্রণালী, যত্ন, ভালবাসাতে অনেক মূর্খ ছাত্র মনুষ্য জীবন লাভ করে তবে ২।৪টি মাত্র অতি তীক্ষ্ণবুদ্ধি বালক নিজের চেষ্টায় উন্নতি লাভ করিয়াছে তাহাও জানি।

বালককাল হইতেই আমার হৃদয়ের বাসনা ছিল আমি ডাক্তার হইব। অনেক ঘটনাচক্রে পড়িয়া তাহাতে হতাশ প্রায় হই; কিন্তু মা ইচ্ছাময়ী জীবের প্রকৃত ইচ্ছা জানিলে কালে তাহা পূর্ণ করিয়াই থাকেন। তাই আমার মত মূর্খ লোক কলিকাতায় একটী চিকিৎসক মধ্যে গণ্য হইয়াছে।

প্রত্যেক বালকেরই ভবিষ্যৎ জীবন সম্বন্ধে কি করিবে তাহার লক্ষ্য স্থির থাকিলে নিশ্চয়ই তাহার পথ পাইবে; কিন্তু আমাদের দেশে সকলেই স্রোতের মুখে গা ঢালিয়া দেয়। ইউরোপ আমেরিকার প্রত্যেক বালকই আপন লক্ষ্য স্থির করিয়া লয় এবং নিজ নিজ অভিভাবক দ্বারা লক্ষ্য স্থলে যাইবার উপায় করিয়া লয়।

আমাদের সৌভাগ্য পণ্ডিতে মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র সেন এবং দীননাথ সেন প্রভৃতি মহোদয়ের মত শিক্ষাগুরু আমরা পাইয়াছিলাম। এরূপ জানিতে পাই অনেক শিক্ষক মহাশয়রাই ছাত্রদের সহিত সেরূপ স্নেহ মমতা রাখেন না।

ওকালতীর পদ প্রাপ্ত হইয়া শ্রদ্ধাস্পদ ঈশ্বরবাবু যখন ধামরাই ছাড়িয়া যান, তখন তাঁহার জন্য সমস্ত ছাত্রবৃন্দ এবং অভিভাবকেরা কাঁদিয়া অস্থির হইয়াছিল। তাহাতে ছাত্রেরা সভা করিয়া অনেকেই তাহার সম্বন্ধে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রচনা পাঠ করে। আমার রচনা টুকুতে লিখিয়াছিলাম যে—"জন্মদাতা পিতা অপেক্ষাও জ্ঞানদাতা ও শিক্ষাদাতা শ্রেষ্ঠতর।

পিতৃদেবের অপর এক ছাত্র শ্রীযুক্ত হরিমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয় সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া বৃন্দাবনে আছেন। তিনি এখন অতি বৃদ্ধ, এবং "নোলক বাবাজি" নামে পরিচিত হইয়া বহু সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত ব্যক্তির গুরুরূপে পূজা পাইতেছেন। তাঁহার বাড়ী ও ধামরাই গ্রামে।

আমার পিতামাতার বহুকাল যাবৎ কেবল কন্যাই হইতেছিল। আমার জন্মের পূর্ব্বে নয়টি কন্যা হইয়াছিল। তাহাদের ছয়টি শৈশবে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। আমার প্রথমা ভগিনী দিগ্বসিনী দেবীর বিবাহ খুব সম্পন্ন গৃহে হইয়াছিল। তাহার শ্বশুর দেওয়ান গৌরমোহন রায় আমাদের সে অঞ্চলের একজন বড় লোক ছিলেন। অপরা ভগিনী বসন্তবালার বিবাহ ও গ্রামের জমিদার ৺ভারতচন্দ্র দাস মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত দক্ষিণা-রঞ্জন দাসগুপ্তের সঙ্গে সম্পন্ন হয়। ইহাঁদের অবস্থা ও বেশ ভাল ছিল। তৃতীয়া কন্যা বগলা দেবীকে বিবাহ করিয়াছিলেন, বায়রা গ্রামবাসী ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট পূর্ণচন্দ্র রায়। তখন তিনি সবে ডিপুটি হইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে নামিয়াছেন। প্রথমা ভগিনীর স্বামী ব্রজমোহন রায় অল্প বয়সে কলেরা রোগে প্রাণ ত্যাগ করেন। একটি কন্যা লইয়া দিদি আমাদের সংসারে আগমন করেন, এবং প্রায় চির-জীবনটা আমাদের সংসারে অতিবাহিত করেন। তৃতীয়া বগলা দেবী ১৬ বৎসর বয়সে কলেরা রোগে প্রাণত্যাগ করেন।

নয়টি কন্যা হইবার পরে, আমার মাতার বহু মানতের ফলে, দেবগৃহে বহু ধন্না দেওয়া, মাদুলি ধারণ ও গ্রহ-শান্তির বহু ব্যবস্থা করার ফলে হউক, কিম্বা কোন একটা দুঃসহ দুঃখ জগতে প্রবেশ করিবার হঠাৎ সুবিধা লাভের গতিকে হউক আমি আমার যমজ ভগিনী মৃন্ময়ী দেবীকে সঙ্গে লইয়া মাতুলালয় বগজুড়ী গ্রামে এক আম্রবৃক্ষ তলে আতুর ঘরে অবতীর্ণ হইয়াছিলাম। কার্ত্তিক মাসের ১৭ই, শক ১৭৮৮ শুক্রবার, রাত্রি তখন ৪ দণ্ড বাকী আছে। আমার পিতা তখন ধামরাই ছিলেন, তিনি পরদিন বেলা ১০টার সময় স্নান করিতেছিলেন, এই সময়ে বগজুড়ী হইতে প্রেরিত লোক তাঁহাকে আমার জন্মের খবর দিল। তিনি যে সিক্ত বস্ত্র খানি ছাড়িয়া ছিলেন এবং যে শুষ্ক বস্ত্র পরিতেছিলেন, উভয়ই, একটি কলসী যাহার জলে স্নান করিয়াছিলেন, ঘটিটি ও জল-চৌকীখানা, গামছা এবং যাহা কিছু সাম্‌নে ছিল, চোখের জল মুছিতে মুছিতে তাহার সমস্তই সেই সংবাদবহ লোককে দান করিয়া ফেলিয়াছিলেন।

জন্মিয়াই তাঁহাকে এরূপ আনন্দ দিতে পারিয়াছিলাম কি গুণে? তাঁহাদের বংশে একটা মুষল হইল কি অলাবু হইল তাহা তো তাঁহারা জানিতেন না; তবু সারারাত্রি জাগিয়া আমার পিতামাতা আমার মুখ দেখিয়া কি আনন্দ পাইয়াছিলেন?—বোধ হয় আমাদের মধ্যে তাঁহারা আনন্দস্বরূপকে পাইয়াছিলেন. বোধ হয় সকল ছেলের মধ্যেই সেই আনন্দস্বরূপ থাকেন, যখন আমিত্ব প্রবল হইয়া সেই আনন্দস্বরূপকে আড়াল করিয়া ফেলে, তখন জীব ভগবানের সঙ্গে পৃথক হইয়া পড়ে।

পিতৃদেব পুত্র-লাভ বিষয়ে একবারে হতাশ হইয়া ধামরাই স্কুলের পদেই চিরজীবন কাটাইবেন, এই ইচ্ছা করিয়াছিলেন। "বেশী অর্থ উপার্জ্জন করিয়া কি ফল হইবে? আমরা কাহার জন্য রাখিয়া যাইব?

গ্রন্থকারের যমজ ভগিনী মগ্নময়ী দেবী।

এই কথা বলিতেন। মেয়েদের তখন সম্পন্ন ঘরেই বিবাহ হইয়াছিল। আমার মায়ের সঙ্গে এই বিষয় লইয়া তাঁহার সর্ব্বদা তর্কযুদ্ধ চলিত ও ফলে তিনি অর্থোপার্জ্জন সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত নিতান্ত উদাসীন ও নিশ্চেষ্টই রহিয়া গিয়াছিলেন।

কিন্তু যে দিন আমার জন্ম হইল, সেই দিন, তাঁহার একটা নূতন কর্ত্তব্যের ভার পড়িল, ইহা মনে হইল; এবং অল্পকালের মধ্যেই ধামরাই স্কুলের পদ ত্যাগ করিয়া মানিকগঞ্জ মুন্সেফ-কোর্টের উকিল হইলেন।

আমার পিতা ও মাতা দুই ভিন্ন মতাবলম্বী এবং দুই ভিন্ন প্রকৃতির ছিলেন। মাতা ছিলেন তেজস্বিনী, পিতা ছিলেন মৃদু-স্বভাব। মাতা ছিলেন অর্থ সম্পদের প্রয়াসী, পিতা ছিলেন অনাড়ম্বর এমন কি দরিদ্র জীবনের পক্ষপাতী। পিতা ছিলেন ব্রাহ্ম, মা ছিলেন গোঁড়া হিন্দু। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে জিনিষ পত্র ও আসবাব সম্বন্ধে মা সাদা-সিধা ধরনের টেকসই দ্রব্যাদি পছন্দ করিতেন, বাবা জমকালো প্রাচীন জড়োয়া-পাড় বস্ত্রাদি এবং উড়িষ্যা প্রভৃতি অঞ্চলের প্রাচীন শিল্প-যুক্ত কাংস্য, পিত্তল ও তামার জিনিষ পছন্দ করিতেন। মা অর্থ সঞ্চয় করিতে চাহিতেন, বাবা যে জিনিষ পত্র দেখিতেন তাহাই কিনিতেন। পুরাতন জিনিষ কিনিবার তাঁহার একটা বিষম সখ্ ছিল। এই লইয়া প্রায়ই মাতার সঙ্গে তাঁর মতান্তর ঘটিত। মাতার বহু নিষেধ সত্ত্বেও তিনি খুব চওড়া নানারূপ কারুকার্য্য ভূষিত শাল, তাহা যত পুরাণোই হউক না কেন,—নানারূপ চিত্র বিচিত্র খোদাই পুরাতন আলমারা ও খট্টা—যাহা হয়ত ব্যবহারে ক্ষয় পাইয়া গিয়াছিল—এইগুলি কিনিয়া কিনিয়া বাড়ী বোঝাই করিতেন। মা ইহার নিতান্ত বিরোধী ছিলেন, "এগুলির আয়ু দুই দিন, অনর্থক এদের পাছে টাকা নষ্ট করা কেন?"

বাবা বুঝাইতে চেষ্টা করিতেন "সেই শিল্প দুর্লভ শিল্প, এমনটি কি এখন কার দিনে হবার যো আছে ?" ইঁহাদের এ সম্বন্ধে মত কিছুতেই মিলিত না। একদিন বাবা আমাকে সাচ্চা জড়াও সিল্কের একটা মোগলাই পোষাক নীলামে কিনিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার বড় ইচ্ছা ছিল, আমি সেইটি পরি, কিন্তু সেটি পরিলে আমাকে নবাব খাঞ্জাখাঁর একটি ক্ষুদ্র সংস্করণের মত দেখাইত। তাঁহার বহু অনুরোধে আমি উহা পরিয়া একদিন স্কুলে গিয়াছিলাম ; তখন আমার বয়স দশ। আমার সহপাঠিরা আমায় দেখিয়া হাতে তালি দিল ঠাট্টা করিয়াছিল, এমন কি গিরীশ পণ্ডিতের অটুট গাম্ভীর্য্য ভাঙ্গিয়া তাঁহার ও ঠোটের আড়ালে একটা পরিহাসের হাসি ফুটিয়া উঠিয়াছিল। বলা বাহুল্য, আমি ত সেই এক বারের পর তাহা আর পরি নাই, এখন মনে হয়, কেন পরিলাম না ! তিনি যে বেশে সাজাইয়া আমাকে দেখিতে আনন্দ পাইতেন, আমি কেন তাহার প্রতিকূল হইলাম ! সেই জামাটার সাচ্চা নক্ষত্রগুলি ও জড়াও পাড়, উইএ টুকরা টুকরা করিয়া কাটিয়া ফেলিয়াছিল, বহু দিন আমি একটা সিন্দুকে উইএর সেই ভুক্তাবশেষ দেখিয়াছি। একবার বাবা আমার জন্য একটা চোগা কিনিয়াছিলেন—সে ১৮৭৭ সনে হইবে। আমার মাসীমা তাহার বড় ছেলের জন্য একটা কিনিলেন। একটার লাল জমি—পশ্চাৎভাগে বহু বিস্তৃত সাচ্চা কাজ, সম্মুখ ভাগ ও কণ্ঠের দিকে ও নানা সাচ্চা কাজে ঝলমল, সেটি ছোট, ১০ বৎসরের বালকেরই যোগ্য। আর একটা প্রমাণ সাইজ, সাদা জমি, পশমের তোলা ধারে ধারে কিছু কিছু কাজ আছে। আমার দাদার জন্য মাসীমা এই শেষোক্তটি কিনিলেন। হাতের দিক্‌টার মাঝে একটা সেলাই দিয়া সেই লম্বা জিনিষ দুটা গুটাইয়া ফেলিয়া কোট্‌টা দাদা তখনই ব্যবহার করিতে লাগিলেন এবং এখন পর্য্যন্ত অর্থাৎ প্রায় ৪৩ বৎসর পরে ও বোধ হয় সেটি ব্যবহার করিতেছেন,

তাহার হাত দুটির মাঝের সেলাইটা অবশ্য এখন আর নাই। কিন্তু আমার জন্য বাবা সেই প্রথমটি কিনিয়া ছিলেন, তাহা ১০ম বর্ষ বয়সের পর আর ব্যবহার করিতে পারি নাই। দুইটির প্রত্যেকের দাম তখন ছিল ২৭৲ টাকা।

এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয় লইয়া মায়ের সঙ্গে বাবার সর্ব্বদাই অনৈক্য হইত। কিন্তু ঝগড়াটা এক হাতের তালি, বাজিয়া উঠিতে পারিত না। কারণ মা অনেক কথা শুনাইয়া দিতেন, বাবা চুপটি করিয়া শুনিতেন, যেন সেগুলি তাঁহাকে বলাই হইতেছে না। এই নীরব অনাশ্লিষ্ট শ্রোতাটির উপর মায়ের রাগ ক্রমশ বাড়িয়া উঠিত। যখন ভাষা ক্রমশ উত্তেজিত ও কণ্ঠস্বর খুব উচ্চগ্রামে চড়িয়া উঠিত, তখন বাবা পাখা খানি হাতে করিয়া নিজেকে বাতাস করিতে করিতে বাহিরের প্রকোষ্ঠে যাইয়া বড় একটা বেতের চেয়ারে হেলান দিয়া চোখ বুজিয়া বসিয়া থাকিতেন।

মানিকগঞ্জে আসার পর হইতে বাবার পশার খুব বৃদ্ধি হইল। তিনি সেখানকার শ্রেষ্ঠ উকিল হইয়া দাঁড়াইলেন, এবং গভর্ণমেণ্টের উকীল রূপে মানোনীত হইলেন। সে সময় খুব সুখেই গিয়াছে। মানিকগঞ্জে তখন দুধের সের দুই পয়সা। সাধারণতঃ মুসলমানেরাই দুধ বিক্রয় করিত। দুধে জল দেওয়ার পদ্ধতি তখনও প্রচলিত হয় নাই। মুসলমানেরা হিন্দুর জাতি বিচার মানিয়া দুধে জল মেশান পাপের কার্য্য বলিয়া মনে করিত। মাছ খুবই সস্তা ছিল। আমাদের বাসায় রোজ একমণ খাটি দুধ আসিত, তাহার দাম এক টাকার কাছাকাছি ছিল। বিধবা জ্যেষ্ঠা ভগিনী দিগ্বসনী দেবী দুধের পুরু সর ঘিয়ে ভাজিয়া রাখিতেন। তিনি বৃন্দাবন, কাশী প্রভৃতি অঞ্চল বেড়াইয়া আসিয়াছিলেন, এবং প্রত্যেক জায়গা হইতেই কোননা কোন মেঠাই তৈরী করার প্রণালী শিখিয়া আসিয়া ছিলেন,—তাঁহার হাতের বরফীর মত বরফী আমি খাই নাই। তাছাড়া

'বকুল-চাকি', এবং নানা প্রকারের মালপো তৈরি করায় তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। নারিকেল ও দুধ দিয়া যে তিনি কতরূপ মেঠাই তৈরী করিতে পারিতেন, তা আর কি বলিব? তাঁহার মত নারি-কেলের সূক্ষ্ম চিঁড়ে জিরে প্রস্তুত করিতে সে অঞ্চলে কেহ জানিত না। তিনি নারিকেল ও দুধ দিয়া মাছ, ময়ুর, গাছ,—তার ডালে ডালে ফুল ও পাখী বসিয়া আছে,—পদ্ম প্রভৃতি কতরকম জিনিষ যে তৈরি করিতে পারিতেন, তাহার সীমা সংখ্যা নাই। সেগুলি মর্ম্মর-গঠিত মূর্ত্তির ন্যায় কোন কোনটি সাদা ধব্‌ধবে্‌ করিয়া রচনা করি-তেন, কোন গুলি বা নানা বিচিত্রবর্ণে—লাল, নীল, কালোর সুনপুন চিত্রনে—সখের খেলনার মত দেখাইত। একবার বাবার বন্ধু একটি মুন্সেফ (কালিকাতার অঞ্চলের) আমাদের সঙ্গে অনেকদিন ধরিয়া মিষ্টদ্রব্য উপহারের পাল্লা দিয়াছিলেন। তাঁহার গৃহিণী ভাল মেঠাই তৈরী করিতে পারিতেন। তাঁহাদের বাড়ী হইতে আমাদের বাড়ীতে উপহার আসিত, এবং আমারা ও তাহার প্রতিদান পাঠাইতাম। অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহার হার হইয়া গেল, দিগ্বসনীর দিগ্বিজয়ী হাতের কাছে কোন ময়রার সাধ্য ছিলনা দাঁড়ায়, অপরের কিকথা! তিনি এক একদিন শুধু কাশীর মেঠাই চালাইতেন, চম্‌ চম্‌ দিয়া চমকাইয়া ফেলিতেন; কখনও বা বৃন্দাবনে পেঁড়া, বরফির বহর চালাইতেন। কিন্তু যখন তিনি নারিকেল ও দুধ দিয়া কারুকার্য্য করিতেন, তখন ত ইটালির ভাস্কর ও কৃষ্ণনগরের কুমার তাহার কাছে হার মানিয়া যাইত।

নিরামিশ রান্না যে তিনি কতরূপ রাঁধিতে জানিতেন, তাহা আর কি বলিব? সেরূপ রুচিকর জিহ্বার পরমসম্পদ আর কোথায় পাইব? মাণিক-গঞ্জের মাছ খুব সস্তা ছিল, কিন্তু সুয়াপুরে আরো সস্তা ছিল। সুয়াপুরের নিকটবর্ত্তী রঘুনাথ-পুরের প্রকাণ্ড বিলে জেলেরা এক অদ্ভুত উপায়ে মাছ

ধরিত। বড় একটা নৌকার গলুইএর উপর তারা দাঁড় দিয়া ঠক্‌ঠক্ একরূপ শব্দ করিত, অমনই চারদিক হইতে লাফাইয়া মাছ আসিয়া নৌকায় পড়িত। সেই মাছ সংগ্রহের এক বিপদ ছিল,—বড়বড় মাছ জেলের ঘাড়ে পড়িয়া অনেক সময় জেলেকে একবারে ঘাল করিয়া ফেলিত, তাদের কখনও কখনও ঐরূপ আঘাতে হাত পা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। পুরাপুর বসিয়া ।৹ আনা কি ।√৹ আনা মূল্যে একটী প্রকাণ্ড রুই, (প্রায় ১৪।১৫ সের ওজনের) আমরা ক্রয় কবিয়াছি। সাধারণত দুই তিন পয়সায় মাছ চাহিলে জেলে ছোট ছোট মাছে বড় একটী খালুই ভর্ত্তি করিয়া দিত, মাঝারি রকমের একটি পরিবার তাহা খাইয়া সাবাড় করিতে পারিত না। তৈলের সের ছিল ।√৩ আনা ; ঘি বার আনা (উৎকৃষ্ট গাওয়া ঘি) আমাদের বাড়ীতে সাধারণত ঘি কেনা হইত না, দুধের সর অনেক দিন সঞ্চয় করিয়া তাহা বাটিয়া ঘি করা হইত,তাহার সুমিষ্ট ঘ্রাণে প্রাণ পুলকিত হইয়া উঠিত। এখন রাজা মহারাজারা যেরূপ খাইতে পান না (ভেজালের যন্ত্রনায় টাকা থাকিলে ও ভাল খাদ্য জোটেনা) তখন যে সাধারণ গৃহস্থ সেরূপ আহারে পরিতৃপ্ত হইতেন। সেই দুধের ঘিয়ের স্বরাজ্যে আমাদের ছেলেরা শুকাইয়া মরিতেছে, জোলো দুধের কয়েক চামচ এবং ভেজাল ঘিয়ের ছিটা ফোঁটা তাহাদের ভাগ্যে জুটিতেছে না। অনেক সময় হরলিক কিম্বা এলেনবাড়ী দিয়া 'দুধক পিয়াস' ঘোলে মিটাইতে হইতেছে।

আমার ছোটবেলাটা খুব আদরেই কাটিয়াছে। খেলার সাথীদের মধ্যে কেউ কেউ প্রায়ই আমাকে 'আদুরে ছেলে' বলে খেপাইত। অতি শিশুবয়সে বাড়ীতে অত্যন্ত দুষ্টামি করিয়া পিতামাতার প্রশ্রয় পাইয়াছি, এমন কি আমার ৪।৫ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত শুধু আমাকে দেখিবার জন্য দুইটি চাকর নিযুক্ত ছিল। লক্ষ্মী নাম্নী পরিচারিকার ক্রোড় হইতে নামিয়া যখন আমি হামাগুড়ি দিতে শিখিলাম, সেই সময় হইতে আমার

জন্য সেই দুইটি চাকর নিযুক্ত ছিল। তার মধ্যে আমাদের গ্রামের রামদুর্লভ সিংহের ভ্রাতুষ্পুত্র কোকাসিংহের কাজ ছিল—আমার মার ধর সহ্য করা। আমি রাগিয়া গেলে তাহার উপর উৎপাত করিতাম এবং তা' তাকে সহ্য করিতে হইত। তাহার গায়ের চামড়ার উপর দাঁত বসাইয়া রক্ত বাহির করিয়া, তাহারই কাঁধে চড়িয়া, তাহার মাথার চুল ছিঁড়িতাম, সে একবারে নিত্যানন্দমহাপ্রভুর মত, "মেরেছে কলসীর কানা, তাই বলে কি প্রেম দিব না" এই নীতির অনুসরণ করিয়া আমার মার ধর্ সহ্য করিয়া আদর করিতে থাকিত। এই মার ধর্ করার স্বভাবটা আমার ৮।৯ বছর পর্য্যন্ত ছিল। আমার পরে মায়ের আরো দুইটি মেয়ে হইয়াছিল, তাহাদের একজনের নাম ছিল মৃন্ময়ী ও অপরের নাম ছিল কাদম্বিনী,—ফটোগ্রাফ নাই, তা না হইলে দেখাইতে পারিতাম মৃন্ময়ীর ডাগর চোখদুটির কি স্নিগ্ধ মহিমাময় মাধুর্য্য ছিল এবং পাতলা ঠোঁট দুখানিতে কি মন ভুলানো হাসি ফুটিয়া উঠিত। কাদম্বিনীর কাল চুলে যেন সত্যই মেঘের লহর ছড়াইয়া পড়িত। এই দুই ভগিনী যে আমার হাতে কত মার ধর খাইয়াছে তাহা আর কি বলিব! বড় হইয়া সেই অপরাধের অনুতাপে আমি কতরাত্রি বিছানায় শুইয়া শুইয়া কাঁদিয়া কাটাইয়াছি। ইহারা আমার হাতের মার ধর খাইয়া কিছু বলিত না, কারণ সেই বাড়ীর একছত্র ক্ষুদ্রসম্রাট আমিই ছিলাম—বহু ভগিনীর মধ্যে একমাত্র পুত্র হওয়ার সৌভাগ্য লাঞ্ছিত হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়া ছিলাম। তাহারা জানিত, তাহাদের দাদার এই অধিকার ভগবানই দিয়াছেন। কিন্তু আমার মা আমাকে প্রাণাপেক্ষা বেশী ভালবাসিলেও আমার এই সকল অত্যাচারে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া যেরূপ চক্ষের ভঙ্গীতে আমার প্রতি চাহিতেন, তাহাতে আমি ভয়ে কেঁচো হইয়া যাইতাম; কিন্তু আমার চক্ষে জল দেখিলে তিনি আমায় কোলে করিয়া চুমো খাইতেন। আমার মার-ধরের চিহ্ন বা স্মৃতি এখনও সুয়াপুর

গ্রামের একটি লোক বহন করিতেছে। সে হচ্ছে, আমার বাল্যকালের খেলার সাথী বনবিহারী সাহা, তাহার হাতে একটা দাগ এখনও আছে, আমি সেইখানে তাহাকে একটা ছুরি দিয়া আঘাত করিয়াছিলাম। সে সেইটি দেখাইয়া এখনও স্নেহের গৌরব করিয়া থাকে। আমি জন্ম হইতেই এত দূর আদুরে হইয়াছিলাম, যে আমার সঙ্গে যে যমজ ভগিনী হইয়াছিল, তাহাকে "বাঁদী" নাম দেওয়া ছিল। সে এখনও জীবিত আছে, চিরকালের অভ্যাসবশতঃ এখনও "বাঁদী" নামই মুখে আইসে, কিন্তু এই ভাবে ডাকার দরুণ তাহার স্বামী আমার নিকট একদিন বিরক্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন।

আমি বাড়ীতে দৌরাত্ম্য করিতাম, কিন্তু বাহিরে গো-বেচারি ছিলাম। আদুরে ছেলে বলিয়া কথায় কথায় আমার সহচর বন্ধুরা আমায় ঠাট্টা করিত। দুর্ব্বল ছিলাম বলিয়া যে সে আমার চড়-থাপড় মারিয়া যাইত—আমি তাহা কাহাকেও বলিতাম না। সেই সময়ে দুএকটি অশ্রু চোখের কোণে দেখা যাইত, তা এক হাতে মুছিয়া ফেলিতাম।

---

(৬)

শিক্ষা দীক্ষা।

পাঁচ বছর বয়সে যথারীতি হাতেখড়ি হওয়ার পর, আমি সুয়াপুর গ্রামে বিশ্বম্ভর সাহার পাঠশালায় লেখাপড়া করিতে সুরু করিয়া দেই। ইহার পূর্ব্বেই আমি রামায়ণের অনেকটা মুখস্থ বলিতে পারিতাম। অক্ষর পরিচয় হওয়ার পূর্ব্বেই আমার সেটি হইয়াছিল। দিগ্বসনী দেবী শুধু মিষ্টান্ন প্রস্তুত করায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন, এমন নহে। তিনি প্রাচীন ও আধুনিক বাঙ্গলার সুপণ্ডিতা ছিলেন। বৈষ্ণব-পরিবারে তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল—সুতরাং তাঁহার সংগ্রহের মধ্যে চৈতন্ত-চরিতামৃত হইতে আরম্ভ করিয়া বৈষ্ণব বন্দনা প্রভৃতি বহু বৈষ্ণব গ্রন্থ ছিল। সাঁঝের দীপ জ্বালিয়া শীতকালে ঘরের মধ্যে একটা আগুন করিয়া আমরা বসিয়া যাইতাম। তিনি ঐ সকল পুস্তক সুর করিয়া পড়িয়া যাইতেন। তাঁর সুর কি মিষ্ট ছিল! এখনও আমার কাণে তাহার রেস জাগিতেছে। আশ্চর্য্যের বিষয় যাঁহার সুর এরূপ মিস্রির মত মিষ্ট ছিল, রাগিয়া গেলে তাঁহার সুর এমন রুক্ষ ও তীক্ষ্ণ হইত যে তাহাতে উদ্দিষ্ট ব্যক্তির কর্ণ ভেদ করিয়া মর্ম্মস্পর্শ করিত। তিনি পুঁতির নানারূপ ছড়ি ও খেলনা প্রস্তুত করিতে পারিতেন; তা ছাড়া জরির সুতো দিয়া রুমালের উপর নানারূপ কারুকার্য্য প্রদর্শন করিতেন।

রামায়ণ ও মহাভারত সাধারণত পড়া হইত। আমার মনে আছে অন্ধকার রাত্রি। ঘরের বাহিরে কালো শাড়ী পড়িয়া অমাবস্তা নিঝুম হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। আমাদের ঘরের সেই আগুনের দুই একটি

Memo

The birth day of my
son and daughter
is 17th Kartick Friday
night at the last part
nearly four Dunda
[illegible] of that night

গ্রন্থকার ও তাঁহার যমজ ভগিনীর জন্ম সম্বন্ধে পিতা ঈশ্বরচন্দ্র সেনের স্বহস্ত লিখিত বাং ১২৭৩ সনের ১৮ই কার্ত্তিক তারিখের স্মারক-লিপি।

শিখা জানালা-পথে প্রবেশ করিয়া যেন অমাবস্যার নিবিড় কৃষ্ণকপালে একটি রক্তচন্দনের টিপ পরাইয়া দিতেছে। ঝিল্লির অবিরাম তানে আমাদের বাগান-বাটী মুখরিত। রাত্রি হয় ত নয়টা, কিন্তু পাড়াগাঁয়ের রাত্রি—চারিদিকে জনপ্রাণীর সাড়া নাই, দিদি পড়িয়া যাইতেন :—

"মহা ভয় উপজিল দে'খ রণস্থল।
কুক্কুর গৃধিনী-শিবা করে কোলাহল ॥
হাতে মুণ্ড করিয়া নাচয়ে ভূতগণ।
শৃগাল করিছে মাংস শোণিত ভক্ষণ ॥
রক্তের কর্দ্দম নদী চলিতে না পারে।
শোকাকুল নারীগণ কাঁদে উচ্চস্বরে ॥"

দিদির সুরে একটা উদ্‌ভ্রান্ত ভয়ের ঝঙ্কার জাগিয়া উঠিত। আমরা বসিয়া যেন স্পষ্ট দেখিতাম, হত সৈনিকের রক্তাক্ত মাথাটা বিকটাকৃতি কবন্ধেরা ছুড়িয়া ফেলিতেছে; তাহারা এত কাছে, বোধ হইত, যেন তাহাদের শ্বাস-প্রশ্বাস আমাদের গায় পড়িয়া সর্ব্ব শরীরে একটা ভয়ের শিহরণ জাগাইতেছে।

এই ভাবে রামায়ণ—মহাভারত পড়া চলিত। তরণীসেনের বধ পড়িতে পড়িতে দিদি কাঁদিয়া ক্ষণকালের জন্য পড়া বন্ধ করিতেন, আমরাও কাঁদিয়া চক্ষু মুছিয়া লইতাম। এখন ভাবি, আমি তখন তিন চার বছরের শিশু, কিন্তু কৃত্তিবাস এমন ভাষায় রামায়ণ লিখিয়াছিলেন, এবং পরবর্ত্তী নকলকারীরা তাঁহার সহজ ভাষাকে কালে কালে এমনই সহজ করিয়াছিল—যে আমি তখনই তাঁহার বেশীর ভাগ লেখাই বুঝিয়াছি—যেটুকু বুঝি নাই—তাহা কল্পনা আরও উজ্জ্বল সুন্দর করিয়া দেখাইয়াছে।

দিদির মুখে বৈষ্ণব গান শুনিয়া আমি যে আনন্দ পাইতাম বোধ হয় কোন কীর্ত্তনীয়ার মুখে গান শুনিয়া সে আনন্দ পাই নাই। শিশুর কোমল হৃদয়ে প্রথম-জীবনের প্রভাব অপূর্ব্বরূপে কাজ করে। আমার মনে হয়, শৈশবে যে সকল বিষয় লইয়া আমরা আনন্দ লাভ করিয়া থাকি, যৌবনে তাহাই আমাদিগকে উদ্দীপনা প্রদান করে—এবং তাঁহারই ব্যাখ্যা করিয়া আমরা শেষ জীবন কাটাইয়া থাকি। এই শৈশবই জীবনের প্রথম ক্ষেত্র, তখন যে সকল বীজ বপন করা হয়-দুঃখের হউক সুখের হউক -শেষকালে সেই বীজ সঞ্জাত ফসলই আমাদের ভাগ্যে ফলিয়া ওঠে।

সুতরাং যখন বিশ্বম্ভর সাহার স্কুলে পড়িতে গেলাম, -তখন রামায়ণ ও মহাভারতের কতক কতক অংশ আমার কণ্ঠস্থ। বিশ্বম্ভরের এক পা খোঁড়া ছিল—আমরা কলার পাতে লিখিতাম,-বাড়ী হইতে কতকটা কলার পাতা ও একটা খাগের কলম ও দোয়াত সঙ্গে লইয়া যাইতে হইত। আর একটা পত্রে খানিকটা বালি থাকিত, উহা ব্লটিং কাগজের কাজ করিত। দোয়াতগুলি মাটির ছিল, তাহা সাধারণতঃ ত্রিকোণ হইত; প্রত্যেক কোণে একটি করিয়া ছিদ্র থাকিত, সেই ছিদ্র-পথে সূতা গলাইয়া একটা শিকের মত তৈরী করিয়া দোয়াতটি ঝুলাইয়া লইয়া যাইতাম। দোয়াতের মধ্যে খানিকটা নেকড়া থাকিত, কালী চল্‌কে উঠিয়া পড়িয়া যাইতে পারিত না। খাগের কলম সকলেই কাটিতে পারিত না, এক একজনের এ বিষয়ে অশিক্ষিত-পটুতা ছিল. সেই সকল শিল্পীদের নিকট উমেদারী করিয়া কলম কাটিয়া আনিতাম। আমি এ বিষয়ে কখনই দক্ষতালাভ করিতে পারি নাই। খাগের কলম এবং কিছু দিন পরে হংসপুচ্ছ কাটিতে যাইয়া আমি প্রায় সর্ব্বদাই গোড়া হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত কাটিতে কাটিতে সাবাড় করিয়া ফেলিতাম।

বিশ্বম্ভর সাহা খোঁড়া হওয়ার দরুণ পা ততদূর না চলিলেও হাত খুব বিলক্ষণই চলিত। তিনি যখন ঠাট্টা তামাসা করিতেন, তখন যেমন পাঠশালা ঘর তরুণ কণ্ঠের হাসিতে উচ্ছ্বসিত মুখরিত হইয়া উঠিত, তেমনই আবার যখন মা'র-ধর সুরু করিয়া দিতেন, তখন কান্নার কলরবে পাড়া অস্থির হইয়া উঠিত। আমাদের পড়ার বই ছিল—"শিশু বোধক" এই কল্পতরুর নিকট চতুর্বর্গ ফল পাওয়া যাইত। 'নামতা' 'কড়াকিয়া' হইতে দাতাকর্ণের কবিত্ব, 'ক' 'খ' 'গ' 'ঘ' হইতে স্ত্রী ও স্বামীর পত্র লেখার সেই অপূর্ব্ব ধারা "শ্রীচরণ সরসী, দিবানিশি সাধন-প্রয়াসী মালতী মঞ্জরী দেবী ও "শীতান্তে নিতান্ত সংযোগ" প্রভৃতি বিরহীর প্রাণের আকাঙ্ক্ষা-জ্ঞাপক নানা কথা আমরা একটি শব্দমাত্র না বুঝিয়া মুখস্থ করিয়াছি। কিছুমাত্র ত্রুটি হইলে আমাদের দেশ-সুলভ মোটা বেতের আঘাতে পৃষ্ঠদেশ কণ্টকিত হইয়া গিয়াছে। বঙ্গের এনসাইক্লোপিডিয়ার এই ক্ষুদ্র সংস্করণে পূর্ব্বোক্ত অধ্যায়গুলি ও বিরহী-বিরহিনীর পত্র-ব্যবহার ছাড়া দাখিলা, আদালতে আরজি ও পিতার নিকট পত্র লেখার ধারা লিপিবদ্ধ ছিল। এই পুস্তক পড়া শেষ করিয়াই অনেক পড়ুয়া কর্ম্মক্ষেত্রে নামিতেন—তাঁহারা কেহ হইতেন গ্রামের পাটোয়ারী—তসিলদার। এমন কি কেহ কেহ পঞ্চায়েতের সর্দ্দার হইতেন। এই শিক্ষার বলে কিছু-তেই আটকাইত না। এই পুস্তকের যে কাটতি কত ছিল, তাহা লং সাহেবের ক্যাটালগ পড়িয়া হিসাব করিলে দেখা যাইতে পারে।

বিশ্বম্ভরের পাঠ-শালায় চারুপাঠ দ্বিতীয়ভাগ পর্য্যন্ত পড়া শেষ করিয়া আমি মাণিকগঞ্জ মাইনর স্কুলে ভর্ত্তি হইলাম। বিশ্বম্ভরের নিজে পড়া-শোনার দৌড় ঐ চারুপাঠ পর্য্যন্তই ছিল—এমন কি চারুপাঠের শেষ পর্য্যন্ত অনেকটা তিনি নিজেই ভাল বুঝিতেন না—এজন্ত উচ্চ ক্লাসের পড়ুয়ারা ঠকাইবার ইচ্ছায় যখন তাঁহাকে বিরক্ত করিত—তখন একদিকে

তিনি দমাদম কিল, চড় ও বেত মারিতে থাকিতেন, এবং অপর দিকে কঠোর শাসনসূচক বহুতর গালাগালি মুখ হইতে নিষ্ঠিবনের সঙ্গে অজস্র বাহির হইতে থাকিত। তিনি একাই যেন সব্যসাচী ;—স্বীয় শরীরের বিধিদত্ত অস্ত্রশস্ত্র ও বাক্যবাণ দ্বারা বিদ্ধ করিয়া এই ভাবে তিনি বিদ্রোহ নির্ব্বাণ করিয়া ফেলিতেন। অভয়শঙ্কর সেন মহাশয়ের বাড়ীর বাহিরে আটচালা ঘরটা বিশ্বম্ভরের এই লীলাভূমি ছিল। আমি ত্রিশ বৎসর পরে ১৯১৮ সনে সেই আটচালা ঘরের পড়ন্ত অবস্থা দেখিয়া আসিয়াছি; সাত বৎসরের শিশু তখন পঞ্চাশ বৎসরের বৃদ্ধ।

মানিকগঞ্জে স্কুলে প্রথম যখন প্রবেশ করি, তখন প্যারীমোহন বাবু ছিলেন, হেড মাষ্টার; বাহিরে নিরীহ ভাল মানুষ বলিয়া তাঁর খ্যাতি ছিল, কিন্তু ছেলেদের ছিলেন তিনি কালান্তক যম। তিনি সহজে রাগিতেন না, শীত গ্রীষ্মে একটা ছিন্ন তালি দেওয়া নীল রঙ্গের র‍্যাপার গায় দিয়া চেয়ারের উপর দুই পা তুলিয়া দিয়া জড়সড় হইয়া বসিয়া অনেকটা সময়ই ঝিমাইতেন। কিন্তু লঙ্কাধিপের দ্বিতীয় সহোদর প্রতিম এই মহাত্মার যখন নিদ্রাভাব ঘুচিয়া চক্ষের রক্তবর্ণ ফুটিয়া উঠিত—তখন যে ছাত্র কোনরূপ ত্রুটি করিয়াছে—তাহাকে শুধু-হাতে বিষম প্রহার করিতেন তাঁহাকে আমরা বেত ব্যবহার করিতে দেখি নাই। কিন্তু এই রাগের তাণ্ডব বৎসরের মধ্যে দুই একবার হইয়াছে মাত্র। আমাদের সহাধ্যায়ী উমাচরণ ছিল, কোর্ট ইন্‌স্পেক্টর শ্যামাচরণ গাঙ্গুলীর পুত্র। উমাচরণ অতি দুষ্ট ছিল, একদিন প্যারীবাবু তাহাকে ধরিয়া টেবিলের পায়ের সঙ্গে চাদর দিয়া বাঁধিয়া রাখিয়াছিলেন—এবং উৎপাতের শাস্তি হইল মনে করিয়া পা দুখানি বিশ্রামের ভাবে টেবিলের নীচে চালাইয়া দিয়া ঝিমাইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন—কিন্তু উমাচরণ তাঁহার শ্রীপদযুগলে এমনই হেঁচরাইয়া দিয়াছিল যে, পা হইতে বেশ খানিকটা রক্ত বাহির হইয়া গেল।

সেই দিন তাহার ঘুম একবার ভাঙ্গিয়া গিয়া স্কুল গৃহকে তিনি রণক্ষেত্রে পরিণত করিয়াছিলেন।

ইহার অল্পদিন পরেই দাসোড়া গ্রামবাসী শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্রসেন মহাশয় আমাদের স্কুলের হেড মাষ্টার হইয়া আইসেন। ইনি জীবনে প্রথম ব্রাহ্মমতাবলম্বী ছিলেন। ইনি জীবিত আছেন, বয়স প্রায় পঁচাত্তর হইবে—এখন তিনি গোঁড়া হিন্দু। তাঁহার স্কুলে আবির্ভাব হওয়ার পর প্যারী বাবু দ্বিতীয় শিক্ষক হইলেন—ইতিপূর্ব্বে ছেলেরা এই স্কুলের অধ্যাপকগণের নামে যে ছড়া বাঁধিয়া তাঁহাদের গুণ-গরিমা অক্ষয় করিয়া রাখিয়াছিল—তাহা আমার বেশ মনে আছে—সেটি এই :—

* * মাষ্টারের বড় রাগ।
সদাই যেন নেকড়ে বাঘ॥
* * মাষ্টার সিন্ধু ঘোটক
সাত পুরুষে তার নাই চটক।
* * * পণ্ডিত অতি কুড়ে,
সদাই থাকেন চেয়ার জুড়ে।
* * * * অতি চাষা,
ঐ পাড়ে তার ভাঙ্গা বাসা।"

"ঐ পাড়ে" শব্দ বিশেষ অর্থ-বোধক,—মাণিকগঞ্জ মহকুমার নিম্নে একটা খাল বহিয়া গিয়াছে। সেই খালের পশ্চিম পাড়েই অধিকাংশ অধিবাসীর বাস—"ঐ পাড়ে" অর্থ ভিন্ন পাড়ে—পূর্ব্বদিকে।

পূর্ণচন্দ্র সেন একটু রাগী ছিলেন। প্যারী বাবুর ন্যায় তিনি বছরের

মধ্যে দু-একবার রাগিতেন না, অনেক সময় রাগিয়াই থাকিতেন, ছেলেরা তাঁহাকে বড়ই ভয় করিত। একটুকু অতিরিক্ত ক্রোধ ভিন্ন তাঁহার আর সকলই সদ্‌গুণ ছিল। দীর্ঘ, গৌরবর্ণ মূর্ত্তি, প্রশস্ত কপাল, চক্ষু দুটি জ্যোতির্ম্ময়, কথা খুব তাড়াতাড়ি বলিতেন না—আস্তে আস্তে থম্‌কে কথা বল্‌তেন—কিন্তু যাহা বলিতেন—তাহা গাঢ় অনুভব ব্যঞ্জনা করিত; তিনি প্রায়ই হেমবাবুর কবিতা ক্লাসে পড়িয়া শুনাইতেন। কবিতা পড়িবার সময় এমনই ধীরভাবে প্রতিটি কথার উপর জোর দিয়া পড়িতেন, যে শিশু-শ্রোতাদের মনে যেন ছাপ পড়িয়া যাইত। তাঁহার কাছে ইংরেজী প্রথম শিখিয়াছিলাম। দুই চার মাসের মধ্যে তিনি ইংরাজী ব্যাকরণের সূত্র আমাদের এমন বুঝাইয়া দিয়াছিলেন, যে তাহার পরে ব্যাকরণের খুব বেশী শিখিবার ছিল না। সভা হইলে তিনি প্রায়ই নীরব থাকিতেন—কারণ বক্তৃতা দেওয়ার ক্ষমতা তাঁহার ছিল না। পর সময়ে তিনি মাণিকগঞ্জে সর্ব্বপ্রধান উকিল হইয়াছিলেন—তাহা বক্তৃতার ছটায় নহে। যেমন করিয়া তিনি আমাদিগের মনে কবিতার ছাপ মারিয়া দিয়াছিলেন, ইংরাজী ব্যাকরণের সূত্র গাঁথিয়া দিয়াছিলেন, অল্প কথায় সেই ভাবে তিমি হাকিমকে তাঁর মক্কেলের জোরের কথাগুলি এমনই বুঝাইয়া দিতেন, যে প্রতিপক্ষের উকিলের ওজস্বিনী ভাষায় হাকিমের পূর্ব্বসংস্কার কিছুতেই টলিত না। তিনি যদি জানিতে পারিতেন—মক্কেলের মোকদ্দমা মিথ্যা, তবে কিছুতেই সে মোকদ্দমার ভার গ্রহণ করিতেন না।

পূর্ণবাবুর চরিত্র অতি বিশুদ্ধ—তাঁহার মত বৈষ্ণবশাস্ত্রের বোদ্ধা বঙ্গদেশে খুব কমই দেখিয়াছি। আমার যখন বার বৎসর বয়স, তখন আমি তাঁহার কাছে বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাসের পদের ব্যাখ্যা প্রথম শুনিয়াছিলাম, তিনি প্রথম বিদ্যাপতির এই পদটি আমাকে পড়িয়া শুনাইয়াছিলেন।

"কানুমুখ হেরইতে ভাবিনী রমণী।
ফুকরই রোয়ত ঝর ঝর নয়নী॥
অনুমতি মাগিতে বরবিধু বদনী।
হরি হরি শবদে মুরছি পড়ে ধরণী॥
বুঝায়ে কহয় তবে নাগর কান।
হাম নাহি মাথুর করব পয়ান॥
ইহবর শবদ পশিলু যবে শ্রবণে।
তব বিরহিনীধনি পাওল চেতনে॥
নিজ করে ধরি দুঁহ কানুক হাত।
যতনে ধরল ধনি আপনাক মাথ॥"

কৃষ্ণ যে উপন্যাসের নায়ক নহেন—স্বয়ং ভগবান এবং রাধা যে সাধারণ প্রণয়িণী নহেন—ভগবৎ প্রেমানন্দের স্বরূপ, তিনি সেই দিনই আমাকে তাহা এমন করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছিলেন—যে তাঁহার মুখোচ্চারিত ব্যাকরণের সূত্র যেরূপ আমার চিত্তে খোদিত হইয়া গিয়াছিল—সেই ভক্তিব্যাখ্যাও আমার মনে সেইরূপই হইয়াছিল—আমিকখনই রাধাকৃষ্ণ-সম্বলিত পদাবলী সামান্য নায়ক-নায়িকার প্রেমোপাখ্যানের মত আর পড়িতে পারি নাই। তিনি আমাকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন, বিদ্যাপতির ভাব-সম্মিলন অর্থ শরীরের মিলন নহে; উহা হৃদয়ে ভগবৎসত্তার অনুভূতি; এজন্য সেই মিলনের উপচার ও অভ্যর্থনা কিছুই বাহিরের নহে; দেহ ভগবানের মন্দির, এবং সেই মন্দিরেই তাঁহার অভ্যর্থনার বেদী—

পিয়া যব আয়ব এ মঝু গেহে।
মঙ্গল আচার করব নিজ দেহে॥

বেদী করব হাম আপন অঙ্গমে।
ঝাড়ু করব তাহে চিকুর বিছানে।
আলিপনা দেওব মতিম হার।
মঙ্গল কলস করব কুচভার॥

বাহিরের আলিপনা দেওয়া নহে; বক্ষে তাহার জন্য বেদী তৈরী হইল, মুক্তাহারেই সেই আলিপনা হইবে। স্তনদ্বয় মঙ্গলঘটস্বরূপ হইবে, এবং উন্মুক্ত সুদীর্ঘ কেশদাম দ্বারা ঝাঁটা প্রস্তুত করিয়া সেই বেদী পরিষ্কার করা হইবে। এখানে যিনি আসিতেছেন, তিনি বাহিরের পথ দিয়া আসিয়া বাহিরের ঘরে আসন গ্রহণ করিবেন না, এই দেহের মন্দিরে তাঁহার প্রতিষ্ঠা হইবে—সুতরাং এই দেহেই সমস্ত মঙ্গল আচারের ব্যবস্থা হইতেছে।

পূর্ণবাবুর গভীর ভক্তি আমাদিগকে এই সংশিক্ষা দিয়াছিল। কিন্তু তখনও তিনি ব্রাহ্ম মত একবারে ছাড়েন নাই। কেশব বাবু যখন ভগবৎ-প্রেরণার দোহাই দিয়া কন্যা-বিবাহের আয়োজন করিতেছিলেন এবং "Am I not an inspired prophet?" বক্তৃতা দিয়া কলিকাতার টাউন হল কাঁপাইতেছিলেন, তখন এই ধর্ম্মনিষ্ঠ পল্লীযুবক তাঁহার শিশু-শ্রোতাদিগের নিকট অনেক সুগভীর পরিতাপসূচক আন্তরিক আক্ষেপোক্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি পিতৃদেবের সঙ্গে এ সম্বন্ধে প্রায়ই আলোচনা করিতেন এবং তাঁহার স্বকৃত "সত্যব্রতের পরীক্ষা" নামক কাব্য গ্রন্থের একস্থানে লিখিয়াছিলেন,

"মৃৎস্তূপে বসিয়া যথা রাখাল বালক
গম্ভীর ভঙ্গীতে করে রাজাজ্ঞা প্রচার
বেদীর উপরে বসি তথা ছন্নমতি
ঈশ্বরোপলক্ষে করে আপনা প্রচার।"

এই 'ছন্নমতি' কেশবচন্দ্র সেন,—এবং এই 'ছন্নমতি' কথাটায় এটি বুঝাইতেছে, যে কেশব বাবুর অত্যন্ত বিরুদ্ধ হইলেও পূর্ণ বাবু তাঁহাকে প্রতারক মনে করেন নাই।

মাণিকগঞ্জ স্কুলে পূর্ণবাবুর প্রভাব আমরা খুব বেশী অনুভব করিয়াছিলাম। আমরা একত্র পড়িতাম—প্রসন্নগুহ, কেদার বসু, অবিনাশ, দুর্গাকান্ত ও আমি। প্রসন্নগুহ খোলা মন,—উদার চরিত্র। কেদার সেই বয়সেই কতকটা বৈষয়িক—ক্ষীণ দেহ। অবিনাশ ধীর গম্ভীর,শান্তশিষ্ট, মেয়েদের "ভাল ছেলে।" দুর্গাকান্ত নেহাৎ গো-বেচারী—আমরা বাজারের কাছে খোলা মাঠে ব্যাটবল খেলিতাম। আমাদের সঙ্গী আরও দুইজন ছিল—হেম নেউগী ও শশী নেউগী, ইহারা একটু নীচের ক্লাসে পড়িত, কিন্তু খেলায় আসিয়া যোগ দিত। শশী আমাদের অপেক্ষা বয়সে একটু ছোট ছিল, তাহার চোখদুটি হরিণের মত ছিল, এজন্য আমরা তাকে "হরিণ শিশু" বলিয়া ডাকিতাম। প্রসন্ন গুহ ও আমি গলায় গলায় থাকিতাম, আমাদের এত ভাব ছিল। তাদের ও আমাদের বাসাবাড়ী অতি কাছাকাছি ছিল, তার মায়ের সঙ্গে আমার মায়েরও খুব ভাব ছিল। উভয়ে এক হইলে কত ঘণ্টা সুখ দুঃখের গল্পে কাটিয়া যাইত; প্রসন্নের মায়ের চেহারা ছিল শ্যামবর্ণ, তাঁহার একটা লক্ষ্মীশ্রী ছিল, সুরটি ছিল স্নেহময়, তিনি সকল ছেলেরই মায়ের মতন ছিলেন। একটা সোনার হার সর্ব্বদা গলায় পরিতেন, কামরাঙ্গার ডিকস্ এডিসন হ'লে যেরূপ হয়, তেমনই সোনার দানা দিয়ে সেই হার গড়া হইয়াছিল, পল উঠানো ছোট ছোট বাদামের মত। প্রসন্নের ছোট ভাই গগন (অভয় গুহ) সম্প্রতি কলিকাতা হইতে পি, এচ, ডি উপাধি লাভ করিয়া অধ্যাপকের কাজ করিতেছেন।

প্রসন্ন ও আমি সর্ব্বদা একত্র থাকিতাম, খাইতে বসিতে—ঘুরিয়া

বেড়াইতে অবিরত সে আমার সঙ্গী। বিধাতা আমাদের গান গাহিবার শক্তি দেন নাই, তবুও আমরা দুজনে গানের যে বিকট চেষ্টা করিতাম, তাহাতে নূতন পুকুরের দুই ধারের প্রান্তরভূমি যেন সত্যসত্যই ভয়ে কাঁপিয়া উঠিত। দুজনে একত্র পূর্ণবাবুর হাতে কিল চড় খাইয়া মানুষ হইয়াছি। সে এখন ময়মনসিংহের জজ আদালতের একজন ভাল উকীল—প্রসন্ন স্বর্গীয় রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর, বিদ্যাসাগর, সি আই, ই মহাশয়ের এক কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিল।

আমাদের দলের কেদারনাথ বসু মাইনর পাশ করিয়া আর বেশী উঠিতে পারে নাই। সে-মোক্তারী পাশ করিয়া মাণিকগঞ্জেই মোক্তারী করিত, তাহার পশার সকলের চাইতে ভাল হইয়াছিল। একদিন গিরীশ পণ্ডিত তার মাথায় চড় মারিয়াছিলেন। সে সেইদিন পণ্ডিত মহাশয়কে যেরূপ ধমক দিয়াছিল, তাহা আমি এখনও পর্য্যন্তও ভুলি নাই। পণ্ডিতের দিকে ক্রুদ্ধনেত্রে চাহিয়া সে বলিল, "পণ্ডিত মহাশয় ব্রহ্ম-তালুতে চড় মারছেন কেন? আর কি জায়গা নাই। দমাদম পিঠে মারুন না কেন? আমার মাথার অসুখ—আর আপনার একটা কাণ্ড জ্ঞান নাই?"

সেকালের মাষ্টার পণ্ডিতদের যে মারধর সম্বন্ধে কাণ্ডজ্ঞানের অভাব ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। হাতী দেখিতে উঁকিমারার অপরাধে পূর্ণবাবু আমার নাকটা ধরিয়া এমন মলিয়া দিয়াছিলেন, যে পাঁচ ছয়দিন আমার নাকের ডগাটা টকটকে লাল হইয়াছিল।

দুই তিন বছর হ'ল কেদার মারা গিয়াছে। আমাদের সেই সময়ের আর দুই বন্ধু মাণিকগঞ্জবাসী আজাহার ও তফিরুদ্দি উভয়েই মারা গিয়াছে। আজাহার ঐ সব্‌ডিভিসনে মোক্তারীতে খুব পশার জমাইয়া হঠাৎ সাত আট বৎসর হইল মারা পড়িয়াছে। আজাহার দেখতে বড়

সুপুরুষ ছিল। মরিবার এক বছর পূর্ব্বে সে কলিকাতায় আমার বাসায় হঠাৎ বাড়ীর মধ্যে চলিয়া আসে। আমি প্রায় পঁয়ত্রিশ বৎসর তাহাকে দেখি নাই, কালোকুঞ্চিত কেশদামের পরিবর্ত্তে এলোমেলো সাদা-কাঁচা চুল, দোহারা ক্ষীণ-কটি তরুণ মূর্ত্তির পরিবর্ত্তে বেশ মোটাসোটা, হৃষ্টপুষ্ট ভুরিওয়ালা চেহারা,—রঙ্গের সে ঔজ্জ্বল্য নাই, ফর্শা ছিল—সেই ফর্শা রং যেন বেগুণে রঙ্গের বাটীতে গুলিয়া মাখান হয়েছে—কি করিয়া চিনিব? "কে আপনি? এ যে বাটীর ভেতর" বলিয়া হঠাৎ রুক্ষস্বরে কথা বলিতে যাইয়া দেখিলাম, তাহার সঙ্গে সতের আঠার বৎসরের এক তরুণ সদ্য-যৌবন সুদর্শন মূর্ত্তি! লুপ্তস্মৃতির পুনরুদ্ধারের ন্যায় এই তরুণ যুবককে বিশেষ পরিচিত বলিয়া মনে হইল; আমি সেই বালককে দেখিয়া পঁয়ত্রিশ বৎসরের ব্যবধান ভুলিয়া গিয়া বলিলাম "আজাহার নয় কি?" প্রৌঢ় আমায় বলিল "ওটি আজাহার-তনয়, এই আমি হচ্ছি আজাহার, তোমাকে এই বাড়ীর মালিক বলিয়া না জানিলে কখনই বুঝিতে পারিতাম না, তুমি সেই দীনেশচন্দ্র, একবারে বদলাইয়া গিয়াছ।"

তাহার ছেলে ম্যাট্রীকুলেশন পাশ হইয়াছে, তাহাকে প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্ত্তি করিতে সে নিজে এসেছে। আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া তাহাকে ভর্ত্তি করাইয়া দিলাম। আজাহার বলিল "দেখতে মোটা দেখ্‌ছ, আমার শরীরটি একটি ব্যাধি মন্দির, একজন ভাল ডাক্তারের সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দাও।" ডাঃ সতীশচন্দ্র বরাটের উপর তাহার ভার দিলাম। কয়েক মাস ঔষধ ব্যবহার করিয়া একটু ভাল ছিল—তার পরে শুনিলাম—সে মাণিকগঞ্জে হঠাৎ মারা পড়িয়াছে।

আমাদের খেলার সাথী সেই "হরিণশিশু" শশী নেউগী জলপাইগুড়ি জজ আদালতের একজন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উকিল হইয়াছিল। সেও আজ দশ বার বৎসর হইল মারা গিয়াছে। তাহার ভাই হেম নেউগী সবজজ হইয়া

বোধ হয় এতদিন পেন্সন নিয়া থাকিবে। দুর্গাকান্ত রায় হাওড়ায় সব-জজিয়তি করিতেছে।

মাণিকগঞ্জ স্কুল হইতে আমরা পাঁচজন মাইনর পরীক্ষা দিয়াছিলাম ইংরাজি ১৮৭৯ সনে। তার মধ্যে আমি, কেদার, প্রসন্ন ও দুর্গাকান্ত থার্ড ডিভিশনে পাশ হইয়াছিলাম। অবিনাশ ফেল হইয়াছিল। পূর্ণ বাবু বলিতেন আমি ইংরেজীতে ভাল, কিন্তু অঙ্কে আমার মাথা খেলে না, সেই কথাই বেদবাক্য বলিয়া মানিয়া লইয়া, এবঞ্চ তাহাতে কতকটা গৌরব মনে করিয়া, সাহিত্যই পড়িতে আরম্ভ করি—এবং গণিতকে তুচ্ছ করি,—তাহার ফলে সত্যই আমি গণিতে কাঁচা রহিয়া গেলাম, কিন্তু এখন মনে হয়—আমি পড়িলে গণিত আয়ত্ত না করিতে পারিতাম এমন নহে।

এই মাইনর পরীক্ষায় একটা বিভ্রাট হইয়াছিল। ইংরেজী পরীক্ষায় যে ছেলে মাণিকগঞ্জ স্কুলে সর্ব্বোচ্চ নম্বর পাইবে—তাহার সেই বৎসর একটা রৌপ্য-পদক পাওয়ার ব্যবস্থা ছিল। আমি ইংরেজিতে ভাল ছিলাম—সুতরাং উক্ত পদকটি যে আমার প্রাপ্য ছিল—তাহা সকলেই জানিতেন এবং আমিও পূর্ব্বসিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছিলাম। কিন্তু পরীক্ষার ফল বাহির হইবার কয়েক মাস পরে ইন্‌স্পেক্টর আফিসে অনুসন্ধান হইলে জানা গেল আমার ইংরেজীর কাগজখানি খোওয়া গিয়াছে। অথচ আমি মাইনর পাশ হইয়াছি। সেকালে মোট নম্বরের একটা নির্দ্দিষ্ট অংশ রাখিলেই পাশ হওয়া যাইত—সুতরাং ইংরেজীতে শূন্য পাইয়াও আমি পাশ হইয়াছিলাম। বাবা যখন এ বিষয় লইয়া লেখালেখি করিতে লাগিলেন, তখন আর কোন ফল হইল না। আমি যে ইংরেজী কাগজ দিয়াছিলাম, তাহা প্রমাণিত হইতে বিলম্ব হইল না—কিন্তু ইন্‌স্পেক্টর সাহেব দুঃখ করিয়া লিখিলেন—অনুসন্ধানটা খুব দেরীতে

হইয়াছে—তখন আর এ বিষয়ে কোন প্রতিকারের উপায় ছিল না। বাবা লিখিলেন যদি ইংরেজীতে শূন্য পাইয়াও মাইনর পরীক্ষা পাশ করা যায়, তবে মাইনর ও ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় কি তফাৎ থাকে? ফলে সেই বৎসর নূতন আইন হইল যে মাইনর পাশ করিতে হইলে ইংরেজীর পরীক্ষায় একটা নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক নম্বর থাকা প্রয়োজন।

মাইনর পরীক্ষা পাশ হইবার পূর্ব্বেই আমার দ্বাদশ বৎসর বয়সে বিবাহ হইয়া গিয়াছিল। আমার শ্বশুর উমানাথ সেন কুমিল্লা কলেক্টরীতে হেড ক্লার্ক ছিলেন, তাহার পিতা সেখানে সর্ব্বপ্রধান মোক্তার ছিলেন, এবং সেইখানেই আমার পিতার মাতুল চন্দ্রমোহন দাস (যাঁহার সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে বিস্তারিতভাবে লেখা হইয়াছে) ওকালতি করিতেন। মাণিকগঞ্জ স্কুলের শেষ সীমা অতিক্রম করার পর—পিতা আমাকে কুমিল্লায় পাঠাইয়া দিলেন।

তখন আমাদের সংসারে দৈন্য ও রোগ ঢুকিয়াছে। ইহার মধ্যে প্রসিদ্ধ সভার ও তন্নিকটবর্ত্তী কয়েকটি গ্রাম মাণিকগঞ্জ মহকুমা হইতে সরাইয়া লইয়া ঢাকায় সদরের অন্তর্গত করা হইয়াছে। সাভার ধনী বণিকগণের একটা কেন্দ্র ছিল, এবং এই স্থানের সকল মোকদ্দমাই বাবা পাইতেন,—ঐ গ্রাম এবং তন্নিকটবর্ত্তী কয়েকটি গ্রাম বাবার হাতছাড়া হওয়াতে তাঁহার পসার অত্যন্ত কমিয়া গেল—এই সময়ে বাবা বহুমূত্র রোগাক্রান্ত হন, এবং তাঁহাব দুইটি চোখেই ছানি পড়ে। আমাদের নানারূপ কষ্ট উপস্থিত হয়।

মা বড় কষ্টে আমাকে একাকী দূর কুমিল্লায় ছাড়িয়া দিতে সম্মত হন। আমার শিক্ষার উন্নতিকল্পে সর্ব্বদাই মা অতি দৃঢ়চেতা ছিলেন। তাঁহার মত স্নেহময়ী—ত্যাগ-পরায়ণা রমণী আমি খুব কমই দেখিয়াছি। তাঁহার সমস্ত আবদার ও বিরোধ ছিল আমার পিতার সহিত, কিন্তু

অপর সকলের সঙ্গে তাঁহার কোন আবদারই ছিল না। যাহাকে তিনি প্রতি মুহূর্ত্তে চোখে হারাইতেন, তাহাকে তিনি কৈশোরে সাত দিনের পথ দূরে পাঠাইয়া বৎসর ধরিয়া যে কি উৎকণ্ঠায় থাকিতেন, তাহা আমি এখন বুঝিতে পারি। ইহার পর যখন আমি ঢাকায় পড়িতাম, তখন ছুটিতে আমি বাড়ী আসিয়া ছুটি ফুরাইলে একটি দিন ও বেশী বাড়ী থাকিতে পারিতাম না। আমার পড়ার কোন বিঘ্ন হইলে তিনি আমায় ক্ষমা করিতেন না। তাঁহার এই ব্যবহার আমার নিকট নির্ম্মম বোধ হইত। কিন্তু তাঁহার একমাত্র পুত্রের প্রতি অদম্য স্নেহ-প্রবাহকে যে তিনি কিরূপ সংযমের রাস ধরিয়া ঠেকাইয়া রাখিতেন—তাহার মধ্যে পুত্রের ভবিষ্যতের শুভ চিন্তা কতটা প্রভাব বিস্তার করিত—তাহা ভাবিয়া দেখিলে, তাঁহাকে সাধারণ স্ত্রীলোক হইতে অনেক উচ্চ স্থানে আসন দিতে হয়। আমি যখন ঢাকায় পড়িতাম, তখন যে আত্মীয়ের বাড়ী ছিলাম, তিনি প্রায়ই আমাকে অযথা কষ্ট দিতেন এবং তাঁহার আশ্রিত অপরাপর আত্মীয় বালক অপেক্ষা আমাকে অবহেলার চক্ষে দেখিতেন, আমাকে দিয়া অনেক ফরমাইস খাটাইতেন এবং প্রায়ই এ ছুতো ও ছুতো ধরিয়া গালমন্দ দিতেন। আমি তাঁহার বাড়ীতে চোরের মত থাকিতাম, তাঁহার ছেলেদের সঙ্গে স্ফূর্ত্তি করিয়া খেলিতে সাহস পাইতাম না। যখন উৎকট শারীরিক পরিশ্রমের দরকার হইত, তখন সর্ব্বাপেক্ষা দুর্ব্বল হইলেও সেই কাজের জন্য আমারই ডাক পড়িত। ছয় সাত মাস পরে ছুটিতে বাড়ী আসিতাম। আমার প্রকৃতি নীরব ও সহিষ্ণু ছিল; বহু মনের কষ্ট আমি মুখ ফুটিয়া বলিতাম না। কিন্তু একদিন আমি নীরব রাত্রিতে ঝিল্লি-নাদিত প্রকৃতির নিতান্ত আড়াল পাইয়া মায়ের গলা জড়াইয়া কাঁদিয়া আমার মনের দুঃখ তাঁহার কাছে বিনাইয়া বিনাইয়া বলিয়াছিলাম।

মা আমাকে দৃঢ়ভাবে বলিলেন "ছিঃ! খোকা—তুই বড় তুচ্ছ কথা বড় করিয়া দেখিস্। সে (আমার আশ্রয়দাতা আত্মীয়) কেন এমন করিতে যাইবে? এ তোর বুঝবার ভুল! আর যদি দুই একটা কাজে সে তোকে লাগায়, তা কর্‌তে অপমান কি? গুরুজনের সেবায় পুণ্য হয়। তাই ভেবে সে সকল কাজ করিস্। তুই কি সে বাড়ীর চাকর যে নিজকে এত হীন মনে কচ্ছিস্?" এমনই দৃঢ়ভাবে তিনি কথাগুলি বলিলেন যে আমার সমস্ত আক্ষেপ অধরে মিলাইয়া গেল—সমস্ত অশ্রু চক্ষে শুকাইয়া গেল; বৃন্তচ্যুত ফুল যেরূপ আশ্রয় লাভের ব্যাকুলতায় পাথরে আছড়িয়া পড়ে, আমি মায়ের নির্ম্মম অন্তঃকরণের নিকট মাথা খুঁড়িয়া সেইরূপ বিড়ম্বিত হইলাম। তখন মনে বড় দুঃখ হইয়াছিল। এখন বুঝিতে পারিতেছি, মাতা কতটা সংযম দ্বারা নিজের উদ্গত সহানুভূতির বাহ্যিক প্রকাশকে রোধ করিয়াছিলেন। তিনি যদি সাধারণ স্ত্রী-সুলভ ব্যাকুলতা দ্বারা আমার কথার প্রশ্রয় দিয়া কান্নাকাটি করিতেন, তবে আমার লেখা পড়ার সুবিধা চিরদিনের জন্য রুদ্ধ হইয়া যাইত—আমি সে বাড়ীতে আর থাকিতে পারিতাম না।

বাবা আমাকে কাছে বসাইয়া উপাসনা পদ্ধতি শিখাইতেন। ঠাকুর-দেবতা যে কিছু নয়, তাহা বুঝাইতেন "একমাত্র আরাধ্য ঈশ্বর—তাঁহার রূপ নাই। ছেলেরা যেমন পুতুল লইয়া ভাবে ইহারাই মানুষ, কাঠ পাথর ও মৃণ্ময় বিগ্রহ লইয়া তেমনই লোকে ভাবে ইহারাই দেবতা। ছেলেরা যেমন পুতুলের বিয়ে দেয়, ইহাঁরা তেমনই পুরাণ রচনা করিয়া এই সকল কাঠ পাথরের মূর্ত্তি সমূহের জন্ম হইতে সুরু করিয়া বিবাহাদি সমস্ত বিষয়ে গল্প রচনা করিয়া পুস্তক লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।" পিতা যখন একা আমায় লইয়া এই সকল উপদেশ দিতেন, তখন মা হঠাৎ ঝড়ের মত ঘরে ঢুকিয়া সমস্ত উপদেশ ওলট পালট করিয়া দিয়া ক্রুদ্ধ স্বরে পিতাকে

বলিতেন—"ওগো তোমার পায়ে পড়ি, তুমি ওর মাথাটী খেও না, তুমি জীবন ভরিয়া আমায় এই সকল কষ্ট দিয়ে এসেছ, সাত নয় পাঁচ নয়, আমার একটা ছেলে তাহাকে ও একবারে যাহান্নামে দেওয়ার পথ করিতেছ। এরূপ করিলে আমি তোমার পায়ের কাছে মাথা খুঁড়িয়া মরিব, না হয় গলায় দড়ি দেব। বার মাসে তের পার্ব্বণ করিতে সকল কাজ আমাকে নিজে করিতে হয়। বাড়ীতে দুর্গোৎসব—তাও পুরুৎ ডাকা হ'তে বাজার করার ব্যবস্থা এমন কি বাজনার বন্দোবস্ত ও আমার করতে হয়। ভেবেছি খোকা বড় হইলে সে এই সকল ব্যাপারে আমার সহায় হইবে—তুমি ওকেও বিধর্ম্মী করিয়া তুলিতেছ!" মায়ের কথার তোড়ে বাবা ভাসিয়া যাইতেন। আমি ইহার পরে প্রহারের ভয়ে আস্তে আস্তে তাঁহার নিকট হইতে উঠিয়া যাইতাম।

আমি যেবার "এল, এ" পরীক্ষা দিব, তখন ফিলিপ, টি, স্মিথ সাহেব একবার ঢাকায় আসিয়াছিলেন। ইনি ছিলেন "এপিফেণীর" এডিটর। ইনিই এই পত্রিকাখানি প্রথম প্রকাশ করেন। সাহেব আমাকে বড়ই ভাল বাসিতেন, ১৮৮২ সনের এপিফেনি কাগজে আমার অনেক লেখা বাহির হইয়াছিল। তিনি ঢাকায় আসিয়া শুনিলেন, আমি সুয়াপুর গ্রামে চলিয়া আসিয়াছি। তিনি আমায় লিখিলেন "অক্সফোর্ড মিশনের ব্যয়ে তুমি ঢাকায় চলিয়া আসিয়া আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ কর, নতুবা ব'ল আমি তোমাদের সুয়াপুর গ্রামে যাইব।" বাবা পত্রখানি পড়িয়া খুসী হইয়া বলিলেন "বেশ্‌ত সাহেব এ গ্রামে আসুন না, এখানে সভা করিব ও তাঁহাদের সঙ্গে ব্রাহ্ম-মতের পোষকতা করিয়া পাল্লা দিব।" কিন্তু মা এই কথা শুনিয়া বিষম চটিয়া গেলেন—"আমাদের সংসারটা কি ভূতের লীলার স্থান যে ব্রাহ্ম খ্রীষ্টান সকলে মিলিয়া এখানে উৎপাত করিবে? উপলক্ষ তো একটা আধ মরা ছেলে" আমার দিকে ক্রুদ্ধ চক্ষে চাহিয়া বলিলেন—

"খোকা তুই লিখে দে—আমাদের হিন্দু ধর্ম্মের মত শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম আর নাই—আমরা খ্রীষ্টানী মত শুনিতে চাই না।" আমি স্মিথ সাহেবকে লিখিলাম, "আমাদের গ্রামের লোক গোঁড়া হিন্দু,—এখানে আসিলে আপনার ভাল লাগিবে না।"

আমার মাতার ধর্ম্ম সম্বন্ধে মতের উদারতা না থাকিতে পারে—কিন্তু সকল বিষয়েই তাঁহার একটা প্রবল মত ছিল—এবং তাঁহার মতানুসারেই আমাদের চলিতে হইত। পিতা তাঁহার ধর্ম্ম-বিশ্বাস লইয়া যেন কতকটা স্বতন্ত্র হইয়া থাকিতেন, আমরা পূজার উৎসব ও বার মাস তের পার্ব্বণে হিন্দু ধর্ম্মের জয় ডঙ্কা বাজাইয়া ফিরিতাম।

———

(৭)

গৃহে হিন্দু ও ব্রাহ্মমত—

পিতামাতার ও ভগিনীদের মৃত্যু।

আমি ব্রাহ্ম ও হিন্দু—এই দুই শ্রেণীর মধ্যে যাহা সর্ব্বাপেক্ষা ভাল—তাহা সর্ব্বদা চোখের সাম্‌নে দেখিয়াছি। আমার মাতা, মাতামহ ও বড়দিদি-দিগ্বসনী দেবীর যে ভক্তি ও নিষ্ঠা দেখিয়াছি, দেবতার পূজায় যে আগ্রহ ও ব্যাকুলতা দেখিয়াছি, তাহাতে মনে হইয়াছে হিন্দুর দেবতারা জীবন্ত। মাতামহ এত বড় তেজস্বী ব্যক্তি ছিলেন—কিন্তু তিনি যখন শুইয়া শুইয়া গাইতেন "আমার মন যদিরে ভোলে। তবে বালীর শয্যায় কালীর নাম দিও কর্ণ মূলে" তখন তাঁহার দুই চক্ষের জল অজস্র পড়িত। যখন তাঁহার বিশাল দুর্গামণ্ডপে অতি বৃহৎ দশভুজা প্রতিমার আরতির সময় পুরোহিত-কর-ধৃত পঞ্চ প্রদীপ ঘুরিতে থাকিত, অগুরু ও ধূপের সুগন্ধে ও ধোঁয়ার মধ্য হইতে অদৃশ্য ও অব্যক্ত রূপের প্রকাশের ন্যায় মুকুট ও অঞ্চলের স্বর্ণবর্ণ ঝল্‌মল্‌ করিতে থাকিত; কিম্বা পুষ্পপাত্রের ফুল ও চামর সেই বিরাট মূর্ত্তির মুখের নিম্নে দুলিয়া দুলিয়া অরূপকে অপরূপ করিয়া দেখাইত, তখন মাতামহ গললগ্ন উত্তরীয় ও নগ্ন পদে দৈন্য জানাইয়া জোড় হস্তে দাঁড়াইয়া থাকিতেন—দুই গণ্ড ভাসিয়া অশ্রু প্রবাহিত হইত। মা ধন্না দিয়া কাঁদিতে থাকিতেন, কখনও আহার নিদ্রা ছাড়িয়া মন্দিরের দোরে আঁচল পাতিয়া শুইয়া প্রার্থনা জানাইতেন, তখন মাতামহ ও

মাতার আরতি যে বিশ্ব-মাতার কাছে যাইয়া পৌঁছিত–সে সম্বন্ধে আমার কোন সন্দেহ ছিল না এবং এখনও নাই। দিদি দিগ্বসনী দারুণ যক্ষ্মা কাশী লইয়া শেষ রাত্রে নীচেকার একটা সেঁতসেঁতে ঘরে বসিয়া জপ করিতেন; যখন দাসদের বাড়ীর কুঞ্জ বেহাগ রাগিণী গাইয়া দ্বিপ্রহর রাত্রির অভ্যর্থনা করিয়া ঘুমাইয়া পড়িত, তখন দিদির জপ আরম্ভ হইত এবং প্রভাতের কাক-কলধ্বনির সঙ্গে জপ শেষ করিয়া তিনি স্নানার্থ নদীতে যাইতেন, তথা হইতে আসিয়া একবার আমিষের ঘরে রান্না করিয়া পুনরায় নদীতে স্নান করিয়া নিরামিশ পাকে রান্না করিতেন, খাওয়াদাওয়ার পর আবার জপে বসিয়া রাত্রি নয়টা পর্য্যন্ত জপ করিতেন, অধিকাংশ সময়ই গায়ে 'একশত তিন' জর থাকিত এবং প্রায়ই গলা হইতে রক্ত পড়িত। এ সকল কাজ তাঁহাকে আমরা কেন করিতে দিয়াছি, প্রশ্ন হইতে পারে। তাহার কারণ, তিনি যেটা করিবেন—সেইটি করিবেনই। তিনি জেদ করিয়া বসিলে তাহাকে বাধা দেওয়ার ক্ষমতা কাহারও ছিল না। মহামহোপাধ্যায় দ্বারকানাথ কবিরাজ মহাশয় বলিয়াছিলেন—এতদিন এই যক্ষ্মা রোগ লইয়া এরূপ দুশ্চর তপস্যা করিয়া মানুষ যে কি করিয়া বাঁচিয়া থাকিতে পারে, তাহা আমাদের শাস্ত্রে বলে না,—তিনি যে তপস্যা করিতেছেন–সেই তপস্যার শাস্ত্রই এই প্রহেলিকার মর্ম্মোদ্ধার করিতে পারে।"

একদিকে হিন্দুধর্ম্মের এই জলন্ত বিশ্বাস প্রত্যক্ষ করিয়াছি, অপর দিকে পিতৃদেবতার সৌম্য-দর্শন, শান্ত সমাহিত মূর্ত্তি—জ্ঞানের যেন স্থির প্রদীপ। মন্দিরের আরতি হইতে তাহার প্রভাব ও কম ছিল না। তিনি দিবারাত্রি প্রায়ই উপাসনায় কাটাইয়া দিতেন। তিনি কখনও অসত্য কথা বলিয়াছেন, এমন কেহ বলিতে পারিবেন না। তাঁহার ক্রোধ দেখি নাই, তাঁহার চাঞ্চল্য বা মতের পরিবর্ত্তন দেখি নাই, দুঃখ শোকে তাঁহাকে

ক্ষুব্ধ হইতে দেখি নাই, তাঁহার আমার প্রতি অসীম ভালবাসায় ও কোন উদ্বেল বা উচ্ছ্বাস দেখিতে পাই নাই, শুধু একদিন তিনি অধৈর্য্য হইয়াছিলেন—আমার মায়ের মুখে শুনিয়াছি। তিনি ভয় করিতেন নদীকে আর সাপকে। সাপের ভয়ে ঘরে ঘরে বড় খাট পাতা থাকিত ও চাঁদোয়া টাঙ্গানো হইত; নানারূপ মসারীব কায়দা করিয়া তিনি তোষকের নীচে রন্ধ্র মাত্র ফাঁক রাখিতে দিতেন না। সেই একদিনের কথা বলিতেছি। নদীতে ঝড়ের সময় নৌকায় থাকিলে তিনি ভয় পাইতেন, কিন্তু ভয়ের কোন বাহ্য-লক্ষণ প্রকাশ না করিয়া স্থির প্রস্তর-বিগ্রহের ন্যায় বসিয়া উপাসনা করিতে থাকিতেন, তাহার ঈষৎ কম্পিত ওষ্ঠাধর ও অর্দ্ধ নিমীলিত চোখের ভঙ্গীতে যেন বুঝিতাম—'রক্ষা কর', 'রক্ষা কর', এই প্রার্থনা ভাষায় ব্যক্ত না হইয়া ও মনেব মধ্যে চলিতেছে। একদিন নৌকায় তাঁহার মুহুরি বিপিন ঠাকুরের সঙ্গে তিনি আমায় ঢাকায় পাঠাইয়া দিয়াছিলেন, তখন আমার বয়স চৌদ্দ বৎসর। সন্ধ্যাবেলা প্রবল ঝড় হয়, আমরা ঝড়ের রকম বুঝিয়া একটা চড়ায় নৌকা নঙ্গর করিয়া ফেলি। বৃষ্টি ছিল না, শুক্‌নো ঝড়, আমি ও বিপিন ঠাকুরদা সেই চড়ার ধুলি খেয়ে নৌকায়এসে স্থির হইয়া বসিয়াছিলাম। এরূপ ভারি নোঙ্গর ছিল ও এরূপ শক্ত লৌহের শিকলে তাহা আবদ্ধ ছিল যে নৌকা উড়াইয়া বা ভাসাইয়া লইবার কোন সম্ভাবনা ছিল না। মায়ের কাছে শুনিয়াছিলাম, রাত্রে ঝড় উঠিলে পিতা পাগলের মত হইয়া "আমিই খোকাকে মারিয়া ফেলিলাম, আমার খোকা কোথায় গেল? তাকে কে এনে দেবে?" এইভাবে বহু আক্ষেপ করিয়া সেই ঝড়ের মধ্যে লণ্ঠন লইয়া দুই মাইল দূরে আমার মাতুলালয় বংজুড়ী গ্রামে ছুটিয়া যাইয়া আমার মাতুলদিগের দ্বারা পরদিন অতি প্রত্যূষে ঢাকায় লোক পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়া আসেন।

কিন্তু এই দিন ছাড়া আর কখনও তাঁর কোনরূপ ব্যাকুলতা দেখি নাই। আমি একবার রাত্রি নয়টার সময় মাতুলালয়ে ছিলাম, বাড়ি (সুয়াপুর) হইতে তখন এক লোক আসিয়া বলিল—"কর্ত্তা (বাবা) মরণাপন্ন, আপনি এখুনি চলুন।" আমি একটা ঘোড়ায় চড়িয়া সাত আট মাইল পথ অতিক্রম করিয়া বাড়ী আসিলাম। রাত্রি ছিল জ্যোৎস্নাময়ী, পল্লীগুলি ছিল নিদ্রাবিষ্ট, নিঝুম,—কিরূপ দুর্ভাবনায় যে যাইতেছিলাম—তাহা বলিয়া উঠা কঠিন। তখন জ্যৈষ্ঠমাস,—বেশ সুখকর বায়ু বহিতে ছিল—কিন্তু আমার মনের মধ্যে ছিল হাহাকার।

ঘোড়ার বেগ শিথিল করিয়া রাত্রি প্রায় বারটার সময় বাড়ী পৌঁছিলাম, গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম বাবা তাকিয়ায় ঠেস্ দিয়া বসিয়া আছেন। আমাকে দেখিয়া বলিলেন "একটা crisis, (বিপদের অবস্থা) এসেছিল, দক্ষিণা (ডাক্তার, আমার ভগিনীপতি) এতক্ষণ ছিল, সে বলিয়া গিয়াছে বিপদ কেটে গেছে।" তখন তিনি স্থির-ভাবে বসিয়া উপাসনা করিতেছিলেন। আমার মনে যখনই তার কথা মনে হয়, তখনই তাঁহার সেই সৌম্য উপাসনার মূর্ত্তি জাগিয়া উঠে,—"ভয়ানাং ভয়ং ভীষণং ভীষণানাং" এবং বয়ং ত্বং স্মরামঃ বয়ং ত্বং ভজামঃ বয়ং ত্বং জগৎসাক্ষিরূপং নমামঃ" মহা-নির্ব্বাণ তন্ত্রের এই পরিচিত শ্লোকগুলি তাঁহার উপাসনার মন্ত্র ছিল। এই গুলি অর্দ্ধস্ফুট স্বরে আবৃত্তি করিয়া তিনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাইয়া দিয়াছেন—এই শ্লোকগুলি যেন তাঁহার পক্ষে আশ্রয়ের অটল হিমালয়, এখানে পৌঁছিলে, যেন তিনি একেবারে অনড়, বিপদাতীত ও সম্যক্ নিরাপদ্ হইয়া যাইতেন।

কখনও দেখিয়াছি অতি প্রত্যূষে তিনি ফুলের বাগানে বেড়াইতে

বেড়াইতে মৃদু স্বরে গাইতেছেন, "মন চল নিজ নিকতনে।" তাহার প্রতিটি কথায়, প্রতিটি সুরে যেন সেই "নিজনিকেতনের" শান্তির প্রতি ইঙ্গিত করিত। শেষ জীবনে "ইন্দ্রিয় দশ, হইতেছে অবশ, ক্রমেতে নিশ্বাস যায় ফুরিয়ে" এই গান গাহিয়া নিত্যধামের যাত্রী হইতে যে তাঁহার বিলম্ব নাই, এই বুঝাইতেন। শেষ কালটায় বাউলের গানের প্রতি তাঁহার একটা নেশা হইয়াছিল। আমাদের আঙ্গিনায় নালু গয়লা, কোকা, হরি সাঁহা প্রভৃতি বিবিধ জাতীয় লোকেরা লম্বা লম্বা গৈরিকবর্ণের আলখাল্লা ও ফকিরী আসবাব, এবং একতারা প্রভৃতি লইয়া লাফাইয়া নৃত্য করিত ও গাইত—"বাঁশের দোলাতে চড়ে—কেহে বটে শ্মশান-ঘাটে যাচ্ছ চলে।" সংসার লীলার অবসানে সেই বাঁশের দোলা অবলম্বন করিয়া প্রকৃতির সমস্ত দেনা চুকাইয়া—প্রত্যেককে ত শ্মশান-যাত্রী হইতে হইবে—সুতরাং প্রত্যেকের মনে এই সুর বৈরাগ্য জন্মাইত।

এই উপাসনার ভাবেই তাঁহার মৃত্যু হয়। তখন সুয়াপুর গ্রাম বন্যা প্লাবিত,—কুত্রাপি চতুষ্পার্শ্বে একটু উঁচু স্থান নাই। কোথায় তাঁহাকে দাহ করা হইবে? ১৫ই ভাদ্র ১৮৮৬ সন, ঝরঝর করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছিল, আমাদের একখানি বড় মেটে ঘরের প্রাচীরটা ঝুপ্ করিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িয়া গেল। মা বলিলেন "ঐ ঘরখানা গেল"—বাবা ক্ষীণ স্বরে বলিলেন, "এ কথা এখন আমায় শুনাইয়া লাভ কি?" কালীর মাতা (বিধবা ও আমাদের আত্মীয়া) আসিয়া বাবাকে বলিলেন "ঈশ্বর, কালী-দুর্গার নাম কর।" বাবা বিরক্তির সুরে বলিলেন "যাহা কখনও করি নাই, আপনারা শেষ মুহূর্ত্তে তাহা নিয়ে আমায় কষ্ট দিচ্ছেন কেন?" এই বলিয়া উপাসনার ভাবে চক্ষু বুজিলেন এবং আর দশ পনর মিনিটের মধ্যে প্রাণ ত্যাগ করিলেন। বড় কয়েকখানি নৌকা একত্র করিয়া

তদুপরি স্তূপীকৃত মৃত্তিকায় শয্যা রচনাপূর্ব্বক চিতা নির্ম্মাণ করিয়া তাঁহাকে দাহ করা হইয়াছিল।

আমার মা এই ঘটনার কয়েক মাস পরে ৫ই ফাল্গুণে প্রাণ ত্যাগ করেন। পিতার মৃত্যুর পর যে তিনি শয্যাগ্রহণ করিয়াছিলেন, সে শয্যা আর ত্যাগ করেন নাই। কেবল দেখিতাম সকালবেলা কাঁপিতে কাঁপিতে নিজে দাঁড়াইয়া থাকিয়া আমার জন্য কিছু দুধ নিজে আনিয়া ক্ষীর করিবার জন্য কর্পূরা দিদিকে দিতেন এবং আমি যখন খাইতাম, তখন বিছানা হইতে আমার খাওয়া দেখিতেন। একবার ঝড়ে নৌকা ডুবিয়া বহু কষ্টে প্রাণ বাঁচাইয়া মা বাবার কোলে ফিরিয়া কাঁদিয়া তাহাদিগকে জড়াইয়া ধরিয়াছিলাম; তখন মনে হইয়াছিল বিপদ কাটিয়া গেল—শান্তির স্থান পাইলাম। তারপর যে জীবনে কত দুঃখ কত ঝড় সহিলাম—হতাশ হইয়া কার কাছে যাইব—ব্যাকুল ভাবে খুঁজিয়াছি, তেমন নিরাপদ্ স্থান ত আর পাই নাই।

পিতামাতার মৃত্যুর কয়েক মাস পূর্ব্বে আমার দুইটি ছোট ভগিনী মৃণ্ময়ী ও কাদম্বিনী প্রাণত্যাগ করিয়াছিল। দুইজনের মৃত্যুই আকস্মিক, কাদম্বিনী সন্ন্যাস রোগে প্রাণত্যাগ করে, তখন তাহার ১৪ বছর বয়স। এই ঘটনার একমাস পরে মৃণ্ময়ী প্রথম সন্তান হওয়ার পর ধনুষ্টঙ্কার রোগে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তখন তাহার বয়স ১৬ বৎসর। মৃণ্ময়ীব সেই পদ্ম-পলাশনিভ চোখদুটী চিরদিনের জন্য মুদিত হইল! আমাদের বাড়ীর দক্ষিণদিকের পুকুরে যখন সে সাঁতার কাটিয়া জল-ক্রীড়া করিত তখন পূর্ব্বদিকের সূর্য্যালোকে সেই চোখ দুটীর উপর পড়িয়া—তাহা পদ্মের মতই দেখাইত। কাদম্বিনীর সেই স্নিগ্ধ শ্যামাভ বর্ণ ও নিবিড় দীর্ঘ কেশদাম—যাহা মৃত্তিকাস্পর্শ করিবার উচ্চাভিলাস পোষণ করিত—তাহা শ্মশানে পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল। ইংরেজী

১৮৮৬ সনে আমার পিতামাতা ভগিনী সকলকে হারাইলাম, এবং বাত-ব্যাধি রোগে দক্ষিণাঙ্গ হীনবল হইয়া আমি শয্যা গ্রহণ করিলাম। দুগ্রহের রোষবহ্নি তখন ধক্ ধক্ করিয়া আমার উপর জ্বলিতেছিল, তাহা ভাবিতে এখনও শরীর ভয়ে কাঁপিয়া উঠে।

———

(৮)

খেলাধূলা।

পড়াশুনার কথা পুনরায় সুরু করিবার পূর্ব্বে আমরা বাল্য ও কৈশোর জীবনে যে সকল খেলা খেলিয়াছি ও আমোদপ্রমোদ করিয়াছি তাহার একটা সংক্ষিপ্ত ইতিহাস দিতে চেষ্টা করিব।

আমার বাল্য-লীলার কেন্দ্র ছিল তিনটী। একটী মাণিকগঞ্জে, যেখানে আমার পিতা ওকালতি করিতেন, দ্বিতীয় মাতুলালয় বগজুরী গ্রামে যেখানে আমার জন্মহয়, তৃতীয় সুয়াপুরগ্রামে—আমাদের বাড়ীতে।

মাণিকগঞ্জের খেলার সাথীদের কথা পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, আমার নিত্যসহচর ছিল, প্রসন্ন গুহ।

বাজারের নিকট খোলা মাঠে আমরা ক্রিকেট খেলিতাম; কখনও বা "হাডু-ডু-ডু" খেলিতাম। "হাডু-ডু-ডু" খেলিবার তিন রকম মন্ত্র ছিল। একটা নির্দ্দিষ্ট স্থান হইতে "ডু-ডু" শব্দ করিতে করিতে রওনা হইতে হইত। এক নিশ্বাসে—"ডু-ডু" শব্দ করিতে করিতে যাহাকে ছোঁয়া যাইত, সেই "মরিত"; অর্থাৎ সে কিছুকালের জন্য অর্থাৎ সেই খেলোয়াড়ের আয়ু পর্য্যন্ত, খেলায় যোগ দান হইতে বঞ্চিত হইয়া থাকিত। খেলোয়াড় এইভাবে "ডু-ডু" শব্দ করিতে করিতে ইহাকে উহাকে ছুইতে চেষ্টা করিত; কিন্তু তাহার নিশ্বাসটা ফুরাইয়া গেলে যদি কেহ তাহাকে ধরিত, তবে সে "মরিয়া যাইত।" অনেক সময় দেখা গিয়াছে, সে এক নিশ্বাসের মধ্যেই একজনকে ছুঁইয়াছে,

কিন্তু স্পৃষ্ট ব্যক্তি খেলোয়াড়কে সজোরে ধরিয়া ফেলিয়াছে, যদি এক নিশ্বাসে "ডু-ডু" করিতে করিতে সেই ছেলেটির হাত হইতে বলপূর্ব্বক নিষ্কৃতি লাভ করিয়া সে পুনরায় তাহার নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইতে পারিত, তবেই তাহার জয়। কিন্তু ইতিমধ্যে যদি তাহার নিশ্বাস টানা বন্ধ হইয়া যাইত, এবং তৎকর্ত্তৃক স্পৃষ্ট ব্যক্তি যদি তাঁহার নিশ্বাস টানা বলপূর্ব্বক ধরিয়া বন্ধ করিয়া ফেলিতে পারিত, তবে "ডু-ডু" শব্দ-কারীর মৃত্যু এবং স্পৃষ্ট ছেলের জয় সূচিত হইত। এই "ডু-ডু" ছাড়া এই খেলার আরও দুই রকম মন্ত্র ছিল, তাহা পূর্ব্বেই লিখিয়াছি,—তাহার একটা ছিল "কপাটী কপাটী চ্যাং" এবং আর একটি ছিল—"মড়ার খপর দেঙ্গে, তবলা বাজাওঙ্গে"—বলা বাহুল্য, এক নিশ্বাসে ঐ কথাগুলি উচ্চারণ করিতে করিতে যতগুলি ছেলেকে প্রধান খেলোয়াড় ছুঁইতে পারিত, তাহারা সবগুলি মরিত। এবং তাহার নির্দ্দিষ্ট স্থলে পৌঁছিবার পূর্ব্বে যদি তাহার নিশ্বাস ফুরাইয়া যাইত, এবং তদবস্থায় তাহাকে বিপক্ষ কেহ ছুঁইয়া ফেলিত তবে সে মরিত।

আমি এই সকল খেলা ও ক্রিকেটে অতিশয় হীন স্থান অধিকার করিতাম। বড় বড় খেলোয়াড়দের আদেশানুসারে কখন কখনও কাণমলা, নাকমলা খাইতে খাইতে কোন একটি স্থানে দাঁড়াইয়া থাকিয়াছি, তাহার উপর "আদুরে" ছেলে ব'লেও নিগ্রহ সহ্য করিয়াছি, আমার ন্যায় দুর্ব্বল দলের ভেতর কেহ ছিল না।

কিন্তু প্রসন্ন আর আমি যখন নূতন সড়কের উপর দিয়া গান করিয়া কিম্বা কথাবার্ত্তা বলিতে বলিতে যাইতাম, তখন আমার স্ফূর্ত্তির অবধি থাকিত না। প্রসন্নের দেশ হচ্ছে বাখরগঞ্জ বানরী-পাড়া, তাহাদের দেশে আমিন আসিলে মুসলমান প্রজারা কি ভাবে

কি ভাবে বিদ্রোহী হইয়া আমিনদিগকে আক্কেল দিয়াছিল, তৎসম্বন্ধে একটা গান সে খুব তার স্বরে নিত্যই গাহিত, আমিও তাহার দোহারগিরি করিতাম, যেমন গায়ক তেমনই দোহার। উভয়ের কণ্ঠ হইতে যে স্বর-লহরী উত্থিত হইত তাহাকে "কাক-কোলাহল" ভিন্ন অন্য নাম দেওয়া যাইতে পারিত না। গানটার কিছু কিছু অংশ আমার এখনও মনে আছে। তাহা এই—

"শুন্‌ছ নি ভাই সবারা চাঁদ মিঞা
যে খই পাঠাইছে।
লাল বলদ লাগিয়ে দেবে
যেতর বাড়ী আমিন আছে।"

এই গানটি রচিত ছিল 'সন্ধ্যা-ভাষায়'। অর্থাৎ কতকগুলি শব্দ তাহারা নিজেদের মধ্যে পারিভাষিক করিয়া ফেলিয়াছিল। উদ্ধৃত দুটি ছত্রে 'খই' শব্দের অর্থ সংবাদ এবং লাল বলদ অর্থ আগুন। চাঁদ মিঞা ছিল দলের নেতা, তাহার আজ্ঞা ছিল যে যে বাড়ীতে আমিন আসিয়াছে, সেই সেই বাড়ীতে আগুন লাগাইয়া দিতে হইবে।

বাজারের কাছে কখনও কখনও খেম্‌টা নাচ হইত, প্রায়ই বারোয়ারী পূজা উপলক্ষে। সে নাচ অতীব জঘন্য। কিন্তু আমার তখন আট নয় বছর বয়স—তখন তাহার কিছু বুঝিতাম না। খেমটাওয়ালীর অতি দুষ্ট অঙ্গ ভঙ্গী দেখিয়া বহুলোক—তাহার মধ্যে ভদ্রলোকের সংখ্যাও নিতান্ত কম ছিল না—যে কিরূপ উন্মত্ত উত্তেজনা দেখাইত, তাহা মনে পড়িলে আমার এখনও লজ্জা হয়। সেই সমবেত দর্শকগণের

মধ্যে কেহ কেহ আবার অতি অশ্লীল মন্তব্য উচ্চ স্বরে প্রকাশ করিয়া স্ত্রীলোকটিকে উৎসাহ দিতে থাকিত,—তাহাতে নর্ত্তন-ভঙ্গীর ধৃষ্টতা আরও বাড়িয়া যাইত ও নর্ত্তকীর মুখে হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিত।

আমার যখন আট নয় বছর বয়স তখন সেই আসরে এক বাঈজির গান শুনিয়াছিলাম, তাহার বয়স কুড়ি বাইশ বছর ছিল। তাহার বর্ণ ছিল কালো-আঁধারে আকাশে নবনীরদ-মালার ন্যায়, কালো হইলেও বর্ণটি ছিল স্নিগ্ধ, মন-ভুলানো; তাহার মুখ ঘিরিয়া বক্রান্ত কেশদাম দুলিয়া দুলিয়া যেন ভ্রমরের মত খেলা করিতেছিল এবং পশ্চাৎ ভাগে অতি নিবিড় ও ঘন মুক্ত চুলরাশি যেন জমাট আঁধারের মত শোভা পাইতেছিল। —"নবজলধর রূপ বড় মনে লাগে, কত কেঁদে মরবি লো তুই শ্যাম-অনুরাগে। ভেবে ছিলি যাবে দিন তোর সোহাগে সোহাগে।" তারপর বুঝিয়াছিলাম সে কালেংড়া সুরে গানটি গাইতেছিল। তাহার কণ্ঠ এমনই মধুর ছিল এবং সে এমনই ভাবের আবেশে গানটি গাইয়াছিল যে আজ ৪৩ বৎসর পরেও তাহার মূর্ত্তিটি ও করুণ সুর আমার যেন প্রত্যক্ষবৎ মনে হইতেছে। "নবজলধরের" কথা সে গাইতেছিল —কিন্তু তাহার চেহারাটিও নবজলধরের মতই ছিল।

কখন কখন সেই আসরে যাত্রা গান হইত, তখনও যাত্রায় বক্তৃতার ভাগ বেশী হয় নাই—গানের ভাগ বেশী ছিল। সে সকল গান আমি ভাল বুঝিতে পারি নাই, কিন্তু 'সং'গুলির কথা বেশ মনে আছে, তাহারাই সেই আসর জমকাইয়া তুলিত। সংগুলির কথা প্রায়ই নীতি-বিরুদ্ধ প্রেম লইয়া হইত। একটা ছোড়া একদিন রন্ধন-নিরতা একটি রমণীর উদ্দেশে, রান্নাঘরের পার্শ্বে অন্ধকারে দাঁড়াইয়া গাহিতেছিল—"নিতি নিতি ফিরি আমি তোমার কানাচে।"—এর মধ্যে সেই রমণীর স্বামিজী এক লগুড়

লইয়া প্রেমিকটিকে তাড়া করিলেন। রমণীটির বোধহয় গানটি একবারে মন্দ লাগে নাই—কারণ সে একটু আক্ষেপের ভাবেই স্বামীর কাণ্ডটা দেখিতেছিল। সংগুলির ব্যাপার প্রায় এইরূপ দুর্নীত প্রেম লইয়াই হইত। আর একজন নিরাশ প্রণয়ীর গান আমার এখনও মনে আছে "মজে শিমূলের ফুলে আমার একুল ওকুল দুকুল গেল।" কখনও এক পাগলা বামুন হাতে তুড়ি দিতে দিতে আসিয়া আসর জমকাইয়া গাইত "যা কিছু পাই তাইতে খুসি গো যা কিছু পাই—তাইতে খুসি, * * যদি লোকে করে পীড়াপীড়ি তবে পাগল হয়ে অমনি হাসি।.........তখন সাজিমাটি নিয়ে কাপড় ঘসি গো।" সে নাচিয়া গাইয়া আসর মাৎ করিয়া দিত। বলা নিষ্প্রয়োজন—উদ্ধৃতাংশে গানের অশ্লীল ভাগ বাদ দিয়াছি। কিন্তু আমাদের সুয়াপুরে যাত্রা কিম্বা মঙ্গল-গানের সং এত অশ্লীলতা দুষ্ট হইত না,—সে সকল সং আসিত ছেলেদিগকে হাসাইতে। অনেক সময়ই তাহারা মূল কাহিনীর অঙ্গীয় হইত,—লবকুশের যুদ্ধের পালা একবার আমাদের বাড়ীতে হইয়াছিল—তাহাতে লবকুশের সঙ্গে বানরদিগের যুদ্ধ উপলক্ষ করিয়া এই ভাবে হাস্যরস অবতারিত হইয়াছিল—"দাদাগো" বলিয়া লব কুশকে এক একটা বানর দেখাইয়া তাহার রূপ বর্ণনা করিতেছিল—"দেখছ না—সে বেটাত ছিল ভাল, আর এক বেটা আসছে দাড়িতে বেঁধে পলো।" এই ভাবে এক একটা বানরের মূর্ত্তি বর্ণনা করিয়া সে এমনই হাস্যরসের উদ্দীপনা করিয়াছিল যে আমরা শিশুমণ্ডলী আমোদের চোট সামলাইতে না পারিয়া হাসিতে হাসিতে মাটীতে গড়াগড়ি যাইতেছিলাম।

আমার মামার বাড়ীতে বাহির খণ্ডে পূজার সময় যে কবি-গান হইত তাহা মেয়েদের দেখ্‌বার উপায় ছিল না। সে কবিগণের মত অশ্লীল কিছু মনে ধারণা করা যায় না। পুরুষ ও স্ত্রীলোক একত্র হইয়া যেরূপ

ভঙ্গীতে নাচ্‌তে থাক্‌তো,—তাহা পুরী ও কনারকের মন্দিরের বীভৎস মূর্ত্তিগুলির সঙ্গে তুলিত হইতে পারে—তফাৎ এই সেই পাথরের খোদাই মূর্ত্তিগুলি একবারে নগ্ন, আর কবির দলের পুরুষ ও স্ত্রী বস্ত্র ত্যাগ করিত না। কতকাল যাবৎ যে মন্দির-প্রাঙ্গন এই যৌন বীভৎসতাকে প্রশ্রয় দিয়াছে বলা যায় না, কিন্তু যদি প্রস্তর বা মৃণ্ময় দেবতারা কথা কহিতে পারিতেন, তবে নিশ্চয়ই এই সকল বিকট উৎসব থামাইয়া দিতেন। যাঁহারা কথা কহিতে পারে না তাহাদের যে কত বিড়ম্বনা ও উৎপাৎ সহ্য করিতে হয়—তা বলিয়া শেষ করা যায় না, দেবতারাও তাহা হইতে বাদ পড়েন না।

কিন্তু, এই সকল ছাড়া কথকতা, কীর্ত্তন, চণ্ডীমঙ্গল, রামমঙ্গল প্রভৃতিতে প্রকৃত ভক্তির উচ্ছ্বাস আমরা অনেক সময় দেখিয়াছি। সুয়াপুর গ্রামে বৎসর বৎসর এক অধিকারী ঠাকুর (তাঁহার নাম আমি ভুলিয়া গিয়াছি) রামমঙ্গল গান করিতেন, তাঁহার গান আমরা আগাগোড়া হাঁ করিয়া শুনিয়াছি। তিনি গানে গানে যেন ছবি আঁকিয়া যাইতেন। একটা চামর দোলাইয়া তিনি আসরের এদিক-ওদিক ঘুরিয়া গান করিতেন—একাই যেন একশ। তাঁহার সঙ্গের লোকেরা "দোহার" হইত। তিনি একাই রাম হইয়া বনবাস যাইবার প্রস্তাব করিতেন এবং সীতা হইয়া স্বামীর সঙ্গে যাওয়ার জন্য অনুনয় করিতেন, কৌশল্যা হইয়া বিলাপ করিতেন এবং দশরথ হইয়া প্রাণত্যাগ করিতেন। যখন সং দেওয়ার দরকার হইত, তখন "দোহার"দের মধ্য হইতে একটা লোককে ধরিয়া আনিয়া আসরে তাঁহার সামনা সামনি দাঁড় করাইতেন এবং তাহার সহিত নানারূপ কৌতুকপূর্ণ বাদানুবাদ করিয়া আমাদিগকে হাসাইতেন।

কিন্তু এই সকল সাধারণ উৎসবে আমাদের আমোদের তৃষ্ণা

মিটিত না। আমরা কতরূপ যে দুষ্টামি করিতাম—তাহা ভাবিলে এখনকার বালকদিগকে নিতান্ত শান্ত-শিষ্ট বলিয়া মনে হয়। আমাদেরই বাড়ীতে আমার দলের বালকেরা ভাল আম কাঁটাল, খেজুর-রস, গোলাপ জাম প্রভৃতি চুরি করিত। এ সকল কাণ্ড দ্বিপ্রহর রাত্রে হইত। আমি থাকিতাম পাহারা, অর্থাৎ বাড়ীর কেহ জাগিলে, দলের ছেলেদিগকে সতর্ক করিয়া দিতাম। আমাদের বাড়ীতে খুব বড় একটা কড়াতে সব তৈরী করিবার জন্য দুধ জ্বাল দেওয়া হইত। উনুনের আঁচ কমাইয়া দিয়া তাহার উপর প্রকাণ্ড কড়াটা রাখিয়া দিবা দ্বিপ্রহরে মা ঘুমাইয়া পড়িতেন। ঝি চাকরেরা বাহিরে ঘুমাইত। এমন সময় আমরা দুই তিনজনে বাহির হইতে রান্নাঘরের বেড়ার ফাঁক দিয়া সুদীর্ঘ পাকাটি চালাইয়া উহা কড়াটার মধ্যে প্রবিষ্ট করিয়া সমস্ত দুধটা খাইয়া ফেলিতাম। শুধু সরটা কড়ার নীচে শুইয়া পড়িয়া থাকিত। এই সকল উপদ্রব শুধু কৌতুকের জন্যই বেশী করিতাম—ক্ষুধার তাড়নায় নহে। দ্বিপ্রহর রাত্রে নানা ফল ও খাদ্য দ্রব্য নিজেদের বাড়ী হইতে চুরি করিয়া আমরা পুকুরের ধারে বসিয়া সাবাড় করিতাম। আমাদের মধ্যে কেহ কেহ মুড়ি দিয়া এক একখানি কাঁটাল খাইয়া ফেলিত। এই ভাবে উদর পূর্ণ এমন কি অত্যধিক স্ফীত করিয়া আমরা সেই রাত্রিকালে পুকুরের জলে ঝাপিয়া পড়িতাম। শেষ রাত্রে আস্তে বাড়ী ঢুকিয়া কাপড় ছাড়িয়া ঘুমাইয়া পড়িতাম। বগজুরী গ্রামে আমি ও আমার জ্যেঠতুত ভাই হীরালাল গামলায় চড়িয়া পুকুরের জলে বেড়াইতাম। একটা বৈঠা ঘুরাইয়া জল কাটিয়া আমরা অগ্রসর হইতাম। গামলাটা আমাদিগকে লইয়া চরকার মত ঘুরিতে ঘুরিতে চলিত। অবশ্য এক একটা গামলায় এক একজন মাত্র চড়িয়া এই জল-কেলী করিতে পারিত। আমি খেলে-

শ্বরীর ন্যায় বড় নদীর উপর গামলার "বাছ" দেখিয়াছি। ২০।২৫ জন গামলায় চড়িয়া দ্রুতবেগে নদী পাড়ি দিয়াছে। যে ব্যক্তি সকলের পূর্ব্বে যাইতে পারিয়াছে, সে পুরস্কার পাইয়াছে।

আমি ও হীরালাল দোতলার উপর একটা ছোট ঘরে বসিয়া কত ছবি আঁকিতাম, তাহা আর কি বলিব। হরিতাল গুলিয়া হলুদ রং করিতাম, সিন্দুর গুলিয়া লাল করিতাম। প্রতিমা গড়িতে গোলক-দেউরী আসিত, তাহার কাছে অনেক চাহিয়া চিন্তিয়া কিছু কিছু রং আদায় করিতাম, তখন অল্প দামের রংয়ের বাক্স সর্ব্বত্র পাওয়া যাইত না। আমরা আঁকিতাম দশমুণ্ড কুড়ি হস্ত রাবণ-রাজা, ও লোল রসনা দিগ্বসনা কালী মূর্ত্তি,—কখনও কখনও রাম-সীতা, বাঘ ও বেড়াল আঁকিতাম। "নূতন পুকুরে"র পাড়ে বসিয়া মাটি ছানিয়া কত যে কালী-মূর্ত্তি ও সরস্বতী-মূর্ত্তি তৈরী করিয়াছি তাহার অবধি নাই! সেই মূর্ত্তি শুকাইলে তাহাতে রং চড়াইয়া তার পর পূজার ব্যবস্থা করিয়াছি। দুপুরের রৌদ্রে মাথার চাঁদি ফাটিয়া যাইতেছে, আমরা দুই ভাই বসিয়া নিপুনভাবে ঐ সকল মাটীর মূর্ত্তি গড়িতেছি, এমন সময় আমার ছোট মাতুল শ্রীমোহন সেনের উচ্চ কণ্ঠ শুনিয়া পালাইয়া গিয়াছি। বস্তুত তাঁহার তাড়নায় একদণ্ড স্থির হইয়া আমরা ছবি আঁকিতে পারি নাই, মাটীর মূর্ত্তি গড়িতে পারি নাই, "কাশীর" গাছে চড়িয়া কুল খাইতে পারি নাই। প্রায়ই এই সকল গুরুতর কার্য্য অর্দ্ধ-সমাপ্ত রাখিয়া আমা-দিগকে পলাইয়া যাইতে হইয়াছে। আজ আমার স্মৃতিতে ছোট মামার সেই স্নেহ-গঞ্জনার সুর মধু হইতেও মধুর বোধ হইতেছে। তাঁহাকে আর পাইব না, হীরালালও আমাদিগকে ছাড়িয়া গিয়াছে।

একদা আমি মানিকগঞ্জে কাগজে কাঁচি দিয়া কাটিয়া অনেকগুলি মূর্ত্তি তৈরী করিয়া ফেলিলাম। সমস্ত রাম-বনবাসের পালাটা এইভাবে

গ্রন্থকারের মাতুল স্বর্গীয় শ্রীমোহন সেন

প্রস্তুত হইল। রাম গড়িলাম, দশরথ, সীতা, কৌশল্যা, কৈকেয়ী, ভরত প্রভৃতি সকলই তৈরী হইল। দিব্য একটা কুজ করিয়া মন্থরা প্রস্তুত করিলাম, এবং কাগজের সরু সরু স্তর কাটিয়া রামের জটা বানাইলাম। তারপর একটা বড় ঘরে খুব লম্বা একটা সুতা লট্‌কাইয়া তাহার উপর সেই কাগজে কাটা মূর্ত্তিগুলি ঝুলাইয়া পর পর সাজাইয়া রাখিলাম। সেই ঘরের দরজায় একটা লম্বা কাপড় টাঙ্গাইয়া সেই কাপড়খানি জলে আর্দ্র করিয়া অপর একটা দরজা দিয়া ঘরে ঢুকিলাম, এবং একটা লণ্ঠন হাতে করিয়া সেই কাপড়ের মধ্যে প্রতিফলিত মূর্ত্তির ছায়া দিয়া ছায়া-বাজি দেখাইতে লাগিলাম। লণ্ঠনটা কাছে আনিলে মূর্ত্তিগুলির ছায়া খুব বড় হইত এবং দূরে নিলে ছায়াগুলি খুব ছোট দেখাইত। এই উৎসব দেখাইবার জন্য বহু বালককে নিমন্ত্রণ করিলাম, তন্মধ্যে বগজুরী হইতে হীরালাল আসিল। আমার বয়স তখন ৯, হীরালালের বয়স ৭। ইহার বহু বৎসর পরে H. L. Sen and Bros (এচ, এল সেন এণ্ড ব্রস) নাম দিয়া হীরালাল কলিকাতা ফটোগ্রাফের কারবার খোলে এবং সর্ব্বপ্রথম সেই কলিকাতায় বায়স্কোপ আনাইয়া দেখায়। তাহার বায়স্কোপ কোম্পানির নাম "রয়েল বায়স্কোপ কোম্পানি" এখন তাহার ভ্রাতা মতি-লাল সেই কারবার চালাইতেছে। রয়েল বায়স্কোপ কোম্পানিই কলি-কাতার আদি ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বায়স্কোপ কোম্পানি ছিল। হীরালালের মত ফটোগ্রাফ তুলিতে খুব অল্প ব্যক্তিই পারিতেন। সে নিজে ফিলিম আনাইয়া বায়স্কোপের দেশীয় কয়েকখানি ছবি উঠাইয়াছিল। তাহার কোম্পানির আয়ও বিস্তর হইয়াছিল। কিন্তু চরিত্রদোষে সে সমস্ত মাটী করিয়া ফেলিয়া অকালে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। যতদূর মনে পড়ে হীরালালের ভাগিনেয় (আমার মামাত ভগিনীর ছেলে) ভোলা পার্শী ম্যাডানের নিকট যাইয়া তাঁহাকে দিয়া নূতন বায়স্কোপ কোম্পানি

স্থাপনের প্রস্তাব করে। এইভাবে ভুবনবিজয়ী "এলফিনষ্টনে"র সূত্রপাত হয়। হীরালালের হাতে শিক্ষালাভ করিয়া ভোলাই ম্যাডান মহোদয়কে এই কার্য্যে লওয়ায়, এবং তাঁহার কোম্পানীর প্রাথমিক সফলতার কারণ হয়। হীরালালের প্রতিভা অনন্য-সাধারণ ছিল, সে ইংলণ্ড ও এমেরিকার ফটোগ্রাফ ও বায়স্কোপ-সাহিত্যের যেরূপ চর্চ্চা করিয়াছিল, সেইরূপ শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা বিরল। সে শুধু ফটোগ্রাফি শিখিবার জন্য ১৪।১৫০০০৲ টাকা খরচ করিয়াছিল। তাহাদের বাড়ীতে তাহার যে ষ্টুডিও ছিল, তাহা এতদ্দেশে যে কোন শিল্পীর গৌরবের কারণ হইতে পারিত। তাহার চরিত্র তুষার-শুভ্র ছিল, কলিকাতার থিয়েটারের পাল্লায় পড়িয়া নটরাজ বন্ধুবর্গের দ্বারা প্রবর্ত্তিত হইয়া সেই হীরালাল যেরূপ দুর্গতি প্রাপ্ত হইয়াছিল—তাহা তদ্রূপ কুসংসর্গের পরিণামের একটা জলন্ত দৃষ্টান্ত।

হীরালাল একদিন আমাকে বলিয়াছিল "দাদা, বলত আমার যে চিত্র বিদ্যা, ফটোগ্রাফী ও বায়স্কোপের প্রতি এই একান্ত অনুরাগ ও ঝোঁক, তাহা কেমন করিয়া হইল?"

আমি বলিলাম,—"এইগুলি নিয়ে সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকতে থাকতে ঝোঁক হ'য়েছে। এল, এ পর্য্যন্ত পড়ে পড়া ছেড়ে দিলি, তার পর তো এই কচ্ছিস্—ঝোঁক এতে ক'রেই হয়েছে।"

সে বলিল "না দাদা—এই ঝোঁকের মূলে তুমি, তুমি যে আমাকে লইয়া ছবি আঁকিতে, সেই সময় ইহার সূত্রপাত, তুমি যে দিন আমাকে ছায়াবাজি দেখাইয়াছিলে সে দিন যে আমার মনে যুগ উল্টিয়া গিয়াছিল, তাহা তোমায় বলি নাই—কিন্তু সেই ছায়াবাজি দেখার কথা কৈশোর-জীবনে প্রতিদিন আমার মনে পড়িয়াছে—উহাই এই রয়েল বায়স্কোপের ভিত্তি।" কেউ নিজ ঘরে বসিয়া এক টুকরা কাগজে আগুনে ধরাইয়া

যেরূপ অবহেলায় তাহা ফু দিয়া উড়াইয়া দেয় এবং সেই জলন্ত কাগজটা অপর একজনের ঘরের চালে পড়িয়া তাহা অগ্নিময় করিয়া ফেলে, এ হচ্ছে সেইরূপ। হীরালালের মানসিক শক্তি ও রুচি ছিল এই কলা-বিদ্যার দিকে, সুতরাং আমার কাছে যাহা ছেলে খেলা ছিল, তাহা তাহার প্রকৃতির প্রবর্ত্তক হইয়া দাঁড়াইল। হীরালালের প্রকৃতি কলা-বিদ্যার ক্ষেত্র ছিল—আমার খেলাধূলা যাইয়া সেখানে বেশ সোনার ফসল জন্মাইয়া ফেলিল—সে এ জন্য আমার যে গৌরব দিয়াছিল, তাহা আমার একবারেই প্রাপ্য নয়।

আমাদের আর একটা খেলা ছিল, পুকুরে বা নদীতে যাইয়া পরস্পরের মুখে জল ছুড়িয়া মারা। এই জল ছুড়িয়া মারা কার্য্যে আমার মত দক্ষ কেউ ছিল না। আমি দুর্ব্বল ছিলাম, কিন্তু জল ছুড়িয়া আমা অপেক্ষা বহু বলিষ্ঠ ব্যক্তিকে আমি অন্ধের মত করিয়া ফেলিয়াছি, সে হাতড়াইতে হাতড়াইতে পলাইয়া নিষ্কৃতির পথ খুঁজিয়াছে। অনেক সময় পাঁচ ছয় জন একত্র হইয়া আমার মুখে জল ছুড়িয়া মারিয়াছে, আমি সব্যসাচীর ন্যায় একা তাহাদিগের প্রত্যেকের প্রতি এরূপ ক্ষিপ্রভাবে জল প্রক্ষেপ করিয়াছি যে সপ্তরথীর মত তাহারা রণে ভঙ্গ দিয়াছে. আমার সঙ্গে কতক সময় যুঝিতে পারিত একমাত্র নলিনী। তাহাও ১০। ১৫ মিনিটের বেশী নয়। প্রাতে ৮টার সময় ধণেশ্বরীর শাখা গাজিখালি (কানাই নদীতে) এই ভাবে যাইয়া জলক্রীড়া করিতে সুরু করিয়াছি এবং বেলা তিনটার সময় চক্ষু দুটি রক্তজবার ন্যায় করিয়া বাড়ী ফিরিয়াছি। কত দলকে যে এইভাবে ঘাল করিয়াছি, কত স্নানার্থীর দল যে এই সময়ের স্নান সমাধা করিয়া চলিয়া গিয়াছে, এবং আমি প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত কিরূপ অটুট বিক্রমে যুঝিয়াছি, তাহা আর কি লিখিব। আমার মাতা আমার এই সকল ব্যবহারে কিরূপ কষ্ট পাইতেন, তাহা বুঝান শক্ত। কতবার

লোক পাঠাইয়া হয়রাণ হইতেন, এবং শেষে ঘরে বসিয়া কাঁদিতে থাকিতেন। যখন তৃতীয় প্রহর বেলায় বাড়ী ফিরিতাম, তখন মা যেন আমায় হাটিয়া আসিতে দেখিয়াও আশ্চর্য্য হইতেন, এই অবস্থায় কোন ব্যক্তি দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে, তাই আশ্চর্য্যের বিষয়। ভগবান তাহার ফলে আমাকে এত অত্যাচারেও মারিয়া ফেলান নাই—এই জন্য তিনি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেন। এইরূপে ডান হাতের উপর প্রচণ্ড অত্যাচার করাতে সমস্ত ডান দিকটা অবশ হইয়া আমি বাতব্যাধি রোগে পঙ্গু হইয়া পড়িয়াছিলাম। মাতা ইহারই আশঙ্কা করিয়া কত অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেন, হায় সেই মাতৃ অশ্রু! তাহার প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ আমার জীবনে যে কত কষ্ট পাইয়াছি—তাহা লিখিবার শক্তি আমার নাই।

পূর্ব্ববঙ্গ নদী মাতৃক দেশ। যখন পশ্চিমবঙ্গে প্রথম আসিলাম, তখন বারি-বিরল শুষ্ক নাগরীক দৃশ্য ও দুর্গন্ধ জঞ্জাল পূর্ণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ডোবা আমার চক্ষু দুটিকে যেন পীড়িত করিয়াছিল। কোথায় সেই অপর্য্যাপ্ত বন্যায় জল সঞ্চার! কোথায় সেই পূর্ণ-তোয়া ধবল ফেনিল তরঙ্গ,—ফুল্লকুন্দ তুষার সদৃশ শুভ্র ধলেশ্বরীর শ্বেতাজ-সুন্দর বিরাটরূপ! কোথায় সেই উদ্দাম উত্তাল চক্রাকৃতি ঘূর্ণবায়ুসমুত্থিতঅট্টহাস্যময়ী মহামহিমান্বিতা পদ্মা! কোথায় সেই অতলস্পর্শ সাভারের নদী! একদিকে বংশাই, একদিকে কানাই, ব্যাঘ্রী যেরূপ শাবকদ্বয় লইয়া আস্ফালন করে—সেইরূপ উৎকট ক্রীড়াশীলতার রূপ—আমার পক্ষে যুগপৎ ভৈরব ও সুন্দর! বন্যার জলে যখন গ্রাম ভাসিয়া যাইত, মাতার ক্রোড়ে শিশুর ন্যায় সেই অনন্ত জলরাশির অঙ্কে ছোট ছোট অট্টালিকা ও পর্ণকুটীর কি সুন্দর দেখাইত! আমি আর অবিনাশ জ্যোৎস্নাধবলিত রাত্রে ছোট একখানি ডিঙ্গাতে শুইয়া থাকিতাম, নৌকা ভাসিয়া ভাসিয়া নান্নারের বিলের দিকে যাইত! উপরে

আকাশে তারা ও জোৎস্না এবং নিম্নে—হাট মাট ঘাট সমস্ত ডুবাইয়া বিশাল জলরাশিতে কত রক্তদল পদ্ম ও শুভ্রদল কুমুদ ফুটিয়া উঠিত। আমরা দুইজনে কতদিন ছবির ন্যায় স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া সেই শোভা দেখিয়াছি। পূর্ব্ববঙ্গের বর্ষা যে না দেখিয়াছে, তাহার নিকট বরুণ দেবতা কি করিয়া পূজা পাইবেন? পদ্মার ক্রোড়ে যে ব্যক্তি জেলে-দের মাছ ধরিতে না দেখিয়াছে—সে কি করিয়া বুঝিবে সে দেশের জেলেরা কেন আপনাদিগকে 'গঙ্গাপুত্র' বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে?

এই জলে দুর্গোৎসবের সময় প্রতিমাবিসর্জ্জন লইয়া কত না আমোদ গিয়াছে? মনসাদেবীর ভাসান গান উপলক্ষে "নৌকা বাছ" লইয়া কত না উৎসব হইয়াছে! বন্ধুবর্গ সহ নৌকা বাহিয়া আমরা কত সুখে জ্যোৎস্না রাত্রি উপভোগ করিয়াছি। শিশুকালে আমরা একত্র মিলিয়া গাজিখালিতে কোন দরিদ্রের নৌকা ছাড়িয়া দিয়া মধ্যে গাঙ্গে উহা ডুবাইয়া দিয়া সাঁতার কাটিয়া ফিরিয়া আসিয়াছি। পরদিন সেই দরিদ্রের আর্ত্তনাদে কর্ত্তাদের ঘুম ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, তাঁহারা সেই দরিদ্রকে ২৫।৩০৲ গুনাগারি দিয়া আমাদিগের প্রতি চক্ষু রাঙ্গাইয়া কত ভর্ৎসনা করিয়াছেন।

সেই সুয়াপুর গ্রামের স্মৃতি আমার নিকট কিরূপ মধুর, তাহা বলিবার ভাষা নাই। সে গ্রামের প্রত্যেক রমণীই যেন সেই শৈশবকালে আমাদের মাতা ছিলেন। যার বাড়ীতে রাত্রি হইয়াছে, তার বাড়ীতে শুইয়াছি। খাওয়ার সময় যে বাড়ীতে থাকিতাম, সেই বাড়ীতেই খাইয়াছি, বঙ্গপল্লীর সে আত্মপরবিরহিত ভ্রাতৃভাব এখন স্মৃতিতে পর্য্যবসিত। উহা দুঃস্বপ্নের মধ্যে একটুকু সুখ স্বপ্ন, ভাঙ্গা কৃষ্ণবর্ণ ভয়াবহ মেঘের আড়ালে এক খণ্ড ক্ষুদ্র চন্দ্রিকা।

আমরা সুয়াপুর শ্রীনাথ গুপ্তের বাহিরের ঘরে বসিয়া তাস খেলিতাম। আমার খেলার সাথী ছিল অবিনাশ, নলিনী, কুমুদিনী এবং মোহিনী (শেষোক্ত তিনজন সহোদর) সর্ব্বজ্যেষ্ঠ মোহিনী। আমাদের বাড়ী হইতে তাহাদের বাড়ী একটা পুকুরের এপার ওপার। বর্ষাকালে আমরা নৌকাতে পার হইতাম। ছোট নৌকা ঘাটে দিনরাত বাঁধাই থাকিত, একটা লগি দিয়া নৌকা বাহিয়া পার হইতাম। তাস খেলা তিন রকমের ছিল। ১। ডাকের খেলা, ২। দেখা বিন্তি ৩। বিন্তি বা গেরাবু। ডাকের খেলা তিনজনে, দেখা বিন্তি দুইজনে এবং গোরাবু চারজনে খেলিতে হইত। ডাকের খেলারই প্রচলন বেশী ছিল,—একবারে "রং"শূন্য হইলে খেলোয়াড় "বুরুজ" অর্থাৎ ফেল হইত। যে "বুরুজ" হইত সে সকল খেলোয়াড়দের হাতে নাকমলা-কানমলাটা খাইত। আমি আদুরে ছেলে—সুতরাং আমাকে ক্ষেপাইয়া, মারিয়া, ভেঙ্গচাইয়া অপরাপর বালকেরা একটা ক্রুর আমোদ অনুভব করিত। ডাকের খেলায় আমি "বুরুজ" হইলে একটা ছেঁড়া জুতার মালা আমার গলায় পরাইয়া দিয়া অপরাপর বালকেরা হাতে তালি দিয়া হাসিত এবং অন্দর হইতে মেয়েরা পর্য্যন্ত আমার সেই অবস্থা উঁকি মারিয়া দেখিয়া বেশ আমোদ অনুভব করিত, আমি কাঁদিতে কাঁদিতে নালিশ করিবার জন্য আমার সর্ব্বপ্রধান বিচারপতি মায়ের নিকট চলিয়া যাইতাম।

আমার যখন ১২ বছর বয়স, তখন আমাদের আত্মীয়দের এক বাড়ীতে তাঁহাদের নিকট সম্পর্কীয় একটি মহিলা তাঁহার শিশুদিগকে লইয়া আসিয়া কয়েক মাস বাস করিয়াছিলেন। আমার বর্ণ শ্যাম হইলেও ছেলেবেলায় আমার চেহারা লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। চুলগুলি ছিল আমার কোঁকড়ানো, এবং চোখ দুটি আমি বাবার কাছ থেকে পাইয়াছিলাম, তাহা ছিল বড় এবং তীক্ষ্ণ শক্তি দৃষ্টিপূর্ণ। সেই

মহিলার একটি মেয়ে ছিল -তার নাম ন--। তাহার তখন বয়স ১৫। সেই বাড়ীতে আমার একটি সহপাঠী ছিল, সে ছিল গৌরবর্ণ, সুশ্রী। ন—তাহাকে ছোট দাদা বলিয়া ডাকিত। ন—এর মুর্ত্তিটি আমার এখনও বেশ মনে আছে। চোখ দুটি হরিণের মত, গণ্ডে কে যেন চাঁপার রং, মল্লিকার শুভ্রবর্ণও যুঁথিজাতের স্নিগ্ধতা ঢালিয়া দিয়াছে, এলোমেলো চুলগুলি কখনও কপালের চারিদিকে ঝুলিয়া পড়িয়া সুন্দর দেখাইত, কখন বহু বেণীতে বদ্ধ থাকিয়া একটা কুণ্ডলাকৃতি ধুম্রের মত খোঁপা হইয়া যাইত, কখনও বা মেঘের একটি সূক্ষ্ম লহরের মত এক বেণী হইয়া পিঠে দুলিতে থাকিত। তাহাকে কখনই আমি হাঁটিতে দেখি নাই, নীলাম্বরী কাপড় খানির আঁচল দোলাইয়া সে প্রায়ই ছুটিয়া চলিত, এবং মাঝে মাঝে আমার দিকে চাহিয়া ঈষৎ হাস্যে অধর যুগল প্রসন্ন করিয়া পালাইয়া যাইত।

একদিন তাহাকে বাড়ীর বড় বড় মেয়েরা ধরিয়া পড়িল—"ন—তুই বল্, কাকে বে কর্‌বি?" সে লজ্জায় বিরক্তি-বোধক কতকগুলি গঞ্জনা করিয়া পালাইয়া গেল। কিন্তু সেই বাড়ীর একটি বউ তাহাকে কিছুতেই ছাড়িল না, সে নির্জ্জনে বহু মিনতি করিয়া অভয় দিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল-"বল্ ন—তুই কাকে বে কর্‌বি। আমি কারুকে বলব না" বহু সাধ্য সাধনায় এবং বারংবার প্রতিশ্রুতিতে নিশ্চিন্ত হইয়া সে বউটির কানের কাছে মুখ রাখিয়া প্রাণের কথাটা অতি মৃদুস্বরে বলিল "ঐ যে ছোট দাদার সঙ্গে বেড়ায়—নাম জানি না, ছোট দাদার মত ফর্সা নয়, কিন্তু দেখ্‌তে ভারি সুশ্রী।" নাম সে জানিত না, আমি বলিয়া দিতেছি—সেই দ্বাদশবর্ষীয় বালকের নাম দীনেশচন্দ্র।

এই কথা কৃতঘ্ন, অবিশ্বাসী বউটি সেই দিনই পাড়াময় রাষ্ট্র করিয়া দিল—তারপর কয়েকদিন আর পাড়ার বাহির হইতে পারি নাই। যে

দেখিয়াছে সেই জিজ্ঞাসা করেছে "কিরে ন"···নাকি তোকে পছন্দ করিয়াছে·?" আমি লজ্জায় মরিয়া গেলাম। ন—ও তদবধি আমাকে দেখিলে ছুটিয়া পলাইত, কিন্তু চঞ্চল পাদক্ষেপে পলাইবার সময় হঠাৎ পাছ ফিরিয়া আমার দিকে তার সুন্দর চক্ষুর একটি দৃষ্টির ফুলবাণ নিক্ষেপ করিয়া যাইতে ভুলিত না।

তাহার সঙ্গে আমার বিবাহ হইবার নয়, কারণ আমাদের গোত্র ছিল এক। সেই রমণীর অদৃষ্ট অতি মন্দ, বিবাহের ছয়মাস পরে সে বিধবা হয়, তাঁহার স্বামী সেই বৎসর বি, এ পরীক্ষা দেন। যদিও সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন, কিন্তু গেজেটে ফল বাহির হইবার পূর্ব্বেই যক্ষা রোগে প্রাণত্যাগ করেন। তদবধি বিধবা, পূজা আহ্নিকও নানা ধর্ম্মানুষ্ঠানে দীর্ঘজীবন কাটাইয়া দিতেছেন। আমার সঙ্গে তার আর দেখা হয় নাই। কিন্তু গত বৎসর একজন আত্মীয়, যিনি "ন—এরও আত্মীয়, আমাদের বাড়ীতে এসেছিলেন। তার নিকট শুনিলাম, তিনি আমার সম্বন্ধে অনেক কথা—এমন কি আমার চেহারা কিরূপ আছে—তাহাও জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। শিশুকালের কথাগুলি আজীবন মনে থাকে, এটি কি আশ্চর্য্যের বিষয় নয়? নতুবা সেই তাঁর ১০ বৎসর বয়সের দুদিনের দেখা—একটা ছেলেখেলা বই কিছুই নয়, তাঁহার স্মৃতি আজ ৫০ বৎসর বয়সে বা তাঁহার মনে থাকিবে কেন—এবং সেই কথা শুনে আমার মনেই বা কালিদাসের "মধুরানি নিশম্য শব্দান্" শ্লোকের ন্যায় পূর্ব্ব জন্মের স্মৃতি এরূপ অভাবনীয় মধুরালেখ্যের ন্যায় মনে পড়িবে কেন?

কৈশোর কালের ন্যায় কাল মানুষের জীবনে আর নাই। শিশু অজ্ঞান, কিন্তু কিশোরের জ্ঞান হইয়াছে। যুবক প্রবল আকাঙ্ক্ষা লইয়া উন্মত্ত, তাহার স্বীয় মত, স্বীয় চরিত্র দৃঢ় হইয়াছে। কিন্তু এই শৈশব-

নিশার অজ্ঞাতালোক এবং যৌবন-দিবসের সম্যক প্রবুদ্ধালোকের সন্ধি-স্থলে যে কৈশোর-উষা তাহা বড়ই মনোরম। কিশোর পরের জন্য অনায়াসে জীবন দিতে পারে, প্রাণ দিয়া ভালবাসিতে পারে, প্রতিদানের কথা—হিসাবের কথা তাহার মনেই স্থান পায় না। এজন্য ভগবানের কিশোর-রূপ কল্পনা করিয়া শাস্ত্রকারের প্রেমধর্ম্ম বুঝাইয়াছেন।

———

পড়াশুনা

পাঠকের মনে থাকিতে পারে আমি ১৮৭৯ সনে মাইনর পাশ করিয়া কুমিল্লায় পড়িতে গিয়াছিলাম। সেখানে যাইয়া গভর্ণমেণ্ট স্কুলে চতুর্থ-শ্রেণীতে ভর্ত্তি হইলাম। তখন হেডমাষ্টার ছিলেন জগদ্বন্ধু ভদ্র, - ইনি সাহিত্য সমাজে সুপরিচিত। মেঘনাথ বধ কাব্যকে ঠাট্টা করিয়া "ছুছুন্দ-দরীবধ" নামক যে অপূর্ব্ব বিদ্রূপকাব্য রচিত হইয়াছিল, তাহার লেখক ছিলেন এই জগদ্বন্ধু ভদ্র মহাশয়। এই কাব্যটি পুরোপুরি রামগতি ন্যায় রত্ন মহাশয়ের বঙ্গ সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাবে উদ্ধৃত হইয়াছিল। পূর্ব্ববঙ্গে তখন ইংরেজী ভাষায় ব্যুৎপন্ন ব্যক্তিদিগের শীর্ষ স্থানে ছিলেন ঢাকা জেলার মস্তগ্রামনিবাসী উমাচরণ দাস মহাশয়। তিনি যেমনই পণ্ডিত ছিলেন তেমনই সঙ্গীত শাস্ত্রে বিশারদ ছিলেন। জগদ্বন্ধু ভদ্র মহাশয় উমাচরণ বাবুর সাহায্য লইয়া বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পদ প্রকাশ করেন। ইহাঁদের পূর্ব্বে কোন আধুনিক স্তরের লোক এইসকল পদের প্রতি অনুরাগপ্রকাশ করেন নাই। তত্ত্বাবোধিনী পত্রিকায় "বংশী-ধরে"র প্রসঙ্গে সর্ব্বদা ঠাট্টা বিদ্রূপ প্রকাশিত হওয়ায় বৈষ্ণব পদাবলীর প্রতি শিক্ষিত সমাজের বরং একটা তীব্র ঘৃণার ভাবই ছিল। জগদ্বন্ধু ভদ্র মহাশয় বহুসংখ্যক বাবাজির আখড়াতে ঘুরিয়া কি কষ্টে যে এই সকল পদ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার পদাবলীর ভূমিকায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ইনিই এইক্ষেত্রে প্রথম হলধর, ইট-পাথর ভাঙ্গিয়া ইনিই এই ক্ষেত্র সর্ব্ব প্রথম হলচালনার উপযোগী করিয়াছিলেন। ইহাঁর পরে সারদামিত্র মহোদয়, কালীপ্রসন্ন কাব্য-বিশারদ, রমণীমল্লিক, অক্ষয়চন্দ্র

রবীন্দ্রনাথ, শ্রীশ মজুমদার, নীলরতন, নগেন্দ্রগুপ্ত; সতীশ রায়, অমৃত-বাজার পত্রিকার অধ্যক্ষেরা—এবং অপর অপর শিক্ষিত লোক এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন—কিন্তু এই পথের সর্ব্বপ্রথম পথিক এবং নবতন্ত্রীদের মধ্যে এই বিষয়ের প্রথম দীক্ষিত ছিলেন ভদ্র মহাশয় ও উমাচরণবাবু।

জগদ্বন্ধু ভদ্র মহাশয়ের তৃতীয় কীর্ত্তি, তাঁহার অসাধারণ সংগ্রহ-নৈপুণ্য ও বিরাট অধ্যবসায়ের জীবন্ত দৃষ্টান্ত "গৌরপদতরঙ্গিণী"—সাহিত্য-পরিষৎ হইতে টাকির খ্যাতনামা জমিদার রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, এম,এ বি এল্ মহাশয়ের ব্যয়ে প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রথম সংস্করণ নিঃশেষ হইয়া আসিয়াছে—এখন ভদ্রমহাশয় স্বর্গগত; অপর কোন যোগ্য ব্যক্তির দ্বারা সম্পাদিত হইয়া এই দুর্লভ পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের সময় আসিয়াছে।

জগদ্বন্ধু ভদ্রমহাশয় ছিলেন হেডমাষ্টার। আমি চতুর্থশ্রেণীর পড়ুয়া, আমি তাঁহার কাছে পড়ি নাই। কিন্তু তিনি যে মাথার উপর চাপিয়া ছিলেন, এ বিষয়ে ত সন্দেহ নাই। তাঁহার চেহারাটা ছিল ছোটখাটো, রোগা ও শ্যামবর্ণ, তিনি অতি নিরীহ ব্যক্তি ছিলেন। যে যুগের শিক্ষকদের হস্তে বেত্র, চক্ষে রক্তিমা ও ভাষায় ভীতিপ্রদর্শন সর্ব্বদাই যেন ছাত্রের রক্ত শুষিয়া খাইত,—অধ্যাপনার সেই নিদারুণ যুগেও জগদ্বন্ধুবাবুর হাঁকডাক আমরা কখনও শুনি নাই। তিনি বৈষ্ণব সাহিত্য চর্চ্চা করিয়া প্রকৃতই বৈষ্ণব হইয়া গিয়াছিলেন। তিনি প্রাচীন কবিগণের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া সময় সময় ব্রজবুলিতে পদ-রচনা করিতেন, তাহা বিষ্ণু-প্রিয়া প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হইত। ভদ্রমহাশয় বড়ই পানের ভক্ত ছিলেন,—তাম্বুলরসসিক্ত অধর-প্রান্ত তিনি রুমাল দিয়া মুছিতেন আর কথা কহিতেন। ইহার বহুদিন পরে তিনি ফরিদপুর জেলাস্কুলের

হেডমাষ্টার হইয়া আসিয়াছিলেন, তখন ইঁহার স্কুলে আর একটি ছাত্র ছিলেন, ছাত্রটি বোধ হয় তৃতীয় কি চতুর্থ শ্রেণীতে পড়িতেন—তিনি এখন বঙ্গদেশের নাতিক্ষুদ্র অংশ লোকের ভক্তি আকর্ষণ করিয়া "অবতার" রূপে গণ্য হইয়াছেন। তাঁহার নাম "প্রভুপাদ জগবন্ধু"। শুনিয়াছি সম্প্রতি তাঁহার দেহত্যাগ হইয়াছে, কেহ কেহ বিশ্বাস করেন, তাঁহার পুনরাবির্ভাব হইবে।

১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে নিদারুণ শিরঃপীড়ায় আক্রান্ত হইয়া আমি একবৎসর ফরিদপুরে ছিলাম, তখন জগবন্ধুবাবু অবসর লইয়া তথায় বাস করিতেছিলেন। আমি শয্যাশায়ী, সুতরাং যাইতে পারিতাম না—তিনি প্রায়ই আমাকে দেখিতে আসিতেন। তাঁহার মত অমায়িক ও সাহিত্য-প্রাণ, ভক্তিপরায়ণ লোক একালে খুব অল্পই দেখা যায়।

দ্বাদশবর্ষ বয়সে কুমিল্লায় যাইয়া পড়িতে লাগিলাম। তখন ক্লাসে যে সকল ছাত্র ছিল—তাহাদের মধ্যে একমাত্র ব্রজমোহনের অস্তিত্ব অবগত আছি। সে কুমিল্লার কোন মাইনর কি ছাত্রবৃত্তি স্কুলে শিক্ষকতা করিতেছে। ক্লাসে আমার মত অল্পবয়স্ক ছাত্র কেহ ছিল না।

আমার আত্মীয় মুকুন্দ ও আমি এক বাসায় থাকিতাম। আমি উভচর জীবের ন্যায় চন্দ্রমোহন দাস মহাশয় ও আমার শ্বশুর—উভয়ের বাড়ীতেই থাকিতাম। রাত্রি-যাপন হইত শ্বশুর বাড়ীতে-মুকুন্দের সহিত এক শয্যায়। আমাদের খট্টার পার্শ্বে মাদুর পাতিয়া শুইত মহিমচাকর। সে আধ্‌বয়সী ছিল, জাতিতে ভূঁইমালী। সে আমাদিগকে পতিতা রমণীদের সম্বন্ধে তাহার বিগত যৌবনের কত কেচ্ছা যে শুনাইত, তাহার সংখ্যা নাই। সেই তরুণ বয়সে ঐ সকল গল্প শুনিতে আমাদের খুব ভাল লাগিত, আরব্য-উপন্যাসের গল্পের ন্যায়

সেগুলি কল্পনাকে মুগ্ধ করিত। শেষে সে প্রস্তাব করিল—আমাদিগকে গণিকা-বাড়ী লইয়া যাইতে। মুকুন্দ সেই সুদিনের প্রতীক্ষায় ছটফট্ করিতে লাগিল। আমার লোভও কম হয় নাই। আমি দ্বাদশবর্ষ বয়স্ক ছিলাম, এবং মুকুন্দ ছিল চতুর্দ্দশবর্ষবয়স্ক। ইহার মধ্যে একদিন ঢাকা হইতে একপত্র পাইয়া জানিতে পারিলাম যে আমার সহাধ্যায়ী—প্রসন্ন গুহ ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে তৃতীয় শ্রেণীতে ভর্ত্তি হইয়াছে। ইহা শুনিয়া আমি একবারে ক্ষেপিয়া গেলাম, "তাহারা আমার এক বৎসর পূর্ব্বে এণ্ট্রান্স পরীক্ষা পাশ হইবে—ইহা হইতেই পারে না। এখানে আমাকে কেউ তৃতীয় শ্রেণীতে প্রমোসন দেবেন না, কারণ আমি ভাল ছেলে নই। এখান হইতে ঢাকায় গেলে মাইনর পাশের সার্টিফিকেট দেখাইলেই আমি তৃতীয় শ্রেণীতে ভর্ত্তি হইতে পারিব।" তখন এক স্কুল হইতে অন্য স্কুলে যাইতে কোনরূপই আঁটাআঁটি কিছু ছিল না। মনে মনে এই সিদ্ধান্ত স্থির করিয়া বাবাকে লিখিলাম—"আমাকে যদি কুমিল্লা হইতে লইয়া যাওয়ার বন্দোবস্ত এখনই না করেন, তবে আমি পলাইয়া যাইব।"

এই বয়ঃসন্ধির সঙ্কটে—ভগবান্ আমাকে রক্ষা করিলেন। মুকুন্দ দত্ত নানা কারণে অল্পবয়সেই লেখাপড়া অবসান করিয়া জীবনটা অকর্ম্মণ্য করিয়া ফেলিল, আমি তাহার কাছে থাকিলে তো আমারও সেই গতি হইত! আমাদের শৈশবের জীবনের প্রাক্কালে তো সেই হতভাগ্য মহিম-মালী লালসার সল্‌তে জ্বালাইয়া আলেয়ার আলোর দিকে আমা-দিগকে টানিয়া লইয়া যাইতেছিল, একজনকে সে প্রতারিত করিয়াছিল—আমিও তো সেই পথে যাইতাম। কিন্তু হঠাৎ ঢাকায় যাইবার জেদ আমার মনে কে দিল? বোধ হয় সকলেরই ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় পূর্ব্ব-নির্দ্দিষ্ট পথ ভাঙ্গিয়া চুরিয়া—তিনি এইভাবে অপরিহার্য্য কর্ম্মসূত্রের নিয়মে

সকলকে স্বতন্ত্র এক পথে সরাইয়া—টানিয়া লইয়া যান,—ইহাকেই "দৈব" বলে।—ইহা পুরুষকারকে সর্ব্বদা পদদলিত করিয়া নিজের জয়ডঙ্কা বাজাইয়া জীব-জগতের ভবিষ্যৎ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেয়।

যথাসময়ে আমার শৈশবের নিত্য সহচর, যাহার ঘাড়ে পিঠে ক্রোড়ে আমি সর্ব্বদা বিহার করিতাম, যাহার চুল ছিঁড়িতাম, শরীরে কামড় দিয়া রক্ত বাহির করিয়া দিতাম, এবং যাহার ক্রুদ্ধ হস্তের মুষ্টিবদ্ধ হইয়া আকৃষ্ট হইতে হইতে কত রৌদ্রের পথ হইতে ছায়ার পথে; কত বৃষ্টি-ধারা হইতে গৃহের ছাদের নীচে চীৎকার করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে আনীত হইতাম, সেই দ্বারকা সিংহ, আমাদের বাড়ীর চির বিশ্বস্ত শৈশবের চির-পরিচর আসিয়া উপস্থিত হইল। শ্বশুর-শাশুড়ীর চরণবন্দনা করিয়া; ঠাকুরদাদা চন্দ্রমোহন দাসের অনুমতি লইয়া আমি ইংরাজী ১৮৭৯ সনের পৌষ মাসে ঢাকায় পুনরায় ফিরিয়া চলিলাম। তখন আমি গোঁড়া হিন্দু। পথে নারায়ণগঞ্জে এক ভদ্রলোক উকিল আমার বাবার ছাত্র ছিলেন। বাবা তাঁহাকে লিখিয়াছিলেন "আমার ছেলে দীনেশ আমাদের একটি লোক লইয়া রাত্রে যদি নারায়ণগঞ্জে উপস্থিত হয়, তবে তুমি তাহার তত্ত্বাবধান করিয়া বাসায় রাখিও।" আমরা পিতার নির্দ্দেশ মত সেই বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম। সন্ধ্যাকাল, বাবুটি আমাদিগকে খুব যত্ন করিলেন; অল্প সময়ের মধ্যে নানারূপ পরিপাটী রান্না হইল। আমরা খাইতে বসিয়া গেলাম। কিন্তু আমার মনে একটা খট্‌কা বাঁধিয়া গেল। দেখিলাম একজন স্ত্রীলোক রান্না করিতেছে, তাহার আকৃতি ও ব্যবহার দেখিয়া তাহাকে ব্রাহ্মণী বলিয়া বোধ হইল না। এই স্ত্রীলোকটি আমাদের সকলের ভাত দিয়া গেল। কিন্তু হঠাৎ দেখিলাম সেই বাড়ীর চাকরটা "হেঁসেলে ঢুকিয়া খানিকটা নুন আনিল, তখন স্ত্রীলোকটি ব্যঞ্জন বাটিতে ঢালিতেছিল,—

ভৃত্য তাহাকে ছুঁইয়া নুন আনিল, তাহাতে স্ত্রীলোকটি কিছু বলিল না। তখন আমি নিশ্চিত বুঝিলাম, মেয়েলোকটি কখনই ব্রাহ্মণী নয় —নিশ্চয়ই শূদ্র-জাতীয়া। রাগে আমার শরীর কাঁপিতে লাগিল ও দুঃখে আমার চক্ষু ফাটিয়া জল পড়িতে লাগিল। এই সময়ে সেই ভদ্রলোকটির একজন আত্মীয় আমাদের পাতে ঘি দিয়া যাইতেছিলেন, তিনি বলিলেন "দীনেশের পাতে বেশী করিয়া দাও।" আমার পাতে ঐ ব্যক্তি ঘি ঢালিতে লাগিলেন,—তিনি প্রায় আধ পোয়াটেক ঘি আমার পাতে ঢালিলেন, আমি হাঁ-না কিছুই বলিলাম না। ইহাতে সকলের দৃষ্টি আমার দিকে আকৃষ্ট হইল। ভদ্রলোকটি দেখিলেন, আমার চক্ষু হইতে অশ্রু গড়াইয়া গণ্ডে পড়িতেছে। ইহাতে তিনি যারপর নাই অপ্রস্তুত হইলেন। একজন আগন্তুক ভদ্রলোক আসিয়া বলিলেন—"গাধা, আমি তোকে আগেই বলেছিলেম, ছেলেমানুষ হলেও তোর মত জাত-খেকো-তো সকলে নয়, তুই একদিন লজ্জা পাবি। দেখ্‌ছিস্ না বাঁশের থেকে কঞ্চি দড়।" যাহাহউক ভদ্রলোকটি আমি বালক হইলেও, জোড়হাতে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া আমাকে তুলিয়া লইয়া গেলেন। ইতিমধ্যে নিকট-বর্ত্তী ব্রাহ্মণ পাড়ায় এ খবর পৌঁছিয়াছিল। তাঁদের একজন বহু সমাদরে আমাকে তাঁহাদের বাড়ীতে নিয়া খাওয়াইলেন। বলা বাহুল্য যে, বাবার ছাত্র ভদ্রলোকটি চোরের ন্যায় আমার পাছে পাছে অপরাধ-অনুতপ্ত-দৃষ্টি মৃত্তিকায় ন্যস্ত করিয়া গিয়াছিলেন, এবং আমার খাওয়া শেষ হইলে নিজে শেষে আসিয়া ভোজনে বসিলেন। আমি তাঁহাকে বলিয়াছিলাম, "যে কারণেই হউক, আমি এখানে আসাতে আপনাদের মিছামিছি কতকগুলি মনঃক্ষোভ ও কষ্ট হইল, এজন্য লজ্জিত আছি। তিনি কোন উত্তর দিলেন না, কিন্তু একথায় যে তাঁহার লজ্জা আরও বাড়িয়া গেল—তাহা বুঝিতে পারিলাম।

জীবনে আর একদিন হিন্দুত্বের গোঁড়ামি দেখাইয়াছিলাম। আমার মা গোঁড়া হিন্দু হইলেও তাঁহার মনে সেইদিন আঘাত দিয়াছিলাম। আমি তাঁহার সঙ্গে ঢাকা হইতে সুয়াপুর চলিয়াছি, তখন আমার বয়স একাদশ বর্ষ, সে ১৮৭৮খৃঃঅব্দে হইবে। মা আমার জন্য রান্না করিয়াছেন—ধলেশ্বরী দিয়া চলিয়াছি—বিস্তৃত নদীর অপর পাড় দেখা যাইতেছে না, একপাড়ের সিকতারাশি রোদে চিক্ চিক্ করিতেছে—সেখানে বহুদূর পর্য্যন্ত লোকালয়ের চিহ্ন, কদলী কিংবা অন্য কোন বৃক্ষের লেশ নাই। মা জেলে-ডিঙ্গি হইতে সদ্য-ধৃত ইলিস মৎস্য কিনিয়াছেন, তাহারই ঝোল ও ভাজা রান্না হইয়াছে। আমি মায়ের সাথে বসিয়া খাইব—এই আশায় বসিয়াছিলাম। মা বলিলেন "খোকা তুই খা।" আমি বলিলাম "আমি তোমার সাথে খাইব।" উত্তরে তিনি জানাইলেন, তিনি নৌকায় কিছু খাইবেন না।

আমি—"কেন"?

মা—"কি করিয়া খাই বল্, দুটো মেটে হাঁড়িতে রান্না হয়েছে, তার একটা ফেটে গিয়েছে। নমঃশূদ্রদের নৌকা, তাদের কাঁসার থালা ভাল করে ধুয়ে দিয়াছে—তাতে গঙ্গাজল দিয়ে আবার ধুয়ে তোকে পরিবেশন করিয়া দিতেছি। কলিতে ধাতু-নির্ম্মিত পাত্রে দোষ নাই, তুই খা।"

আমি বলিলাম "তুমি খাবে না কেন, তা বুঝিলাম না।"

মা—"আমি বুড়ো হয়েছি, আমি ওদের থালায় কি ক'রে খাব?"

আমি—"না, তুমি না খেলে আমি খাব না।" মা অত্যন্ত দুঃখ ও বিরক্তির সঙ্গে বলিলেন, "ছাখ্ খোকা, তুই মিছে কষ্ট আমায় দিস্ না, ঝোড়ো হাওয়ায় উনুনের আগুন কতবার নিবে গেছে—নাকের জলে—চোখের জলে এই রান্না হয়েছে! এত কষ্টের রান্না,—তুই ছেলে মানুষ, এতটা বাড়াবাড়ি কেন কচ্ছিস্।"

কিন্তু আমি সেই থালায় কিছুতেই খাইলাম না। মাঝিদের পাতা কাটিয়া আনিতে বলা হইল,তারা বলিল,"মা-ঠাকরুণ—এখুনি ঝড় আসিবে এখনই যদি পাড়ি না দিতে পারি, তবে বৈকালে বিপদের আশঙ্কা আছে, এখন কলাপাতের খোঁজ করিতে গেলে দুই তিন দণ্ড দেরি হইবে। আমাদের কি? আপনার এক ছেলে তাকে যদি এই বিপদে ফেল্‌তে চান, তবে আমাদের প্রাণের মমতা আর কি? আমরাত আপনাদের প্রজা, মর্‌তে বলেন, মর্‌তে পারি।"

মা ভয় পাইয়া কলাপাতা আনিতে লোক পাঠাইলেন না, এবং বহুক্ষণ ধরিয়া নীরবে চক্ষের জল মুছিতে লাগিলেন। শেষে রাত্রি কতকটা হইলে যখন দেখিলেন আমি কিছুতেই খাইলাম না, তখন ক্রোধের সহিত মাঝিদিগকে সেই সকল ভাত মাছ দিয়া বলিলেন "খোকা, বাড়াবাড়ি ভাল নয়, তুই যদি মোছলমানের ভাত না খাস্, তবে আমি বাপের বেটি নই, তোর অদৃষ্টে সকল অখাদ্যই একদিন খেতে হবে, এইটি মনে রাখিস্।" সে সকল আমার অদৃষ্টে হইয়াছে কিনা বলিতে চাই না, যদি ঘটিয়াই থাকে তবে তাহা মাতৃ অভিশাপের ফলে—আমার কোন হাত নাই। ব্রহ্মা বিষ্ণু যাহা পারেন নাই, দুর্লংঘ্য কর্ম্মফল ঠেকাইব, এমন সাধ্য আমার কি থাকিতে পারে?

মায়ের মনে যে আমি কতরূপে কত আঘাত দিয়াছি, তাহা বলিয়া শেষ করিতে পারিব না। মা বাঙ্গালা বই বেশ পড়্‌তে পারিতেন, কিন্তু তিনি লিখিতে পারিতেন না। একখানি চিঠি লিখাইবার জন্য যে তিনি আমাকে কত অনুনয় করিতেন, তাহা ভাবিতে আমার চোখের জল আইসে। "আমি এখন পারব না" এইরূপ হঠকারী ভাবে উত্তর দিয়া জেদ বজায় রাখিতাম। মা সমস্ত পাড়া ঘুরিয়া আসিতেন—হয়ত সে সময় কাহাকেও পাইলেন না, যে যার কাজে বাহির হইয়া গেছে।

দিদি হয়ত তীর্থদর্শনে বৃন্দাবন অঞ্চলে গিয়াছেন। এক ঘণ্টা পাড়া ঘুরিয়া কাগজ খানি হাতে করিয়া আমার খট্টার পার্শ্বে আসিয়া বসিতেন। ইচ্ছা যে তাঁহার পুত্র অনুতপ্ত হইয়া বলিবে—"মা, কেন কষ্ট কচ্ছ? আমি লিখে দিচ্ছি।" কিন্তু আমার মত হতভাগ্য এমন কেউ আছে? আমি মায়েব এই সামান্য কষ্ট টুকু দূব করিতে চেষ্টা কবি নাই। কখনও কখনও বড় দুঃখে তাঁহার মুখ হইতে রূঢ় কথা বাহির হইয়াছে "এতটা গর্ব্ব ঠিক নয়! খোকা, যিনি হাতের শক্তি দিয়েছেন, তিনি সে শক্তি ফিরিয়া নিতে পারেন।" একটি ক্ষুদ্র দীর্ঘ নিশ্বাসের সঙ্গে উচ্চারিত এই সামান্য দুটি কথা যে আমার পক্ষে বজ্রাঘাতের ন্যায় হইয়াছে তাহা যদি মা জানিতেন, তবে এই কথাগুলি তিনি কিছুতেই বলিতেন না। জীবনের প্রায় ছয়টি বছর আমি অশক্ত দক্ষিণ হস্তে একটি পংক্তি লিখিতে পারি নাই। একখানি পত্র লিখাইতে হইলে পথের থেকে মানুষ ধরিয়া আনিতে হইয়াছে, তখন কিরণ ও অরুণ অতি-শিশু। মৃত্যুর সময় নিদারুণ হাঁফানি রোগে তিনি একদিন বড় কষ্টে বলিয়াছিলেন,—বোধহয় 'কুষ্মাণ্ড-খণ্ড" খেলে একটু আরাম বোধ করিতাম।" তখন আমি বি, এ পড়ি। আমার ধনশালী মামারা মায়ের কোন খোঁজ তখন নেন নাই। এইআক্ষেপ মনে হইতেছে আমি কুলি হইয়া মজুর হইয়া কেন কুষ্মাণ্ডখণ্ড কিনিয়া দিলাম না? ঢাকায় বড় বড় এক রকমের গোল বেগুন বাজারে পাওয়া যায়,তাহা বড় সুস্বাদু, তাহাকে "লাফা বেগুন" বলে; আমার বাবা তাহা খাইতে ভালবাসিতেন। আমি যতবার ঢাকায় গিয়াছি ও আসিয়াছি, তিনি প্রতিবারই বলিয়া দিতেন "দীনেশ, যদি পার, তবে কয়েকটা লাফা-বেগুণ আমার জন্য আনিও" সেই দুইচার পয়সার জিনিষও আনিতে আমি প্রতিবারই ভুলিয়া গিয়াছি। আমি বাড়ী গেলে তাঁহার বড় ইচ্ছা হইত, আমি খানিকক্ষণ তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া থাকি; কিন্তু আমি এক

মুহূর্ত্ত বসিয়া চলিয়া যাইতাম। তিনি অতিশয় সংযমী ছিলেন; আমার ব্যবহারে কষ্ট পাইলেও মুখে কোন দিন কিছু বলেন নাই। জীবনে যে সকল কষ্ট পাইয়াছি ও পাইতেছি—তাহা যদি আমার যোগ্য না হয়, আর কার যোগ্য? তাঁহাদের স্নেহের কথা কি বলিব? সে অনন্ত স্নেহ কি করিয়া বুঝাইব! সমুদ্রের পর পার কে দেখাইবে? পদ্মার জল মাপিয়া তাহা কতখানি, কে বুঝাইবে? সে সকল কথা না বলাই ভাল। আমার অশ্রুর ঘন প্রাচীরে আমার অনুতাপ ও দুঃখ চিরকাল আবৃত হইয়া থাকুক, আমার মনের ব্যথা যেন ভাষায় ব্যক্ত না হয়! সে পবিত্র-ব্যথার প্রবাহে আমার সমস্ত পাপ ধুইয়া যাউক—বাহিরে তা বলিয়া হা হুতাশ করিলে আমার তপস্যা নষ্ট হইয়া যায়। এখন দেবতা দর্শনের জন্য কেন লোকে পুরী যায়, কেন মুমূর্ষু-ব্যক্তি সর্ব্বস্ব পণ করিয়া তীর্থের দিকে ছোটে তাহা আমি বেশ বুঝিতে পারি। মনে হয় যদি এক মুহূর্ত্তের জন্য মাতাপিতার চরণপদ্ম আবার দেখিতে পাইতাম, তবে আমার চক্ষু ধন্য হইয়া যাইত। কোন কথা বলিয়া সেই মুহূর্ত্তের সাক্ষাৎকারকে অযথা বাচালতার দ্বারা বিড়ম্বিত করিতাম না—কেবল তাঁহাদের শ্রীচরণ-প্রান্তে বসিয়া শ্রীমুখদ্বয়ের শোভা দেখিতাম, হরগৌরীর রূপ দেখিতাম, এবং অজস্র চক্ষুজলে যা বলিবার—তা সকলই বলিতাম, যতদুঃখ সহিয়াছি—তাঁহারা ছাড়িয়া যাওয়ার পর—সেই স্নেহের সহস্রাংশের একাংশও যে কোথাও পাই নাই, তাহা অশ্রু বিন্দুর দ্বারা নিবেদন করিতাম এবং যাহা কাচের ন্যায় অবহেলা দ্বারা উপেক্ষা করিয়াছি তাহা যে এখন আমার কাছে কৌস্তুভ কহিনূর হইতে কত বেশী মহার্ঘ হইয়াছে—তাহা বুঝাইতাম। ইহার নাম "দর্শনানন্দ"—এই দর্শন কি আর কোন জন্মে আমার ভাগ্যে ঘটিবে?

ঢাকায় আসিয়া কলেজিয়েট স্কুলে ভর্ত্তি হইলাম। তখন কলেজিয়েট স্কুল নাম-ডাকের—অনেক ভাল ছেলে আমাদের সাথে পড়িত। সর্ব্বাপেক্ষা ভাল ছিল ললিত, তার চেহারাটি বেশ সুশ্রী ছিল, বুদ্ধি ছিল ক্ষুরধার। সে যে ইউনিভারসিটিতে প্রথম হইবে—ইহা সকলেরই বিশ্বাস ছিল। কিন্তু দ্বিতীয় শ্রেণীতে উঠিয়া তাহার চরিত্রে দোষ ঘটে—সে এণ্ট্রেন্স পরীক্ষা পাশ হইয়া মাত্র দশ টাকার একটা বৃত্তি পাইয়াছিল। আমাদের সঙ্গে বিপিন চক্রবর্ত্তী পড়িত, এরূপ ভাল ছেলে বড় দেখা যায় না। কৈলাসবাবু হেডমাষ্টারের বাড়ীতে বহু লোকের রান্না করিয়া সে তাহার উদর-সংস্থান করিত ও বিধবা মাতার খরচ চালাইত। তাহার চেহারাটি ছিল প্রকৃতই ব্রাহ্মণের মত—প্রশান্ত, ধীর, কামনা-বর্জ্জিত, গৌরবর্ণ। সে এন্‌ট্রেন্স পরীক্ষায় পঞ্চম হইয়া কুড়ি টাকা বৃত্তি পায়। আমি বি, এ পর্য্যন্ত তাহার সঙ্গে একত্র পড়িয়াছি, তাহার পিঠে কত কিল চড় মারিয়াছি, কিন্তু সে কথাটি বলে নাই। সে যখন নিবিষ্ট হইয়া অঙ্ক কষিতে থাকিত, তখন তাহার বাহ্য জ্ঞান থাকিত বলিয়া মনে হইত না। বি, এ খুব ভালভাবে পাশ করিয়া সে রুরকীতে যাইয়া ইঞ্জিনিয়ারী পড়ে, তথায় সে এত বেশী নম্বর পাইয়া প্রথম হইয়াছিল যে রুরকীর ইতিহাসে এরূপ নম্বর আর কেহ পান নাই। কাশীতে সে একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার হইয়া 'রায়বাহাদুর' উপাধি পায়—তথায় সে সর্ব্বজন প্রিয় ছিল। আমার ভগিনী দিগ্বসনী দেবী তখন কাশীতে ছিলেন, কোন প্রয়োজনে আমি বিপিনকে লিখিয়াছিলাম দিদির সঙ্গে দেখা করিতে। সে এমনই অনাড়ম্বর ও নিরীহ ভাল মানুষ ছিল, যে দিদি তাহাকে পোনের কুড়ি টাকা মাহিয়ানার কেরাণী বলিয়া ভুল করিয়াছিলেন। বিপিন অকালে প্রাণ ত্যাগ করে। কলেজিয়েট স্কুলে কয়েক দিনের জন্য অন্নদা-চরণের সঙ্গে পড়িয়াছিলাম, তিনি এণ্ট্রেন্স পরীক্ষায় দ্বিতীয় হন এবং কুড়ি টাকা বৃত্তি উপার্জ্জন

করেন। তিনি ত্রিপুরা মহারাজের মন্ত্রী হইয়াছিলেন এবং অনেক দিন ম্যাজিষ্ট্রেটের কাজ করিয়াছিলেন—তাঁহার সঙ্গে বিশেষ ঘনিষ্ঠতা হইবার আমার কোন কালেই সুবিধা হয় নাই। আমার আর এক সহধ্যায়ী মনোমোহন। সে ময়মনসিংহের জমিদার ব্রজেন্দ্রকিশোর রায় মহাশয়ের ষ্টেটে সর্ব্বে-সর্ব্বা হইয়া ন্যাসনাল কলেজ স্থাপনের কল্পনায় ব্যস্ত ছিল,—তাহার বিশ্বাস, বিধাতা বিশ্বের সমস্ত বুদ্ধি তাহার মাথায় দিয়াছেন—একদিন সে আমায় বলিয়াছিল—"আমরা ছিলাম ক্লাসে ভাল ছেলে, তুই সকলের পাছে পড়িয়া থাকতিস্, কি আশ্চর্য্য তুই নাম ও খ্যাতি লাভ কর্‌লি, আমরা ভাল হয়ে সেরূপ পারলুম কৈ ?" দীনবন্ধু মজুমদার আমার আর এক সহাধ্যায়ী—ইহার সঙ্গে তৃতীয় শ্রেণী হইতে বি, এ পর্য্যন্ত পড়িয়াছি। কালো চেহারা মস্ত মস্ত দুটি চোখ, কথাবার্ত্তা মেয়েলী ঢংয়ের। এক জোড়া ছেঁড়া চটী পায় দিয়া সে এল এ, বি এ ক্লাসে চিরকাল যাতায়াত করিয়াছে এবং পদ্য লিখিয়া আমার সঙ্গে পত্র-ব্যবহার করিয়াছে, সেও এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় বৃত্তি পাইয়াছিল। এখন সে ইম্পিরিয়াল সেমিনারির হেড মাষ্টার – আমার প্রবর্ত্তনায় সে এবার বাঙ্গলায় এম এ, দিতেছে। কলেজিয়েট স্কুলে আমার বেশী দিন পড়া হইল না। কারণ আমার পিতার আর্থিক অবস্থা শোচনীয় হইয়া আসিয়াছিল। তাঁহার এক ছাত্র ধামরাই নিবাসী অনাথবন্ধু মল্লিক জগন্নাথ স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষ ছিলেন, তাঁহার সাহায্যে একটি ফ্রি ষ্টুডেণ্ট সিপ পাইয়া আমি জগন্নাথ স্কুলে আসিয়া ভর্ত্তি হইলাম।

তখন মাতুলালয়ে থাকিতাম, আমার মাতামহের নামে তখন আমাদের সম্মানের অবধি ছিল না, স্বয়ং গণিমিঞা আমাদিগকে তাহার বাড়ীর উৎসব উপলক্ষে আদর ও স্নেহ দেখাইতেন।

জগন্নাথ স্কুলে আমার একান্ত অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিল কুমদিনী বসু। তাহার

চেহারাটি মেয়েলী ধরণের ছিল, রংটা খুব গৌরবর্ণ ছিল না, কিন্তু বড় স্নিগ্ধ ও লাবণ্যময় ছিল। আমাকেও লোকে মেয়েলী চেহারার ছেলে বলিয়া ঠাট্টা করিত। কুমুদিনী ও আমি ছিলাম সকলের থেকে বয়সে ছোট ও আমাদের পরস্পরের মধ্যে খুব ভাব ছিল; আমি এগারটি বোনের মধ্যে এক ছেলে, তাও আবার যমজ এক ভগিনীর সঙ্গে—সুতরাং আমার মুখে কতকটা মেয়েলী ভাব থাকা আশ্চর্য্য নহে। কুমুদিনী আমার চাইতে চার ছয় মাসের বড় ছিল। আমি ও সে—এই দুই জন বহু ছাত্রের লক্ষ্য ছিলাম, তাহারা যে আমাদের কাছে কি চাইত তাহা ভাল বুঝিতাম না। কিন্তু তাহারা লম্বা লম্বা চিঠি লিখিয়া জ্বালাতন করিত, কাছে আসিয়া ঘেসিয়া বসিবার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিত ও মুখের দিকে নির্ব্বাক হইয়া তাকাইয়া দেখিত। দুএকজন আবার নির্জ্জনে পাইলে এরূপ সকল কথা বলিত যেন দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে কিম্বা আয়েষা জগৎসিংহকে বলিতেছে। এই উৎপাতে কুমুদিনী ও আমি বড়ই ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িতাম। ইহার মধ্যে একটী দাড়ী গোঁপওয়ালা ছেলে একদিন আমার গলা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়া ফেলিল এবং বলিল 'আমি তোমায় বড্ড ভালবাসি।"

একদিকে এই উৎপাত, অপর দিকে বৈকুণ্ঠ পণ্ডিতের চড় ও বেত্রাঘাত—আমাকে বড়ই বিড়ম্বিত করিয়া তুলিল।

মোট কথা জগন্নাথ স্কুলের ছেলেরা ভারি দুষ্ট ছিল; সেই স্কুলের দোতলা হইতে ** বাজারের ত্রিতল, চৌতল, দীর্ঘরথাকৃতি বাড়ীগুলির ছাদ দেখা যাইত। সেই ছাদে মেয়েরা নগ্ন দেহে স্নানান্তে কাপড় শুকাইতে দিত কিম্বা সিক্ত কাপড় ছাড়িয়া শুষ্ক শাড়ী পরিত—আমাদের ক্লাসের ছেলেদের মধ্যে অনেকে তখন জানেলায় ভিড় করিয়া ঐ সকল মেয়েদের দেখিত ও ঠাট্টা বিদ্রূপ করিত। আমি ও কুমুদিনী—সে সকল হাসির অর্থ বুঝিতাম না, কিন্তু ছেলেরা যে দুষ্টুমি করিতেছে তাহা বেশ বুঝিতে পারিয়া

উহাদিগকে ঘৃণা করিতাম। আমাদের সঙ্গে পড়িত শিরাপ্রসন্ন ও রাসবিহারী। রাসবিহারী এখন কোথায় ওকালতি করিতেছে। দিগিন্দ্র-হাজরার চেহারাটা ছিল ধরধবে মহাদেবের ন্যায়—সে ক্লাসে পড়িয়া কেবলই ঘুমাইত। রজনীপণ্ডিত তাহার উপাধি দিয়াছিলেন lion of sleep(নিদ্রা-সিংহ); সে এখন ঢাকা জজ আদালতে ওকালতি করিতেছে। ক্লাসে ভাল ছেলে ছিল—পূর্ণ রাউত, সে সকল বিষয়েই ভাল ছিল—কিন্তু অঙ্কে ছিল বিশেষরূপ ভাল। আমি যে এন্‌ট্রেন্স পাশ করিব, এমন সন্দেহ কেহ ক্ষণকালের জন্যও পোষণ করে নাই, যেহেতু আমি এক শত নম্বরের মধ্যে অঙ্কে তিন চার নম্বর পাইতাম। কুমুদিনীর নম্বর ও প্রায় সেইরূপ উঠিত; কিন্তু আমরা, দুইজনই ইংরেজীতে বেশ ভাল নম্বর পাইতাম।

কুমুদিনী একদিন আমায় বলিল "পূর্ণ এমন কি ভাল ছেলে? আমি আর তুই যদি অঙ্ক ভাল করিয়া কষিতে থাকি, তবে কি পারব না. আচ্ছা, সেই চেষ্টা করা যা'ক।" এই বলিয়া সে দিন রাত করিয়া অঙ্ক কষিতে সুরু করিয়া দিল, তারপর যে সাপ্তাহিক পরীক্ষা হইল—তাহাতে সে ক্লাসে অঙ্কে তৃতীয় হইল। ছাত্র ও শিক্ষকগণ অবাক্ হইলেন। টেষ্ট পরীক্ষায় কুমুদিনী অঙ্কে প্রথম ও পূর্ণ রাউত দ্বিতীয় হইল,—আলাদিনের প্রদীপ ঘষিয়া অট্টালিকা উঠাইবার মত এই কাণ্ডটা আশ্চর্য্যজনক হইয়া গেল।

ইহার পর কোন অভাবনীয় ঘটনায় কুমুদিনীর সঙ্গে আমার ভাবান্তর হইল—তাহার সঙ্গে কথা বন্ধ করিয়া দিলাম। কুমুদিনী পূর্ণকে পরাজয় করিয়া এণ্ট্রেন্স পরীক্ষায় পোনর টাকা বৃত্তি পাইল—পূর্ণ পাইল দশ টাকা—তারপর কুমুদিনী ঢাকা ছাড়িয়া অন্যত্র পড়িতে গেল, তদবধি তাহার সঙ্গে আমার দেখা হয় নাই, শুনিয়াছি সে সবজজিয়তি করিতেছে।

মুএখন আমার অবস্থা বলিতেছি। আমি কুদিনীর দেখাদেখি অঙ্ক কষিতে

আরম্ভ করিলাম। অঙ্কে আমিও এমন পারদর্শিতা দেখাইলাম যে তাহা যদিও কোন অদ্ভুতরূপ বিস্ময়কর ঘটনা হয় নাই—তথাপি ছাত্র ও শিক্ষকগণের মধ্যে তা নিয়ে বেশ একটা আন্দোলন হইয়াছিল। একটা ক্লাস—পরীক্ষায় আমি ত্রিশ পাইলাম। অঙ্কের শিক্ষক শরৎচন্দ্র সেন মহাশয় আমাকে বলিলেন "তুমি নকল করিয়াছ"। আমি বলিলাম, "আমি নেহাৎ খারাপ ছেলে নই, যদিও আপনার বিষয়ে দুইতিনের বেশী নম্বর পাই না। পূর্ণ আমার খুব বিশেষ বন্ধু, তার পার্শ্বে বসিয়া চিরকাল আমি দুই তিন পাইয়া আসিয়াছি—যদি নকল করিবার প্রবৃত্তি থাকিত, তবে চিরদিনই বেশী নম্বর পাইতাম"। আমাদের সঙ্গে রসিকবসু নামক এক ছাত্র সার্টের ইস্তিরি করা প্লেট ও কাফের মধ্যে ইতিহাসের সমস্ত প্রয়োজনীয় কথা লিখিয়া তাহার উপর কোট ঝুলাইয়া আসিত। "বড্ড গরম" বলিয়া কোটের বোতাম খুলিত ও হাত হইতে কাফ বাহির করিয়া অবাধে প্রশ্নের উত্তর লিখিয়া যাইত। এই সকল কারণে কিছু কিছু অবিশ্বাসের কারণ না হইতে পারিত, তাহা নয়।

যাহা হউক যে ভাবে অঙ্কের চেষ্টা করিতে লাগিলাম, তাহাতে টেষ্ট পরীক্ষার পূর্ব্বেই বেশ যোগ্যতা লাভ করিতে পারিতাম—সন্দেহ নাই—কিন্তু এই সাফল্যের একটা অন্তরায় আসিয়া উপস্থিত হইল।

ঢাকায় ওলাউঠা

সে ১৮৮১ সন। ঢাকায় তখন যেরূপ ওলাউঠার প্রকোপ হইয়াছিল, সেরূপ উৎকট অবস্থা বড় দেখা যায় না। প্রথমতঃ তাঁতিবাজারের পথে যাইতে "হরিবোল" শব্দে বহু মৃতব্যক্তিকে লইয়া যাইতে দেখিতাম, তখন মড়াটা ডানদিকে কি বামদিকে দেখিলাম, তাহাই নিয়া মনে বিতর্ক করিয়া যাত্রার শুভাশুভনির্ণয় করিতাম,—কচি প্রাণে তখনও ভয়ের সঞ্চার হয় নাই, তখন থাকিতাম বাবুর বাজারে দীননাথ মুন্সীর হাবিলিতে মেস করিয়া। সেই মেসে আমাদের গ্রামের বহুছেলে থাকিত অবনীশ, মহেন্দ্র, অবিনাশ, প্রভৃতি। মহেন্দ্র এখন ঢাকা জেলা কোর্টের ফৌজদারীর বিভাগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উকিল। আমাদের বাড়ীর কাছে,—ছিল রমাপ্রসন্ন-রায়ের বাসা। তিনিও আমাদের গ্রামের লোক—ডিপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটী করিতেন। তাহার ছোট ভাই উমাপ্রসন্ন আমাদের সঙ্গে জগন্নাথ স্কুলে পড়িত, তাহার চেহারা ছিল কালো খর্ব্ব স্থূল। কলেরা তাঁতিবাজার হইতে সুরু করিয়া ধীরে ধীরে বাবুরবাজার মুখে রওনা হইল। স্কুলে যাইয়া দেখিতাম ক্রমশঃ ছেলে কমিয়া যাইতেছে, তাহারা ভয়ে ঢাকা ছাড়িয়া যাইতেছে। পথে—দোকান-পাটে শুষ্ক ভীতনেত্র লোকগুলি দাঁড়াইয়া কেবল ঐ ব্যারামের কথাই বলিতেছে—সেরূপ ভয় কলিকাতার মত স্থানে হইতেই পারে না। কলিকাতায় কোথায় কি হইতেছে—কে খবর রাখে, শুধু সংবাদপত্র পড়িয়া জানা,—কিন্তু ঢাকার মত ক্ষুদ্র সহরে সে যে কি ভয়—তাহাও কলেরা আবার সংক্রামক। সমস্ত সহরটির উপর একটা মৃত্যুর ছায়া পড়িয়াছিল—সকলের মুখে

কালিমা। একদিন সন্ধ্যাকালে মেসে বসিয়া আছি, উমাপ্রসন্ন আসিয়া বলিল, "আমাদের বাড়ীর পায়খানাটা ভাল নয়—তোদের এখানে যাব।" সে ঘটী হাতে গেল; কিন্তু প্রায় এক ঘণ্টার মধ্যে ফিরিল না; দেখিয়া আমরা যাইয়া দেখি সে পায়খানার উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া অজ্ঞান হইয়া আছে, তাহাকে ধরাধরি করিয়া উঠাইয়া আনিয়া বাড়ীতে পৌঁছিয়া দিলাম। আমরা সারা রাত্রি তাহার সেবা করিতে লাগিলাম; রাত্রি একটা দুইটা পর্য্যন্ত, কাগজী নেবু, ঔষধ, বরফ প্রভৃতির জন্য বাজারে হাটাহাটি করিতে লাগিলাম। তারপর দিন ভয়ে আমরা কিছু খাইলাম না, বেলা ৪টার সময় উমার অবস্থা অতি খারাপ হইল, একেতো সে কালো ছিল—তার উপর চোখদুটি শিব চক্ষুর মত হইল, চুলগুলি চাঁছিয়া ফেলা হইল, গণ্ডের কঙ্কাল উঁচু দেখা যাইতে লাগিল, একটা নেংটী পরা—সে কি ভয়ানক দৃশ্য। আজগর মিঞা হোমিওপ্যাথী চিকিৎসা করিতেছিলেন, তিনি সেই অবস্থায় ফুট-বাথের ব্যবস্থা করিলেন। কিন্তু যাই তাহার পা-দুখানি গরম জলে ডুবানো হইল অমনই প্রাণবায়ু নির্গত হইয়া গেল। সে কি শোকাবহ দৃশ্য! তাহার মাতা প্রায় /৫ সের পরিমিত বরফ খণ্ড হাতে লইয়া উন্মত্তভাবে আজগর মিঞাকে ছুঁড়িয়া মারিতে যাইতেছেন। আজগর মিঞা কোটের বোতাম খুলিয়া উন্মুক্ত বক্ষে বলিতেছেন—"মা, মারুন,—আমি আপনার ছেলের প্রাণের জন্য দায়ী, আমায় মেরে যদি আপনার শোক নিবারণ হয়—তাহাই করুন।" উমাপ্রসন্নের মাতা তখন বরফ খণ্ড ছুঁড়িয়া ফেলিয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। আমরা উমাকে দাহ করিয়া রাত্রি ১১টার সময় মেসের বাসায় ফিরিলাম, সেদিন কেহ জল স্পর্শ করি নাই। রাত্রি দুইটার সময় অবনীশ কাঁদিয়া উঠিল, আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম কি হইয়াছে, সে

বলিল, "কলেরা"। 'কিরূপে হইল, তারত কোন লক্ষণ দেখ্‌ছি না?' সে কাঁদিয়া বলিল আমি সারাদিন কিছু খাই নাই, তবু পেটের মধ্যে কেমন অসোয়াস্তি বোধ করিতেছি। আমি হাসিয়া উঠিলাম। আমরা কেহই এখন পর্য্যন্ত ঘুমাই নাই, ঘুমের ভাণ থরিয়া চক্ষু মুদিয়া পড়িয়া ছিলাম, প্রত্যেকের মনে হইতেছিল "আমার কলেরা হইল"—কারণ পেটের ভিতর একটা অসোয়াস্তির ভাব সকলেই অনুভব করিতেছিলাম। রাত্রি কোনরূপে কাটিয়া গেল। পরদিন বেলা ৮টার সময় তৈল গায়ে মাখিয়া আমরা বুড়িগঙ্গায় স্নান করিতে গেলাম। সেইখানেই নৌকা করিয়া সুয়াপুর রওনা হইয়া যাইব, নৌকাতেই রান্না করিব, এই সংকল্প করিলাম। কিন্তু নদীর ঘাটে যাইয়া দেখিলাম, ঢাকা হইতে সুয়াপুরের ভাড়া ২৲ টাকা ২॥০, টাকার স্থলে ৩০৲।৪০৲ টাকা হইয়াছে। ভীত সন্ত্রস্ত বহু সহরবাসী নদীর ঘাটে হাজির হইয়াছে ও প্রাণ লইয়া পালাইতেছে; নৌকা আর পাওয়া যায় না; আমাদের মাথায় বজ্রাঘাত হইল। শেষে ঠিক করিলাম, ৩০৲।৪০৲ টাকা দিয়াই নৌকা ভাড়া করিব। এমন সময় বাহির হইতে বুড়িগঙ্গা বাহিয়া একখানি নৌকা আসিল, মাঝিরা সহরের এই উৎপাতের কথা জানিত না। আমরা সাগ্রহে সুয়াপুর যাইতে ভাড়া কত জিজ্ঞাসা করিলাম, তাহারা বলিল, ৩৲ টাকা। আর দরদস্তুর না করিয়া তখনই মেসের বাড়ীতে তালা লাগাইয়া সকলে একত্র নৌকায় উঠিয়া পড়িলাম। ইতিমধ্যে কোথা হইতে শ্যেণ পক্ষীর ন্যায় আমার ভগিনীপতি নবরায় মহাশয় আসিয়া উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "দীনেশ, আমি তোমাকে কিছুতেই বাড়ী যাইতে দিব না, চল আমাদের বাসায়। এবার তোমার পরীক্ষার বৎসর।" আমার বয়স তখন চৌদ্দ। কাঁদিতে কাঁদিতে নবরায়ের বাড়ীতে তাঁতিবাজার গেলাম; পথে বলিলাম "রায়জি আপনি কি জানেন না, আমি মাবাপের এক ছেলে?" তিনি তাঁহার দন্ত-

পংক্তি বাহির করিয়া উপেক্ষাভরে হাসিলেন। আমি ভাবিলাম "মরিবার সময় মায়ের কাছে শুইয়া মরিতে পারিব না, এই আমার অদৃষ্টের লেখা।" সেদিন যে কি ভাবে কাটিল, তাহা আর কি বলিব? একটা উৎকট দুঃস্বপ্নের মত দিনটা চলিয়া গেল। স্কুলে গেলাম, দেখিলাম সহপাঠীরা প্রায় সকলে পালাইয়া গিয়াছে, মাষ্টারবর্গও প্রায়ই অনুপস্থিত। রাস্তা দিয়া আসিতে পথে পথে কেবল 'হরিবোল,' কান্নার রোল, অনাথ ছেলে-মেয়েদের চীৎকার,—দোকান-পাট বন্ধ। "বলহরি" মিষ্ট কথাটা বুকের মধ্যে বজ্রনিনাদের মত বাজিতে লাগিল। সন্ধ্যায় মনে হইল সমস্ত সহরটি ঘিরিয়া ছায়ার মত কে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। মানুষ দেখিয়া ভুত বলিয়া ভয় হইতে লাগিল। রাত্রে আসিয়া বাসায় দেখিলাম কৈলাস বাবু চীৎ হইয়া পড়িয়া আছেন, তিনি 3rd yearএ পড়িতেন, নবরায়ের আত্মীয়। এখন তিনি ফরিদপুর জেলা কোর্টের উকীল-সরকার। নব-রায়ের ভৃত্য ডেঙ্গু ও দাসী বামা আমার ও কৈলাস বাবুর কাছে দুইটী পেয়ালা ভাঙ্গের সরবৎ লইয়া আসিল। কৈলাস বাবু এক পেয়ালা খাইলেন, নব রায় এক পেয়ালা পূর্ব্বেই খাইয়াছিলেন। আমি ব্রাহ্মের পুত্র, বলিলাম—"ভাঙ্গ বা কোন নেশা প্রাণান্তেও খাইব না। কলেরা হইলেও নয়।" বাহিরে এই বিক্রম দেখাইয়া মাঝের ঘরটায় একা শুইয়া পড়িলাম। তখন আমার ভগিনী সেখানে ছিল না। রাত্রি দুই প্রহরের সময় পাশের বাড়ীতে উৎকট "বলহরি" চীৎকারে আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। ভয়ে আমার ঘুম হয় নাই, একটু তন্দ্রা আসিয়াছিল মাত্র। আমি সেই তন্দ্রার মধ্যে স্পষ্ট দেখিতেছিলাম, নেংটি পরিয়া উৎকট শিবনেত্রে, মুণ্ডিত মস্তক দোলাইয়া একটা আঙ্গুল নির্দ্দেশ করিয়া গাঢ় কৃষ্ণ ছায়ার মত উমাপ্রসন্ন আসিয়া আমার পাশে দাঁড়াইয়াছে ও বলিতেছে, "দীনেশ. চল্ আমার সঙ্গে যাবি?"

নিদ্রা ভঙ্গের পর দেখিলাম, আমার সমস্ত শরীর হিমের মত ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছে, ভয়ে বাক্‌রোধ হইয়াছে, হাত পা নাড়িবার শক্তি নাই। প্রায় আধ ঘণ্টা পরে হাতে পায়ে একটু শক্তি হইলে আমি হামাগুড়ি দিয়া অতি কষ্টে নবরায়ের ঘরের দরজায় কড়া নাড়া দিয়া তাঁহাকে জাগাইলাম। তিনি আমার অবস্থা দেখিয়া ভীত হইলেন, এবং কৈলাস বাবুর ঘরে আমার থাক্‌বার ব্যবস্থা করিয়া দিয়া নিজে শুইয়া পড়িলেন। কৈলাসবাবু দেখিলেন—আমার হাত পা একবারে ঠাণ্ডা, আমার মুখে কথা বাহির হইতেছিল না,—জিভটা শুকাইয়া কাঠ হইয়াছে। তিনি লেপ মুড়ি দিয়া আমার হাতে পায়ে নিজের হাত পা ঘসিয়া গরম করিলেন। প্রভাত বায়ুর স্পর্শে আমি যেন নূতন জীবন পাইলাম। এবং সেই দিনই সুয়াপুর রওনা হইয়া গেলাম। বুড়িগঙ্গার হাওয়ার স্পর্শে আমার সমস্ত ভয় দূর হইল। পল্লীমায়ের অঞ্চলের বাতাস আমার গায়ে লাগিল।

সুয়াপুর আসিয়া ভয় দূর হইল,—খুব স্ফূর্ত্তির সঙ্গে কয়েক দিন কাটিল। পূজার কিছু পূর্ব্বে ঢাকার চিঠিতে জানিলাম, ঢাকায় কলেরার প্রকোপ কমিয়াছে। টেষ্ট পরীক্ষা নিকটবর্ত্তী, উহা তখন পূজার পূর্ব্বেই হইত। সুতরাং ঢাকায় ফিরিয়া আসিতে হইল—কিন্তু ঢাকায় আসিয়া কলেরার ভয় আবার আমায় পাইয়া বসিল, "হরিবোল" শব্দ রাস্তায় শুনিলেই চমকিয়া উঠিতাম,—পেটের ভিতর সর্ব্বদাই একটা অসোয়াস্তির ভাব অনুভব করিতাম এবং রোজ সন্ধ্যার পর শুইয়া মনে হইত, সেই রাত্রেই কলেরা রোগে মরিয়া যাইব। এই ভয়ে দিনরাত ঔষধ খাইতাম। সালফিউরিক এসিড ডিল পকেটেই থাকিত, শিশির ছিপি খুলিয়া ঔষধ পড়িয়া আমার অনেক আল্‌পাকা ও গরদের জামা জ্বলিয়া গিয়াছে। শুধু সালফিউরিক এসিড নয়, পিপারমেণ্ট, বিছমাউথ, ভুবনেশ্বর, ক্লোরোডাইন, স্পিরিট ক্যাম্ফার প্রভৃতি ঔষধ খাইয়া এমনই পেটের

অবস্থা দাঁড়াইয়াছিল যে প্রায়ই আমায় কোষ্ঠবদ্ধ হইয়া থাকিত। এইভাবে ২।৩ বৎসর ঢাকায় কাটাইয়া আমার শরীর একবারে মাটী করিয়া ফেলিয়াছিলাম। ভয়-জনিত মস্তিকের বিকার, স্নায়বীয় দুর্ব্বলতার দরুণ শিরঃপীড়া ও বাতঃব্যাধি শেষে আমার জীবনটাকে অকর্ম্মণ্য করিয়া ফেলিয়াছিল। ঢাকায় তখন জলের কল ছিল না, কুয়োর জল খাইতে হইত; তাহাতে গলাগণ্ড জন্মিত, এবং সেই জলের গুণে বার মাস কলেরা ঢাকায় লাগিয়াই থাকিত। ঢাকার নামে আমার সেই শৈশবের ত্রাস এখনও আছে। ছোট ছোট দুর্গন্ধ গলি; বৃষ্টি হইলে কলিকাতার গলিতে জল দাঁড়ায়, ঢাকায় সুরকী ও নানা আবর্জ্জনা পচিয়া একটা কাথের মত পদার্থ প্রস্তুত হয়, পদব্রজে চলিলে হাটু পর্য্যন্ত সেই কাথে লিপ্ত হয়। ঢাকায়ই আমার স্বাস্থ্য চিরদিনের জন্য হারাইয়া আসিয়াছি। এখন শুনিয়াছি জলের কল হওয়ায় কলেরা কমিয়াছে, কিন্তু অলি-গলির নরকে বোধ হয় যমরাজ তেমনই জোরে প্রভুত্ব করিতেছেন।

১৮৮১ সনের কলেরার মহামারীতে আমার অঙ্কের চর্চ্চা বেশী দূর অগ্রসর হয় নাই। এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় অঙ্কে তিন নম্বর কম হইয়াছিল, শুনিলাম, তদ্দরুণ ৩০ নম্বর অপরাপর বিষয় হইতে কাটা হইয়াছিল এবং এইজন্য আমি তৃতীয় শ্রেণীতে পাশ হইয়াছিলাম।

---

(১১)

সাহিত্য-সেবা, কৌতুক ও উৎসব

আমার সাহিত্য-জীবন অতি শৈশবেই আরব্ধ হইয়াছিল। যখন আমার ৭ বৎসর বয়স, তখন আমি পয়ার ছন্দে সরস্বতীর এক স্তব লিখিয়াছিলাম। তৎপর কত যে কবিতা লিখিয়াছি, তাহার ইয়ত্তা ছিল না। ক্লাসে ভাল ছাত্র না হইলেও পাঠ্যপুস্তক ছাড়া বাহিরের সাহিত্য-চর্চ্চায় আমার সমকক্ষ কেহ ছিল না। আমাদের সুয়াপুর গ্রামের নিকটবর্ত্তী নায়ার গ্রাম হইতে কৈবর্ত্ত-জমিদার অম্বিকাবাবু "ভারত-সুহৃদ্" নামক একখানি মাসিক পত্রিকা বাহির করেন। আমার যখন ১০ বৎসর বয়স, তখন সেই পত্রিকায় "জলদ" নামক এক কবিতা লিখিয়া পাঠাই। তাহাতে যাহা যাহা লেখা ছিল তাহার মর্ম্ম এই:—হে মেঘ, তুমি একটুকু কালের জন্য বায়ুর কৃপায় উঁচু জায়গায় উঠিয়াছ বলিয়া এত স্পর্দ্ধা করিয়া যণ্ডের ন্যায় চীৎকার করিতেছ কেন? পরের কৃপার উপর নির্ভর করিও না। যে বায়ু খেলার পুতুলের মত তোমায় কিছুকালের জন্য উঁচু জায়গায় ধরিয়া তুলিয়াছে, সেই বায়ুই তাহার খেয়াল ছাড়িয়া গেলে তোমাকে ঘাড় ধরিয়া মাটীতে নামাইয়া দিবে, সুতরাং পরের আশ্রয়ে এতটা স্পর্দ্ধা ভাল নহে।"

দশ বৎসর বয়সের পক্ষে এ লেখাটা নিতান্ত মন্দ হয় নাই। এই দশ বৎসর বয়সে মাইনর স্কুলের তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ার সময় আমি বাজে বই অনেক পড়িয়া ফেলিয়াছিলাম। বঙ্কিমবাবুর উপন্যাস, হেমবাবুর কবিতাবলী, নবীন সেনের অবসর-রঞ্জিনী প্রভৃতি পুস্তকে আমি

কৃতবিদ্য হইয়াছিলাম! আমার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় ছিল স্বর্গীয় দীনেশ-চরণ বসু মহাশয়ের "কবিকাহিনী"—দীনেশবসু মহাশয় তখন ঢাকা জেলার খ্যাতনামা কবি ছিলেন। বঙ্গদর্শনে বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিয়া তাঁহার কবিতার সুখ্যাতি করিয়াছিলেন। দীনেশ বসু কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয়ের অন্তরঙ্গ সুহৃদ্ ছিলেন এবং উক্ত সাহিত্য-রথীর সম্পাদিত বান্ধব পত্রিকার একজন বিশিষ্ট লেখক ছিলেন। মাইনর স্কুলের তৃতীয় শ্রেণীতে উঠিবার সময় ক্লাসে প্রথম হওয়ায় আমি দীনেশ বসু মহাশয়ের "কবি-কাহিনী" এবং স্যার ওয়াল্টার স্কটের "গ্র্যাণ্ড ফাদারস্ টেল্‌স" এই দুই বই প্রাইজ পাইয়াছিলাম। এই বই দুই খানি দশ বৎসর বয়সে আমি ভাল করিয়া পড়িয়াছিলাম। কবিকাহিনী বেশ বড় কবিতার পুস্তক, ইহার প্রত্যেকটি কবিতা আমার মুখস্থ ছিল। তাহা ছাড়া রামায়ণ-মহাভারত ত আমার জিহ্বাগ্রে ছিল।

ভারত সুহৃদে 'জলদ' কবিতা ছাপা হইলে আমি যশের মুকুট মাথায় পরিয়া যেরূপ গৌরব বোধ করিয়াছিলাম—তাহা বলিবার নহে। ভারত-সুহৃদের সেই সংখ্যাটী দুই বৎসর পর্য্যন্ত আমার পকেটে পকেটে ঘুরিত। পকেট হইতে পত্রিকার একটা অংশ আমি ইচ্ছাক্রমে বাহির করিয়া রাখিতাম—উহার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্য। যাহার সঙ্গে দেখা হইয়াছে তাহারই দৃষ্টি যে প্রকারে উহাতে পড়িতে পারে, তাহার চেষ্টা করিয়াছি। এবং যখন কোন ভদ্রলোক আমার নীরব আগ্রহে প্রদত্ত পত্রিকাখানি হাতে লইয়া পাতা উল্টাইয়া শেষে আমার কবিতাটীর নিকট পৌঁছিতেন, এবং আমার নাম দেখিয়া "একি? এটা কি তুই লিখিয়াছিস্?" বলিয়া সাগ্রহে পড়িতে সুরু করিয়া দিতেন—তখন আমি গৌরবে আকাশে যেন মাথা ঠেকাইয়া চুপ করিয়া স্বমহিমায় স্বপ্নাবিষ্টের ন্যায় বসিয়া থাকিতাম।

ইহার পর বিস্তর কবিতা লিখিয়াছি; নিঝুম রাত্রে দিদি মুক্তা-লতাবলী পড়িয়া শুনাইতেন। মুক্তা না দেওয়াতে ক্রুদ্ধ কৃষ্ণ মায়াপুরী নির্ম্মাণ করিয়া বিরহী রাধার স্পর্দ্ধা ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলেন। স্বর্ণবেত্র হস্তে রাধার অপেক্ষা রূপলাবণ্যশীলা রাজকুমারীরা নিথর রাত্রিতে তাঁহাকে গঞ্জনা ও ঠাট্টা করিয়া অনুতাপ বাড়াইয়া দিয়া-ছিলেন। সেগুলি দিদি এমনই করুণকণ্ঠে সুর করিয়া পড়িতেন, যেন আমার চক্ষে ছবির পর ছবি ফুটিয়া উঠিত। রাধার দুঃখে শিশুহৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইত। সেই স্মৃতি হইতে ৪২ বৎসর পরে আমি গত বৎসর "মুক্তাচুরি" বহি লিখিয়াছিলাম।

তারপর মাইনর ক্লাসে উঠিয়া আমি বাইরণের "চাইল্ড হেরল্ড ও 'ডন জুয়ান' প্রভৃতি পাঠ করি। সকলাংশ না বুঝিলেও যেটুকু বুঝিতাম, তাহাতে আমার কল্পনা আমাকে অনেক দূর লইয়া যাইত। আমি খাতার পর খাতা পূর্ণ করিয়া কবিতা লিখিয়া তৃপ্তি বোধ করিতাম। আমার মনের উপর যে পুলকের বোঝা চাপিয়া থাকিত, তাহা কবিতা রচনা করিয়া নাবাইতে পারিলে যেন আরাম অনুভব করিতাম।

দশ বৎসর বয়সে অবিনাশ এবং আমি একদা আমাদের বাড়ীর ধারে চড়ক-উৎসবের খোলা মাঠটায় দাঁড়াইয়া—জীবনে কে কি করিব তাহাই আলোচনা করিতেছিলাম। অবিনাশ বলিল "আমি জমিদার হইব, শত শত লোক আমার পাছে পাছে ছুটিবে, আমরা এককালে বড় জমিদার ছিলাম, আমি সেই নষ্ট প্রতিষ্ঠার উদ্ধার করিব।" আমি বলিলাম—"আমি কবি বা গ্রন্থকার হইব, কুঁড়ে ঘরেও যদি থাকি, তবে সেই কুঁড়ে ঘরের নিকট যাবতীয় জ্ঞানী ব্যক্তি মাথা নোওয়াইবেন।" তাহার পর প্রায় ৪২ বৎসর চলিয়া গিয়াছে। অবিনাশ হেমনগরের

(ময়মনসিংহ জেলার) জমিদারের নায়েব হইয়াছে! সে কি, এ কেন করিয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। হেমনগরের জমিদারের আয় বাৎসরিক ৪ চারি লক্ষ টাকা। অবশ্য শত শত লোক নায়েব মহাশয়ের পাছে পাছে ঘোরে, এবং যখন জমিদারের প্রতিনিধি হইয়া সে মফঃস্বলে যায়—তখন প্রজাদের নিকট রাজ-সম্মান পাইয়া থাকে।

অবিনাশের সঙ্গে সে দিনও দেখা হইয়াছিল—আমাদের দশ বৎসর বয়সের সে কথা গুলি তাহার বেশ মনে আছে—সে তাহা উল্লেখ করিল।

যদিচ জীবনের নানা পথ অভীপ্সিত মত হয় নাই,—কিন্তু যাহা শিশুকালে ভাবিতাম—এই বৃদ্ধ বয়সেও সেই মূল লক্ষ্য অবলম্বন করিয়া চলিয়া আসিয়াছি। এণ্ট্রান্স পরীক্ষা দেওয়ার পর আমি মনে করিয়াছিলাম, আমি কেন হইলে বাগ্মিতা শিখিব। এই জন্য দাশোড়ার খালের পাড়ে সন্ধ্যাকালে একা একা বেড়াইতাম ও ইংরাজীতে বক্তৃতা দেওয়ার চেষ্টা করিতাম; নিজেকে ডিমসথেনিসের স্থলে অভিষিক্ত করিয়া হস্তের ভঙ্গী ও কণ্ঠস্বরের কায়দা অভ্যাস করিতাম। যখন সেকেণ্ড-ইয়ার ক্লাসে পড়ি তখন একটা নোটবুকে এই মর্ম্মে লিখিয়াছিলাম—"বাঙ্গালার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি হইব, যদি না পারি তবে ঐতিহাসিক হইব। যদি কবি হওয়া প্রতিভায় না কুলোয়, তবে ঐতিহাসিকের পরিশ্রম-লব্ধ প্রতিষ্ঠা হইতে আমায় বঞ্চিত করে, কার সাধ্য?"

জীবনের একটা ধারা কৈশোর হইতে এক ভাবেই চলিয়া আসিয়াছিল। কাব্যানুরাগ দিদি দিগম্বরী দেবী আমায় দান করিয়াছিলেন, তিনি যখন বৈষ্ণবপদ মৃদু স্বরে গাইতে থাকিতেন, তখন আমার মনে যে আনন্দ হইত, তাহা শুধু অশ্রুজলপ্লাবিত হইয়া ভাসিয়া যাইত না, তাহা আমার কল্পনার ঘরে আরতির ঘিয়ের বাতি জ্বালাইয়া

দিত। তাঁহার কণ্ঠের সেই মধুর "রজনী শাঙন ঘন, ঘন দেওয়া গরজন, রিমি ঝিমি শবদে বরিষে" গান আমার চক্ষে বর্ষাকে এক নূতন সজ্জায় সাজাইয়া উপস্থিত করিত।

আমি আমার মাতুলালয়ে এক প্রকোষ্ঠে বহু কাগজ পত্র বিছানায় স্তূপীকৃত করিয়া কবিতা লিখিতে থাকিতাম। হীরালালকে পড়িয়া শুনাইতাম, কিন্তু আমার প্রধান ভক্ত ও শ্রোতা ছিল আমার মাসতুত ভাই দুইটি—গিরীশচন্দ্র ও হেমচন্দ্র। আমি যাহা লিখিতাম তাহাই তাহারা অবাক্ হইয়া শুনিত; কিন্তু আমার অনুকরণ করিতে চেষ্টা করিত, আমার অপর এক মামাত ভাই ইন্দ্রমোহন। সেও আমার মত কাগজপত্র ছড়াইয়া হাঁসের পাখার কলম ধরিয়া কবিতা লিখিবার জন্য শুভ-মুহূর্ত্তের প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকিত। সে হংস-পুচ্ছটি মাঝে মাঝে দাঁতে কামড়াইত এবং এই সকল প্রক্রিয়ার দ্বারা কবিতার ভাবকে ঘনীভূত ও সচেষ্ট করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিত। বাড়ীর অপরাপর ছেলেরা তাহার প্রকোষ্ঠের জানালায় উঁকি মারিয়া তাহার এই সকল ভাব লক্ষ্য করিয়া চাপা হাসিতে পেট ফাটিয়া মরিবার দাখিল হইত। কারণ সে টের পাইলে রক্ষা ছিল ছিল না। আমার মাতুলেরা আমায় বলিতেন, "তুই ইন্দ্রমোহনের মাথাটা একবার খেয়ে ফেল্লি।" আমার যে কি অপরাধ তাহা আমি কিছুই বুঝিতাম না।

ইন্দ্রমোহনের কবিতার পদ প্রায় খোঁড়া হইয়া যাইত, অর্থাৎ হয়ত চোদ্দ অক্ষর হইত না, তা না হইলে শেষের অক্ষরের সঙ্গে উপরকার ছত্রের শেষাক্ষরের মিল অদ্ভুত রকমের হইত। সে একটিও বিমুগ্ধ শ্রোতা পাইত না এবং তাহার কবিতা শুনিলে সকলেই হাসিত। তাঁহার পিতা—আমার বড় মাতুল—আনন্দমোহন সেন, উন্মাদ ছিলেন, সুতরাং তাহারও মাথার কোন জায়গার একটি কল জন্ম হইতেই বিগড়ানো ছিল। ইহার মধ্যে

একদিন তাহার সামান্য সর্দ্দি জ্বর হইল। অমৃত কবিরাজ মহাশয় তাহাকে সাতটা মহালক্ষ্মী-বিলাসের বড়ি দিয়া বলিলেন,—"একটি খেয়ে ফেল, যদি জ্বর না ছাড়ে তবে আর একটা খেও।" ইন্দ্রমোহন ঔষধ খাওয়ার জন্য স্থির-প্রতিজ্ঞ হইয়া একটা তাকিয়া ঠেস্ দিয়া বসিয়া প্রথমত একটি বড়ি খাইল, এবং দশ মিনিটের পর নিজের নাড়ী টিপিয়া কি বুঝিল সেই জানে,—তাব পরে আর একটা বড়ি খাইল এবং মিনিট পনের পরে আর একটা খাইল। এইরূপে দুই তিন ঘণ্টার মধ্যে সে সাতটা বড়ি শেষ করিয়া ফেলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। তাহার কনিষ্ঠা ভগিনী এই কাণ্ডটা দেখিয়াছিল -সে তাহার মাতাকে জানাইল; মাতা ঘুরিয়া কবিরাজ মহাশয়ের বাড়ীতে গেলেন। তিনি বলিলেন, "আজ সারা রাত্রি উহাকে পুকুরে স্নান করাও, দুই তিনটা লোক যেন ধরিয়া রাখে ও অবিরত মাথায় জল ঢালিতে থাকে,—তাহা হইলে বাঁচিলেও বাঁচিতে পারে,—কিন্তু অন্য যদি কিছু হয়, তবে আমি আর কি করিব?" সেইরূপ করা হইল, তাহার জীবন রক্ষা হইল—কিন্তু সে একাবারে উন্মত্ত হইয়া সকলকে মার ধর করা সুরু করিয়া দিল—এতদবস্থায় তাহাকে পাগলা-গারদে পাঠান হইল এবং ২৩।২৪বৎসর বয়সে সেই গারদেই তাহার মৃত্যু হইল।

আমার প্রথম কবিতা-রাজ্যের শিষ্যটির উপর মাতা সরস্বতী এই বর দিয়াছিলেন। ক্লাসে এবং পরীক্ষার ফল সম্পর্কে আমার খ্যাতি যেরূপই থাকুক্, ঢাকা ছাত্রসমাজে শীঘ্র সকলে জানিত পারিল—আমি ইংরেজী কবিতা ও বৈষ্ণব-পদ ইত্যাদি এত পড়িয়া ফেলিয়াছি, যে কেহই আমার সঙ্গে এই সকল বিষয়ে আঁটিয়া উঠিতে পারিত না। ফার্ষ্ট ইয়ার হইতে সেকেণ্ড ইয়ারে আমি ঢাকা কলেজে ইংরেজী-সাহিত্যে প্রথম হইলাম,এবং তার পর যে সকল সাহিত্যিক সমিতি হইত, তাহাতে আমি সেক্সপীয়র

ও মিল্টন প্রভৃতির বিদ্যা দেখাইয়া সকলকে চমৎকৃত করিয়া দিতাম। কিন্তু অন্যান্য বিষয়ে আমি এতটা কাঁচা রহিয়া গেলাম, যে আমি যে পরীক্ষা পাশ করিতে পারিব, তাহা কাহারও বিশ্বাস ছিল না।

বাড়ীতে বাজে বই পড়া এবং কবিতা লেখা চলিতে লাগিল! আমাদিগকে ফারশী শিখাইবার জন্য আমার মাতুল চন্দ্রমোহন সেন একজন মৌলভি রাখিয়া দিয়াছিলেন। সারাদিন স্কুলে থাকিয়া এবং নানারূপ সাহিত্য-সমিতিতে প্রবন্ধ পাঠ ও কবিতার আলোচনা করিয়া বাড়ীতে আসিয়া একটু মনের মত আনন্দে কাটাইব, তখন আসিয়া দেখি লম্বা লম্বা সাদা দাড়ী দোলাইয়া ফারশী পড়াইবার জন্য মৌলভি সাহেব বসিয়া আছেন.—বড়ই বিরক্তি বোধ হইত। এক মাস দুই মাস ফারশী পড়ার পর দেশে মাতুলালয় বগজুরী গ্রামে গেলে মাতামহ বলিলেন, "নিয়ে আয় বই, তোরা ফারশী কি শিখিয়াছিস্ দেখ্‌ব।" সশঙ্ক অবস্থায় হীরালালকে অগ্রে করিয়া আমি যাইলাম, কারণ হীরালাল ছিল তাঁর খুব প্রিয়, ঝড়ঝাপ্‌টা যা আশঙ্কা করিয়াছিলাম—তা হীরালালের উপর দিয়া মন্দীভূত অত্যাচারে নিঃশেষ হইয়া যাইবে, এবং আমি তাহার আড়ালে থেকে নিজে ত্রাণ পাইব। এই ভাবে তাঁর কাছে গেলে তিনি প্রথমত বলিলেন, "পড়"। হীরালাল পড়িতে সুরু করিল "আলেফ্‌ জবর আ, আলেফ জের এ, আলেফ পেষ ও"—অমনই মাতামহ রাগিয়া বলিলেন, "একি হইতেছে? এ উচ্চারণ ত কিছুই হইতেছে না।"—এই বলিয়া গলার মধ্যে খাদ্যদ্রব্য আটকাইয়া গেলে কিম্বা তালিসাদি চূর্ণ খাওয়ার পর কাশি-গ্রস্ত রোগীর গলায় যেরূপ আওয়াজ হয়, সেইরূপ একটা বিকটধ্বনি পূর্ব্বক —সেই কণ্ঠধ্বনিকে সুর করিয়া তালব্য ধ্বনিতে পরিণত করিয়া তিনি এমনইভাবে পড়িতে লাগিলেন যে মৌলভির সাধ্যি কি তাঁর কাছে এগোয়! ফারশী খুব ভাল জানেন বলিয়া তার একটা খ্যাতি ছিল,—

সেই পাণ্ডিত্য-মূলক খ্যাতি আমাদের নিকট বিশেষরূপ প্রতিপন্ন করিবার জন্য তিনি যে গলা দিয়া কতরূপ আওয়াজ বাহির করিতে লাগিলেন, তাহা কি বলিব। কেহ যদি একটা ঢাকের চামড়া দিয়া হারমনিয়াম তৈরী করে এবং মধ্যে চরকা ঘুরণের শব্দ করে—তবে বোধ হয় সেইরূপ একটা অদ্ভুত সুরের কতকটা নকল হয়। কিন্তু ঐ অপূর্ব্ব আবৃত্তি শোনাই আমাদের চূড়ান্ত বিপদ নয়, যদিও হাসি চাপিয়া রাখিতে আমাদের প্রাণান্ত হইতেছিল। ইহার পরে তিনি হীরালালকে সেই সুর নকল করিয়া "আলেফ্ জবর আ" প্রভৃতি আবৃত্তি করিতে বলিলেন। হীরালাল যতই চেষ্টা করিতে লাগিল, ততই তাঁর রাগ বাড়িয়া চলিল; কারণ বুঝিলাম তরুণকণ্ঠে ফারশীর আবৃত্তি হইতেই পারে না। যদি আমার মাতামহ মুন্সী মহাশয়ের সাধা গলার আওয়াজটাই ঠিক হইয়া থাকে—হীরালালের মীহি সুর কি করিয়া সেই উদাত্ত স্বরের নকল করিবে? যদি কেহ তাহার কণ্ঠ সজোরে চাপিয়া ধরিত—তবু না হয় কিছু হইতে পারিত। দুইতিনবার ব্যর্থ প্রয়াসের পর—মুন্সী মহাশয় তাঁহার চটি হাতে লইলেন। চটী জোড়ার দাম বেয়াল্লিশ টাকা, তার মধ্যে অনেক জড়োয়া কাজ ও পাথর ছিল। সেই চটীর কয়েক ঘা হীরালালের পিঠে পড়িল। আমার বয়স তখন ১৫, হীরালালকে প্রহার করিতে যাইয়া তিনিএক একবার আরক্ত নয়নে আমার প্রতি অপাঙ্গ দৃষ্টি করিতে লাগিলেন। আমি বিপদ দেখিয়া দে ছুট্। হীরালালও এক লাফে তাঁহার সম্মুখ হইতে পালাইয়া গেল। প্রহার ত কিছুই নয়, কারণ সেরূপ কোমল চটীর আঘাত, উহা ত একরূপ সুখ, এবং যিনি আঘাত করিতেছিলেন, তাঁহার বয়স তখন ৮৫, তাঁহার লোল চর্ম্ম ও জীর্ণ দেহে বা কতটা বল থাকিবে, যে তিনি আমাদের মত স্ফূর্ত্তিমান,—তরুণদিগকে ঘাল করিবেন? কিন্তু মার ধর যাহাই হউক—অপমান ত বটে। আমাদের সমস্ত রাগ হইল মৌলভী বেচারীর উপর।

৺ গোকুল কৃষ্ণ মুন্সী।

ইহার পরে ঢাকায় যাইয়া তাঁহাকে যেরূপ নাকাল করিয়া তাড়াইয়া দিয়াছিলাম, তাহাতে মৌলভী সাহেব নিজের নাক কান নিজে মোচড়াইয়া "বিসমিল্লা" বলিয়া 'এরূপ ছাত্র প্রাণ গেলেও আর পড়াইবেন না'—ইহা শপথ করিয়া আমাদিগকে ছাড়িয়া গেলেন। হাড় জুড়াইল,—কিন্তু মনে হয়, তখন যদি ফারশী পড়িতাম—তবে শেষে কাজ দেখিত। বাড়ীতে যখন ফিরিয়া আসিলাম, তখন মুন্সী মহাশয় রৌপ্য পিকদানিটা সামনে করিয়া বসিয়া কাশিতে কাশিতে আমাদিগকে অনেক গালমন্দ দিলেন, এবং ফারশীর মত যে এমন আশ্চর্য্য জিনিষ জগতে কোথাও নাই তাহা বুঝাইতে যাইয়া নানা ভঙ্গীতে উচ্চারণ করিয়া হাফেজ হইতে

"মর খোর্ মোসাহেফ বসোজ আতস অন্দর কাবাজান,
সাকিনে বুৎখানা বস্ মর্দ্দম আজারি মকুন।" * প্রভৃতি শ্লোক আবৃত্তি করিয়া অর্থ বুঝাইতে লাগিলেন।

ঢাকার বাসায় আমাদের পড়িবার আড্ডাটা কম জম্‌কালো ছিল না। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের আমরা যেরূপ চর্চ্চা করিয়াছি, সে কালের ছাত্রদের মধ্যে কেউ সেরূপ করে নাই। প্যারাডাইস লষ্টের অনেকগুলি ক্যাণ্টো তো আমাদের একবারে মুখস্থ ছিল। আমার মাসতুত ভাই জগদীশ বাবু ছিলেন—এ সকল বিষয়ে আমাদের দলের নেতা। তিনি আমার মত বাহিরের বই তত পড়েন নাই সত্য, কিন্তু যে সকল বই তিনি ক্লাসে পড়িয়াছিলেন, তাহা কমা, সেমিকোলেন শুদ্ধ তাঁহার মুখস্থ ছিল। তিনি উত্তর কালে অর্থাৎ ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে এম, এ

* মদ খাও, কোরাণ পুড়িয়ে ফেল, কাবামন্দিরে আগুণ জ্বালাইয়া দাও, যেখানে পৌত্তলিকগণ থাকে, সেইখানে বাস কর, কিন্তু মনুষ্যের অন্তঃকরণে কষ্ট দিও না।

পরীক্ষায় ইংরাজীতে প্রথম হইয়া স্বর্ণপদক লাভ করেন। সংস্কৃতেও তিনি প্রথম হইতে পারিতেন, তাহার সে বিষয়েও এতটা দখল ছিল। তিনি যখন দিনাজপুর এনট্রান্স স্কুলে চতুর্থ শ্রেণীতে পড়িতেন—তখন আমি মাণিকগঞ্জ মাইনর স্কুলে চতুর্থ শ্রেণীতে পড়িতাম। সেই সময় তিনি অভিধান খুঁজিয়া শব্দ চয়নপূর্ব্বক নানারূপ ফ্রেজ লাগাইয়া চারি পৃষ্ঠার এক ইংরাজি চিঠি আমাকে লিখেন। আমি বহু চেষ্টা করিয়া তাহার এক বর্ণও বুঝিতে পারি নাই। মা জিজ্ঞাসা করিলেন "জগদীশ কি লিখিয়াছে?" আমি ত শুধু—"জগদীশ চন্দ্র সেন" ও "মাইডিয়ার দীনেশ" এই দুটী কথা বুঝিতে পারিয়াছিলাম। মার প্রশ্নে মুখ কাচু মাচু করিয়া বলিলাম—"লিখিছে, ভাল আছে।" মা বলিলেন "এত লম্বা চিঠিতে কি "কেবল আমি ভাল আছি, এইটুকু লিখিয়াছে?" আমি বলিলাম, "উহাতে আমাদের পড়াশুনাও বইএর কথা আছে—তুমি বুঝিবে না।"

জগদীশ দাদা ভবভূতির "স্থানে স্থানে মুখরককুভো ঝাঙ্কতৈর্নিঝরাণাং" এবং "কিমপি কিমপি মন্দং মন্দমাসত্তিযোগাৎ" প্রভৃতি যখন পড়িতেন, তখন আমাদের মনোবীণার তার সবগুলি যেন তাঁহার আবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে বাজিয়া উঠিত। শকুন্তলা তো—তাহার ছিল জিহ্বাগ্রে—"গচ্ছতি পুরঃশরীরং ধাবতি পশ্চাদ্‌সংস্থিতং চেতঃ" প্রভৃতি শ্লোক আওড়াইয়া তিনি এমনই একটা ভাবের আবেশ দেখাইতেন যে, শ্লোকগুলি তাঁহার আবৃত্তি শুনিয়াই আমাদের মুখস্থ হইয়া গিয়াছিল। আবার অঙ্ক কষিবার সময় গুন্ গুন্ করিয়া গাইতেন "মুখরমধুরং ত্যজ মঞ্জীরং।" সমস্ত "গীতগোবিন্দ" খানি তাঁহার মুখস্থ ছিল। আমরা ত কথায় কথায় "Takes away the rose from love's fore head and sets a blister there," কিম্বা "All hopes

abondon ye who enter here" প্রভৃতি সেক্সপীয়র এবং ডান্টের পদ দিন রাত কথায় কথায় উদ্ধৃত করিতাম। সেক্সপীয়রের হ্যামলেট, ম্যাকবেথ, ওথেলো, কিংলিয়ার—এই চারিখানি নাটক আমার প্রায় আগাগোড়া মুখস্থ ছিল। ইহা ছাড়া বেন জনসন্, মরলি, জন ওয়েব-ষ্টার, ফিলিপ মেছেঞ্জার, ফোর্ড প্রভৃতি এলিজাবেথীয় যুগের নাট্যকারদের সঙ্গেও বিশেষরূপ পরিচিত হইয়াছিলাম। আমাদের কলেজে সাহিত্য-সভায় এবং ছাত্রমণ্ডলীর মধ্যে দাঁড়াইয়া যখন আমি হলিনসিয়ডের ক্রনিকল এবং মারলোর Edward II. এর নিকট সেক্সপীয়র কত খানি দায়ী তাহা বুঝাইতাম, তখন আমি ক্লাসে ভাল ছেলে না হইলেও আমার প্রতি সহপাঠীদের বিশেষ শ্রদ্ধা জন্মিত, তাহাতে সন্দেহ নাই। দিন রাত্রি ইংরাজি কবিতা পড়িতাম। চ্যাটারটনের "Death of Charles Badwin হইতে আরম্ভ করিয়া টেনিসন ও ব্রাউনিং পর্য্যন্ত আমি কিছু বাদ দেই নাই। ভিক্টর হিউগো হইতে আরম্ভ করিয়া ডাউডনের "Shakespeare's mind and art" প্রভৃতি সেক্সপীয়র-সংক্রান্ত সমস্ত সাহিত্য আমাদের নখাগ্রে ছিল। আমি যখন সেকেণ্ড ইয়ারে পড়ি, তখনই টেইন্ দুই তিন বার পড়িয়া ফেলাইয়া ছিলাম, এবং তাঁহারই মত—অথচ প্রাচ্য আলোর নূতন রেখাপাতে উজ্জ্বল করিয়া একখানি ইংরাজী সাহিত্যের ইতিহাস লিখিব, একদা এই সঙ্কল্প করিয়া নোট সংগ্রহ করিতেছিলাম। এই সময়ে আমার এক অভিন্ন হৃদয় সুহৃদ্ জুটিল, তিনি জগদীশ দাদার ও প্রিয়তম বন্ধু হইয়া পড়িলেন—তাঁহার নাম রামদয়াল মজুমদার। ঢাকা কলেজে তখন অধ্যাপক ছিলেন—নীলকণ্ঠ মজুমদার এম, এ, পি, আর, এস্। তিনি আমাদিগকে কবিতা পড়াইতেন। আমার এত কবিতা পড়া ছিল, যে ক্লাসে আমি তাঁহাকে কতবার শুধু বিস্ময়াবিষ্ট নহে, একটু বিরক্ত ও

করিয়াছি। তিনি মনে ভাবিতেন আমি তাঁহাকে উপেক্ষা করি, এজন্য এক দিন বলিয়াছিলেন—"your litlle head is full of conceit, তোমার "ছোট্ট মাথাটি অহমিকায় পূর্ণ," এ বলা সত্ত্বেও কিন্তু কবিতার পরীক্ষায় তিনি আমাকে প্রায়ই প্রথম করিতেন। নীলকণ্ঠবাবু ছিলেন স্থূলদেহ, ধীর-গম্ভীর প্রকৃতি, চোখে কালো চসমা পরিতেন। তাঁহার ছোট ভাই রামদয়াল Uberbeg's 'History of Philosoph'y হাতে করিয়া একদিন পাটুয়াটুলী দীনবন্ধুর কাগজের দোকানের সামনে হাসিয়া হাসিয়া নিজে যাচিয়া আমার সহিত আলাপ করিল। তদবধি দিন নাই, রাত নাই—আমরা একত্র থাকিতাম। আমার মাসীমা—জগদীশবাবুর মাকে—রামদয়াল মা বলিয়া ডাকিত, এবং আমাদের পরিবারের সেও একজন হইয়া পড়িয়াছিল। ইংরাজী-সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনায় আমরা এতটা উন্মত্ত হইয়া যাইতাম যে রাত্রি ১টা পর্য্যন্ত কখন কখনও বুড়িগঙ্গার পাড়ে ঘুরিয়া ঘুরিয়া একবার উত্তর হইতে দক্ষিণে আর বার দক্ষিণ হইতে উত্তরে উত্তেজিতভাবে কথা বলিতে বলিতে বিচরণ করিতাম। ফরাসী লেখক ইউজুন সুর "The Wandering Jew"এর দাদার বাকের চরিত্র লইয়া আমাদের মধ্যে কত তর্কবিতর্ক গিয়াছে,—ননপ্লেটকে ভালবাসিয়া শুইনিতির ভাল করিয়াছিলেন কিমন্দ করিয়াছিলেন, শিলারের "দি রবারসে'র দস্যু-চরিত্র কি পাঠককে উন্নত করে অথবা নীচু করে, ইত্যাদি কত রকম আলোচনা যে আমাদের মধ্যে হইত তাহার ঠিক নাই, তখন আমরা সাহিত্যকে যেরূপ প্রাণের বস্তু বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলাম—এখনকার ছেলেরা তাহার সিকি অংশও করে কিনা সন্দেহ—এখন বঙ্গীয় যুবকের রঙ্গমঞ্চ হচ্ছে কার্য্যক্ষেত্র,—কর্ম্ম-জীবনের বিরাট আদর্শ তাদের সামনে। আমাদের সময়ে সাহিত্য-চর্চ্চাই সেই স্থান লইয়াছিল।

গ্রন্থকারের ভগিনী ময়মমী দেবীর নিকট বাং ১২৮৯ সনের ২৯শে পৌষ তারিখে পিতা ঈশ্বরচন্দ্র সেনের স্বহস্ত লিখিত পত্র হইতে উদ্ধৃত হইল, ইহাতে গ্রন্থকারের প্রবেশিকা পাশের কথা আছে।

আমি যখন প্রথমবার্ষিক শ্রেণীতে পড়ি, তখন অক্ষয় সরকারের নবজীবন প্রথম প্রকাশিত হয়। সে বোধ হয় ১৮৮৩ সন হইবে, তখন আমার বয়স ১৫। সেই বৎসরই আমার একটা কবিতা--- "পূজার কুসুম"—নবজীবনে প্রকাশিত হয়। তখন নীলকণ্ঠবাবু নবজীবনে লিখিতেন। ঢাকার এক পঞ্চদশবর্ষীয় বালক এরূপ প্রতিষ্ঠাপন্ন পত্রিকায় লিখিতেছে—দেখিয়া তিনি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন। কিন্তু ঢাকা কলেজে পড়ার সময় আমি এত কবিতা লিখিয়াছি এবং তাহার গোড়া এত লোক ছিল—যে আমার অতিরঞ্জিত ভাবীসাফল্য সম্বন্ধে আমার ভাই গিরীশ ও হেম যেরূপ স্বপ্ন দেখিত, দয়াল ও সহাধ্যায়িগণের অনেকেই উহা সেইরূপ বিশ্বাস করিত। ইতি মধ্যে রামদয়ালকে আমি উস্কাইয়া তাহার এক কবিতা পুস্তক "সখিনা" প্রকাশিত করাইয়াছিলাম। কারাবালা ক্ষেত্রের বর্ণনাটি বড় সুন্দর হইয়াছিল। সখিনা বাঙ্গালী-ঘরের মৃদু-স্বভাবাপন্ন লাজুক মেয়েটির মত চিত্রিত হইয়াছিল এবং কাশিমের সঙ্গে তার প্রেম - ঈষৎ বিকশিত কুন্দ কোরকের ন্যায় অন্তর্নিহিত সুবাস লইয়া যেন আত্মপ্রকাশ করিতে লজ্জা বোধ করিতেছিল। "সখিনা" এখন সব ফুরাইয়া গিয়াছে। রামদয়ালকে সেদিন ও জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, সে বলিল তাহার কাছে ও এক খানি নাই।

আমি ইংরাজি সাহিত্যের যে ইতিহাস লিখিবার পরিকল্পনা করিতেছিলাম, তাহা এই জন্য যে বিলাতী আদর্শটার প্রাচ্য আদর্শের দ্বারা তুলনা-মূলক বিচার আবশ্যক। সাহেবেরা আসিয়া তো সংস্কৃত ও প্রাকৃত সাহিত্য সম্বন্ধে আমাদের বিচার মাথা পাতিয়া নেন না। তাঁহারা বুঝুন আর না বুঝুন, খুব স্পর্দ্ধার সঙ্গে আমাদের বড় বড় কবিদিগের টিকি ধরিয়া নাড়া দিতে ছাড়েন না, এমন কি কবিগুরু

বাল্মীকির কথা লইয়াও কত অহমিকা পূর্ণ আলোচনা করেন; বিলাতি মাপকাটি লইয়া আসিয়া আমাদের ঘরের ঠাকুরদের প্রতি অবজ্ঞাপূর্ণ মন্তব্য প্রকাশ করেন। চৈতন্যকে পাগল বলিয়া সাব্যস্ত করেন—আমাদের বিরাট অলাঙ্কার শাস্ত্রের রীতি ও নীতির আদর্শ আয়ত্ত করিয়া বুঝিবার যোগ্য তাঁহাদের মাথাই বা কোথায়, অবসরই বা কোথায়?—যা, তা, সমালোচনা করেন এবং তাহাই আমরা বেদ-কোরাণ বলিয়া মানিয়া লই। কিন্তু তাঁহারা যখন সেক্ষপীয়র ও মিল্টনের ডঙ্কা বাজাইয়া যান আমরাত তখন মসগুল হইয়া তুড়ি মারিয়া তাল রাখি। আমি মনে করিয়াছিলাম—তাঁহাদের সাহিত্যের আলোচনা আমি আমাদিগের দিক হইতে করিব। তাহার উদ্দেশ্য নয়, প্রতিহিংসা-বৃত্তি প্রণোদিত হইয়া তাঁহাদিগকে খাটো করিবার চেষ্টা। আমাদের দেশ তো সাহিত্য সম্বন্ধে অন্ততঃ পাঁচ সাত হাজার বৎসর চিন্তা করিয়াছে, আমাদেরও তো একটা আদর্শ আছে। তাহাদের সাহিত্যে যা কিছু হইবে—যত কিছু আবর্জ্জনা ও সরস্বতীর পাদপীঠের উপর দৌরাত্ম্য—সমস্তই আমরা "বিশ্ব-সাহিত্য" বলিয়া মানিয়া লইব এবং আমাদের জিনিষ না বুঝিয়া সে গুলি সংকীর্ণ গণ্ডীর কথা বলিয়া উড়াইয়া দিব—এটা কখনই সমীচীন নহে। ধরুন আমি Lord Byronএর মধ্যে এমন অনেক জিনিষ পাইতেছি—যাহা তাঁহার সমস্ত অসংযম ও স্বেচ্ছাচারিতার মধ্য হইতে ঘন-নিবিড় মেঘব্যূহের মধ্য হইতে বিদ্যুৎস্ফুরণের মত—তাঁহার প্রকৃতি-গত ধর্ম্ম-প্রাণতা পরিস্ফুট করিয়া দেখাইতেছে। প্রকৃতির সেই সাধুত্ব, আত্মার সেই উজ্জ্বল গৌরব,—তাহার কবিতায় ফোট ফোট অবস্থায় আছে, তিনি অল্প বয়সে মৃত্যুমুখে না পড়িলে বোধ হয়, সেই জিনিষটা সম্যক বিকাশ লাভ করিতে পারিত। চাইল্ড হেরল্ডে এমন কি ডন-জুয়ানের মধ্যেও আত্মার মহান্ শক্তির প্রতি সুস্পষ্ট ইঙ্গিতময় বহু

কথা আছে। মানুষের মনই যে প্রেমের চক্ষে চাহিয়া রূপ গড়িয়া লয়, বাস্তবিক রূপবান্ কি রূপশীর দেহে তাহা নাই—কিম্বা যেটুকু আছে, তাহা ক্ষুদ্র উপলক্ষ্য মাত্র, এই কথা কেমন সুন্দর করিয়া চাইল্ড হেরল্ডের তৃতীয় অধ্যায় লেখা আছে। ডনজুয়ানের নানা কুরুচিপূর্ণ অসঙ্গতির মধ্যেও সন্ধ্যাবর্ণনায়, আত্মার শক্তি যে কতবড়, মানবাত্মা যদিও ক্ষুদ্র বারি বিন্দুর ন্যায়—তাহা যে বিশাল বারিধিরই স্বরূপ দেখাইতেছে, তাহা তিনি এমন সুন্দর করিয়া বুঝাইয়াছেন যে আমার মনে হয় তাঁহার লেখায় প্রাচ্য মনের যে সাড়া পাওয়া যায়, তাহাতে আমরাই সেই সকল অংশের ভাল সমালোচনা করিতে পারিব। অথচ এই সকল বিষয়ে তাঁহার ইংরেজ সমালোচকগণ প্রায় নির্ব্বাক, তাঁহারা বেশী বুঝিয়াছেন বাইরণের সেই দিক্‌টা যাহা ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অভিব্যক্তি, সমাজের প্রতি স্পর্দ্ধাপূর্ণ চোখ-রাঙ্গানি এবং অকুণ্ঠিত একান্ত নির্ভীকতা। সুতরাং আমরা ইংরেজী সাহিত্যের ইতিহাস লিখিলে তাহা যে সেই জিনিষটাকে খাটো করিয়া দেখাইবার চেষ্টায় পর্য্যবসিত হইত তাহা নহে, অবশ্য সেক্সপিয়র যে তাহার হ্যামলেট নাটকের শেষাঙ্কে একত্র ছয় সাতটা হত্যা করিয়া গ্রীক বিয়োগান্ত নাটকের রীতি রক্ষা করিলেন, এবং কিং জনে যে বালক আর্থারের চক্ষু দুটি উত্তপ্ত লৌহশলকা দ্বারা তুলিয়া ফেলিবার জন্য উদ্যোগ চলিল—তদ্দ্বারা নাট্যসম্রাট বৃথা শোক উদ্দীপনার চেষ্টা করিলেন এ সকল হয়তঃ আমরা প্রশংসা করিতে পারিতাম না। কারণ যে দুঃখ মনে শুধু ঘা দেয়, কিন্তু চিত্তকে উন্নত করে না—যে দুঃখ ত্যাগের ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়া নাই, এমন দুঃখ বর্ণনা করা আমাদের সাহিত্য-নীতির বিরুদ্ধ। যাহা হউক যখন ইংরেজী সাহিত্যের ইতিহাস আমি লিখিলাম না, তখন এসকল কথার প্রসঙ্গ নিষ্প্রয়োজন।

একদিকে লেখা পড়ার এই ঐকান্তিকী চেষ্টা ও অপরদিকে বাড়ীতে

নানারূপ দুষ্ট বুদ্ধির প্রণোদনে অশিষ্টাচরণ—পাঠ্যপুস্তকের সঙ্গে একেবারে সম্পর্ক রহিতত্ব—এই ছিল আমার কলেজ-জীবনের ইতিহাস। আমাদের এই সকল দুষ্ট ব্যবহারের উদ্ভাবনী শক্তি জোগাইত, মহেন্দ্র-প্রতিভা। মহেন্দ্র আমার মামাত ভাই। আমাদের ঢাকার বাসায় শশাঙ্কমোহন নামক এক কায়স্থ যুবক থাকিত, সে একটু পাগ্‌লাটে ছিল এবং অল্পেই এমন ক্রুদ্ধ হইত, যে সে আমাদের আমোদের একটা কেন্দ্রস্থান হইয়া পড়িয়াছিল, আমাদের দুষ্টামির দুর্গোৎসব হইত তাহাকে লইয়া। মহেন্দ্র একদিন একটি গল্প তৈরী করিল এবং সেটি এমন প্রত্যক্ষ ঘটনার ন্যায় বর্ণনা করিতে লাগিল যে কথাটা একান্ত অদ্ভুত রকমের হইলেও বাহিরের লোক তাহা বিশ্বাস করিতে লাগিল ও শশাঙ্ক তাহাতে চটিয়া প্রায় ক্ষেপিয়া যাইবার মত হইল।

ঘটনাটা এই,—একদিন বৈঠকখানা ঘরে অতি বিমর্ষভাবে মহেন্দ্র বসিয়াছিল। বাহিরের লোক একজন আসিয়া তাঁহাকে সেইরূপ বিমর্ষ থাকার কারণ জিজ্ঞাসা করিল, তখন শশী (শশাঙ্ক) ও আমরা সেইখানে বসিয়াছিলাম।

মহেন্দ্র বলিল "মহাশয়, দুঃখের কথা কি বলিব! আমার একটা পোষা শালিক ছিল, সে এতটা পোষ মানিয়াছিল, যে আমি পড়িতে বসিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিতাম সে ডানা দুইটা বিস্তার করিয়া ধীরে ধীরে উড়িয়া আমার বাহুমূলে—কাঁধের উপর এবং মাথার উপর বসিত। দুই চারটা চা'ল কি ধান-ছড়াইয়া দিলে সে মাথা নাড়িয়া আমাকে দেখিত ও লাল দুটি ঠোঁট দিয়া তাহা কুড়াইয়া খাইত ও এমন চমৎকার শীষ দিতে থাকিত, যে তাহা শুনিলে আমি তাহাকে আস্তে ধরিয়া ঠোঁটে চুম খাইতাম, এমন কি কুকুরের মত সে আমার পেছন পেছন হাঁটিয়া চলিত, আমি ফিরিয়া ফিরিয়া সেটাকে দেখিতাম,—তখন আমার

মনে যে কি আনন্দ হইত তা আর কি বলিব! পাখীটা আমার প্রাণ ছিল।” মহেন্দ্র এই খানে চক্ষু মুছিবার ভাণ করিল খানিকটা চুপ করিয়া রহিল; তারপর বলিতে লাগিল। “গত শনিবার বৃষ্টির পর একটু ঠাণ্ডা হয়, তারপর রৌদ্র উঠিলে আমি পায়খানায় সংলগ্ন উত্তর দিকের ছাদটার উপর খাঁচাটা শুদ্ধ পাখিটাকে রাখিয়া যাই। একটু রোদ লাগিলে পাখীটা আরাম পাইবে, এই ছিল উদ্দেশ্য। মহাশয়, কি বলিব! প্রাণ বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে, ২টার সময় বাড়ী আসিয়া দেখি খাঁচা খালি,—শালিকটা নেই। খাঁচার দোর বন্ধ ছিল। বেড়ালে নিয়ে যাওয়ার যো ছিল না। আর পাখীটা এত পোষা যে উড়তে ভুলিয়া গিয়াছিল—সুতরাং তার নিজে উড়িয়া যাইবার কোন সম্ভাবনাই ছিল না। আমি পাগলের মত বাড়ীর ইহাকে উহাকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলাম, কেহই কিছু সন্ধান দিতে পারিল না। তবে দুর্গা-দাস মজুমদার মহাশয় বলিলেন, ‘বাপু, আমি পায়খানায় গিয়াছিলাম, তখন পাখীটাকে খাঁচায় দেখিয়াছিলাম, ইহার মধ্যে টের পাইলাম, শশী একটা ঝড়ের মত পায়খানার পাশ কাটিয়া ছাদে চলিয়া গেল এবং তারপর একটা চিঁচিঁ, চিঁচিঁ শব্দ হইল। পাখীটা প্রাণান্ত কষ্টে চীৎকার করিতেছিল, আমি যখন বাহিরে আসিলাম, তখন দেখিলাম, ছাদের উপর খালি খাঁচাটা পড়িয়া আছে ও শশী দ্রুতবেগে পালাইয়া যাইতেছে, তাহার ঠোঁটের কাছে পাখীটার একটা পালক লাগিয়াছিল।’ বলা বাহুল্য গল্পটা আগাগোড়া তার তৈরী। গল্পটি বলিয়া মহেন্দ্র দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বসিয়া রহিল। শশীর চোখের রক্তিমা গাঢ় হইতে-ছিল। সেই ব্যক্তি বলিলেন, “শশীবাবুর মাথাটা চিরকালই একটু গরম, তাই বলিয়া কি পাখীটার কাঁচা মাংস উনি খাইয়া ফেলিলেন, বায়ুরোগ—তোমার লীলা আশ্চর্য্য!” এই কথা শুনিয়া হঠাৎ একটা লাফ মারিয়া

শশী মহেন্দ্রের গণ্ডদেশে একটা চড় মারিল—মহেন্দ্র ও আমরা ভয়ে পালাইয়া গেলাম। কিন্তু সেই দিনই আমাদের জিন্দাবহরের গলিতে রাষ্ট্র হইয়া গেল যে শশী শালিক মারিয়া খাইয়াছে। এ বিষয়ের প্রকৃত মর্ম্মানভিজ্ঞ ব্যক্তিরা সরল বিশ্বাসে শশীকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন "সত্য সত্য কি তোমার বুদ্ধিটা লোপ পাইয়াছিল—এমন কাণ্ডটা করিয়া ফেলিলে?" শশী তখন লগুড় লইয়া প্রশ্নকারীদিগকে তাড়া করিয়া ছুটিল।

শশী কচ্ছপকে জন্মাবধি ঘৃণা করিত। জিন্দাবহরের গলিতে আমার মাতুলালয়ের একটা জায়গায় বরিশাল নিবাসী কয়েকজন ব্রাহ্মণ বাসা করিয়াছিলেন, তাঁহারা বড়ই কচ্ছপ মাংসপ্রিয় ছিলেন। কচ্ছপের মাংস ও ডিম তুলিয়া লইয়া তাঁহারা সেই জীবের খোলসটা এবং নাড়ী-ভূড়ি শুদ্ধ মাথাটা ফেলিয়া দিতেন। একদা মহেন্দ্রের শিক্ষা ক্রমে জগদীশ দাদা সেই মাথা সমেত নাড়ী ভূড়িটা শশীর পকেটে পুরিয়া রাখিয়াছিলেন। শশী বাহিরে গিয়াছিল, পরিশ্রান্ত হইয়া বাড়ী ফিরিয়া আলনার ঝুলানো কোটটা অতিরিক্ত ভারি দেখিয়া পকেটে সেই বীভৎস দ্রব্যটা আবিষ্কার করে। অমনই "চক্ষু ঘোরে যেন নাট, হাত নাড়া ঘন ডাক্, চমকে সকল পুরজন" অবস্থাটি হইল। সে এক হাতে সেই অস্পৃশ্য বীভৎস-দর্শন বস্তুটা এবং অপর হস্তে লগুড় লইয়া দাদকে যে ভাবে তাড়া করিয়াছিল, তাহা না দেখিয়াই কাশীদাস কিরূপে লিখিয়াছিলেন—"পৃথিবী বিদার হয় চরণের ভরে। ক্রোধ দৃষ্টিতে যেন জগৎ সংহারে॥ গজেন্দ্র মারিতে যেন ধায় মৃগপতি"—সেইটি আশ্চর্য্য বটে।

এই সকল দুষ্টামিতে আমরা নিত্য নিযুক্ত ছিলাম। বগজুরীর মাতুলালয় অতি প্রকাণ্ড ছিল,খুব বড় কোন রাজবাড়ীর মত। বাড়িটি

প্রায় ৩০।৪০ বিঘা লইয়া, তন্মধ্যে প্রায় ৪।৫ বিঘা শুধু ফুল বাগানই ছিল, অনেকগুলি মালী সেই ফুলবাগানে কাজ করিত। প্রাতঃকালে বাগানে গেলে ভ্রমরের ডাকে কাণে মধুবর্ষণ করিত; সদ্য প্রস্ফুট নানাজাতীয় গোলাপের লাল রঙ্গে চক্ষু ঝলসিয়া যাইত। তিন দিকে দীঘি,—জল কাক-চক্ষুর ন্যায় কালো ও স্বচ্ছ, নহবৎখানায় উৎসব উপলক্ষে সানাইএর ভয়ঁরো পুরবী প্রভৃতি নানা রাগের আলাপন হইত। দক্ষিণদিকের দোতালার বারেন্দা মস্ত বড়, যেন ঘোরদৌড়ের মাঠ। সেই বারেন্দার নীচে দুই দিকে দুই প্রকাণ্ড ঘর—তাহার একটা পশুশালা আর একটা চিড়িয়াখানা। পশুশালায় বড় বড় হনুমান প্রভৃতি থাকিত, চিড়িয়াখানায় প্রায়ই তিন চারিটী ময়ূর থাকিত। সদর দরজার মধ্য দিয়া সুদীর্ঘ পথ; তাহার দুইদিকে চেয়ারের মত হেলান দেওয়া পাকা গাঁথুনির সুদীর্ঘ বেড়া—তন্মধ্যে বসিবার আসন, তারপর আর একটা বড় গেট্, তাহার দুইদিকে রাজপুত ও মুসলমান সর্দ্দার, হস্তে ঢাল ও তরোয়াল, তথায় প্রাচীরের গায়ে সেকালের নানারকম অদ্ভুত অদ্ভুত অস্ত্র। এই সমগ্র বাড়ীটা আমার মাতামহ গোকুলকৃষ্ণ মুন্সী মহাশয় একটা হাঁক দিলে যেন কাঁপিয়া উঠিত। দুইজন চাকর শুধু তাঁহার গোঁপের তোয়াজ করিবার জন্য নিযুক্ত থাকিত, তাহারা সেই গোঁপের লহরী নানারূপ মাল-মসলা দিয়া তৈরী করিত, সেই লহরীর উপর গোঁপের চুল লতার কায়-দায় হেলাইয়া দিয়া অগ্রভাগ ছুঁচের মত সূক্ষ্ম করিয়া গণ্ডের উপর কুণ্ডলী করিয়া লগ্ন করিয়া দিত। সেই গোঁপে তা' দিয়া তিনি যখন তাকিয়া ঠেস্ দিয়া বসিয়া থাকিতেন, তখন-নায়েব, খোসামুদে, মোসাহেব প্রভৃতি সকলে তাঁহার চেহারার তারিফ করিত। "গণিমিঞার ঘড়ি, নীলাম্বরের বড়ি, গোকুল মুন্সীর গোঁপে তা। গল্প শুনবি তো নীলাম্বর মুন্সীর কাছে যা" এই কবিতা ২৫ বৎসর পূর্ব্বে পূর্ব্ববঙ্গের

সর্ব্বত্র প্রবাদ বাক্যের ন্যায় ছিল। আমি ছিলেট, ত্রিপুরা প্রভৃতি যে অঞ্চলে গিয়াছি সর্ব্বত্রই মাতামহের নাম করিয়া সম্মান লাভ করিয়াছি -- "গোকুল মুন্সীর গোঁপে তা" সকলের মুখেই শুনিয়াছি। তাঁহার নাট-শালার মত এরূপ বড় নাটমন্দির বঙ্গদেশে খুব অল্পই দেখিয়াছি। তাঁহার দুর্গামণ্ডপ যেরূপ সারি সারি নানারূপ মুসলমানী ও প্রাচীন হিন্দুগণের কায়দায় প্রস্তুত স্তম্ভ দ্বারা সজ্জিত হইয়া একটা জমাকালো ভাব দেখাইত সেরূপ হয়ত মফঃস্বলের কোন কোন রাজবাড়ীতে থাকিতে পারে, কিন্তু সেই দুর্গামণ্ডপে দুর্গাদেবীর যে মৃণ্ময়ী-মূর্ত্তি গোলক দেউড়ী তৈরী করিত অত বড় বিরাট-মূর্ত্তি বঙ্গদেশের কোথায়ও দেখিতে পাই না। একশ ভরির সোনার মুকুট মাথায় পরিয়া যখন ডাকের সাজে সাজিয়া সেই মূর্ত্তি সপ্তমীর দিন বোধনের সময় সমবেত বহুশত লোকের চক্ষুর সামনে দাঁড়াইতেন, তখন শুম্ভ নিশুম্ভ-বিঘ্নী, পাশাঙ্কুশ, ঘণ্টা, খেটক, শরাসন অসি, চক্র, শূল শর হস্তে যেন সত্যই জগন্মাতা আমাদিগকে দেখা দিতেন। আরতির ধোঁয়ায়, ধূপ ও অগুরুর সুগন্ধে একশত পঁচিশ বাতি ঝাড়ের আলোকে—সেই মূর্ত্তির উজ্জ্বল স্বর্ণবিন্দু মাখা উত্তরীয় অঞ্চল যেন ঝলমল করিতে থাকিত। নর্ত্তকী, বাদ্যকর, কাঁসর বাদক---যেন তাহাদের জন্মাবধি অর্জ্জিত নৈপুণ্য শুধু জগন্মাতাকে দেখাইয়া তৃপ্তিলাভ করিতে প্রাণপণে লাগিয়া যাইত। নর্ত্তকীর অঙ্গভঙ্গী, বাদ্যকরের বাদ্য শুধু সেই বিগ্রহকেই লক্ষ্য করিত। মানুষকে দেখানো যেন তাঁহাদের অভিপ্রেত নয়। সেরূপ দেব-নৃত্য ও দেব-সংগীত—সেরূপ ঐকান্তিকী ভক্তি আর কোথায় দেখিব! এই যুগ হইতে তাহা চলিয়া গিয়াছে।

দোলের সময় ফাগ লইয়া যে ঘটা হইত. তাহাও একটা বর্ণনীয় বিষয় বটে। আমরা ফাগ লইয়া যে কত লোকের চক্ষে মারিয়াছি তাহার অবধি নাই। একবার পুলিশের কতকগুলি লোকের উপর

ফাগ লইয়া অত্যাচার করাতে তাহারা আমাদের ভয় দেখাইয়া ছিল। তাহাতে আমাদের লোকের হাতে তাহারা ভয়ানক মার খাইয়া ছিল—কিন্তু নালিস করিতে সাহস পায় নাই, শুধু মাতামহের ন্যায় প্রবল প্রতাপান্বিত জমিদারের ভয়ে নহে—সেকালে দেলের ফাগ খাওয়া একটা রীতি ছিল - এই রীতির বিরুদ্ধে কেহ কিছু করিতে চাহিত না এবং এতৎ সম্বন্ধে বিপক্ষতা করিলে সমাজে নিন্দিত হইতে হইত। দোলের সময় মনে পড়ে আমরা বাহির খণ্ডের সুবৃহৎ হল্ ঘরটায় ২০।৩০টী ছেলে সকালে শুইয়া আছি, চাকরেরা নেকড়া ও জলের ঘটি লইয়া প্রত্যেকের চক্ষু খুলিয়া দিতেছে। কারণ পূর্ব্বদিন ও পূর্ব্বরাত্রে এত ফাগ আমাদের চোখে পড়িত, যে পরদিন চোখের দুটি পাতা একবারে আটকাইয়া যাইত। ভৃত্যদের সাহায্যে চক্ষু না খুলিলে—চোখ বুজিয়া থাকিত। মহেন্দ্রদা ফাগ নিক্ষেপে ওস্তাদ ছিল। আমার চক্ষে যে সে কতবার ফাগ মারিয়াছে,—যাতে করে আমি পৃথিবীটা প্রায় গোলকধাঁধার মত দেখিয়া নিজেকে সামলাইতে না পারিয়া মাটিতে পড়িয়া গিয়াছি, তাহার অবধি নাই। কিন্তু আমি যদি যাচিয়া ভাব করিয়াছি, তবে সে আর আমার প্রতি ফাগ ছুঁড়িয়া মারে নাই। তথাপি তাঁহার পূর্ব্বকৃত অত্যাচারের কথা মনে করিয়া আমি ও হীরালাল তাহাকে সর্ব্বদা জব্দ করিবার সন্ধানে থাকিতাম। তাহার সঙ্গে বাহ্যিক ভাব করিয়া পেছন থেকে যাইয়া হঠাৎ চোখে ফাগ ছুঁড়িয়াছি,—কিন্তু সে এমনই চালাক ছেলে, যে আমাদের ফাগ কোন কালেই তাহার চোখের উপর যাইয়া পড়িত না, চোখের পাশ কাটিয়া গণ্ডের উপর শুধু ক্ষণস্থায়ী রক্তিমায় পুষ্পবৃষ্টি করিয়া যাইত। কিন্তু বিশ্বাস-ভঙ্গের প্রতিহিংসায় তাহার চোখ দুটি বাঘের চোখের ন্যায় জ্বলিতে থাকিত, এবং আমরা তাহাতে প্রমাদ গণিতাম। কারণ যেরূপ সাবধানতার সহিতই না কেন তাহাকে

এড়াইতে চেষ্টা করিতাম, কোনরূপ ফাঁক পাইয়া সে চিলের মত ছোঁ মারিয়া হঠাৎ চোখে এমনই জোরে ফাগের অগ্নিবাণ মারিয়া যাইত, যে প্রকৃতই যেন ক্ষণকালের জন্য চোখ দুটি আগুনের তাপে জ্বলিতে থাকিত। হীরালাল ও আমি মহেন্দ্রদার হাতে যে কত কষ্ট পাইয়াছি, তাহা লিখিয়া উঠিতে পারিব না। যখন "লক্ষ্মী জনার্দ্দন" (মাতুলালয়ের বিগ্রহ) "গন্ত ফিরিয়া" (গোষ্ঠ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া) বাড়ীতে আসিতেন, তখন শত শত লোক যে কি আনন্দ করিত, তাহা আর কি বলিব! ফাগে আকাশ লাল হইয়া যাইত, ধূসর-বরণা সন্ধ্যা যেন আপাদ মস্তক লাল চেলীতে আবৃত হইয়া থাকিতেন। যখন "লক্ষ্মী জনার্দ্দনের" সিংহাসন ধাতু-নির্ম্মিত সুন্দর স্তম্ভযুক্ত চৌদলার উপর চড়াইয়া লোকেরা স্কন্ধে বহন করিয়া বাড়ীতে ফিরাইয়া আনিত, তখন আবির-রঞ্জিত দেহে শত শত লোক হাত উঁচু করিয়া গাইত "জয় দে লো রামের মা তোর গোপাল এল ফিরে। এগিয়ে বরিয়ে গোপাল নিয়ে যাও ঘরে।" "বরিয়া" অর্থ বরণ করিয়া। সে যে কি আনন্দ তাহা মুখে বলার নহে, লেখনীতে লিখিবার নহে। অন্তঃপুর হইতে স্ত্রীলোকেরা জয় জয়কার দিতেছেন, শঙ্খ নিনাদ করিতেছেন, নহবৎ বাজিতেছে, বাড়ীর সকলেই মনে করিতেছে, গোপাল সত্যই ফিরিয়া আসিতেছেন। ঘরের বিগ্রহ দুই এক ঘণ্টার জন্য বাহিরে যাওয়াতে যেন মায়েরা উৎকণ্ঠায় চোখ দুটি পথের পানে ফেলিয়া রাখিয়া ছিলেন। আবির-রঞ্জিত চৌদলার কার্ণিসের পার্শ্বে লাল পতাকা দেখিয়াই তাহারা যেন প্রাণ পাইলেন এবং আনন্দে অধীর হইয়া উঠিলেন। এখন যদি আমাদের বাড়ীতে এরূপ কোন উৎসব হয়, তাহা হইলে মেয়েরা হয়ত সেলাইয়ের কলের কাছে বসিয়া সেমিজে লেছ লাগাইতে থাকিবেন এবং উৎসব সম্বন্ধে একবারে অনাসক্ত থাকিবেন,—এটি ভাল হইয়াছে কি মন্দ হইয়াছে তাহা বিচার করিবার শক্তি আমার নাই, কিন্তু

দেশ হইতে যে একটা প্রকাণ্ড আনন্দ চলিয়া গিয়াছে, তাহা নিঃসংশয়ে বলিতে পারি। দুর্গোৎসব-দোলৎসব তাড়াইয়া দিয়াছি—এই যুগের শিক্ষায় পূর্ব্ব সংস্কার ও রুচি নষ্ট করিয়াছি সত্য, কিন্তু সেই সকল উৎসবের জায়গায় আর কোন আনন্দ দিতে পারিয়াছি কি? আনন্দ ভিন্ন যে জাতীয় জীবনের মূল শুকাইয়া যাইতেছে।

— —

কালীপ্রসন্ন ঘোষ।

আমি যখন দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ি, তখন কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয়কে সর্ব্ব প্রথম দেখিয়াছিলাম। সেবার লর্ড রিপণ বিদায় লইতেছেন। সমস্ত বঙ্গদেশ জুড়িয়া তাঁহার বিদায়-সভা চলিতেছে। সেইরূপ এক সভা ঢাকা জগন্নাথ স্কুলের একটা সুদীর্ঘ গৃহে আহুত হইয়াছিল। বক্তা আনন্দ রায় প্রভৃতি, কিন্তু সভার সর্ব্বপ্রধান আকর্ষণ কালীপ্রসন্ন ঘোষ বক্তৃতা করিবেন, এই সংবাদ। কারণ বহুদিন তিনি প্রকাশ্য বক্তৃতা করেন নাই। ইহার কিছু পূর্ব্বে কৃষ্ণানন্দ স্বামী ও শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়—হিন্দু ও ব্রাহ্মধর্ম্মের পাল্লা দিয়া ঢাকার সভাগৃহগুলিকে খুব সরগরম করিয়া গিয়াছিলেন। কোন লোক কালীপ্রসন্ন বাবুকে যদি যাইয়া বলিতেন "মহাশয় হিন্দু ও ব্রাহ্মদলের বক্তৃতার চোটে আকাশ ফাটিয়া যাইতেছে—আপনি এত বড় বক্তা, আপনি চুপ করিয়া আছেন কেন ?" তিনি তাহার উত্তরে উপেক্ষার ভাবে তাঁহার অভ্যস্ত ভাঁকালো ভাষায় বলিতেন "কাক-কোলাহল।"

সেই দিন বোধ হয় ১৮৮১ সনে হইবে,—আমি কালীপ্রসন্ন ঘোষকে প্রথম দেখিলাম। আনন্দ রায় প্রভৃতি অনেক ব্যক্তি বক্তৃতা করিয়া গেলেন, তাহারা সরল ভাষায় লর্ড রিপণ আমাদের জন্য কি কি করিয়াছেন, আমাদিগকে স্বায়ত্তশাসন দিতে যাইয়া তাঁহার স্বদেশীয় লোকদের হাতে কিরূপ বিড়ম্বিত হইয়াছেন, এই সকল বলিয়া—তাঁহার ভারত-পরিত্যাগের জন্য দুঃখ করিলেন। সোজা ভাষায় সহজ ভাবে বক্তৃতা

গুলি মন্দ লাগিল না। কিন্তু সর্ব্ব শেষে উঠিলেন কালীপ্রসন্ন ঘোষ, তখনও তিনি "রায় বাহাদুর" "সি আই" "বিদ্যাসাগর" প্রভৃতি পদবী পান নাই। তখন শীতকাল, মোটা পাড়-শূন্য একটা বেগুণে রঙের বানাত তাহার গায়ে ছিল। তিনি যখন বক্তৃতা মঞ্চের টেবিলের নিকট আসিয়া দাঁড়াইলেন—তখন দেখিলাম সুদীর্ঘ সুন্দর নাসিকা, উজ্জ্বল গণ্ড, বৃহৎ চক্ষুদ্বয়ে যেন প্রতিভা জ্বলিতেছে। যেমন দীর্ঘ তেমনি স্থূল—বরং স্থূলতার জন্য একটু খর্ব্ব বলিয়া মনে হয়। বিশাল গোঁপের অন্তরালে দুটি রক্তিম অধর, দেখা মাত্র মনে হয়, সেই অধর কথা কহিবার দক্ষতা লইয়াই সৃষ্ট হইয়াছে, উন্নত করতলটি পদ্মাভ—বর্ণ গৌর, খুব উজ্জ্বল গৌর নয়, সেই বেগুনে রংএর বনাতখানি মর্ম্মর মুর্ত্তিতে যেরূপ বস্ত্রাদির ভাঁজগুলি দেখায়, সেইরূপভাবে বিন্যস্ত হইয়া একটা দিক দিয়া যেন বক্তৃতা-মঞ্চটি ছুঁইয়া আছে। সেই বেগুনে রঙের দীপ্তিতে তাঁহার গৌরবর্ণ যেন ঈষৎ শ্যামল হইয়াছে। যখন দাঁড়াইলেন, তখনই মনে হইল - এ ব্যক্তি শক্তিশালী। তারপর যখন মৃদুস্বরে দুই একটা কথা বলিয়া হঠাৎ ভাষায় অপূর্ব্ব উদ্দীপনা অবতারণা করিলেন, তখন সভাগৃহটি একবারে নীরব ও মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া গেল. ভাষা ওজস্বিনী, বাক্য-গুলি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড,—সমাস বদ্ধ, কিন্তু তাহার কোন অংশ হীনবল নহে, এ যেন অর্জ্জুন গাণ্ডীবধনু হইতে শর নিক্ষেপ করিতেছেন—সে গাণ্ডীব আর কাহারও ব্যবহার্য্য নহে,—মেঘনাদ বধ কাব্যের মত উন্মা-দনাময়ী ভাষা। ২০ মিনিট কাল শ্রোতারা যেন এক মহাকাব্য শুনিল, সেই কাব্যের শেষভাগ করুণরস মধুর। স্বপ্নাবিষ্টের ন্যায় আমরা সেই বক্তৃতাটি শুনিলাম, বঙ্গভাষার যে কি ভয়ানক শক্তি—সেদিন বুঝিলাম। তারপর ত কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন, শিবনাথ শাস্ত্রী, রবীন্দ্র নাথ প্রভৃতি কত মনস্বী ব্যক্তির বাঙ্গলা বক্তৃতা শুনিয়াছি, কিন্তু সেরূপ পাহাড় পর্ব্বত

নিক্ষেপকারী দেবাসুরের ক্রীড়ার মত, অবাধস্রোতা ঐরাবত-বিজয়ী দুর্জ্জয় গঙ্গার মত,—বিপুল দম্ভময় মেঘগর্জ্জনের মত, শিবের প্রণব-ধ্বনির মত, -বিজয় দুন্দুভির মত—বঙ্গভাষার ধ্বনি আর কোথাও শুনি নাই। বৈষ্ণব কবিতার মাধুরীতে যে বঙ্গভাষাকে এলাইয়া পড়িতে দেখিয়াছি, কালীপ্রসন্নের বক্তৃতায় সেই ভাষাকে জয়শ্রীমণ্ডিতা সাম্রাজ্ঞীর মত দেখিয়াছি। বঙ্গভাষা যে জগজ্জয়ী হইবে—সেই শিশুকালে একটা অস্পষ্ট আভাসের ন্যায় তখন তাহা মনে হইয়াছিল।

আমি প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে উঠিয়া এপিফেণীতে প্রবন্ধ লেখার জন্য স্মিথ সাহেবের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছিলাম, তাহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। স্মিথ ছিলেন অকস্‌ফোর্ড মিসনের মিসনারি, তিনি অল্প সময়েরমধ্যে সেই মিসনের কাজ খুব জাঁকাইয়া তুলিয়া ছিলেন। তাহার সহকারীছিলেন ব্রাউন ও ডগ্‌লাস। এই ডগ্‌লাস এখন বেহালায় স্কুল খুলিয়া খুব জোরের সহিত প্রচার কার্য্য করিতেছেন।

কিন্তু ইঁহাদের প্রেরণা দিয়াছিলেন স্মিথ;—ইনি খাটো, এবং শীর্ণদেহ ছিলেন—অতি অল্প বয়সেই ইনি প্রাণত্যাগ করেন। স্মিথ সাহেবের ইচ্ছা হইল, আমি ভাল করিয়া বাইবেল পড়ি। তিনি আমার চিঠি পত্র এবং প্রবন্ধাদি পড়িয়া আমার একটু পক্ষপাতী হইয়া পড়িয়া ছিলেন এবং তাঁহার কেন জানি একটী বিশ্বাস হইয়াছিল যে আমি বাইবেল ভাল করিয়া পড়িলে হয় ত খ্রীষ্টান হইতে পারি। এই ভরসায় ও বিশ্বাসে তিনি আমাকে বিশেষ করিয়া ধরিলেন যে আমাকে বাই-বেল পড়িতেই হইবে। হীরালাল বলিল "ক্ষতি কি? তুমি লিখে দাও—তুমি কবুল আছ।" স্মিথ ঢাকার চ্যাপ্‌লেস আলিয়ট সাহেবকে আমার বাইবল পাড়াইতে নিযুক্ত করিয়াছিলেন; সময়ে সময়ে আমি তাঁহার মেম সাহেবের নিকট ও পড়িয়াছি। আলিয়েট সাহেব খ্রীষ্টান

ধর্ম্মে অতিশয় ভক্তিমান্ ছিলেন। তিনি বাইবেলের প্রতি অক্ষর ঈশ্বরের হাতের লেখা বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। জনই লিখুন, আর লুকই লিখুন, সুসমাচারের প্রত্যেক কথায় ঈশ্বরের অনুজ্ঞা আছে—এই কথা আমাকে বুঝাইতেন—সুতরাং প্রতিটী ছত্রের প্রতি তাঁহার ভক্তির উচ্ছাস এত থাকিত—যে বাইবেল পড়া যে খুব অগ্রসর হইত—তাহা নহে। একদিন তিনি ইউকারিষ্ট বুঝাইতে যাইয়া সেই দিনের রুটী খ্রীষ্টের পবিত্র মাংস ও মদ তাঁহারই রক্ত—এই ব্যাখ্যা করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। সে কি কান্না! সুতরাং এই ভক্তির অসম্ভব দুর্য্যোগ—ঝড়বৃষ্টি ঠেলিয়া আমার বিদ্যা তরণী মোটেই এগিয়ে গেল না, ঘাটেই নোঙ্গর করিয়া রহিল।

দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে যখন পড়ি, তখন আলিয়েট সাহেব এক দিন আমায় বলিলেন, "কাল লর্ড বিশপ ঢাকায় আসিবেন তুমি শুনিয়াছ? আমি বলিলাম "শুনিয়াছি।"

"কেন আসিবেন, জান?"

"আমি কি করিয়া জানিব?"

"তাঁহার অবশ্য অনেক কাজ আছে, কিন্তু একটি হচ্ছে, তোমাকে পবিত্র ধর্ম্ম দান করা?"

আমি ত এই কথায় অবাক্ হইয়া গেলাম। বলিলাম "আমি খ্রীষ্টান হইব, একথা কাহাকে কবে বলিয়াছি?"

"তবে এই দুই বৎসর যে তোমার পাছে হয়রাণ হইলাম, সে কি সকলই মিথ্যা? আমি যখন আমাদের শাস্ত্র তোমায় নিকট ব্যাখ্যা করিয়াছি, তখন ত তুমি ভক্তিতে গদ্‌গদ হইয়াই শুনিয়াছ, তুমি যে ক্রাইষ্ট সম্বন্ধে ইংরাজী কবিতাটি লিখিয়া ছিলে তাহার ভাব তো ভারি চমৎকার। তুমি যে আমাদের শাস্ত্রে বিশেষ ভক্তিমান, তাহাতো তোমার বাইবেল

পড়িবার আগ্রহ দেখিয়া—আমার ব্যাখ্যার সময় তোমার চক্ষু ও মুখ ভঙ্গী দেখিয়াই হৃদয়ঙ্গম করিয়াছি। আমার স্ত্রী ও আমি তোমার ধর্ম্ম-প্রাণতার কত প্রশংসা করিয়া থাকি। জল ঝড় দুর্যোগের মধ্যেও তুমি বাইবেল পড়িতে আমাদের এখানে আসিয়া থাক—এ সকল কথা আমি রিপোর্ট করিয়াছি—ইহা করা কি আমার অন্যায় হইয়াছে? যাহা হউক তুমি খ্রীষ্টান ধর্ম্ম গ্রহণ কর আর না কর, লর্ড বিশপের সঙ্গে পরশ্ব তারিখে ৮টার সময় সরকারী চার্চ্চে দেখা করিও, নতুবা আমি বিশেষ অপ্রস্তুত হইব। আমি বহুদিন তোমায় পড়াইয়াছি—তাহার এই দক্ষিণাটুক চাই যে লর্ড বিসপের নিকট যেন আমি মিথ্যাবাদী ও বিপন্ন না হই. আমি সরলভাবে যাহা বিশ্বাস করিতাম তাহাই লিখিয়া-ছিলাম, এখন তোমার কথা শুনিয়া বিস্মিত হইয়াছে।"

বিস্ময় যে শুধু তাঁহারই হইয়াছিল এমন নহে, আমার হইয়াছিল ততোধিক। যাহা হউক, আমি লর্ড বিশপের সঙ্গে দেখা করিব, ইহা স্বীকার করিলাম, এবং বলিলাম, যাহাতে তাঁহার সম্বন্ধে আমার বিষয় লইয়া পাদ্রী-লাটের কোন অপ্রীতিকর ভাব না হয়, আমি তাহা করিব। বিদায় কালে আলিয়েট সাহেব আমায় বলিলেন—'লড বিসপ তোমার ন্যায় বালককে দীক্ষা দিলে জীবন ভরিয়া তুমি এ বিষয় লইয়া গৌরব করিতে পারিবে?—এ বিষয়টি ভাবিয়া দেখিও।"

পরদিন সকালে মহেন্দ্রদের (মহেন্দ্রলাল রায়, ঢাকার উকীল) মেসে যাইয়া তাহাকে সকল কথা খুলিয়া বলিলাম। সে বলিল 'তোমায় প্রকাশ্যভাবে আলিয়ট সাহেবকে পূর্ব্বেই বলা উচিত ছিল যে তুমি খ্রীষ্টান হইবে না, সাহিত্য ও ইতিহাস আলোচনার জন্য বাইবেল পড়িতেছ—তাহা হইলে সাহেব কখনই তোমাকে বাইবেল পড়াইতেন না। এবং তাঁহার মনেও তোমার খ্রীষ্টান হওয়া সম্বন্ধে আশার সঞ্চার হইত না।

তিনি যাহা করিয়াছেন, তাহা তাঁহার মত সরলচিত্ত বিশ্বাসী ব্যক্তির পক্ষে কিছুই অসম্ভব বা অনুচিত হয় নাই।” আমি বলিলাম “যদি সরকারী চার্চ্চে পাইয়া আলিয়েট সাহেব জোর করিয়া আমাকে জর্ডনের জল খাওয়াইয়া দীক্ষা দেন,—তাহা হইলে কি করিব?” মহেন্দ্র বলিল, “তুমি নিতান্ত পাগল, তাঁহার মত পদস্থ ব্যক্তি এরূপ কার্য্য করিবেন—তাহা কখনও সম্ভবপর নহে।”

আমি আশ্বস্ত হইয়া বাড়ী ফিরিলাম—কিন্তু এ বিষয়টি আর কাহাকেও জানাইলাম না। পরদিন প্রাতে ৭॥ টার সময় চার্চ্চে গেলাম। সেখানে ইংরেজ ও ফিরিঙ্গিদের ছেলেরা উপাসনা করিতেছিল—একটি বাঙ্গালীর ছেলেও ছিল না। ৮টার সময় ভজনকার্য্যের অবসানের পর সেই ছেলেগুলি আমাকে নানারূপ উৎপাত করিতে লাগিল; কেহ আসিয়া কানের কাছে শীষ দিতে লাগিল, কেহ আমার কোঁচা ধরিয়া টানিতে লাগিল, কেহ বিকট মুখভঙ্গী করিয়া আমাকে ভেঙ্গচাইতে লাগিল, কেহ বা লাফ দিয়া আমার গায়ের কাছে আসিয়া ধপাস্ করিয়া পড়িয়া গেল। ইহার পরে তাহারা মারধর করিবার উপক্রম করিবে—এমন সময় আমি বলিলাম “আমি আলিয়েট সাহেবকে বলিয়া তোমাদিগকে শাস্তি দেওয়াইব” এই কথা বলিতে না বলিতে দেখি আলিয়েট সাহেব উপস্থিত, তাঁহাকে দেখিয়া ছোঁড়া গুলি কেঁচো হইয়া গেল। তিনি আমাকে লইয়া গিয়া লর্ড বিশপের ঘরে প্রবেশ করিলেন এবং আমাকে চিনাইয়া দিয়া বিদায় লইলেন।

লর্ড বিশপ আমার সঙ্গে এক ঘণ্টা আলাপ করিলেন। দেখিলাম লোকটি অতি ভদ্র ও বুদ্ধিমান, তিনি বলিলেন “স্মিথ সাহেবের নিকট তোমার অনেক সুখ্যাতি শুনিয়াছি, তিনি আমাকে বলিয়াছেন, তুমি যে সকল পত্র লিখ—তাহা খুবই ভাল; অবশ্য আলিয়েট সাহেব ব’লেছেন

তুমি দীক্ষা লওয়ার জন্য সম্ভবতঃ প্রস্তুত আছ। আমরা এ সকল বিষয়ে সর্ব্বদা তোমাকে খুব আন্তরিক সহায়তা দিব—কিন্তু এই কার্য্যে লওয়াইবার জন্য কোন জোর করিব না।" আমি বলিলাম, "অ্যালিয়েট সাহেব আমাকে খুব যত্নপূর্ব্বক পড়াইয়াছেন—হয়ত আমার ব্যবহার এমন হইয়াছে, যে তিনি সহজেই ভাবিতে পারিতেন যে আমি দীক্ষা গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হইয়াছি, কিন্তু আমি সত্য সত্যই প্রস্তুত হই নাই। আমি এখনও বালক, এত বড় একটা ঘটনার সম্মুখীন হওয়ার মত চিন্তার বিকাশ আমার হয় নাই।"

এইরূপে নানা কথা বলিয়া বিদায় লইলাম, বোধ হইল লর্ড বিশপ আমার কথাবার্ত্তায় প্রীত হইলেন। ইহাতে বিশেষ উৎফুল্ল হইয়া এই সাক্ষাৎকারের প্রসঙ্গ সকলের নিকট বলিয়া বেড়াইলাম।

এই ঘটনাটি বাড়াইয়া কলিকাতার শ্রীনাথ সেন নামক একজন স্বর্ণ-বণিক-কুলজাত মার্চেন্ট (যিনি বেশ শিক্ষিত ও প্রাচীনবয়স্ক ছিলেন এবং ঢাকায় একটা বড় রকমের দোকান খুলিয়াছিলেন) কালীপ্রসন্ন বাবুকে বলিলেন। তিনি এইভাবে ঘোষ মহাশয়কে বলিয়াছিলেন, "মহাশয়, ব'লব কি? একটি বেশ মনস্বী-বাঙ্গালী ছেলে খ্রীষ্টান হইতে চলিয়াছে।" কালীপ্রসন্নবাবু উত্তরে তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—"ছেলেটিকে আমার নিকট একবার পাঠিয়ে দেবেন তো।" শ্রীনাথ সেন মহাশয় আমাকে ধরিয়া বসিলেন—"চল, তোমাকে কালীপ্রসন্ন বাবু দেখা করিতে বলিয়াছেন।"

ইহার পূর্ব্বেই আমি কালীপ্রসন্ন বাবুর বান্ধবের রীতিমত পাঠক ছিলাম। তাঁহার 'প্রভাত চিন্তা' 'নিভৃত চিন্তা' ভাল করিয়া পড়িয়াছিলাম, এবং তাঁহার লর্ড রিপনকে বিদায় দেওয়ার উপলক্ষে সেই শ্রুতির অমৃত—ভাষার অপূর্ব্ব বিলাস—ওজস্বিনী বক্তৃতাটি শুনিয়াছিলাম। এত বড় লোকের কাছে যাইতে ভয় হইল এবং একটা গৌরবও বোধ করিলাম।

তিনি আমাকে বলিলেন, "সত্যি, তুমি এতটুকু ছেলে, হিন্দু ধ ছাড়িবে? যে ধর্ম্ম তপস্যা-লব্ধ—"

আমি বাধা দিয়া বলিলাম, "আপনি ভুল শুনিয়াছেন, আমি হিন্দুই আছি, হিন্দুই থাকিব, কয়েকটা দিন বাইবেল পড়িয়াছিলাম।"

তাঁহার সেই রক্তিম অধরের অন্তরালে সুশ্রেণীবদ্ধ দংক্তপক্তি হাসির ছটায় দীপ্ত হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, "সে ভাল, বাইবেল পড়িবে তাহাতে দোষ কি? অধ্যয়নই চির জীবনের ব্রত হওয়া দরকার। কেউ বিজ্ঞান, সাহিত্য, ধর্ম্মশাস্ত্র কেউ বা গণিত পাঠ করেন—কিন্তু সকলেই আনন্দের উৎসের সমভাবে সন্ধান পান?"

আমি বলিলাম—"এইটি আমাকে বুঝা ইয়া দিন। আমাদের ক্লাসে পূর্ণ রাউত সারাটি দিন গণিত নিয়ে ব্যস্ত, সে কি আমি প্যারাডাইজ লষ্ট কাব্য পড়িয়া যে আনন্দ পাই, তেমনই আনন্দ পায়? লগারিথেম কি তাহাকে সেই আনন্দ দিতে পারে, যাহা মিল্টনের কবিত্বে পাওয়া যায়? নিউটন কি সেই আনন্দ পেয়েছিলেন যাহা বাল্মীকি বা কালিদাস আস্বাদ করিয়া কাব্য লিখিয়াছিলেন?"

তাঁহার সে ওজস্বিনী ভাষার পুনরাবৃত্তি করিবার ব্যর্থ প্রয়াস পাইব না। কিন্তু তিনি যাহা বলিয়াছিলেন,তাহার মর্ম্ম এই:—"যে বিষয়ে যাঁহারা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ—তাঁহারা কল্পনাবলে একটা আনন্দের রাজ্যে আরোহণ করেন। কবি, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক—প্রত্যেকেরই সে রাজ্যে তুল্যাধিকার। মনে করিয়া দেখ যে দিন নিউটন একটা এ্যাপেলকে গাছের থেকে পড়িতে দেখিয়া "মাধ্যাকর্ষনের" ন্যায় একটা বিশ্বব্যাপী সূত্র আবিষ্কার করিলেন—সেদিন তাঁর মনের কি ভাব। সেই ছোট ফলটিকে যে শক্তি মাটিতে টানিয়া আনিল, সেই শক্তি মেঘলোক হ'তে বৃষ্টিকে ধরাতলে লইয়া আসে,—পর্ব্বতের শৃঙ্গ ভাঙ্গিলে সেই শক্তি তাহাকে ঝুঁটি ধরিয়া ধরণী গহ্বরে ফেলে,

—সর্ব্বত্র সেই মহাশক্তি দশদিক ব্যাপিয়া দুর্জ্জয়ভাবে ক্রীড়াশীল। ক্ষুদ্র একটা জলবিন্দুর উপর যেরূপ সমস্ত বিশ্বের প্রতিবিম্ব পতিত হয়,—তাঁহার আবিষ্কৃত নূতন তথ্যটির উপর সেইরূপ জগৎ ব্রহ্মাণ্ডের মূল-শক্তির ইঙ্গিত। সে দিন নিউটন যে আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন, যোগী-ঋষির ব্রহ্মানন্দের তাহা প্রায় কাছাকাছি।" আমি তাঁহার উদ্দীপনাময় ভাষা ও চোখের দীপ্তির একটা স্মৃতি লইয়া বাড়ীতে ফিরিলাম।

আমি আর বাইবেল পড়িতে যাই নাই। কিন্তু ইহার ছয় সাত মাস পরে একদিন পটুয়াটুলিতে ঢাকার বড় পোষ্টাফিসে উপুড় হইয়া একখানি পত্র ডাকবাক্সে ফেলিবার সময় একটা ঠাণ্ডা সরীসৃপের স্পর্শের ন্যায়—স্পর্শ অনুভব করিলাম, তখন শীতকাল। চমৎকৃত হইয়া মুখ ফিরাইয়া দেখিলাম, আমার পশ্চাতে দীর্ঘাকৃতি ক্ষীণদেহ আলিয়েট সাহেব আমার কাঁধে তাঁহার অকোমল ঠাণ্ডা হাতখানি রাখিয়াছেন। চারি চক্ষের মিলন হইলে তিনি রূঢ় ভাষায় বলিলেন, "Naughty boy, the Oxford Mission has taken a very bad notice of your conduct" দুষ্ট ছেলে, তোমার ব্যবহারে অক্সফোর্ড মিশনের ধারণা তোমার উপর খারাপ হইয়াছে।"

ইহার পর আলিয়েট সাহেবের সঙ্গে আমার জীবনে আর দেখা হয় নাই। স্মিথ সাহেব মরিয়া যাওয়াতে খ্রীষ্টানদের সঙ্গে আমার সমস্ত কারবার চুকিয়া গেল।

---

(১৩)

পরীক্ষা-সমস্যা।

আমার গণিতের প্রতি চির বিমুখতার দরুণ এল, এ পরীক্ষা যে কোন কালেই পাশ করিতে পারিব – কেহই তাহা বিশ্বাস করিতেন না। সমস্ত পাঠ্য পুস্তকের প্রতিই আমি নিতান্ত নিশ্চেষ্ট উদাসীনতা দেখাইয়াছি। বুথ সাহেবের (গণিতের অধ্যাপক) ঘণ্টায় আমি ও ইয়াসিনউদ্দিন গ্যালারীর সর্ব্বোচ্চমঞ্চে বসিয়া ছবি আঁকিয়াছি। ইংরেজীর অধ্যাপক এস, সি হিল সাহেব আমায় বড় ভালবাসিতেন, আমি ক্লাসে সর্ব্বাপেক্ষা ছোট ছিলাম, তিনি আমাকে কত রকমের রহস্য করিতেন। আমাদের অধ্যাপক সারদারঞ্জন সাহেবদের সঙ্গে ঝগড়া করিয়া গবর্ণমেণ্টের কাজ ছাড়িয়া দিয়া মেট্রপলিটনের অধ্যাপক হইলেন। কালজিয়েট স্কুলের প্রসন্ন পণ্ডিত কলেজের অধ্যাপকের পদে উন্নীত হইয়া রঘুবংশের ত্রয়োদশ অধ্যায় পড়াইতে লাগিলেন,—একদিন ক্লাসে গোলমাল করাতে তিনি আমার কান মলিয়া বেঞ্চীর উপর দাঁড় করাইয়া দিয়া গর্জ্জন করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন –"কলেজে পড়্ ছিস্ বলে ভেবেছিস্. আমার মার-ধরের হাত এড়াইয়াছিস! এর পরে একখানি ভাল বেত নিয়ে আস্ব।" ফার্ট-ইয়ারের কোন ছেলেকে এখন এইরূপ ব্যবহার করিলে সেটা একটা অদ্ভুত কাণ্ড হইত। আমি ক্লাসে খুব ছোট থাকাতে আমার এইরূপ দৌরাত্ম্য সহ্য করিতে হইত। আমাদের সংস্কৃতের সিনিয়র অধ্যাপক কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, লজিকের অধ্যাপক মিঃ পি. কে, রায় অতিশয় দয়ালু ছিলেন –ইঁহারা ক্লাসের ছেলেদের প্রতি দুর্ব্ব্যবহার করিতেন না।

পরীক্ষা নিকটে আসিল। আমি আমার চিরন্তনী রীতি অনুসরণ করিয়া পরীক্ষার ঠিক একমাস পূর্ব্বে পাঠ্যপুস্তক হাতে লইলাম। দুই চার দিনের মধ্যে ইংরেজী পড়িয়া ফেলিলাম। কারণ ইংরেজীতে আমি সেক্সপীয়র, শেলি, বাইরণ, টেনের ইংরেজী সাহিত্যের ইতিহাস প্রভৃতি বড় বড় বই পড়িয়া ফেলিয়াছি,—এল, এ পরীক্ষার পাঠ্য আয়ত্ত করিতে সময় লাগিল না। ট্রিগণমেট্রি ও গণিতের অন্যান্য পুস্তকের কতক অংশ কপাল-ঠোকা ভাবে মুখস্থ করিয়া ফেলিলাম। সেই সকল জায়গা হইতে প্রশ্ন আসিলে পারিব, না হইলে নয়। গ্যানোর ফিজিক্স ভারি বই, উহা আমার ছিল না, ইতিপূর্ব্বে উহার আকারটা দেখিয়াছিলাম মাত্র, কোন দিন পাতা উল্টাই নাই। উহাতে ১০০ নম্বর ছিল, ১৫এর নীচে পাইলে নম্বর গণা হইত না, পাশ সম্বন্ধে ঐ বিষয়ে কোন বাধ্য-বাধকতা ছিল না।

ইংরেজীতে পরীক্ষা হইয়া গেল। গণিতের পরীক্ষা দিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেলাম—পাশের নম্বর থাকিবে। কিন্তু গ্যাণোর ফিজিক্সের ১৫ নম্বর না থাকিলে পাশ থাকে না। তখন প্রত্যূষে পরীক্ষা হইত। গণিতের পরীক্ষা শেষ হইলে আমি বেলা ১০টার সময় বাড়ী আসিয়া আহার সমাধা করিলাম, পরদিন ৬৷০ টায় পরীক্ষা। শুধু নাম শুনেছি—তখনও চোখে দেখিনি—গ্যানোর সঙ্গে প্রায় এবম্বিধ পরিচয়। ১০টার পর মহেন্দ্রলাল রায়দের মেসে গেলাম, সে কাইস্নারের ভাল ছাত্র, আমি তাহাকে বলিলাম, "তোরা গ্যানোর কতদূর পড়িয়াছিস্?" সে বলিল "অর্দ্ধেকটা।" গ্যানোর দুই পেপার। পুরো বইতে ১০০ নম্বর, এবং এক একটা পেপারে ৫০। আমি মহেন্দ্রকে বলিলাম "তুই চল্, আমার সঙ্গে তোর গ্যানো নিয়ে।' মহেন্দ্র গ্যাণো নিয়ে আমাদের বাসায় আসিল—সে ঐ বই ভাল করিয়া পড়িয়াছিল, উহার প্রায় তিন শত পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত প্রথমার্দ্ধ, দ্বিতীয়ার্দ্ধও তদ্রূপ। সে পড়িয়া যাইতে লাগিল, এবং যেখানে

আমার খট্‌কা লাগিল তাহা বুঝাইয়া বলিল। অধিকাংশই যন্ত্রাদির কথা। আমি নিজে নিজে চেষ্টা করিলে যেটি বুঝিতে দুই ঘণ্টা লাগিত,তাহা তাহার সাহায্যে আমি পাঁচ মিনিটের মধ্যে বুঝিতে পারিলাম। এই ভাবে বেলা বারটা হইতে রাত্রি নয়টার মধ্যে প্রথমার্দ্ধ পড়া শেষ হইল। তার পর সে বিদায় লইল। আমি নয়টা হইতে দুইটার মধ্যে সেই অংশ আবার নিজে পড়িয়া ফেলিলাম। তারপর ২টা হইতে ৪টার মধ্যে আর একবার পড়া হইল এবং ছয়টার সময় কলম ও ছুরি লইয়া পরীক্ষা দিতে গেলাম। প্রশ্ন পড়িয়া দেখিলাম, সকলটিই জানি, খুব আনন্দের সহিত উত্তর করিলাম। বাসায় আসিয়া দেখি প্রায় সব উত্তরই ভুল হইয়াছে। অর্থাৎ যন্ত্রগুলির ভারি গোলমাল করিয়া বসিয়াছি। হাইড্রলিক প্রেসের বৃত্তান্ত লিখিতে যাইয়া অপর কোন এক যন্ত্রের কথা লিখিয়াছি। এত অল্প সময়ের মধ্যে নামগুলি ঠিক মনে রাখিতে পারি নাই। হিসাব করিয়া দেখিলাম, ৫০এর মধ্যে ১২ পাইব, আর সকলই ভুল হইয়াছে। তখন ভাবিলাম, যদি আর একটি দিন হাতে পাইতাম, তবে হয়ত ৫০এর মধ্যে ৫০ই পাইতাম। কারণ বুঝিবার বা শিখিবার কিছু বাকী ছিল না।

সে দিন শনিবার, "ভাবিলাম যাহা হউক, এক পেপারে ১২ পাইব, আর এক পেপারে ৩ পাইলেই তো ১৫ হইবে, তাহা হইলে তো নম্বর গণনার মধ্যে থাকিবে। সেদিন শনিবার, অর্দ্ধ দিবস পাইলাম, শনিবারের রাত্রি, পুরো রবিবারটা ও রবিবারের রাত্রিটা। এতটা সময়ে কি ৫০ এর মধ্যে ৩ পাইবার উপযুক্ত পাঠ প্রস্তুত করিতে পারিব না? পূর্ব্বের তো আধ দিনে ও একটা রাত্রের পরিশ্রমের ফলে ৫০ এর মধ্যে ১২ পাইয়াছি।" অনেকটা আশ্বস্ত হইয়া ১১ টার সময় ঘুমাইয়া পড়িলাম। একটার সময় ঘুম ভাঙ্গিলে মহেন্দ্রের গ্যানো খানি লইয়া বসিয়া গেলাম। কিন্তু এক বিপদ, সে দিন বুঝাইয়া দিবার কোন লোক ছিল না। মহেন্দ্র

প্রভৃতি প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রেরা শুধু অর্দ্ধেক বই পড়িয়াছেন। দ্বিতীয় বার্ষিকের ছাত্রেরা পরীক্ষায় ব্যস্ত, তৃতীয় বার্ষিকের লোকেরা গ্যানো পড়েন নাই।

সুতরাং পুস্তক একাই পড়িয়া বুঝিতে হইবে,—দ্বিতীয়ার্দ্ধের প্রথমেই চক্ষুর বিবরণ, কিরূপে চক্ষুতে দৃষ্টি সঞ্চার হয়, কোন্ স্নায়ু ও উপস্নায়ু যোগে চোখের পর্দ্দায় কি ভাবে দৃষ্টি জন্মিয়া থাকে,—এই সকল কথা। আমি তিন ঘণ্টা চেষ্টা করিয়াও তিন পাতা বুঝিতে পারিলাম না। ভয়ে শরীরে ঘাম বাহির হইতে লাগিল। পূর্ব্ব দিনের যে প্রবল উৎসাহ ও উদ্যম ছিল, তাহা কোথায় চলিয়া গেল? যতই বুঝিতে চেষ্টা করি ততই যেন সব আরো বেশী গুলাইয়া যাইতে লাগিল। প্রায় সারা রাত্রি চেষ্টা করিয়া বিফল হইলাম। উদ্যম-হীন দেহ, নিষ্প্রভ চক্ষু লইয়া যেন চারিদিকে আঁধার দেখিতে লাগিলাম। যদি গণিতে ফেল হইতাম, তবে আক্ষেপ থাকিত না। গ্যানোর প্রথমার্দ্ধে যদি কিছু না পাইতাম তথাপি আক্ষেপ থাকিত না, কিন্তু শুধু তিন নম্বরের জন্য সমস্ত মাটি হইল এই জন্যই বড়ই আক্ষেপ হইল। আমি হতাশ ভাবে অবসন্ন হইয়া ঘুমাইয়া পড়িলাম। পর দিন বেলা দশটার সময় ঘুম ভাঙ্গিল। কোন মতে কিছু উদরস্থ করিয়া মনে মনে ভাবিলাম, এবার দৈবের উপর নির্ভর করিব। প্রায় তিন শত পত্রের মধ্যে, প্রথম বিষয়টা চক্ষু-সম্বন্ধীয় ১০।১২ পৃষ্ঠা। স্থির করিলাম, এই ১০।১২ পৃষ্ঠা একবারে মুখস্থ করিয়া ফেলিব। ইহা হইতে কোন প্রশ্ন আসিলে পারিব,—না হয় ফেল হইব। একবারে হাল ছাড়িয়া দেওয়া কিছু নয়। সুতরাং প্রায় ৫।৬ ঘণ্টা পড়িয়া সেই ১০।১২ পাতা এক বারে কণ্ঠস্থ করিয়া ফেলিলাম। পরদিন প্রাতে সেই মুখস্থ জিনিষ-টাকে পুনরায় আবৃত্তি করিয়া লইয়া পরীক্ষা-গৃহে গেলাম। এবং প্রশ্ন হাতে লইয়া দেখিলাম, প্রথম প্রশ্নটি সেই অধ্যায় হইতেই আসিয়াছে—

এবং তাহার নম্বর পাঁচ। আর আমায় পাশ ঠেকায় কে? এখানে বলা প্রয়োজন, তখনকার দিনে পাশ করাটা খুব সোজা ছিল না। পরীক্ষকেরা ছাত্রদেরে খাল করিবার জন্যই যেন অস্ত্র শানাইয়াই বসি থাকিতেন।

সাহিত্যিক বন্ধুগণ, বিপদ ও গৃহত্যাগ।

এই ভাবে তৃতীয় শ্রেণীতে এল এ পরীক্ষা পাশ করিয়া তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে ভর্ত্তি হইলাম। আর কিছু না হইলেও আমি ইংরেজী সাহিত্যে অনেক খানি অগ্রসর হইয়াছিলাম। তখন ইংরেজীতে যাহারা এম. এ পরীক্ষায় উচ্চ স্থান অধিকার করিয়া ছিলেন, তাঁহারাও অনেক সময়ে আমার সঙ্গে ইংরেজী সাহিত্য-বিচারে আমাকে পরাভূত করিতে পারিতেন না।

তখন ইংরেজী সাহিত্য যে আগ্রহে পড়িয়াছিলাম, তাহা কতকটা অদ্ভুত রকমের বটে। একটু দূরে থাকিলে রামদয়ালের সঙ্গে চিঠি-ব্যবহার চলিত। সে সকল চিঠি এক একটা অজগর প্রবন্ধ। তাহাতে কত যে ইংরেজীর ফ্রেজ লাগাইবার চেষ্টা, কথায় কথায় বড় বড় কবি গণের লেখা হইতে ছত্র তুলিয়া বাহাদুরী নেওয়া, জীবন-মরণের কত সমস্যার সমাধান, কত প্রণয়ী-প্রণয়িনীর প্রণয়, ধর্ম্ম তত্ব - সমাজ তত্ব থাকিত, তা বলিয়া শেষ করা যায় না। রামদয়াল ইহার মধ্যে আবার বারক্লির থিউরির বুকনি দিত এবং 'পারমেমেণ্ট গ্রুপস অব সেন্সেসন' ও শঙ্করের মায়া-বাদ লইয়া তর্ক তুলিত। ইউবার বেগ, মিল ও স্পেন্সারের মত শুনাইয়া দিত। আমরাও তখন বি. এ তে ফিলসফি পড়িতাম, সুতরাং যদিও রাম দয়াল তখন ফিলজফিতে এম এ পাশ করিয়া ছিল, তথাপি আমি তাহার বক্তৃতা গুলির নীরব শ্রোতা ও পাঠক হইয়া থাকিতাম না, কখন ও শিলার যে কিরূপে শৈশবে গাছে চড়িয়া বিদ্যুৎ আকাশের কোন ছিদ্র দিয়া বাহির হয়, তাহাই আবিষ্কারের চেষ্টা করিতেন—সেই

প্রসঙ্গ লইয়া পত্রে কবিত্বের ফোয়ারা ছুটাইয়া দিতাম, কখন ও বা বাই-রণকে তাঁর পত্নী কেন ত্যাগ করিয়াছিলেন, সেই তত্ত্ব নির্ণয় করিতে যাইয়া আঁধারে ঢিল ছুড়িতাম। রামদয়াল ও আমি একত্র হইয়া তখন কত যে বৈষ্ণব পদ পড়িয়াছি এবং বঙ্গীয় রমণী রচিত সংস্কৃত মাধবীলতার সম্বন্ধীয় "শান্তিময়ি ত্বং মাং কথয়েদম্" প্রভৃতি শ্লোক আবৃত্তি করিয়াছি—তাহার লেখা জোখা নাই। কিন্তু তখন রাজনৈতিক বিষয় লইয়া ছাত্রের দল বড় মাথা ঘামাইত না। সে বিষয়টা ইংরেজ শাসকগণেরই প্রায় একচেটিয়া বিষয় ছিল।

ইহার মধ্যে দীনেশ চরণ বসু মহাশয় "ঢাকা-প্রকাশে"র সম্পাদক হইয়া আসিলেন। যে দীনেশ বসুর 'কবি কাহিনী' শৈশবে আমাকে কবিত্বের স্বপ্নলোকে লইয়া গিয়াছে; যাহার "তুই কি জানিবি সখি, মরমের বেদনা ?" এবং "কখনও রন্ধনশালে করিছ রন্ধন, দ্বিগুণ শোণিত মুখ লোহিত বিভায়" প্রভৃতি কবিতা শৈশবে রাত দিন আওড়াইতাম, তিনি আসিয়াছেন শুনিয়া অতিশয় আগ্রহে তাঁহার সহিত দেখা করিতে গেলাম। দেখিলাম, ইস্‌লামপুর দ্বিতল বাড়ীর ছোট একটি ঘরে চারি দিকে কাগজের স্তূপ, 'ঢাকা প্রকাশ আফিসে" বসু মহাশয় বসিয়া আছেন। তাঁহার বয়স তখন ৩৪, আমার বয়স ১৭।১৮, ঠিক অর্দ্ধেক। বসু মহাশয় চক্ষু দুটি খুব বড় বড়, রংটি ফর্সা অতি মৃদু এবং অল্প-ভাষী, তাঁহার তেজ, বিক্রম কিছুই দেখিতে পাইলাম না, খাটো চেহারাটি। কেবল শান্ত দুটি চোখের অলস মধুর দৃষ্টিতে যেন করুণ কবিত্বের আভা বিকীর্ণ করিতেছিল। কাণে একটু খাটো,--পণ্ডিত রজনীকান্ত গুপ্তের মত নহে—যাঁহার সঙ্গে কথা বলিতে হইলে রীতিমত ঢাক বাজাইতে হইত। কতকটা "হিমালয়ে"র জলধর দার মত।

দীনেশবসু মহাশয়ের সঙ্গে শীঘ্রই আমার বেশ ভাব হইয়া গেল, তিনি

ইংরেজীতে সুপণ্ডিত ছিলেন, তাঁহার ইংরেজী লেখার প্রণালীটিও সুন্দর—বিশুদ্ধ ছিল। আমার শত শত কবিতা তাহাকে পড়িতে দিয়াছিলাম। এবং 'ঢাকা প্রকাশে' আমি কয়েকটি গল্প সন্দর্ভ ও লিখিয়াছিলাম। তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন "তোমার কবিতা মাঝে মাঝে দুই একটি ভাল হয়, কিন্তু তা তোমার গল্পের সঙ্গে তুলনীয় নহে—আমি ভবিষ্যদ্বাণী করিতেছি, তুমি গল্প লিখিয়া যশ অর্জ্জন করিবে।" ইহার কিছু পরে আমি সাত পৃষ্ঠা ব্যাপক এক খানি চিঠিতে আমার বাল্য-জীবনের একটা ইতিহাস লিখিয়া পাঠাইয়া ছিলাম, তাহা পড়িয়া তিনি এত খুসী হইয়া ছিলেন যে আমাকে তখনই বঙ্গীয় গল্প-লেখকদের মধ্যে একটা বিশিষ্ট আসন দেওয়ার অনুকূলে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। একদিন বসু মহাশয়কে সঙ্গে করিয়া আমি ঢাকা কলেজের হোষ্টেল দেখিতে গিয়া ছিলাম, কলেজের ছেলেরা তাঁহাকে নানারূপ মিষ্টান্ন ও ফুলের মালা প্রভৃতির দ্বারা অভ্যর্থনা করিয়াছিল।

ঢাকায় আমি ছাত্র-মহলে কবি ও সাহিত্যিক নামে ইহার মধ্যেই পরিচিত হইয়াছিলাম। তাঁহারা জানিত আমি স্বপ্নলোকে বিচরণ করি। আমার দীর্ঘকেশ,—সংসারানভিজ্ঞতা, পাঠ্য-পুস্তকের প্রতি বিরাগ—সমস্ত বৈষয়িক ব্যাপারের উপর অশ্রদ্ধা - এ সকলই তাহারা কবিত্বের লক্ষণ মনে করিত ; এমন কি আমার বড় বড় দুটি চোখ এবং ভূলুণ্ঠিত উত্তরীয়, ও অনির্দ্দিষ্ট ভাবে পথে পদচারণ ও দিবারাত্রি ভেদ-জ্ঞান-হীন তর্কানুরাগ—এ সমস্তই নাকি তাহাদিগকে সেই কথাই বুঝাইয়াছিল। আমি যে সকল কবিতা লিখিয়াছিলাম, ফেন-গিরীশ ছাড়াও এখন তাহার বিস্তর বিস্ময়-বিমূঢ় ভক্ত শ্রোতা জুটিয়া গিয়াছিল।

এই খানে আমার ঢাকা-জীবনের শেষ হইবে।

ইহার পর পিতামাতা ও ভগিনীদের মৃত্যুতে আমার বুকের উপর

দিয়া ঝড় বহিয়া গেল. সমস্ত আশা ও উত্তমের দীপ নিবাইয়া দিয়া গেল। আমার ভগিনী-পতি নবরায় মহাশয়ের বাসা ছিল ঢাকা শাঁখারী বাজারে। আমি ঝগড়া করিয়া তাঁহার বাড়ীতে যাওয়া বন্ধ করিয়া দিয়াছিলাম। একদিন সেই বাড়ীর সংলগ্ন একটা মেসে আমার সহধ্যায়ী একজনের সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিলাম- কথা বার্ত্তা বলিয়া সিঁড়ি দিয়া নামিব, এমন সময় দেখিতে পাইলাম, নবরায় মহাশয়ের বাড়ীর একটা খড়-খড়ীর পাখী খুলিয়া আমার চতুর্দ্দশ-বর্ষ বয়স্কা ভগিণী কাদম্বিনী তাহার শান্ত সুন্দর দু'টি চোখ দিয়া সতৃষ্ণ ভাবে আমায় দেখিতেছে, তাহার নিবিড় চুলরাশি কপালের কাছে দুলিয়া দুলিয়া এক একবার মুখ খানি ঢাকিয়া ফেলিতেছে। মনে হইল একবার যাই দেখিয়া আসি, কিন্তু নবরায়ের সঙ্গে ঝগড়ার কথা মনে হইয়া গেলাম না। এই ঘটনার চার পাঁচ দিন পরে একদিন বেলা পাঁচটার সময় সেই বাড়ী হইতে একটা লোক হাঁপা-ইতে হাঁপাইতে আসিয়া সংবাদ দিয়া গেল, আমার ভগিনী হঠাৎ অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছে, কিছুতেই জ্ঞান হইতেছে না। আমি, হেম গিরীশ ও জগদীশ দাদার সহিত গিয়া দেখিলাম, কাদম্বিনী যেন ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, নব যৌবন ফুল্ল সুস্থ সুন্দর দেহ যে মৃত্যুর কবলিত তাহা তখন বুঝিয়া ও বুঝিতে পারি নাই। সন্ন্যাস-রোগে সে আমাদিগকে ছাড়িয়া গেল।

তার পর বগজুরী গেলাম। মা কন্যার শোকে কাতর, মৃণ্ময়ী মায়ের কাছে আছে —আমি সন্ধ্যার সময় রোজ মত গ্রামে যাইয়া যাদবানন্দ দাসগুপ্ত কবিরাজ মহাশয়ের সঙ্গে গল্পের আড্ডা দিতাম। জমিদার প্রসন্নকুমার সেনের নির্জ্জন বাগান-বাড়ীতে বসিয়া অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত আলাপ করিতাম। যাদবানন্দ ভারতীতে লিখিতেন—তিনি সাহিত্য-প্রসঙ্গ পাইলে গল্পে মজিয়া যাইতেন। আমি আর তিনি প্রায়ই গল্প করিতে করিতে রাত্রি ১২টা বাজিয়া যাইত। তাঁহার বাড়ী অতি কাছে। আমি

পল্লীগ্রামের সেই নিঝুম মেঠো পথ দিয়া—একা চলিয়া যাইতাম। আঁধার পথ চারিদিকে জঙ্গল, তখন আষাঢ় মাস—পথে সর্পভীতি,—মা এবং আমার সেই ষোড়শ বর্ষীয়া ভগিনী মৃণ্ময়ী ঘুমাইতেন না, তাঁহারা পথের ধারে দাঁড়াইয়া আমি আসিতেছি কি না দেখিতেন। কতবার ঘর হইতে বাহির হইয়া গেটের কাছে পায়ের শব্দ পাইলে "মিছির"—দাড়োয়ানকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিতেন "খোকা আসিয়াছে কি ?"

এই সকল বৃথা কষ্ট আমি মাকে দিয়াছি।

ইহার একমাস পরে মৃণ্ময়ী ধনুষ্টঙ্কার রোগে প্রাণত্যাগ করে, তিন দিন সে রোগের কষ্ট পাইয়াছিল। তাহার ফুল্ল পদ্ম কোরক তুল্য সুন্দর ও বড় দুটি চোখ চির দিনের জন্য নিমীলিত হইয়া গেল। তাহার সেই দুটি চোখের কথা মনে পড়িলে এখনও আমি আমার চোখের জল সম্বরণ করিতে পারি না। হিরণ্ময়ী প্রতিমা "মৃণ্ময়ী"র মূর্ত্তি আজ ১৫ বৎসর পরেও আমি মাঝে মাঝে স্বপ্নে দেখিতে পাই।

পিতা ওকালতী ছাড়িয়া বাড়ী আসিলেন। মা, আমি—আমরা সকলেই সুরাপুর আসিলাম। ইহার মধ্যে বাতব্যাধি হওয়ায় আমার দক্ষিণাঙ্গ অবশ হইয়া গেল।

ইহার কিছু দিন পরে বহুদিন বহুমূত্র রোগে ভুগিয়া বাবা মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন এবং তাহার ৫ মাস পরে হাঁপানি রোগে মা ও তাঁহার কাছে চলিয়া গেলেন। যিনি জীবন ভরিয়া বাবার সঙ্গে কলহ করিয়াছিলেন, তাঁহার মৃত্যুর পর তিনি যেরূপ শোকাকুলা হইয়াছিলেন, সেরূপ শোক সচরাচর দেখা যায় না। স্বামী-শোক তিনি দীর্ঘকাল সহিতে পারিলেন না।

ফাল্গুন মাসে আমাদের বাড়ী খালি হইয়া পড়িল, বসন্তের হাওয়ায় আমার নষ্ট স্বাস্থ্যের উদ্ধার হইয়াছিল। আমার দক্ষিনাঙ্গ সবল হইয়া-

ছিল। সাভারের বিখ্যাত স্বর্গীয় গুরুচরণ কবিরাজ আমার চিকিৎসা করিয়াছিলেন।

বাড়ীতে দিদি দিগ্বসনী ও স্ত্রী রহিলেন। আমি বগজুরী মাতুলালয়ে চলিয়া আসিলাম। সেই সময় জীবনে কি অসামান্য দুঃখই না পাইয়াছিলাম! সারা রাত্রি কাঁদিয়া চক্ষু দুটি জবাফুলের মত করিয়া ফেলিতাম, কখনও কবিতা কখনও গদ্য লিখিতে থাকিতাম, চোখের জলে কাগজ ভাসিয়া যাইত,—কখন কাগজ কলম ছুড়িয়া ফেলিয়া আত্মহত্যার জন্য দড়ি খুঁজিতাম। পূজার সময় আসরের আনন্দ আমার নিরানন্দই বেশী জাগাইত, ঢাক ঢোলের বাদ্য অপেক্ষা সদ্য বলী দেওয়ার জন্য যূপকাষ্ঠে বদ্ধ ছাগ শিশুর তীব্র আর্ত্তনাদ আমার মর্ম্মবেদনার অনুকূল হইত। আমি একা এক বিছানায় শুইয়া সেই বলির পাঠার সুরের সঙ্গে সুর মিশাইয়া মা বলিয়া কাঁদিতাম। একদিন প্রভাস যাত্রা হইতেছিল, যশোদা কোনরূপে দ্বারীদের নিকট প্রবেশ পথ পাইলেন না। কৃষ্ণ যজ্ঞ করিতে ছিলেন—হঠাৎ তাঁহার হাত হইতে স্রুক পড়িয়া গেল, তাঁহার যশোদার আঙ্গিনার কথা মনে পড়িল, অমনই বলাই দাদার গলা জড়াইয়া ধরিয়া গাইলেন "দাদা বল বল, আমার দুঃখিনী মা কোথায় গেল" তখন মা যশোদা দ্বারীর নিষ্ঠুরতায় অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিলেন। সেই সুরে আমার সমস্ত শরীর কেন কাঁপিয়া উঠিল, আমি কাঁদিয়া আসর ত্যাগ করিলাম। এবং সে রাত্রির মধ্যে চোখের জল একবারও শুকাইল না। মায়ের একমাত্র ছেলে যারা—তারা মাতৃহারা হইলে মায়ের অভাব এমনই করিয়া বুঝিয়া থাকে।

পড়াশুনা ত্যাগ হইল। বাড়ীতে যে দুইটি প্রাণী ছিলেন এবং আমাদের বহুকালের প্রজা ও পরিচারিকা কর্পূরা দিদি—ইহাদের ভরণপোষণের ভার আমার উপর। আমি ঢাকা হইতে শ্রীহট্ট হবিগঞ্জ চলিয়া আসিলাম,

আমার মাতুল এত বড়লোক, আমার অবস্থায় অত্যন্ত দুঃখ করিলেন কিন্তু আমার সঙ্গে একটি লোক দিলেন না। আমি ১৮ বৎসর বয়সে ১৮৮৭ সনে হবিগঞ্জ রওনা হইলাম। তখনও আমি খুব গোঁড়া হিন্দু—জাহাজে কিছু খাইলাম না। সারাদিন উপবাস করিয়া জাহাজে নীরবে মা মা বলিয়া কাঁদিতে লাগিলাম. কেই বা মাতৃহারা বালকের খোঁজ রাখে! আমার অশ্রুর সাক্ষী শীতলাক্ষা ও ব্রহ্মপুত্র এবং আশ্বিনের সেই শারদীয় আকাশ, যাহা দিয়া হু হু শব্দে বায়ু বহিয়া যাইতেছিল। সন্ধ্যাকালে লালুয়ার টেক নামে এক জায়গায় জাহাজ হইতে নামিলাম। একখানি নৌকা আমার জন্য প্রস্তুত ছিল—তাহাতে উঠিয়া বিল পাড়ি দিতে লাগিলাম ও মাঝিদের উনুন গোময় দ্বারা শুদ্ধ করিয়া হাঁড়িতে ভাত চড়াইয়া দুটি আলু ভাতে দিলাম। সেই বিলে দুরন্ত হাওয়া—তারা ৪৯ ভাই, দুরন্ত শিশুর ন্যায় ছুটাছুটি করিতেছিল, তাহারা আমার উনুনের আগুন ফুঁ দিয়া নিবাইয়া দিতেছিল। ২ ঘণ্টা চেষ্টা করিয়া যাহা নাবাইলাম তাহা শুধুই চাল ও ধোয়া আলু—একটুও সিদ্ধ হয় নাই। তখন একদিন যে মাতার রান্না সদ্য ধরা ইলিসের ঝোল ও মাছ ভাজা এবং গোপাল ভোগ চালের ভাত—যাহা ঝরা শিউলী ফুলের মত দেখাইতেছিল, নৌকায় তাহা উপেক্ষা করিয়া যে তাঁর প্রাণে ব্যথা দিয়াছিলাম তাহা মনে পড়িয়া ঝরঝর করিয়া চক্ষু হইতে জল পড়িতে লাগিল। ভাত ও আলু ফেলিয়া দিলাম—শুধু চাল কেমন করিয়া খাইব! মুখ ধুইয়া মাঝিদের দেওয়া একখণ্ড সুপুরী চিবাইতে লাগিলাম ও এক হাতে চোখের জল মুছিতে লাগিলাম—যেন মাঝীরা টের না পায়।

---

(১৮)

হবিগঞ্জে।

তখনও স্কুল বন্ধ হয় নাই, আমি ৪০ টাকা বেতনে হবিগঞ্জস্কুলের তৃতীয় শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হইয়াছিলাম। হেড মাষ্টার ফণীভূষণ সেন বি এ এখন ইনি মিনিষ্টার প্রভাসচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের ছেলেদিগকে পড়াইতেছেন) আমার সম্পর্কে মামাত ভাই, দ্বিতীয় শিক্ষক শ্যামচাঁদ বসাক বি এ আমার সহাধ্যায়ী; ইনি গৌহাটি অঞ্চলে অনেক দিন রাজকীয় উচ্চ কাজ করিয়া এখন পেন্‌সন লইয়া ঢাকায় আছেন। আমি ফণীবাবুর বাসায়ই আশ্রয় লইলাম।

ফণীবাবুর পিতা হরিদাস সেন মহাশয় (আমার মাতুল) রোজ সন্ধ্যাকালে বাড়ীর ভিতর আসর জমকাইয়া বসিয়া কত গল্প করিতেন। তিনি রূপ কথার রাজা ছিলেন, কত "বেজান" সহরের কথা, রাজকুমার ও রাজকন্যার, পরী ও দৈত্যের কথা তিনি হাত নাড়িয়া বলিয়া যাইতেন। দাদা, ছোট ভাই বিধু, বৌদিদি ও আমি তাহা শুনিয়া মুগ্ধ হইতাম। খোয়াই বা ক্ষেমঙ্করী নদীর পাড়ে ছিল আমাদের বাসা, নদীটি পর্ব্বতদুহিতা, ছোট হইলেও দুর্জ্জয় শক্তিময়ী, আমারা তাঁহার স্রোতে এক মুহূর্ত্তও দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিতাম না। আমরা রোজই শুনিতাম, আঁধারে গা ঢাকা দিয়া কে একজন নৌকা বাহিয়া যাইত—তাঁহার পুঁজি একটিমাত্র গান ছিল--"মন মাঝি তোর বৈঠা নে রে আমি আর বাইতে পারি না।" কি মিষ্টি সুর! যেন ১৪।১৫ বৎসরের কোন কিশোরীকণ্ঠ

হইতে সেই অমৃত সংগীত ধ্বনিত হইত। গানটি বহুদূর হইতে ভাসিয়া আসিয়া আমাদের বাসার কাছ দিয়া দূর-দূরান্তরে চলিয়া যাইত। আমরা মনে ভাবিতাম, গায়ক কেমন সুন্দর; কেউ বলিতেন, "ও কোন ১৬।১৭ বয়সের বামুনের ছেলে, বর্ণ তপ্ত সোনার ন্যায়' কেউ বলিতেন, "ছেলেটি নিশ্চয়ই উজ্জল শ্যামবর্ণ—ঠিক কৃষ্ণঠাকুরের মত," তার সেই সন্ধ্যার অভিসারকে প্রেম-বৈরাগ্য কল্পনা করিয়া আমরা তাহার সম্বন্ধে কত তর্ক বিতর্ক ও জটলা করিয়াছি। একদিন হাটের বার, আফিস স্কুল ছুটি, হঠাৎ বেলা দ্বিপ্রহরে আমাদের বাড়ীর কাছে শুনিলাম "মনমাঝি তোর বৈঠা-নেরে"—সেই চির পরিচিত মিষ্টসুর—রোজ যাহা সন্ধ্যায় শুনিতাম। বউ-দিদি, দাদা, বিধু এমন কি হুকা হাতে করিয়া মামা পর্য্যন্ত হুড়মুড়ি করিয়া আমরা খোয়াই নদীর পাড়ে গায়ককে দেখিবার জন্য ছুটিয়া আসিলাম, গায়ক আমাদের কাছ দিয়া গাইতে গাইতে চলিয়া গেল, দেখিলাম সে অতিবৃদ্ধ জরাজীর্ণ কৃষ্ণকায় একটি বৃদ্ধ, একটি কাঁথা গায়ে দিয়া গান করিতে করিতে বৈঠা বাহিয়া চলিতেছে। আমরা এইরূপ সকল বিষয় লইয়া হবিগঞ্জে আমোদে থাকিতাম।

দাদা মাহিয়ানা পাইতেন ৮০৲ টাকা। মামার ছিল খুব খরচের হাত; তিনি দশ পনের দিনের মধ্যে সমস্ত খরচ করিয়া ফেলিতেন। দাদা মামাকে খুব ভয় করিতেন, কিন্তু এইরূপ অতিরিক্ত খরচের জন্য আমার কাছে প্রায়ই বিরক্তি প্রকাশ করিতেন। একদিনের কথা মনে আছে, দাদা সেই দিন মাহিয়ানা পাইয়া টাকা মামার হাতে দিয়াছেন। মামা বৈকালে "ফুকাই" চাকরকে সঙ্গে করিয়া বাজারে গেলেন। সন্ধ্যার পর দেখিলাম, ফুকাইএর মাথায় একটা গন্ধ-মাদন প্রতিম বোঝা চাপাইয়া মামা হন্ হন্ করিয়া আসিতেছেন; তিনি উঠানে বোঝা নামাইবার আদেশ দিয়া দাদাকে বলিলেন "দেখ—এই চিতল মাছটা, তুমি ইহার

পেটটা ভালবাস, সস্তায় পাইয়াছি, মাত্র ২৲ টাকা হইয়াছে। আর একটা ডেগ আনিয়াছি ৭।০ টাকা, বউমা মেটে হাঁড়িতে রান্না করিতে কষ্ট পান" —মামার সাগ্রহ বর্ণনায় বাধা দিয়া দাদা বলিলেন "একদিনেই যদি এত খরচ করিয়া ফেলিলেন, মাসের বাকিটা কি করিয়া চলিবে?" এই কথায় মামার সমস্ত আগ্রহ জুড়াইয়া গেল। তিনি দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া ফুঁকাইএর দ্বারা এক সিলিম তামাক সাজাইয়া দাওয়ায় বসিয়া টানিতে লাগিলেন।

রান্না হওয়ার পর খাবার ডাক পড়িল। মামা বলিলেন "ক্ষুধা নাই।" বৌদিদি যাইয়া মামাকে ডাকিতে লাগিলেন একই উত্তর "ক্ষুধা নাই।" মামী যাইয়া পীড়াপীড়ি করিলেন, বিধু যাইয়া বলিল "বাবা, আসুন খাই গিয়ে।" কিন্তু তাহার সেই একই উত্তর। দাদা তখন বলিলেন,—"সংসারে ধার কর্জ্জ হইলে শেষে মুস্কিল হইবে, এজন্য কি একটা কথা বলিয়াছি যে তার জন্য এমন কচ্ছেন? আমায় "না হয় মাপ করুন।" কিন্তু মামা কপট সারল্য দেখাইয়া বলিলেন,"না সত্যিই বল্‌ছি আমার ক্ষুধা নাই, এই বলিয়া কৃত্রিম ঢেকুর তুলিয়া বাক্যের সত্যতা প্রমাণ করিতে লাগিলেন; ফুকাই ক্রমাগত তামাক যোগাইতে লাগিল এবং তিনি ক্রমাগত সেইভাবে গুড়ুক টানিতে লাগিলেন। আমাকে মামা বড়ই ভালবাসিতেন, সব্বাই তাঁহাকে সাধিল, কিন্তু আমি সাধি নাই। যখন সকলে হতাশ হইয়া বলিলেন "কি হইবে? উনি যখন খাইবেন না, চল আমরা যাইয়া খাই" এবং আমার ডাক পড়িল, তখন আমি বলিলাম, "মামা খাইবেন না"? উত্তরে শুনিলাম তিনি কিছুতেই সম্মত হন নাই, তখন আমি বলিলাম "আমার ক্ষুধা নাই, আমি খাইব না" আমাকে জনে জনে আসিয়া সাধিতে লাগিলেন, আমি সেই একই উত্তর দিলাম। তখন দেখি মামা স্বয়ং হুকা হাতে আসিয়া আমায় বলিলেন "সে কি কথা, এমন সুন্দর চিতল মাছটা

এনেছি, তুমি খাইবে না ?” আমি বলিলাম “আপনি না খাইলে আমি খাইব না ” অনেক কথা কাটাকাটির পর আমার জয় হইল। তিনি খাইলেন। খাওয়ার পর কুকাইএর হাতের তৈরী আর একবার গুড়ুক টানিয়া বেজায় স্ফূর্তির সহিত বলিলেন “একটা সহর, তার মানুষ পাথর, গাছ-পাতা পাথর, গরু ঘোড়া প্রভৃতি জীবজন্তু পাথর, পাখী পাথর, পিঁজরায় দেওয়া জল ও চাল সকলই পাথর, সেই সহরের নাম “বেজান সহর” ইত্যাদি।

এইরূপ নানা ভাবের তরঙ্গে দিন কাটিয়া যাইত ; রাত্রি হইলে কবিতা লিখিতাম, ইংরেজী বই পড়িতাম ; রাত্রি যতই নিঝুম হইত, ততই মায়ের জন্য – বাবার জন্য প্রাণটা ছটফট করিয়া উঠিত, চক্ষে অবিরল ধারে জল পড়িত। দাদাকে যখন মামী “খোকা” বলিয়া ডাকিতেন, তখন আমায় যিনি ঐরূপ ভাবে ডাকিতেন, তাঁর কথা মনে করিয়া কষ্টে অশ্রুজল সংবরণ করিতাম। কতদিন গভীর রাত্রে উঠিয়া খোয়াই নদীর পাড়ে পদচারণ করিতে থাকিতাম,এবং একবার মনে করিতাম,“এই তেজস্বিনী নদীর জলে ঝাঁপাইয়া পড়ি, ইনি মাতৃহারা বালককে আশ্রয় দিবেন।” ঢাকায় থাকিতেই গোঁড়ামি ছাড়িয়া কয়েক দিন ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত করিয়াছিলাম। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী একবার ঢাকায় আসিয়াছিলেন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—‘যোগ’ যোগ’ যাহা শুনি,উহাই কি ভগবানকে পাইবার উপায়?”গোস্বামী মহাশয় তখন অনেকটা হিন্দুশাস্ত্র আলোচনা করিতেছিলেন, তিনি বলিলেন—যোগ্‌ সাংসারিক বিষয় লইয়াও হইতে পারে—যোগাবশিষ্ট রামায়ণে এইরূপ একটা প্রশ্ন বশিষ্ঠকে রামচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। বশিষ্ঠ উত্তর না দিয়া বলিলেন, মহারাজ—ঐ যে অদূরে বৃহৎ গাছটি আছে, উহা মূল শুদ্ধ তুলিয়া ফেলিতে আদেশ করুন, কিন্তু সাবধানে কোদাল চালাইতে হইবে, উহার নীচে একটা মানুষ আছে,

তার গায়ে যেন আঘাত না লাগে।" সেই ভাবে গাছটি উৎপাটন করিয়া সত্য সত্যই তাহার অনেকটা নীচে একটা জড়বৎ অজ্ঞান মানুষ বাহির হইল। বশিষ্ঠ যাইয়া নিজের হাত সেই লোকটার মুখের ভিতর দিয়া জিভটাকে টানিয়া সোজা করিয়া দিলেন, সে লোকটা জ্ঞান পাইল ও লাফাইয়া উঠিয়া রামচন্দ্রের কাছে যাইয়া প্রণাম করিয়া বলিল, "মহারাজ বক্‌সিস্ দিন" রামচন্দ্র কিছুই বুঝিতে পারিলেন না, বশিষ্ঠ বলিলেন— এই লোকটা যোগ অভ্যাস করিয়া কুম্ভক করিতে শিখিয়াছিল—শুধু অর্থোপার্জ্জনের উদ্দেশ্যে। এ ব্যক্তি কুম্ভক করিয়া অনেকটা ঊর্দ্ধে উঠিতে পারিত এবং নীচে নামিয়া পড়িলে দলের লোকেরা জিভ টানিয়া সোজা করিয়া দিলেই আবার জ্ঞান লাভ করিত। এই অবস্থায় একদিন লোকটি ঊর্দ্ধদেশ হইতে এক জলাশয়ে পড়িয়া যায়—সঙ্গীরা ইহাকে খুজিয়া না পাইয়া চলিয়া যায়। তারপর বহু যুগ চলিয়া গিয়াছে, জলাশয়ের জল শুকাইয়া তার উপর এই প্রকাণ্ড বৃক্ষটা হইয়াছিল; নিশ্বাস রোধ করিয়া জিভ ব্রহ্মতালুতে ঠেকাইয়া থাকাতে—উহার দেহ অবিনশ্বর হইয়াছিল। এখন আমি উহার জ্ঞান দিয়াছি। এ ব্যক্তি মনে করিতেছে, আপনি সেই রাজা, যাঁহার নিকট আকাশে উঠিয়া তামাসা দেখাইয়াছিল—একজ বক্‌সিস্ চাহিতেছে,:তারপর যে কত যুগ চলিয়া গিয়াছে তাহা উহার জ্ঞান নাই।"

এই বলিয়া গোস্বামী মহাশয় বলিলেন যোগ তাঁহাকে পাইবার পথ ও হইতে পারে; সাংসারিক সুখ ভোগ, ঐশ্বর্য্য লাভ প্রভৃতির উপায় ও হইতে পারে—উহা কতকটা শক্তি-লাভ মাত্র, অভ্যাস দ্বারা উপার্জ্জন করা যায়—ব্রহ্ম লাভের সঙ্গে উহার অপরিহার্য্য সাহচর্য্য নাই।

ইহার পর ঢাকার রামকুমার বিদ্যারত্ন আসিলেন, ইনি একজন বিশিষ্ট ব্রাহ্ম ছিলেন। ইঁহার মূর্ত্তি একবার 'সাহিত্যে' বাহির হইয়াছিল, এত বড়

লম্বা দাড়ী খুব কমই দেখা যায়। বিদ্যারত্ন মহাশয় ছাত্রদের জন্য একটা "সঙ্গত" সভা স্থাপন করিয়াছিলেন, আমাদের তাঁহার কাছে রোজ কি করি তাহা লিখিয়া দেখাইতে হইত। কি কি পাপ চিন্তা করি, কি কি কাজ করি, সকলই লিখিতে হইত। এই নিলর্জ্জতা আমি পছন্দ করি নাই—সুতরাং কতক দিন মাত্র তথায় যাইয়া আমি ব্রাহ্ম-সমাজের সঙ্গে সংশ্রব ত্যাগ করিয়া দিয়াছিলাম।

খ্রীষ্টান, ব্রাহ্ম প্রভৃতি সকলের সঙ্গে মিশিয়া দেখিলাম, শান্তি তো কোথাও পাওয়া গেল না। হবিগঞ্জ বসিয়া অনেক সময় একটা শান্তির স্থল খুঁজিতে থাকিতাম। কোথায় কে আছে, আমার মা যেমন ছিলেন, বাবা যেমন ছিলেন—এমন কি কেউ নাই? যিনি ইহাঁদিগকে দিয়াছিলেন, তিনি কি আমায় ছাড়িয়া দিলেন? এত আদর দেখাইয়া হঠাৎ আমাকে পথের ছেলের মত অনাথ করিয়া ফেলিলেন?

তার পরের বছর পূজায় বাড়ী আসিলাম, একজন বলিলেন, "ওরে বি, এ পরীক্ষাটা দিলি না?" আমি বলিলাম "দেব"; প্রশ্নকারী অবজ্ঞার ভাবে বলিলেন "আর দিয়াছিস্?" সেই অবজ্ঞা আমার মনে বড়ই লাগিল। আমি সেই দিনই থ্যাকার স্পিঙ্কের বাড়ীতে অর্ডার দিলাম। বই আসিল, ইংরাজীতে অনার্স দিব—স্থির করিলাম। কিন্তু ইংরেজীর ছয় খানি বই পাইলাম না।

অপরাপর বই যে দিন পাইলাম, তার পর দিন হবিগঞ্জ রওনা হইলাম। হবিগঞ্জ আসিয়া আমার জ্বর হইল—বড় প্রবল জ্বর, কারণ আমি জীবনটাকে বৃথা মনে করিয়া স্বাস্থ্যের কোন নিয়মই পালন করি নাই। এক মাস জ্বরে ভুগিয়া প্রায় মৃত্যুর সন্নিহিত হইলাম, তখন সুয়া-পুর হইতে দিদি এবং স্ত্রী আসিলেন। আর ও এক মাস পরে জ্বর ছাড়িয়া গেল, তখন পরীক্ষার দেড়মাস বাকী, আমি ফিস্ দিলাম। দাদাকে

বলিলাম, ইংরেজী ও ইতিহাসে, কিছু না পড়িলে ও, পাশ থাকিবে—শুধু পলিটিকাল ইকনমিটি পড়িব, এইটি নূতন—এই দেড় মাস স্কুলে পড়াইয়া "ফসেট" খানি ভাল করিয়া পড়িলাম। তার পর পরীক্ষা দিতে গেলাম। ইংরাজীর ছয় খানি বই চক্ষে দেখি নাই, বাকী গুলি দুই চার দিন পড়িয়াছি, তথাপি ইংরেজী ও ইতিহাসে আমার এমন সাধারণ জ্ঞান ছিল যে আমি ভয় খাইলাম না।

পরীক্ষা দিয়া হবিগঞ্জ ফিরিলাম, যথা সময়ে কয়েক জন পাশ হইয়াছেন, তাহাদের টেলিগ্রাফ আসিল। আমার বিস্তর বন্ধু ও আত্মীয় ছিলেন, নিশ্চয়ই পাশ হইলে তাঁহারা টেলি করিতেন। এমন কি অনেকের খবর চিঠিতেও পাওয়া গেল, তখন নিশ্চয় বুঝিলাম ফেল হইয়াছি। ফল ভাল না হইলেও কোন পরীক্ষায় এ পর্য্যন্ত ফেল হই নাই। গণিতের ঘাড়ে সকল দোষ চাপাইয়া ভাবিতাম, ইহার হাত এড়াইলে তো হাসিয়া খেলিয়া পরীক্ষা পাশ হইব, কিন্তু কি দুর্দৈব যে গণিত শূন্য বি, এ পরীক্ষায় ফেল হইতে হইল! যে দিন অনেকের পাশের খবর চিঠিতে আসিল তার পর দিন পোষ্ট আফিসে যাইয়া একটা টেবলের উপর যাইয়া পড়িয়া রহিলাম। পোষ্ট মাষ্টার মথুর বাবু আমাদের বন্ধু, তিনি কত আদর করিলেন, দাদা আসিলেন—তথাপি আমি টেবিল শয্যা ত্যাগ করিলাম না, স্কুলে গেলাম না। যখন খাওয়ার জন্য বড় বেশী রকমের পীড়াপীড়ি চলিল, তখন হঠাৎ খিড়কীর দোর দিয়া বাহির হইয়া অনির্দ্দেশে এক দিকে চলিতে লাগিলাম। বেলা ১১॥ টার সময় বাহির হইয়া ছিলাম কত দূর গেলাম তাহার ঠিক নাই; কত পল্লী, কতক কৃষক, কত হাটের লোক ঘাটের লোক দেখিতে দেখিতে চলিলাম—তাহার ঠিকানা নাই। এক একবার মনে ভাবিলাম হয় ত কোন পল্লীতে যাইয়া দেখিব, আমার নৈশ-খাদ্যের থালা হাতে করিয়া মা আমাকে ডাকিয়া খাওইতে

বসাইবেন আমি আবার তাঁহার হাতের রান্না খাইব।" এই ভাবিতে চোখের জলে গণ্ড ভাসিয়া যাইতে লাগিল। সারাদিন উপবাস, অন্ধকার রাত্রি—কোথায় চলিয়াছি তাহার ঠিকানা নাই, একটা যায়গায় পৌছিয়া আবার ফিরিয়া আসিতে লাগিলাম। রাত্রি ১১টার সময় বাসায় ফিরিলাম. দেখি মামা, মামী, দাদা. বিধু, বৌ-দিদি সকলেই আমার জন্য উদ্বিগ্ন হইয়া আছেন, কত স্থান খুঁজিয়াছেন। আমার প্রত্যাগমনে তাঁহারা যেন হাতে স্বর্গ পাইলেন। ১২ ঘণ্টা হাঁটিয়া ক্ষুধা-তৃষ্ণায় আমি মড়ার মতন হইয়া পড়িয়াছিলাম। আহারান্তে আঁচাইতে খোয়াই নদীর ঘাটে গেলাম, তখন বেশ জ্যোৎস্না উঠিয়াছে, দুই এক ফোঁটা বৃষ্টি পড়িতেছে। খোয়াইএর জলের প্রতি আমার একটা দুর্নির্ব্বার লোভ ছিল, যখন কোথাও খুঁজিয়া মাতৃ-ক্রোড় পাইলাম না, তখন একদিন ঐ নদীর জলে যাইয়া চরম শান্তি খুঁজিব। সে দিনও আঁচাইতে আঁচাইতে ভাবিতেছি—'এই জলে ঝাঁপাইয়া পড়িলে হয় না?' এমন সময় দাদা আমার দেরি দেখিয়া হাত ধরিয়া তুলিয়া লইয়া গেলেন। ঘরে ঢুকিব এমন সময় দেখি পোষ্ট মাষ্টার মথুর বাবুর বড় ছেলে বৃষ্টিতে ভিজিতে ভিজিতে আসিয়া "দীনেশ বাবু বাড়ীতে আছেন?—সুখবর"—বলিয়া চেঁচাইতেছে। রামদয়াল কলিকাতা হইতে চিঠি লিখিয়াছে, আমি ইংরাজীতে অনার সহ বি, এ পাশ করিয়াছি।

---

(১৬)

কুমিল্লায় চাকুরী।

যাহা হউক একরকম পাশ হওয়া গেল। ইহার পরে কুমিল্লা শম্ভুনাথ-ইনষ্টিটিউসনের ৫০৲ টাকা মাহিয়ানার হেডমাষ্টারি পদ খালি হইয়াছে বিজ্ঞাপন দেখিয়া দরখাস্ত করিলাম। কুমিল্লা আমার শ্বশুর উমানাথ সেন, ও আমার পিতার মাতুল চন্দ্র মোহন দাস ছিলেন, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। সুতরাং সে জায়গাটার উপর আমার একটা লোভ ছিল,—কাজ জুটিয়া গেল। যে দিন নিয়োগ-পত্র পাইলাম, সেই দিনই কাল-বিলম্ব না করিয়া পত্নীও সদ্য জাতা প্রথমা কন্যা মাখনবালাকে লইয়া হরিগঞ্জ ত্যাগ করিলাম।

কুমিল্লার জীবন স্মরণ করিতে এখনও আমার হৃৎপিণ্ড কাঁপিয়া উঠে। কত দুঃখই না সহিয়াছি! আমার গ্রহগণ সকলেই তখন আকাশ হ'তে বোধ হয় এক যোগে আমার দিকে ক্রুদ্ধ নেত্রে তাকাইতেছিলেন। প্রথম হইতেই ঝগড়া, আত্মীয়েরা পর হইলেন, যে দুই এক জনকে যথা সর্ব্বস্ব হারাইয়া একমাত্র আশ্রয়ের ন্যায় আঁকড়াইয়া ধরিয়াছিলাম, তাঁহারা পর হইলেন। শ্বশুর-শাশুড়ী পর হইলেন। চন্দ্রমোহন দাস আমার প্রতি বিমুখ হইলেন, এবং আমার বড় ভগিনী দিগম্বরী দেবী ঝগড়া করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কাশী চলিয়া গেলেন।

নিজকে তেমন একা আর কখনও মনে করি নাই। মনে কেবল এক ইচ্ছা জাগিতেছিল কি করিয়া প্রাণত্যাগ করা যায়। কত দিন মনে ভাবিয়াছি, কাহাকেও বাঘের মুখ হইতে রক্ষা করিতে যাইয়া যদি নিজে প্রাণ দিতে পারিতাম, কোন শিশুকে জল মগ্ন হওয়া হইতে বাঁচাইতে যাইয়া যদি মরিতে সুযোগ পাইতাম,—প্রাণ ত দিবই কিন্তু কাহারও মূল্য বান জীবনের পরিবর্ত্তে যদি আমার এই ছার প্রাণটা দিতে পারিতাম, তবে মৃত্যু সার্থক হইত! আঁধার রাতে দুর্গম পথে চলিয়া গিয়াছি. নিবিড় মেঘ গর্জ্জনের সঙ্গে মন হইতে আর্ত্তনাদ উঠিয়াছে—আমি সেই সর্প-বহুল জঙ্গলের পথে এত অন্ধকারে প্রাণ তুচ্ছ করিয়া চলিয়াছি,—কিন্তু আর আমার মা নাই, যিনি উৎকণ্ঠিত চক্ষু দুটি আমার পথের দিকে ফেলাইয়া রাখিবেন। বিদ্যুৎ দেখিলে ছাতা খুলিয়া মাথায় দিয়াছি, শুনিয়াছিলাম, ছাতার লৌহ বিদ্যুৎ আকর্ষন করে—অন্ধকারে যেখানে জঙ্গল বেশী সেই পথে চলিয়াছি, কিন্তু উরগ জাতীয় কোন বন্ধু আমার ভবপারের কাণ্ডারী হইয়া দর্শন দেয় নাই।

কুমিল্লা আসার পর আমার শ্বশুর মহাশয়ও ঠাকুরদাদা চন্দ্রমোহন বাবু বলিলেন, "তুমি কিছু না জানিয়া দরখাস্ত করিয়াছ। শম্ভুনাথ স্কুল স্কুলই নহে। ভিক্টোরিয়া স্কুলের কয়েকটি বিদ্রোহী ছাত্র একটা স্কুল খুলিবার চেষ্টা করিতেছে। শম্ভুনাথ নামক এক ধনী হিন্দুস্থানীর নামে স্কুলটা হইয়াছে; কিন্তু তিনি কয়েক দিনের জন্য ছেলেদিগকে স্কুল করিবার জন্য কয়েকটি তাঁবু দিয়াছিলেন—বাড়ী নির্ম্মান কি অন্য কোন বিষয়ে কিছুই সাহায্য করেন নাই। এখন কয়েকটা ভাঙ্গা খড়ো ঘরে স্কুল বসে, মাষ্টাররা মাহিয়ানা পান না, তাঁহাদের গুণ পণা ও কিছুই নাই, অম্বিকাবাবু সেক্রেটারী, তাঁহার খুব আগ্রহ আছে—কিন্তু পয়সা কড়ি নাই তিনি কি করিবেন?"

চন্দ্রমোহন বাবু বলিলেন - "একবারে আমাদের জিজ্ঞাসা করিলে না, অমনই দরখাস্ত করিয়া বসিলে?" শ্বশুর-বাড়ীর সম্মোহন আকর্ষন যে আমাকে হিতাহিত জ্ঞান শূন্য করিয়া টানিয়া আনিয়াছিল, তাহা তাঁহাকে কি করিয়া বলিব! সুতরাং চুপ করিয়া রহিলাম।

যাহা হউক স্কুলে যাইতে লাগিলাম। দেখিলাম মাষ্টাররা যখন ইচ্ছা আসেন, যখন ইচ্ছা যান,—আমি কৈফিয়ৎ চাহিলে মুচকি হাসিয়া পাশ কাটিয়া যান্। কেহ একটায় আসেন, ছুইটায় যান, কলেজের প্রফেসার দের মত—গুণপণা ও সেইরূপ। একজন একটি ছাত্রকে দাঁড় হইবার জন্য বারংবার বলিতে ছিলেন 'stood up', 'stood up'. আর এক জন ইতিহাসে পড়াইবার সময় একটি ছত্র পাইলেন Babar founded the Mogul Empire" অমনই চাৎকার করিয়া টিপ্পনি করিতে লাগিলেন, "find, found, found এই তিনরকম পদ ব্যাকরণ-শুদ্ধ, কিন্তু এখানে লেখক founded লিখিয়াছেন, সাহেব কি না—যা ইচ্ছা লিখিয়া পার পাইলেন, বাঙ্গালী হইলেই তাহার টিকিতে হাত পড়িত।"

আমি আমার আত্মীয় ইন্‌স্পেক্টর দীননাথ সেন মহাশয়কে লিখিলাম "শম্ভুনাথ ইনষ্টিটিউসনের এ্যাফিলিয়েট হওয়ার কোন সম্ভব আছে কি না।?" তিনি অতি স্পষ্ট করিয়া একবার নির্লজ্জ অকপটতার সহিত আমাকে জানাইলেন - "কোন সম্ভাবনাই নাই" কারণ—ইঁহাদের ফণ্ডে কোন অর্থই নাই. যদ্বারা একটা এণ্ট্রান্স স্কুল চলিতে পারে।"

অম্বিকাবাবু কিন্তু আমার বেতনটি মাসের প্রথম তারিখেই জোগাই-তেন। স্কুল এফিলিয়েট হইলেই অপর সকলকে মাহিয়ানা দিবেন, এই ভরসায় তাঁহাদিগকে খাটাইতেছিলেন, এজন্যই তাঁহাদের গুণপনা ও ব্যবহারের কোন শৃঙ্খলা বা শোভা ছিল না। কিন্তু ছাত্রগণ ভিক্টোরিয়া স্কুলের উপর হাঁড়ে চটিয়াছিল,—বর্ষাকাল ছেড়া ছনের ছাউনির মধ্য দিয়া

ঘরে বেশ খরপ্রবাহে জল পড়িয়া তাহাদের মাথার চুলে শিবজটাবদ্ধ গঙ্গার ন্যায় আটকাইয়া যাইত,—তাহা তাহারা মাথা হইতে ঝাড়িয়া ফেলিতে চেষ্টা করিত, কিন্তু তদ্বিরুদ্ধে কোন আপত্তি করিত না। বৃষ্টি পড়িতে সুরু করিলে দুই তিন জন ছত্রধরের ন্যায় আমার পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইত, আমার মাথা জল হইতে রক্ষা করিবার জন্য। সেই ভাঙ্গা, কপর্দ্দক শূন্য নিরাশ্রয় স্কুলটির প্রতি তাহাদের মমতা দেখিলে আমার বড় কষ্ট হইত। ইহার মধ্যে তাহারা খুব বড় একটা সভা করিল, তাহাতে আমি ইংরেজীতে এক দীর্ঘ বক্তৃতা করিয়া অল্প সময়ের মধ্যে যশস্বী হইয়া পড়িলাম। জেলাস্কুল এমন কি ভিক্টোরিয়া স্কুল হইতেও ছাত্রগণ আমার কাছে পড়া বুঝিয়া লইবার জন্য এবং আলাপ দ্বারা আপ্যায়িত হইবার জন্য আসিত।

আমি আমার শ্বশুর ও ঠাকুরদাদার তাড়নায় একদিন বাধ্য হইয়া ভিক্টোরিয়া স্কুলের সত্বাধিকারী জমিদার আনন্দচন্দ্র রায় মহাশয়ের সঙ্গে সন্ধ্যাকালে দেখা করিতে গেলাম। ভিক্টোরিয়া স্কুল তখন খুব জাঁকের স্কুল—জেলা স্কুলের মতই তাহার প্রতিপত্তি।

আনন্দবাবু এমন দেখাইলেন যে তিনি যেন আমার প্রতীক্ষা করিয়াই বসিয়াছিলেন। আমার অধ্যাপনা প্রভৃতির সুযশ তাঁহার কানে পৌঁছিয়াছিল, তিনি বলিলেন—"আমার এখানেই আপনার স্থান, আপনি ওখানে থাকিতে পারিবেন না, তা আমি পূর্ব্বেই জানিতাম" আমি প্রথম দিনই তাঁহার বন্ধু হইলাম, তিনি প্রথম হইতেই আমার বন্ধু হইলেন। আমার বহু কষ্টের মধ্যে একমাত্র সহৃদয় উপদেষ্টা তিনি ছিলেন, তাঁহার দুঃখের সময় আমি সর্ব্বদা পার্শ্বচর ছিলাম। কুমিল্লা জীবনের নিবিড় ঘনান্ধকারে তাঁহার বন্ধুত্ব আমার পক্ষে একমাত্র আলোক-সঞ্চারী বিদ্যুল্লেখা।

কয়েক বৎসর হইল "রায় বাহাদুর আনন্দ চন্দ্র রায়" স্বর্গীয় হইয়াছেন। ইঁহার মত মহাপ্রাণ লোক সংসার বড় সুলভ নহে।

ইহার পরে স্কুলের আয় ব্যয় ও শিক্ষকদের ব্যবহার লইয়া আমার সঙ্গে অম্বিকাবাবুর তর্কবিতর্ক হইতে লাগিল। দাদা মহাশয় চন্দ্র মোহন দাস বলিলেন, "তুমি কিছুতেই শম্ভুনাথ স্কুলে থাকিতে পার না, স্কুলটি ত তাদের ঘর। এখানে পুতুল খেলা করিয়া নব যৌবনের প্রথম উদ্যমটা নষ্ট করিয়া ফেলিবে? এই স্কুল ত কিছুতেই বিশ্ব বিদ্যালয়ের গণ্ডীতে স্থান পাইবে না, তা ত বুঝিতে পারিয়াছ, এখানে কেন পড়িয়া থাকিবে?"

কিন্তু অম্বিকাবাবু সমুদ্রে পড়িয়া যেরূপ লোকে তৃণ আশ্রয় করিয়া থাকে, সেই ভাবে আমাকে আকড়াইয়া ধরিয়াছিলেন। ছাত্রগণ আমার প্রতি অনুরাগী ছিল, ইন্‌স্পেক্টার দীনুবাবু আমার আত্মীয় এই ভরসায় তিনি আমাকে অবলম্বন করিয়াছিলেন। আমি দাদা মহাশয়কে বলিলাম —"এই ব্যক্তির আহ্বানে আমি হবিগঞ্জে, হইতে চলিয়া আসিয়াছি ইনি রীতিমত আমার বেতন দিয়া আসিতেছেন, ইঁহাকে ছাড়িয়া গেলে কি আমার পাপ হইবে না?" দাদা মহাশয় ভ্রূকুটি করিয়া বলিলেন, "তুমি যদি এতটা জ্ঞানী হইয়া থাক, অম্বিকা বাবুকে বল তিনি তিন বছরের গ্যারাণ্টি দিন—যদি স্কুল না থাকে, তবু তোমার মাহিয়ানা তিন বছর চালাইবেন। নতুবা যে ঘরে আগুন লাগিয়াছে, সে ঘরে বসিয়া থাকা ঠিক বুদ্ধিমানের কর্ম্ম হইবে না।"

অম্বিকাবাবু তিন বৎসরের গ্যারাণ্টি দিতে প্রস্তুত হইলেন। কিন্তু দাদা মহাশয় বলিলেন "আপনি নিঃসম্বলব্যক্তি, আপনার গ্যারাণ্টির মূল্য কি? আপনি আপনার নিকট আত্মীয় আনন্দবর্দ্ধন মহাশয়ের সই আমুন, তবে সেই গ্যারাণ্টি আমরা স্বীকার করিয়া লইব।" "তাহাই আনিব।" বলিয়া অম্বিকাবাবু চলিয়া গেলেন। আনন্দবর্দ্ধন লিখিলেন

"দীনেশবাবু লাগিয়া থাকিলে স্কুলটি দাঁড়াইতে পারিবে—তখন অম্বিকার বেতন চালাইতে কোন কষ্ট হইবে না, কিন্তু দায়িত্ব আমি গ্রহণ করিতে পারিব না।" অম্বিকাবাবু আমায় অনুনয়-বিনয় করিয়া অনেক কহিলেন, তার পর যখন দাদা মহাশয়ের প্ররোচনায় আমি আনন্দ বর্দ্ধন মহাশয়ের স্বাক্ষরের জন্য জেদ করিতে লাগিলাম, তখন তিনি দু'একদিনের মধ্যে উহা আনিয়া দেবেন বলিয়া ভরসা দিলেন,—আনন্দবাবুর দস্তখতের আনিবার মেয়াদ আরও বাড়াইয়া লইলেন, কিন্তু শেষে বুঝিলাম—এ সম্বন্ধে কোন আশাই নাই।

প্রথম শ্রেণীর ছাত্রগণ আমায় ধরিয়া বসিল, "সার—আমাদের বলুন, এ স্কুল হইতে আমরা এ বছর পরীক্ষা দিতে পারিব কি না?"

সেইদিন আত্মীয় স্বজনের পীড়াপীড়িতে ঠিক করিলাম. শম্ভুনাথ স্কুল ছাড়িয়া দিব। তখন বেলা ১১টার সময় স্কুলে গেলাম। অম্বিকাবাবু পূর্ব্বেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন, সেদিন তিনি মনের দুঃখে স্কুলে আসিলেন না।

আমি ছাত্রগণকে বলিলাম "আমি অনেক চেষ্টা, অনেক লেখা লেখি করিয়া দেখিয়াছি। ইনেস্‌পেক্টার কিছুতেই স্কুল বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত করিবেন না। সুতরাং তোমাদিগকে আমি আর মিথ্যা ভরসায় রাখিব না। আমি এই স্কুল ছাড়িয়া ভিক্টোরিয়া স্কুলের হেডমাষ্টারি গ্রহণ করা ঠিক করিয়াছি, এখন তোমরা যাহা ভাল বোধ তাই কর।"

ছাত্রগণ অত্যন্ত দুঃখিত হইল—অধিকাংশ ছাত্র বলিল, "আমরা ভিক্টোরিয়া স্কুলের বিদ্রোহী ছাত্র—কিন্তু আমাদের দর্প টিকিল না, আপনি যখন যাইতেছেন—তখন আমরাও আপনার সঙ্গে যাইব।"

আমি বলিলাম "আমার সঙ্গে তোমাদের যাওয়া ভাল হইবে না, এই

স্কুল আপনা হইতে নষ্ট হইতে পারে, কিন্তু ইহার ছাত্রমণ্ডলী লইয়া আমি প্রতিদ্বন্দী স্কুল গেলে—আমার পক্ষে শোভন হইবে না।"

তাহারা বলিল—"আপনি যান—আমরা যাহা উচিত বোধ করি, করিব।"

তখন আমি ধীরপদে কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ়ের ন্যায় ভিক্টোরিয়া স্কুলের দিকে চলিলাম। অম্বিকাবাবুর কথা মনে করিয়া আমার মনে অত্যন্ত দ্বিধার ভাব হইতেছিল; তিনি তাঁহার স্কুলের ভিত্তি দৃঢ় করিবার জন্য—প্রতিদ্বন্দী স্কুলের উপর জয়-পতাকা তুলিবার জন্য বড় আশা করিয়া আমাকে আনিয়াছিলেন; আমাকে রাখিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছিলেন—আমি বৈষয়িকতায় প্রলুব্ধ হইয়া তাঁহার পতনোন্মুখ ঘরখানি ভাঙ্গিয়া দিয়া চলিয়া আসিলাম। অন্তর হইতে আত্মাপুরুষ যেন ঘাড় নাড়িয়া বলিতে লাগিলেন, শরণাগতকে আশ্রয় দিবার জন্য কত লোক জীবন বিসর্জ্জন করিয়া থাকে, আর তুমি একান্ত বিপন্নব্যক্তিকে—তোমার নিয়োগকর্ত্তাকে একবারে বিপদের চূড়ান্ত সীমায় রাখিয়া—তাঁহার সনির্ব্বন্ধ বান্ধবতার মাথায় লগুড়াঘাত করিয়া চলিয়া আসিলে!" আমি শুষ্ক মুখে বিবেকের তাড়িত বক্ষের দ্রুত স্পন্দন শুনিতে শুনিতে ভিক্টোরিয়া স্কুলের গেটের নিকট উপস্থিত হইলাম, কিন্তু সবিস্ময়ে ও আতঙ্কিত চক্ষে দেখিলাম—শম্ভুনাথ ইনষ্টিটিউসনের প্রায় অধিকাংশ ছাত্র দলবদ্ধ হইয়া—আমা হইতে অনতিদীর্ঘ ব্যবধানে ধীরে ধীরে ও নিঃশব্দে আমাকে অনুগমন করিয়া আসিতেছে। ভিক্টোরিয়া স্কুলের ছাত্রেরা পূর্ব্বেই খবর পাইয়াছিল, আমি তাহাদের হেড মাষ্টার হইয়া আসিতেছি। আমাকে দূর হইতে দেখামাত্র তাহারা সকলে আমাকে অভিনন্দন করিবার জন্য স্কুল ঘর হইতে বাহির হইয়া যে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিয়াছিল—তাহা আমার এখনও মনে আছে। শম্ভুনাথ-প্রদত্ত তাঁবুতে কয়েকমাস শম্ভুনাথ স্কুল বসিয়াছিল

তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, এজন্য ভিক্টোরিয়া স্কুলের ছাত্রেরা বিদ্রূপ করিয়া শম্ভুনাথ ইনিষ্টিটিউসনের নাম দিয়াছিল "তাম্বুনাথ ইনষ্টিটিউসন।" আজ আমাকে এবং আমার পশ্চাতে শম্ভুনাথ স্কুলের ছাত্রগণকে দেখিয়া তাহারা জয়ধ্বনি করিয়া বলিল "ভাঙ্‌লরে তাম্বুনাথ"। এই চীৎকার শুনিয়া শম্ভুনাথ স্কুলের ছাত্রগণ মাথা হেট করিয়া সজল চক্ষে এক মুহূর্ত্ত স্থির হইয়া দাঁড়াইল; কিন্তু উপায়ন্তর না দেখিয়া ধীরে ধীরে ভিক্টোরিয়া স্কুলের মুক্ত তোরণ দিয়া স্কুলগৃহে প্রবেশ করিল। আমি এত ক্ষুব্ধ হই-লাম—যে তাহা বলিতে পারি না। কেন যেন মনে হইল—আমি ভয়ানক অপরাধ করিয়াছি। আমার দাদা মহাশয়, শ্বশুর মহাশয় এবং অপরাপর আত্মীয়গণ সকলে একবাক্যে বলিলেন "বেশ করিয়াছ"। কিন্তু আমার অন্তরের অন্তরে যে বিচারক আছেন, তিনি অবিরত ঘাড় নাড়িয়া বলিতে লাগিলেন—"কাজ ভাল হইল না।" প্রায় একমাস কাল বিলুপ্ত শম্ভুনাথ ইনষ্টিটিউসনের স্মৃতি সিন্ধবাদের স্কন্ধারলম্বী বৃদ্ধের ন্যায় আমার উপর চাপিয়া রহিল। আমি দূর হইতে অম্বিকাবাবুকে দেখিলে নিতান্ত অপরাধীর ন্যায় পলাইয়া যাইতাম। দু'একবার কোন কোন স্থলে একথা শুনিয়াছি—"দীনেশবাবু, কি কাজটাই কর্‌লে—আরে. ছ্যাঃ এমন বিশ্বাস-ঘাতকতাও করিতে হয়!" একথার কোন জবাব না দিয়া আমি অতি ক্ষুব্ধ চিত্তে বাড়ীতে ফিরিয়া না খাইয়া মড়ার মতন পড়িয়া থাকিতাম।

ভিক্টোরিয়া স্কুলের হেড মাষ্টার হইয়া আমি কাজে বেশ সাফল্য দেখা-ইলাম। প্রথম বৎসরেই আমার স্কুল হইতে একজন কুড়ি টাকা স্কলারসিপ পাইল, অঙ্কে সে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম হইল—সংস্কৃত ও ইংরেজীতে ও তাহার নম্বর খুব উঁচুতে উঠিয়াছিল। চট্টগ্রা ডিভিসনে ইহার পূর্ব্বে কেহ কুড়ি টাকা বৃত্তি পায় নাই, ছেলেটির নাম ছিল "ঝাড়ু মিঞা"—সে একটী গরীব কৃষকের ছেলে ছিল, আমি তাহাকে স্কুল হইতে চার

টাকা মাসিক বৃত্তি দিয়া পড়াইয়াছিলাম। সে পরীক্ষাগুলি পাশ করিয়া "এস্কেন্দার আলি" নাম গ্রহণ করে, এবং ডিপুটি-ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়া শেষে পাগল হইয়া যায়।

ইহার পরের বৎসরও আমাদের স্কুল হইতে একজন চাটগাঁ ডিভিসনে প্রথম হয়, এবং ছোটলাট ইলিয়েট সাহেব আমাদের স্কুল পরিদর্শন করিয়া এই মন্তব্য প্রকাশ করিয়া যান, যে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া স্কুল যখন এরূপ ভাল হইয়াছে,—তখন এখানে গভর্ণমেণ্ট স্কুল থাকিবার কোন প্রয়োজন নাই।

গৃহের অশান্তি,—শোক, দুঃখ আমার উদ্যমকে দমিয়া দিতে পারে নাই। আমি অসংখ্য কবিতা লিখিয়াছিলাম। আমার একখানি কাব্য "কুমার ভূপেন্দ্র সিংহ" কুমিল্লার এক প্রেস হইতে বাহির হইল। যেদিন স্তূপাকৃতি করিয়া মুদ্রিত পুস্তকগুলি আমাদের বাহিরের ঘরে রাখিলাম,—সেই রাত্রিতে আগুণ লাগিয়া প্রায় সমস্ত বই পুড়িয়া গেল, দুই চারি খানি বহুকষ্টে বাহির করিতে পারিয়াছিলাম। বোধ হয় একখানি আমার বাড়ী খুঁজিলে এখনও পাওয়া যাইতে পারে। "কুমার ভূপেন্দ্র সিংহ" কাব্যের ঘটনাটি এই—গিরিবর্ম্মের বৃদ্ধ রাজা যুবরাজ ভূপেন্দ্র সিংহকে একটি মর্ম্মর প্রস্তরের নির্ম্মিত রমণী মূর্ত্তির প্রতি নির্দ্দেশ করিয়া মৃত্যুকালে বলিয়া গিয়াছিলেন, তিনি কোন দৈব-বলে জানিতে পারিয়াছিলেন, ঐ মূর্ত্তির মত রমণী দ্বারাই তাঁহার রাজত্বের ধ্বংস সাধন হওয়ার সম্ভব। যুবরাজ যদি তদ্রূপ কোন রমণী দর্শন করেন, তাঁহাকে যেন স্পর্শ না করেন; স্পর্শ করিলে অচিরে রাজ্য ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে। কুমার ঘটনাক্রমে সেইরূপ রমণীর সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া তাঁহার প্রেমাসক্ত হইয়া পড়েন—উক্ত রমণী এক রাজকুমারী। যুবরাজকে দর্শনমাত্র তিনিও তাঁহার অনুরক্ত হন। যুবরাজ একদিকে

ঐকান্তিকী রূপ-পিপাসা, অন্যদিকে মৃত রাজার নিদারুণ অনুজ্ঞা—এই দুই বিরুদ্ধভাবের মধ্যে পড়িয়া সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় উপস্থিত হন। বহুদিন মনের সহিত সংগ্রাম করিয়া তিনি একদিন মোহান্ধ হইয়া নিদ্রিতা রূপসীর কপোলে একটি মাত্র চুম্বন অঙ্কিত করিয়া দেন। সেই ঘটনার অল্প সময় পরে সংযমন সিংহ নামক শত্রু কর্ত্তৃক রাজ্য আক্রান্ত হয়। কুমার ভূপেন্দ্র একবার এই শত্রুকে দ্বন্দযুদ্ধে পরাস্ত করিয়াছিলেন—কিন্তু তিনি বলবিক্রমশালী হইলেও এবার বিমূঢ় ও ভয়বিহ্বল হইয়া রণক্ষেত্র হইতে পলাইয়া যাইবার চেষ্টায় এক কূপোদকে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করেন।

কুমার সেই রূপসী ললনাকে দূরে রাখিতে বহু চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু নিয়তি বারংবার তাঁহাকে কুমারের সম্মুখে উপস্থিত করিল। অবশেষে জুলিয়া যেরূপ ডনজুয়ানকে সামনে রাখিয়া নিজ হৃদয়ের বল পরীক্ষা করিতে চাহিয়াছিল, কুমারও সেইরূপ তাঁহার হৃদয়রাণীকে স্বীয় প্রাসা-দের সংলগ্ন এক গৃহে রাখিয়া দূর হইতে প্রাণের পিপাসা মিটাইতে চাহি-তেন; কিন্তু হৃদয় লইয়া এই লুকাচুরি বেশী দিন চলিল না, একদিন সত্য সত্যই তিনি নিয়তির বশবর্ত্তী হইয়া পরীক্ষায় হার মানিলেন। সেই রাত্রির বর্ণনাটা তুলিব :—

(১)

"আকাশে ফুটেছে তারা রাশি রাশি।
মধ্য নভে চন্দ্র যায় হাসি হাসি॥
সাদা সাদা যথা যুথিকা-সুন্দর।
ফুটিয়াছে জ্যোৎস্না ধরার উপর॥
মধুর সে আলো পড়েছে কাননে।
ফুল কলিকার সলজ্জ বদনে॥
গোলাপের মুখে বল্লরীর গায়।
গবাক্ষে পড়িয়া চুমিছে নেশায়॥

মুগ্ধ সুন্দরীর মুষন্ত অধরে।
ফুটেছে সে জ্যোৎস্না নীলিম অম্বরে॥

(২)

সেই জ্যোৎস্না মাঝে একাকী কুমার।
ভ্রমিছে নীরবে, পৃষ্ঠদেশে তাঁর॥
ধনু সহ শর ঝুলিছে হেলায়।
শিরোপর হ'তে মণি উজলায়॥
ভ্রমিছে কুমার ব্যথিত হৃদয়।
চিত্তের উদ্বেগ নাহি শান্ত হয়॥
কভু দেখে চন্দ্র জ্বলে ঊর্দ্ধে দূরে।
কভু দেখে সেই স্তব্ধ রাজ পুরে॥
জ্বলিছে দেউটী, নিভিছে দেউটী।
প্রহরীর স্বর মিশে নভে উঠি॥

(৩)

চিত্ত ভার তার লাঘব না হয়।
উদ্বিগ্ন কুমার ব্যথিত হৃদয়॥
সতেজ জ্বলন্ত যেন হুতাশন।
ভালবাসা তার দহিতেছে মন॥
পশিল যুবক চিন্তিত হৃদয়ে।
রাজপুরী পার্শ্বে দ্বিতল আলয়ে॥
ঘারাঘাতে মুক্ত হল গৃহ দ্বার।
সম্ভ্রমে প্রহরী করে নমস্কার॥
পশিল ভুপেন্দ্র অট্টালিকা শিরে।
সুদীর্ঘ সোপান শ্রেণী ভাজি ধীরে॥
ছাদ লয় গৃহ, খুলি ধীরে দ্বার।
পশিয়া দেখিল বিস্ময়ে কুমার॥

(৪)

শুভ্র ফেন-নিভ শয্যায় পড়িয়া।
সুষুপ্তা সুন্দরী রয়েছে লুটিয়া॥
রমণীর শুভ্র কাঞ্চন-বরণে।
পড়েছে জোছনা, সুন্দর বদনে॥
ঘেরি চুল জাল রয়েছে জড়িয়ে।
ধীরে বাত-শিশু খেলে তা লইয়ে॥
ছিন্ন ভিন্ন যথা ফুল হার হায়।
শৈবালে কমল জড়িত হেলায়
স্তূপে স্তূপে ক্ষুদ্র ফুল রাশি মত।
ঘুমে ভুজবল্লী যেন অসংযত॥
এমন সুন্দর এমন কোমল।
নবনীতে যেন গাঁথা ফুল দল॥

এর পরে স্পর্শ হইতে আটকাইল না। তারপর অনেক অঘটন ঘটিল। বহু কষ্টের পর কুমার মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন—তাহা পূর্ব্বেই লিখিয়াছি—

উপসংহার ভাগ এইরূপ :—

(১)

"কিন্তু এখন (ও) জনশ্রুতি আছে,
সন্ধ্যার আঁধারে বন-তরু কাছে,
কৃষ্ণ হয়ারূঢ় যুবক মুরতি।
কুপিত নয়নে জলে উগ্র দ্যুতি॥
রুক্ষ শির-কেশ অসংলগ্ন বেশে।
রাজপুত্র লয়ে ছুটে অশ্ব ক্রেষে॥

চমকি গৃহস্থ জাগি দেখে যাঁরে।
অশ্বের উপরে দূর তরুশিরে॥
খেলিয়া ফিরিতে গৃহেতে সন্ধ্যায়।
শিশুগণে তাহা দেখি ভয় পায়॥
প্রহরী একাকী নৈশ অন্ধকারে।
রাজপথে তারে সভয়ে নেহারে॥

(২)

যুবা অশ্বারোহী সুন্দর বদন।
বিষাদ-ব্যঞ্জক সুতীক্ষ্ণ নয়ন।
ছুটিতেছে জ্যোতিঃ নিরাশ শোকেতে।
পিরিবর্ম্ম রাজ্য হেরিছে কোপেতে॥
কভু পথ ভুলে ভ্রমিয়া পথিক।
শুনে দূর বনে আহ্বানে সৈনিক॥
কূপোদক হ'তে সে তীব্র চীৎকার
ভেদে বায়ুস্তর, নৈশ অন্ধকার।
এখন (ও) সে বনে চলেনা পথিক।
সশস্ত্র তথাপি শিহরে সৈনিক॥
শীতরাত্রে শিশু আগুন ঘিরিয়া
শিহরে ভয়ের কাহিনী শুনিয়া॥"

কুমার ভূপেন্দ্র সিংহ আমার ১৯ বৎসর বয়সের লেখা। ১৮৮৬ সনে পুস্তক খানি রচিত হইয়াছিল। ইহার ২।৩ বৎসর পরে ছাপা হইয়া অগ্নিদাহে অধিকাংশ পুস্তক বিনষ্ট হইয়া যায়।

এইভাবে আমার গৃহ-ভারতীর অগ্নি-পরীক্ষা হইয়া গেল। আরও এক কারণে দেবীর বেদী, কবিত্বের শতদল, আমার বাড়ীতে প্রতিষ্ঠা

পাইতে পারিল না। সে কথা লিখিবার পূর্ব্বে আমার ১৯ বৎসর বয়সের লেখা একটা ব্যঙ্গ-কবিতা, যাহা একটা খাতায় কতকটা ছিল—তাহা এইখানে উদ্ধৃত করিব।

পশুপতি ন্যায়রত্ন।

(১)

ন্যায়রত্ন মহাশয় নিমন্ত্রণ খেয়ে,
উদর করিয়া স্ফীত, গিন্নি কাছে ঘেঁসে
হুকা হাতে উপবিষ্ট। ধোঁয়া যায় ছেয়ে
উড়িতেছে, মরি যথা সুন্দরীর কেশে
বেণীর লহরী, কিংবা বাষ্পযান সাথে
চলে যথা ধূমপুঞ্জ, গিন্নি ভুগি রোগে
সবে উঠেছেন মাত্র, শাখা ক্ষীণ হাতে।
এদিকে একান্ত মনে খড়িকা সংযোগে
দন্ত লগ্ন পর্ণ অংশ করি নিষ্কাশন,
ন্যায়রত্ন করিছেন ধীরে রোমন্থন।

(২)

কথা নাই কোন পক্ষ, প্রকৃতি পুরুষ
পাশা পাশি, কথা নাই, কোন কার্য্য নাই।
ন্যায়রত্ন অতিরিক্ত ভোজনে বেহুস
গিন্নি দূর গত পুত্র, ভাবিছেন তাই।
হেনকালে ঘরভঙ্গ করি উভয়ের।
উপস্থিত হইলাম সম্মুখে তাঁদের॥

(৩)

বলিলেন ন্যায়রত্ন,—"এস পুরন্দর
বহুদিন দেখি নাই"—হামাগুড়ি দিয়া
শয্যার একটি ভাগ করি অবসর,—
বসিতে কহিলা মোরে,—আমিও সরিয়া
একধারে বসি দেখি পণ্ডিতের পাছে।
উড্ডীন টিকিটি দ্রুত বায়ুভরে নাচে॥

(৪)

বলিলাম "মহাশয় কয়টি গভীর
আধ্যাত্মিক প্রশ্ন মনে হয়েছে উদয়।
মীমাংসা তাহার চাই,—প্রভুর শরীর
ভাল তো এখন?—কিছু হতেছে সংশয়।"
হাই তুলি তুড়ি মারি বলিলেন প্রভু
"ব'লে যাও ইতস্ততঃ করিও না কভু।"

(৫)

"ধর্ম্ম কি?" শুধানু যবে,—বাঁকা করি আঁখি
চাহি মোর প্রতি ন্যায়রত্ন মহাশয়
বলিলেন—"শুন বৎস কহি ধর্ম্ম কি,
প্রশ্নের উত্তর গুলি অতি সূক্ষ্ম হয়।
সলিলের ধর্ম্ম এই সিক্ত করে দেহ।
আগুনের ধর্ম পুড়ে যাহা কিছু ধরে।
মৎস্যের সাঁতার ধর্ম, মার ধর্ম্ম স্নেহ।
জীবের—প্রকৃতি-ধর্ম্ম জন্মে আর মরে।"

আমার শত শত কাব্যের পাণ্ডুলিপি, যাহা কুমিল্লা ছাড়িবার সময় আমি একটা বৃহৎ সিন্দুকে রাখিয়া আসিয়াছিলাম, তাহা আমার প্রতিবাসী

বিশ্বেশ্বর গাঙ্গুলী মহাশয়ের পুত্র আমার অজ্ঞাতসারে লইয়া গিয়াছেন, শুনিয়াছি তিনি বঙ্গদেশের ত্রিসীমা পার হইয়া ব্রহ্মদেশে কোন কর্ম্ম করিতেছেন। আমি কিছুতেই তাহা হস্তগত করিতে পারিলাম না। তাহা ছাপা হইলে আধখানা ওয়েবেষ্টারের তুল্য আয়তনের হইত। শৈশব ও কৈশোরে যাহা কিছু লিখিয়াছিলাম --সাহিত্য-হিসাবে হয়ত তাহার কোন মূল্যই নাই --কিন্তু আমার বহু আরাধনার জিনিষ গুলি আমার প্রিয় ছিল। আমার নিত্যকার সুখদুঃখ বিজড়িত সেই খাতা গুলি দেখিবার জন্য বড়ই ইচ্ছা হয়। বড়ই দুঃখের বিষয় যে কোথা হইতে কে আসিয়া আমার ভারতীর সেবার পথে এইরূপ বিঘ্ন উপস্থিত করিল।

ইংরেজী সাহিত্যের একখানি ইতিহাস—ভারতীয় আদর্শের মাপ-কাটিতে বিচার করিয়া বাঙ্গালা ভাষায় লিখিতে সুরু করিব, এই সংকল্প করিতেছিলাম। এমন সময় কলিকাতার পিস্ এসোসিয়েসনের নোটিস পড়িলাম, 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' সম্বন্ধে গবেষণা-মূলক সর্ব্বোত্তম প্রবন্ধের পুরস্কার একটি রৌপ্য পদক দেওয়া হইবে। প্রবন্ধের বিচারক হইবেন—চন্দ্রনাথ বসু ও রজনীকান্ত গুপ্ত।

আমি বঙ্গের প্রাচীন সাহিত্য লইয়া এতদিন ঘাটাঘাটি করিতেছিলাম, সুতরাং এ বিষয়ে প্রবন্ধ লিখিতে সহজেই প্রবৃত্ত হইলাম। এই সময় আমি নবজীবন, জন্মভূমি, অনুসন্ধান প্রভৃতি পত্রিকায় অনেক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তখন 'দাসী' নামক এক পত্রিকা প্রকাশিত করেন, আমি তাহার রীতিমত লেখক ছিলাম। আমার প্রবন্ধের সর্ব্বত্রই আদর হইতেছিল। এমন কি জন্মভূমি পত্রিকার সম্পাদক আমার প্রবন্ধ গুলির ভূয়সী প্রশংসা করিয়া অযাচিত ভাবে কয়েকবার টাকা পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। আমার প্রবন্ধ পাঠ করিয়া বাহিরের পাঠকদের মধ্যেও অনেকে প্রশংসা করিয়া চিঠি লিখিতেন—

অনুসন্ধানে আমার "জন্মান্তর বাদ" নামক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইলে, কবি হেমচন্দ্রের ভ্রাতা সাহিত্যক্ষেত্রে সুপরিচিত ঈশানচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় মহাশয় সম্পাদককে যে চিঠি লিখিয়াছিলেন, তাহাতে আমার অজস্র প্রশংসাবাদ ছিল, সে প্রবন্ধের নীচে আমার নাম ছিল না। পিস্ এসোসিয়েসন 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' সম্বন্ধে আমার প্রবন্ধই পুরস্কার যোগ্য মনে করিয়াছিলেন।

এই প্রবন্ধের সঙ্গে সঙ্গেই আমি ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস লিখিতে সুরু করিয়াছিলাম। কুমিল্লায় হাকিমদের মধ্যে আমার অনেক বন্ধু জুটিয়াছিল, তন্মধ্যে স্বর্গীয় ষ্টাটুটিয়ারী সিভিলিয়ান সুকবি বরদাচরণ মিত্র মহাশয়ের নাম সসম্মানে উল্লেখ-যোগ্য। তিনি তখন মেঘ-দূতের পদ্যানুবাদ করিতেছিলেন। তিনি কুমিল্লায় একটি সাহিত্য-সমিতি গঠন করেন, আমি তাহার সম্পাদক হইয়াছিলাম। বরদাচরণ মিত্র মহাশয় সুদীর্ঘদেহ, গৌরবর্ণ ছিলেন ; তাঁহার সুবৃহৎ চক্ষে, তিলফুলের মত সুগঠিত নাসিকায় ও উজ্জ্বল কপোল হইতে যেন প্রতিভা ফুটিয়া বাহির হইত ; তিনি অতি সুপুরুষ ছিলেন, কিন্তু তাঁহার হাতের আঙ্গুলগুলি জন্মাবধি পরস্পর সংলিপ্ত ছিল ও সেগুলি পূর্ণ-গঠিত ছিল না। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই হাত লইয়া তিনি এত দ্রুতভাবে লিখিয়া যাইতেন, যেন মুক্তাহারের সৃষ্টি করিয়া যাইতেন। কি ইংরাজী, কি বাঙ্গলায় তাঁহার মত ক্ষিপ্র কবিত্বময়ও ওজস্বী ভাষায় লিখিতে আমি অল্প লোককেই দেখিয়াছি। 'কলিকাতা রিভিউ' পত্রিকায় বাঙ্গালা সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁহার একটি সন্দর্ভ প্রকাশিত হইয়াছিল. তাহার ভাষা এরূপ ওজস্বী, রচনা এরূপ সূক্ষ্ম বিশ্লেষণময়ী—এবং ইংরেজী এরূপ বিশুদ্ধ, যে রমেশ দত্ত মহাশয়ের বঙ্গসাহিত্য সম্বন্ধে পুস্তক পাঠ করিয়া যে ধারণা হয়, এই অপেক্ষাকৃত অতি ক্ষুদ্র প্রবন্ধে বঙ্গভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে তাহা হইতে

অনেক বেশী জ্ঞান জন্মে। ইনি ঠিক সাহেবের চাল-চলনে থাকিতেন। যত জজ ম্যাজিষ্ট্রেট আসিতেন, সকলের অপেক্ষা তিনি পাণ্ডিত্য, কর্ম্মঠতায় এমন কি ইংরেজী ভাষার জ্ঞানেও উৎকৃষ্ট ছিলেন, তাঁহারা সকলেই তাঁহাকে শ্রদ্ধা—এমন কি ভয় করিতেন। সাহেবী কায়দা এতটা চালাইতেন যে সবজজগণ কার্ড দিয়া বসিয়া থাকিতেন,—অবসর ক্রমে অল্প সময়ের জন্য দেখা করিতেন,—এবং তাঁহাদের সঙ্গে আদৌ মিশিতেন না। কিন্তু সাহিত্যিক বন্ধু পাইলে যেন তাঁহার গোচারণের মাঠ মনে পড়িত। রাজ বেশ—রাজ-ভাষা ভুলিয়া যাইতেন, এবং অন্তরঙ্গ বন্ধুর মত মেলামেশা করিতেন।

এই "মিত্র-সাহেবে"র আরও অনেক মূর্ত্তি আমি দেখিয়াছি। শারদীয় পূজোপলক্ষে কুমারটুলির বাড়ীতে তিনি যখন দুর্গা প্রতিমার সম্মুখে—পিতা বেণীমাধব বাবুর পদপ্রান্তে গরদের উত্তরীয় গলায় পরিয়া নগ্নদেহে বসিয়া শ্লোক পড়িতেন, তাঁহার রচিত "জগদ্ধাত্রী" ও "মানুষ মেষ" কবিতা আবৃত্তি করিতেন—তখন তাঁহার গম্ভীর ও ওজস্বী কণ্ঠের আবৃত্তির ঝঙ্কারে পূজা মণ্ডপ কাঁপিয়া উঠিত,—সেরূপ ভক্তির উচ্ছ্বাস, কবিত্ব ও প্রবাসে সাহেবী কায়দা—এই দুই বিরুদ্ধ ভাবের সমন্বয় আমি কিছুতেই করিতে পারিতাম না। আমি যখন অতি দুঃসময়ে পড়িয়া পীড়িত ও নিঃসম্বল অবস্থায় তাঁহার নিকট আমার করুণকাহিনী বলিয়াছিলাম, তখন ঝর ঝর করিয়া তাঁহার চক্ষু হইতে জল পড়িয়াছিল—তাঁহার দয়া সেই অশ্রুতেই পর্য্যবসিত হইয়া যায় নাই। তিনি যে জেলায় গিয়াছেন, সেই জেলা হইতেই আমার জন্য মাসে মাসে দুই তিন শত টাকা সংগ্রহ করিয়া পাঠাইয়া অনেক দিন পর্য্যন্ত আমাদের ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন।

এরূপ পিতৃ-ভক্ত লোকও আমার চক্ষে বড় পড়ে নাই। বেণীবাবুর নিকট এই প্রৌঢ়বয়স্ক পুত্র—একটি অপগণ্ড শিশুর মত দেখাইত; এত

বড় পণ্ডিত, এত বড় সাহেব—শিষ্যের মতন কৌতূহলের সহিত পিতার নিকট আধ্যাত্মিক নানা প্রশ্ন করিতেন,—এবং প্রতিটি উত্তর মানিয়া নেওয়ায় যেন গর্ব্ব বোধ করিতেন; শিশুর ন্যায় পিতার নিকট আবদার করিতেন, এবং পিতার কথা কখনই লঙ্ঘন করিতেন না। বরদাবাবুর মৃত্যুর কিছু পূর্ব্বে তাঁহার পিতার মৃত্যু হয় এবং একটি প্রতিভাবান তরুণ পুত্র, তাঁহার মৃত্যুর চার পাঁচ দিন পূর্ব্বে অকালে তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া যায়। কিন্তু বোধ হয় পুত্র শোকাপেক্ষা ও পিতৃশোকই তাহাকে বেশী বিহ্বল করিয়াছিল। আমি বরদাচরণের মৃত্যুর তিনদিন পূর্ব্বে কুমার-টুলীর বাড়ীতে তাঁহাকে দেখিতে গিয়াছিলাম। ভ্রমক্রমে আমি তাঁহাকে বলিলাম "বোধ হয় আপনার পিতার শোকটা আপনাকে বড্ড লাগিয়াছে" —এই কথার কোন উত্তর দিলেন না। কিন্তু চাহিয়া দেখিলাম, তাঁহার দুই চক্ষু হইতে অজস্র জল পড়িতেছে ও কথা বলিবার চেষ্টায় কণ্ঠ-রোধ হইয়া আসিতেছে। তাঁহার পীড়ার তখন উৎকট অবস্থা, আমি অত্যন্ত ভীত ও অনুতপ্ত হইয়া অন্য কথা পাড়িতে লাগিলাম, কিন্তু তাঁহার সেই শোক কিছুতেই প্রশমিত হইল না। আমি বুকে হাত বুলাইয়া তাঁহাকে শান্ত কবিতে চেষ্টা করিতে লাগিলাম,—তাঁহার পিতার প্রায় ৯২ বৎসর বয়সে মৃত্যু হয়। এরূপ পিতৃ-স্নেহ—হিন্দুর ঘরেও আমি খুব অল্পই দেখিয়াছি।

আমার কুমিল্লার আর এক সঙ্গী ছিলেন ডিপুটি রসিকলাল সেন, বিটসন বেল সাহেব ইহাঁর সঙ্গে ঝগড়া করিয়া একবার ইহাঁর বাহুমূলে সন্ধির অস্থিটির স্থান বদলাইয়া দিয়াছিলেন। ইনি ইংরেজী ভাষায় কৃতবিদ্য ছিলেন, এবং সাহিত্যিক ব্যাপারেও ইহাঁর সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি ও পাণ্ডিত্য ছিল। আমি রাতদিন ইহাঁর সঙ্গে থাকিতাম। কিন্তু সকলের চাইতে ডিপুটি ছিলেন, আমার খুল্লতাত কালীশঙ্কর সেন; লম্বায় ইনি ছিলেন

সাত ফিট,—বর্ণ ছিল—গাঢ় কৃষ্ণ, বাঙ্গালা দেশে এত কালো রং বড় দেখা যায় না। ঠোট দুখানি ছিল পুরু। বোধ হয় নীল নদের তীরে জন্মিলেই ঠিক্ হইত, যেন পথ ভুলিয়া বঙ্গদেশে আসিয়া পড়িয়াছিলেন। কিন্তু চক্ষু দুটি ক্ষুদ্র হইলেও জ্যোতিষ্মান ছিল। সমাজনীতি, ধর্ম্মনীতি ইনি প্রতিদিন ডিঙ্গাইয়া চলিতেন, এবং এরূপ যদৃচ্ছাক্রমে জীবন চালাইতেন—তিনি পরের হাঁটাপথে চলিবেন না, এই সংকল্প করিয়াই যেন জীবনযাত্রা সুরু করিয়াছিলেন। ব্যাভিচার গুলি তাঁর এত মৌলিক ছিল--যে তাহা বলিয়া বুঝাইতে পারিব না। আমি দুই একজন অশতিপর বৃদ্ধ মোক্তারকে ইহার খাসকামড়ায় মাজা দোলাইয়া খেম্‌টা নাচ নাচিতে দেখিয়াছি। তৃতীয় শ্রেণীতে পড়িয়া ইনি পড়া সাঙ্গ করেন এবং শুধু কপালের লেখা ও দৈববলে ডিপুটিগিরি লাভ করেন। যদিও ইংরেজী খুব ভাল লিখিতে পারিতেন না এবং বড় বড় রিপোর্ট গুলি আমি ও রসিকবাবু মাঝে মাঝে লিখিয়া দিতাম, তথাপি ঐ রিপোর্টে যদি কোন অসঙ্গতি থাকিত, তাহা তাঁহার চক্ষে অমনই ধরা পড়িত। তিনি নিজ হাতে না লিখিলেও রিপোর্টটি যে পর্য্যন্ত মনের মতন না হইত, সে পর্য্যন্ত লেখক অব্যাহতি পাইতেন না। সেই সকল রিপোর্টের কৃতিত্ব ও সর্ব্বাংশে তাঁহারই থাকিত, এমন কি রিপোর্টের ভাষার অসঙ্গতি পর্য্যন্ত তাঁহার কাণে এড়াইত না। তিনি নির্ভীক ও একান্ত উদার প্রকৃতি ছিলেন। সাত দিনের মধ্যে মাহিয়ানার ৮০০ শত টাকা ফুরাইয়া ধার করিতে বসিতেন। তাঁহার মনস্বিতা এত তীক্ষ্ণ ছিল, যে তিনি যে কাজ উৎরাইতে পারিতেন, এরূপ আর কোন ডিপুটির সাধ্য ছিল না, এজন্য কটন প্রভৃতি বড় বড় সিভিলিয়ানেরা তাঁহার বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। নিজের কৃষ্ণবর্ণ ও বিরূপ চেহারা লইয়া যে তিনি নিজেই কত ব্যঙ্গ করিতেন, তাহা আর কি লিখিব? একদিন আমায় বলিলেন "দীনেশ! আমি যে

কত কালো তা তোরা বুঝিস্ নাই. আমি আজ বুঝেছি! আজ জজ-সাহেবের মেম আমায় পথে বলিলেন "মিষ্টার সেন, তুমি কোথায় যাচ্ছ? আমাদের বাসাবাড়ীর কাছ দিয়া তুমি যাবে কি?" আমি অতিশয় ভদ্রতা করিয়া তাঁহাকে আমার গাড়ীতে তুলিয়া লইলাম। তাঁহার হাত দুখানির ঠিক পাশেই আমার হাত খানি ছিল, আমার মনে হইল খুব সাদা কাগজটার এক প্রান্তে যেন কে কতকটা কালী ঢালিয়া ফেলিয়াছে—আমি যে এত কালো, মেম সাহেবের হাতের কাছে আমার হাত না থাকিলে তাহা বুঝিতেই পারিতাম না।"

সন্ধ্যাকালে কুমিল্লায় আমরা একটা আড্ডা দিতাম। কালীশঙ্কর বাবু, রসিকবাবু, প্রসন্নগুপ্ত ও সত্যবাবু মুন্সেফদ্বয়, গোপালবসু সবজজ, নগেনদত্ত ডিপুটি, কান্তিবাবু ইন্স্পেক্টর, হেমেন্দ্র খাস্তাগির ডিপুটী প্রভৃতি এই আড্ডার রীতিমত সদস্য ছিলেন। গোপাল বসু ইংরেজী ভাষায় বক্তৃতা করিতেন, concatination, troglodyte প্রভৃতি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কথায় তাঁহার বক্তৃতা চলিত, তিনি অভিধানের সাহায্য চিঠি লিখিতেন, অভিধানের সাহায্যে কথা বলিতেন, অভিধানের সাহায্য ব্যতীত তাহার অর্থ স্ফুট করে, কাহার সাধ্য? কৃষ্ণনগর রাজবংশের ডিপুটি ক্ষেত্র গোপাল রায় হারমোনিয়াম বাজাইয়া "বাশী বাজাও না শ্যাম" গান ধরিতেন ও প্রসন্নগুপ্ত মুন্সেফ নানারূপ বিদ্রূপ ও হাসি ঠাট্টায় আড্ডাটা মুখরিত করিয়া ফেলিতেন। আমাদের বিদ্রূপ প্রায়ই কলেকটরীর সেরেস্তাদার চন্দ্রকুমার বাবু ও তাঁহাদের থিউসফির দলের উপর প্রযুক্ত হইত। আমরা রহস্য করিয়া ভোট লইয়া ঈশ্বরের আস্তিত্ব সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত করিতাম। পুলিস ইনস্পেক্টর কান্তিবাবু চোরধরার জন্য একবার বাটী চালান দিয়াছিলেন। কালী-শঙ্কর বাবু বলিলেন, "শোন কান্তি, আমরা চাচ্ছি ঘটরাম ডিপুটী, তুমি

হচ্ছে বাটরাম ইনস্পেক্টর।" ইহার কিছু পরে প্রকাশচন্দ্র সিংহ ও তাঁহার ভ্রাতা সুরেশচন্দ্র সিংহ। (রায় বাহাদুর) এবং মিঃ এ. কে. রায় ডিপুটি হইয়া কুমিল্লায় আসিলেন। বাঙ্গলা কথার মধ্যে ইংরেজী বুকুনি দিলে প্রতিটী কথায় এক টাকা জরিমানা দেওয়ার করার করিয়া আমরা অনেক কৌতুক ও আমোদের সৃষ্টি করিয়াছি।

ইহার মধ্যে ডিক্রুজ নামক একজন টেলিগ্রাফ মাষ্টার আসিয়া জুটিল। সে ফিরিঙ্গী হইলেও খাঁটী ইংরেজের মত তাহার চেহারা ছিল, তাহার ছোট ছোট দুই তিনটি সন্তান ছিল, একজন ছিল চার্লি (Charles)। মেয়েটীর নাম ছিল 'ম্যাগি' (Margret); এই হতভাগ্যের স্ত্রী বাঁচিয়া ছিলেন না। ডিক্রুজ দিনরাত আমার কাছে পড়িয়া থাকিত। শেষে বাজারে বেড়াইতে যাইয়া "গোলাপী" নাম্নী এক গণিকার কুহকে পড়িয়া সে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া যায়। ছেলে মেয়ে যে কি কষ্ট পাইত, তাহা আর কি লিখিব? তাহাকে তাহার সাহেব সমাজ ঘৃণা করিয়া পরিত্যাগ করে। আমি তাহাকে ফিরাইতে অনেক চেষ্টা পাইয়াছিলাম, কিন্তু গোলাপী তাহাকে ভেড়া বানাইয়া ফেলিয়াছিল। সাহেবেরা চক্রান্ত করিয়া উপরে চিঠি লিখিয়া তাহাকে বদলী করাইলেন—একবারে পঞ্জাবে। গোলাপী বুঝিয়াছিল, এর হাতে আর কপর্দ্দকও নাই। তখন সাহেব তাহার পায়ের উপর একদিন একরাত্রি পড়িয়াছিল কিন্তু কিছুতেই সে বাঙ্গালা-দেশ ছাড়িয়া পঞ্জাবে যাইতে স্বীকৃত হইল না। যে দিন যাইবে, সে দিন অপরাহ্নে আমাকে একটা নির্জ্জন জায়গায় গিয়া সে যে কি কান্নাটা কাঁদিয়াছিল—কত আক্ষেপ করিয়াছিল, তাহা আমি ভুলি নাই। স্ত্রীলোকের কুহকে যে মানুষ কতটা বিড়ম্বিত হইতে পারে, ডিক্রুজ—গোলাপী অধ্যায় আমার নিকট তাহার জীবন্ত প্রমাণ হইয়া আছে।

একদিন আমি বাড়ীতে বসিয়া আছি, এমন সময় আমার প্রতিবাসী বন্ধু প্রকাশচন্দ্র সিংহ ডিপুটী মহাশয় তাঁহার আত্মীয় কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশয়কে লইয়া আমার আমার নিকট উপস্থিত হইলেন। খর্ব্বাকৃতি শ্যামবর্ণ.—রোগা চেহারা, লক্ষ্য করিবার মধ্যে বড় দুটী উজ্জ্বল চক্ষু এবং হাসির ছটায় মধুর ঠোঁট দুখানি। কৈলাস বাবু ঐতিহাসিক বলিয়া তখন সর্ব্বত্র পরিচিত, তখন তিনি 'রাজমালা' নামধেয় ত্রিপুরার ইতিবৃত্ত লিখিতেছিলেন। তাঁহার সঙ্গে আলাপটা খুব জমিয়া গেল। প্রকাশ-বাবু বদলি হইয়া গেলেন. তখন হইতে কৈলাসবাবু কুমিল্লায় আসিয়া আমার বাড়ীতেই থাকিতেন। তখন মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্যের বিরুদ্ধে ভয়ানক একটা দল বাঁধিয়া উঠিয়াছিল, কৈলাসবাবু সেই দলের একজন একজন নেতা হইয়াছিলেন। ত্রিপুরারাজ্যের অনেক কেলেঙ্কারীর কথা কৈলাসবাবু তাঁহার ইতিহাসে স্থান দিয়াছিলেন; আমি তাঁহাকে এক পক্ষের ওকালতি করিয়া অপরপক্ষকে নিতান্ত হীনভাবে চিত্রিত করার পক্ষে উৎসাহ দিতাম না, কিন্তু তিনি এবং তাঁহার দলের লোকের বলিলেন "সত্যের অনুরোধে এ সকল লিখিতে হয়।" আমি বলিলাম "পৃথিবীর যত কেলেঙ্কারী ও নিন্দাবাদ—তা' তে সত্যের অনুরোধে বলা হয় বলিয়াই নিন্দাবাদীরা প্রচার করিয়া থাকেন, লোকে যে রাগে অন্ধ হইয়া গালি দিতে থাকে, তাহা তলাইয়া দেখিলে অনেক সময় সত্যকে অতিক্রম করে না। পরের গ্লানি করা সত্যের ধুয়ো ধরিলেও সমর্থন-যোগ্য নহে। যেহেতু মনু একথা বলেন নাই যে সত্য অপ্রিয় হইলে সে কথা বলিতে হইবে।"

কৈলাসবাবু আমার বঙ্গভাষার প্রতি অনুরাগ ও মৌলিক চেষ্টা দেখিয়া সুখী হইলেন, যেহেতু আমি তখন সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গলা পুঁথি সংগ্রহ কার্য্যে অনুরাগী হইয়াছিলাম। আমাদের হেড পণ্ডিত চন্দ্রকুমার

কাব্যতীর্থ আমাদের বাড়ীর এই গৃহটির ক্ষুদ্র তর্কবিতর্কে আসিয়া যোগ দিতেন। আমি দিনের পর দিন কেবলই চণ্ডীদাস ও কবিকঙ্কণের কবিত্ব বিশ্লেষণ করিয়া যাইতাম, মনে হইত—তাঁহারা আমার ব্যাখ্যায় খুব প্রীত হইতেন। আমি অনেক সময় চণ্ডীদাসের কবিতা ইঁহাদিগকে পড়িয়া শুনাইয়াছি।

এই কবির বর্ণিত রাধা এবং বিদ্যাপতির রাধা—দুইটি ভিন্ন সামগ্রী। একজন সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রের ভাণ্ডার হইতে সাজসজ্জা, আনিয়াছেন—অপরা বঙ্গদেশের ভক্তিও ভাব-সম্পদের মূর্ত্তি। একজনের অপাঙ্গদৃষ্টী, যৌবনোদ্গম, রহস্য প্রিয়তা, এমন কি অব্যক্ত অস্ফুট কোরকের ন্যায় অধরপ্রান্তের হাসিটুকু ও অলঙ্কার শাস্ত্রের নিয়মানুযায়ী—সামান্য নায়িকার লক্ষণাক্রান্ত। অপরার বসনাঞ্চল ধুলায় লুণ্ঠন-শীল, তাঁহার নায়কের মনচোরা অপাঙ্গ দৃষ্টি নাই, ধ্যানশীলার ন্যায় মুগ্ধ ঊর্দ্ধ দৃষ্টি। তিনি সমস্ত অলঙ্কার খুলিয়া ফেলিয়া প্রেমের আবেশ দেখাইতেছেন, "বসি থাকি থাকি, উঠয়ে চমকি, ভূষণ খসিয়া পড়ে।" তিনি আবদ্ধ বেণী মুক্ত করিয়া চম্পকমাল্য খসাইয়া ফেলিয়া—স্বীয় কুন্তলদামের কৃষ্ণ শোভা নিরীক্ষণ করেন। ময়ূর ময়ূরীরকণ্ঠে সেই কৃষ্ণোজ্জ্বল স্নিগ্ধ বর্ণ, মেঘে ও সেই কৃষ্ণবর্ণ—আজ, তাঁহার এলাইত কৃষ্ণ কুন্তলেও তাহাই, সুতরাং নিজদেহে এবং বাহিরে তিনি কৃষ্ণকে খুঁজিয়া আবিষ্কার করিয়া ধ্যানশীলা।

এই ধ্যানের রূপ আর কোনও কবির কাব্যে নাই—ইহা গৌরাঙ্গ প্রভুর পূর্ব্বাভাস; চৈতন্য যদি স্ত্রীলোক হইতেন, তবে চণ্ডীদাস বর্ণিত এই রাধার অনুরূপা হইতেন।

"ঘরের বাহিরে, দণ্ডে শতবার
তিলে তিলে আসে যায়।

মন উচাটন, নিশ্বাস সঘন,
কদম্ব-কাননে চায়।"

চণ্ডীদাস রাধার এই বিভ্রান্তরূপ আঁকিয়াছেন; তারপর গৌরাঙ্গের রূপ ধ্যানে লাভ করিয়া রাধামোহন ঠাকুর লিখিয়াছেন :—

"আজু হাম কি পেখিনু নবদ্বীপ চন্দ
করতলে করই বয়ান অবলম্ব।
পুনঃ পুনঃ গতা-গতি করু ঘর-পন্থ
ক্ষণে ক্ষণে ফুলবনে চলই একান্ত॥
ছল ছল নয়নে কমল সুবিলাস।
নব নব ভাব করত পরকাশ।"

বঙ্গদেশের প্রেমের বইএর এক পিঠে রাধা, আর এক পিঠে গৌরাঙ্গ। একজন প্রেমসাধনা-দীপ্ত কল্পনায় দৃষ্ট মানসী প্রতিমা, আর একজন সহস্র ভক্তকণ্ঠের জয় জয় শব্দে অভিনন্দিত, খোল-করতাল-সংগীত-বন্দিত ঐতিহাসিক চিত্র। সাধনা-রাজ্যের এইখানি দুই চিত্রপট। যে ব্যক্তি শতদলকে লক্ষ্য না করিয়া তাহার নীচের পাঁক দেখিয়া ফিরিয়া যায়, সে নিতান্তই হতভাগ্য; তাহার আলোচনার মসীতে সে নিজে কলঙ্কিত হয় মাত্র; কিন্তু পদ্মের নিশ্বাস-সুরভি তাহার ভাগ্যে লাভ হয় না।

চণ্ডীদাস কৃষ্ণের প্রেম বর্ণন করিতে যাইয়া পর পর কতকগুলি ছবি দিয়া গিয়াছেন। প্রথম চিত্রে, কিশোরী বিদ্যুতের মত চাহনি ফেলিয়া চলিয়া গেল, "নবীন কিশোরী, মেঘের বিজুরী, চমকি চাহিয়া গেল" বিদ্যাপতি এই পদের উপসংহারে লিখিয়াছেন—"মেঘমালা সঙে তড়িত-লতা জনু, হৃদয়ে শেল দেই গেল।"

দ্বিতীয় ছবি, দুই সখী পরস্পরে আলিঙ্গন-বদ্ধ হইয়া যাইতেছেন—

"পথে জড়াজড়ি, দেখিনু নাগরী,
সখির সহিত যায়।"

এই ছবি দেখিয়া কৃষ্ণের রাধাকে প্রাণ নিবেদন করিয়া দিবার আকাঙ্ক্ষা হইল—কৃষ্ণ বলিলেন, যদি কেউ সহায় হয়, তার এমনই সৌভাগ্য হয়—

তবে—"তা সনে করি যে লে" ; লে অর্থ স্নেহ।

তৃতীয় ছবি ; রাধা ফুল দিয়া 'বল্' তৈরী করিয়া উর্দ্ধে ছুঁড়িতেছেন, আবার হাত বাড়াইয়া ধরিতেছেন—যেন জীবন্ত আনন্দের চিত্রপট। "ফুলের গেরুয়া" ধরিবার সময় "বসন ভেদিয়া—রূপ উঠে গিয়া"—এই মোহিনী ছবি দেখিয়া কৃষ্ণ মুগ্ধ হইলেন। আবার যখন সে মুচকি হাসিয়া চলিয়া গেল—তখন কৃষ্ণ বিমূঢ় হইয়া সেইখানে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

চতুর্থ দৃশ্য স্নানের ঘাটে। কিশোরী স্নান করিতেছেন,—যমুনার তীরে অলক্ত-রঞ্জিত কোমল পা আর একখানি পদ্মপ্রভ অলক্তরঞ্জিত পায়ের উপর রাখিয়া রাই অঙ্গ মার্জ্জনা করিতেছেন।

"শুনহে পরাণ—সুবল সঙ্গাতি
কো ধনী মাজিছে গা।
যমুনার তীরে, বসি তার নীরে,
পায়ের উপরে পা।"

পঞ্চম দৃশ্য রাই স্নান করিয়া ফিরিতেছেন :—

"চলে নীল শাড়ী নিঙ্গাড়ি নিঙ্গাড়ি
পরাণ সহিত মোর।"

পর পর এক একটি ছবি কবিতায় ফুটিয়া উঠিতেছে। গায়ক এই সকল

গান আখর দিয়া গাহিয়া—এক পেলব-কোমল অপূর্ব্ব নারী-শিরোমণীকে উপস্থিত করেন।

তারপর যখন এই সুন্দরীকে প্রেমাভিষিক্ত করিয়া-নয়নাসারে সিঞ্চিত করিয়া--ধূলিতে লুণ্ঠিত করেন, তখন মধুর ও করুণ রসের অভূত-পূর্ব্ব মিলন হয়। কৃষ্ণের নাম শুনিয়াই তিনি সংজ্ঞাহীনা—"যে করে কানুর নাম তার ধরে পায়। পায়ে ধরি কাঁদে সে চিকুর গড়ি যায়। সোনার পুতলী যেন ধুলায় লুটায়।"

কেমন করিয়া চণ্ডীদাস জানিয়াছিলেন, অর্দ্ধশতাব্দী পরে এক সোনার প্রতিমা নয়নজলে ভাসিয়া কৃষ্ণনাম শুনিবেন এবং যার তার পায়ে পড়িয়া কাঁদিবেন,—সেই গুঢ়রহস্য কি করিয়া বলিব? পার্থিব কোন কাব্যে একথা নাই যে শুধু নাম শুনিয়া প্রেমিকা বিহ্বলা হইয়া পড়েন। তখনও চোখের দেখা হয় নাই। এই নিগূঢ় প্রেম সাধনতত্ত্ব চণ্ডীদাসের মানস-পটে একখানি ছবির ন্যায় স্পষ্ট হইয়া জাগিয়াছিল, তাই বুঝি বিধাতা তাঁহার যাদু কাটি দিয়া ছুঁইয়া সেই ছবিখানি "নদের সোনার মানুষে" পরিণত করিয়া কবিকে স্রষ্টার সমকক্ষ প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন।

চন্দ্রকুমার ও কৈলাস সিংহের নিকট শুধু এই কবিতাগুলি পড়িয়া ক্ষান্ত হইতাম না—সমস্ত বৈষ্ণব-কবিতা চৈতন্য প্রভুর দ্বারা অধিকৃত দেখিতে পাইতাম। মনে হইত,—ভগবৎ প্রেমই কখন মানের মূর্ত্তি ধরিয়া পায়ে পড়িয়া কাঁদিত, ভগবৎ প্রেমই অপগণ্ড শিশুর মুখে বিশ্বের সমস্ত সৌন্দর্য্য ও শক্তি আবিষ্কার করিত। প্রভাত-সায়াহ্নে আরতির শঙ্খ ঘণ্টা নিনাদ, ধূপ-অগুরুর সুগন্ধ, পদ্মবনের ঈষচ্ছবির রক্তিম রাগ এ সমস্তই যেন বঙ্গদেশের পল্লীর হাটে, মাঠে, পথে ভগবদ্ভক্তির আবেশ ছড়াইয়া রাখিয়াছে। আমি মাতৃ-ভূমির, প্রতিপল্লীর ধূলিরেণু পবিত্র মনে করিতে লাগিলাম। ইহা আমার জাতীয়তা

স্বদেশ-প্রেম প্রভৃতির কিছু নহে, ইহা আমার ইংরেজীর নকল করা কোন ভাব নহে। প্রকৃতই এই ভূমির প্রতি রেণু আমার চক্ষের জলের দাবী করিত। এক অব্যক্ত আকর্ষণে আমি বঙ্গদেশের মায়ায় পড়িয়া গেলাম।

ফিরিয়া ফিরিয়া চণ্ডীদাসের গানের দিকে সমস্ত প্রাণ উন্মুখ, উৎকণ্ঠিত হইয়া ছুটিত। কোথায় গেল আমার টিনটারণ এ্যাবি, এমন কি এত সাধের "চীনাংশুকমিবকেতোঃ।" কখনও পড়িতাম—"অবলা এমন তপ করিয়াছে কবে?" কৃষ্ণ স্বয়ং পরশমণি, যাহা শ্রীকরে ছুঁইয়া ফেলেন, তাই তো সোনা হইয়া যায়, তবে "কি লাগিয়া ধরে সখি চরণে আমার।' তিনি "একবার যাই" বলিয়া আমায় কত আদর করেন, বারংবার বিদায় চান,—অৰ্দ্ধপদ যাইয়া আবার ফিরিয়া আসিয়া কাতর হইয়া আমার মুখের দিকে চাহিয়া থাকেন; আমার হাতে হাত রাখিয়া শপথ দেন যেন আবার দেখা হয়, পুনরায় দেখা পাওয়ার অনুমতির জন্য কত মিনতি করেন—

"পদ আধ চায় পিয়া চায় পালটিয়া।
বয়ান নিরখে কত কাতর হইয়া
করে কর ধরি পিয়া শপথি দেয় মোরে।
পুন দরশন লাগি কত চাটু বলে।"

এই সকল কবিতা সকালে বিকালে পড়িতাম, দিনরাত্র পড়িতাম,—এই কবিতাগুলি নির্জ্জনে একা একা আওড়াইয়া আনন্দ পাইতাম।

চণ্ডীদাসের কবিতার একটি প্রকৃতি এই যে, পর পর ছবি দিয়া কবি এক একটি রস জাগাইয়া তোলেন। ধরুন তাঁর মানের পালাটি; প্রথম ছবি মাধবী-তলাতে রাই চিবুকে হাত দিয়া বসিয়া আছেন—কাহারও সঙ্গে কথা বলেন না।

"এক নব রামা আছে রাধা সঙ্গে
তা সনে না কহে বোল।"

নিজের মনঃকষ্ট বুকের ভিতর রাখিয়া সঙ্গিনীসহ রাই একান্ত নিঃসঙ্গীর ন্যায় বসিয়া আছেন, আর তাঁর মর্ম্ম-বেদনাকে যেন রাগিনীর ছন্দ দিয়া একটি কোকিল সেই মাধবীর ডালে বসিয়া ডাকিতেছে।

"মাধবী ডালেতে এক পিক আসি
কহত পঞ্চম বোল।"

দ্বিতীয় দৃশ্য—কোকিলের সেই গান শুনিতে শুনিতে রাধার ভাল লাগিল না। রাই কোকিলকে—

"করতালি দিয়া, দিয়া উড়াইয়া"

আবার বসিয়া কি ভাবিতে লাগিলেন।

তৃতীয় দৃশ্য—শ্রীকৃষ্ণের নিকট হইতে দূতি আসিতেছেন—

"দূর হতে দেখি, দূতির গমন
করিলা শ্রীমুখ বন্ধ।"

দূতি আসিয়া অনেক সাধিল,—সে বলিল "যাঁর জন্য তুমি ঘন ঘন পথের দিকে চেয়ে রাত্রি জাগরণ কর, যাঁর জন্য তুমি কত যত্নে বেণী বাঁধিয়া খোপা কর,—কালো বর্ণে প্রীত হইয়া কালো ফিতা দিয়া কেশ সজ্জা কর—যাঁর স্পর্শ তোমার কাছে লক্ষচন্দ্র স্পর্শ হইতেও শীতল, তাঁকে কি দোষে ত্যাগ করিলে, বল?"

দূতির কথা শুনিয়া রাধিকা কিছু বলিলেন না; মাধবী-তলা হইতে একটা তীব্র কটাক্ষ তাঁর দিকে নিক্ষেপ করিলেন মাত্র। তারপর খানিকটা চক্ষু মুদিত করিয়া রহিলেন, কৃষ্ণ কি করিতেছেন—সেটা জানা

চাই, তাই চোখ মেলিয়া বলিয়া বলিলেন, "কেন এসেছ? কি বলিবে বল।"

তখন কতকগুলি ছবি একে একে অবতারিত হইল, দূতি বলিলেন,—

"তোমার বেণী হইতে যে ফুলটি পড়িয়াছিল তাহা কুড়াইয়া কৃষ্ণহাতে রাখিয়াছেন, তাঁহার চোখের জলে সে ফুলটি ভিজিয়া গিয়াছে।

"তাঁকে দেখিবে তো আমার সঙ্গে চল, মরকত-মণির মত সে ধূলায় লুটাইয়া আছে। তার মালতামালা বিজড়িত চূড়া কোথায় পড়িয়া গিয়াছে তাহার ঠিক নাই, তাঁর নূপুর ও বলয় কোথায়, কে তার খোঁজ লয়? পীত ধরার আচল ধুলায় লুটাইতেছে, নবমঞ্জরীর দল ধরিত্রীর বক্ষে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িয়া আছে।" পর পর এই ভাবের ছবি দিয়া চণ্ডীদাস একটা গাঢ় অনুভূতির রাজ্যে আমাদিগকে লইয়া যাইতেছেন।

তাঁর প্রেমের কবিতা—এক আনন্দ-লোকের জিনিষ। চির-বিরহী জন যদি অভীপ্সিতকে পায়, তবে জিহ্বা কথা বলিতে পারে না,—তার অভিব্যক্তি হয় শুধু অশ্রুতে। সারা জীবনের আরাধনার পর যদি কোন ভক্ত ভগবানকে দর্শন করে, তবে তাহার ভাষায় মনের ভাব ব্যক্ত করে না, সে চোখের জল ছাড়া আর কিছু দ্বারা আনন্দ ব্যক্ত করিতে পারে না। একমাত্র শিশু হারাইয়া যে জননী উন্মত্তাবস্থায় জীবন কাটাইয়াছেন, দেব-প্রসাদে যদি সেই বালক সহসা মাতৃবক্ষে ধরা দেয়, তখনকার আনন্দ অনির্ব্বচনীয়, তাহার ভাষা চোখের জল ছাড়া আর কিছু নহে ভাষার কি সাধ্য তাহা প্রকাশ করে?

চণ্ডীদাসের কবিতা সেই অশ্রু-রাজ্যের। এখানে এক একটি কথা, ক্ষুদ্র অশ্রু বিন্দুর ন্যায়, তাহা বহু ব্যথা-জাত আনন্দের অভিব্যক্তি—"যথা তথা যাই আমি যত দূর চাই। চাঁদ মুখের মধুর হাসে তিলকে জুড়াই।"

অতি সহজ সরল কথায় সেই চিরবিরহব্যথিত দর্শনানন্দের কথাই বুঝাইতেছে। "এছার পরাণে আর কিবা আছে সুখ। মোর আগে দাঁড়াও তোমার দেখি চাঁদ মুখ।"—সেই একই কথা কত ভঙ্গীতে বলা। মুমূর্ষু একবার দর্শনানন্দের জন্য তীর্থে যায়—এই কবি সেইরূপ তীর্থযাত্রী। যে আনন্দ-নিলয়ে গেলে ভাষা পাছে পড়িয়া থাকে, ভাব একাকী চলিয়া যায়,—চক্ষু অশ্রু লইয়া অর্ঘ্য সাজায়—এই কবিতা সেই স্বর্গীয় রাজ্যের। এখানে কবিত্বের বৈদ্যুতিক আলোকে স্বর্ণ-বর্ণ উজ্জ্বল রেখা জ্বলে না, এখানে পবিত্র ঘৃতের সলতায় অলঙ্কার-বিরল মৃণ্ময় পাত্রের আরতির দীপ মন্দিরটি সুগন্ধ ও উজ্জ্বল করিয়া রাখে।

চণ্ডীদাসের কবিতায় যে জিনিষটা কতকটা শীলতাকে ডিঙ্গাইয়াছে, তাহা কৃষ্ণ-কীর্ত্তনেই বেশী, তাহা জয়দেব এবং পূর্ব্ব সুরিদিগের শিষ্যত্বের প্রেরণা প্রমাণ করে। কিন্তু পাঁকের উপর পদ্ম জন্মিয়াছে। তাঁহার আত্ম-নিবেদনের পদগুলি পৃথিবীটাকে শুধু একটা রেখায় ছুঁইয়া আছে মাত্র, বিদ্যুল্লেখার ন্যায়। কিন্তু বসুধা-তল হইতে সে স্বর্গীয় জিনিষটা আসে নাই, তাহা জয়দেবী প্রেরণা নহে, তাহা দৈব-প্রেরণা,—তাহা চেষ্টা করিয়া অনুকরণ করিয়া কেহ পায় না, হঠাৎ দেব-প্রসাদে যেমন কেহ কৌস্তুভ মণিটি পাইয়া বসে—এ সেইরূপ পাওয়া।

এই প্রেমকে তিনি অখণ্ড রূপে দেখিয়াছিলেন। পিতৃস্নেহ, সখ্য ও যৌন প্রেম, সেই অখণ্ডকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ভিন্ন ভিন্ন করিয়া দেখায়—কিন্তু যিনি পূর্ণভাবে উহা পাইয়াছেন, তাঁহার চক্ষে সেই অখণ্ড জিনিষ-টার মধ্যে, দাস্য, বাৎসল্য প্রভৃতি সকল ভাবই আছে, এজন্য তিনি স্বামীর মধ্যে পিতা মাতা ও সমস্ত দেবতাকে পাইয়াছিলেন। এই প্রেম পাইয়া তিনি মানুষকে দেবতাদের অপেক্ষা বড় মনে করিয়া বলিয়াছিলেন "শুনহে মানুষ ভাই, সবার উপরে মানুষ বড়, তাহার উপরে নাই।" এই

প্রেমের ধ্বংস তিনি স্বীকার করেন নাই—এজন্য তিনি বলিয়াছিলেন, “পিরীতি করিয়া ভাঙ্গয়ে যে, সাধন-অঙ্গ পায়না সে” এই মানুষ-প্রেম সাধনা না করিলে ভগবানকে পাওয়া যায় না, এজন্য তিনি বলিয়াছিলেন—“ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া আছয়ে যে জন, কেহ না চিনিতে পারে, প্রেমের আরতি যে জন জানয়ে, সেই সে চিনয়ে তারে।” এই সাধনার পথে ইন্দ্রিয় অন্তরায়, ইহা বুঝাইতে তিনি কহিয়াছেন—প্রেম সাধনা করিতে হইলে দেহকে “শুষ্ককাষ্ঠসম” করিতে হইবে। প্রেমের মর্ম্ম যে না জানে—তাঁহাকে তিনি মন্দিরের বাহিরে থাকিতে বলিয়াছেন। প্রকৃত ধর্ম্ম ব্যাখ্যায় তাঁহারই অধিকার, যিনি মর্ম্ম বুঝিয়াছেন, শুধু সূত্রব্যাখ্যা করেন না। যাঁহার বাহিরে ইন্দ্রিয় খোলা রহিয়াছে,—ভিতরকার সত্য তাঁর নিকট ধরা পড়িবে না।

“মরম না জানে ধরম বাখানে
এমন আছয়ে যারা।
কাজ নাই সখি, তাদের কথায়
বাহিরে রহুন তারা॥
আমার বাহির দুয়ারে কপাট লেগেছে,
ভিতর দুয়ার খোলা।”

এই চণ্ডীদাসের পুঁথি হাতে করিয়া চন্দ্রকুমার কাব্যতীর্থের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে, কৈলাস বাবুর উৎসাহে—আমার অন্তরের দেবতা যে পূজা চাহিতেছিলেন, তাহার নৈবেদ্য তৈরী করার আন্তরিক ইচ্ছায় আমি পুঁথি সংগ্রহে বাহির হইয়া পড়িলাম।

আমার পুঁথি খোঁজার ইতিহাসটা একটা অদ্ভুত গোছের। সংস্কৃত পুঁথিরই লোক খোঁজ সন্ধান করিত; বাঙ্গলা পুঁথির কোন খোঁজই কেহ লইত না। ১৮৯০ সনেও আমরা আত্মীয় স্বজনের নিকট ইংরেজীতে

চিঠি লিখিতাম। তাহার পূর্ব্বে বাবাকে যত চিঠি লিখিয়াছি, তাহার বোধ হয় সকল গুলিই ইংরেজীতে। চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, কবিকঙ্কণ আমি খুব আনন্দের সঙ্গে পড়িতাম বটে, কিন্তু বাঙ্গালা পুথি যে পল্লীতে পল্লীতে তুলট কাগজের খণি খুঁজিলে পাওয়া যায়, একথা তখন কাহারও মনে উদয় হয় নাই। হঠাৎ একদিন কে আমায় "মৃগলুব্ধ" নামক একখানি প্রাচীন হাতের লিখিত পুঁথির খোঁজ দিয়া গেল। সেই পুথিখানি সংগ্রহ করিতে যাইয়া জানিতে পারিলাম, সেরূপ আরও অনেক অপ্রকাশিত পুঁথি ত্রিপুরা-জেলায় আছে। তখন আমি এই কাজে আমার প্রকৃতির সমস্ত ঝোঁকের সঙ্গে লাগিয়া পড়িলাম। একজন খবর দিয়া গেল, "পরাকলি" মহাভারত নামক একখানি বই সেই জেলায় প্রচলিত ছিল। কাশীদাসী মহাভারতের পূর্ব্বে লোকে সেই মহাভারত পড়িত। আমি বুঝিলাম "পরাকালী" "পরাকৃত" বা "প্রাকৃত" কথার বিকৃতি, ভাবিলাম প্রাকৃত ভাষায় একখানি মহাভারত পাইলে ভাষাতত্ত্ব হিসাবে সে আবিষ্কার মহামূল্য হইবে। বহু অনুসন্ধানের পর "পরাকিলি" মহাভারতের খোঁজ পাইলাম, কিন্তু দেখিলাম তাহা লৌকিক প্রাকৃতে রচিত মহাভারত নহে;—উহা পরাগল খাঁর আদেশে কবীন্দ্র পরমেশ্বর বিরচিত মহাভারত। এই মহাভারতের এতদূর প্রচলন ছিল যে ত্রিপুরা, নোয়াখালি, চট্টগ্রাম, ঢাকা ময়মনসিংহ এমন কি বর্দ্ধমাণ হইতেও ইহার পুথি পাওয়া গিয়াছে। তাহার পূর্ব্বের সঞ্জয় রচিত মহাভারত পাইলাম। এইভাবে যখন প্রায় ১০০ শত অপ্রকাশিত বাঙ্গালা পুথির সংগ্রহ হইল. তখন মাসে মাসে তাহার বিবরণ-সম্বলিত সন্দর্ভ "সাহিত্যে" প্রকাশিত করিতে লাগিলাম এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ আমাকে উৎসাহ দিয়া পত্রাদি লিখিতে লাগিলেন।

আমি এই পুথি ক্রয় করিবার জন্য অনুরোধ করিয়া, এসিয়াটিক

এসিয়াটিক সোসাইটির ডাঃ হোরনলি মহাশয়কে চিঠি লিখিলাম। তিনি পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর উপর ভার দিলেন। একদিন সকাল বেলা একটি গ্ল্যাডস্টোন ব্যাগ হাত করিয়া গৌরবর্ণ—ঈষৎ গুম্ফ রেখা লাঞ্ছিত শ্রীমুখ-শালী, ফিটু বাবুর মত, পণ্ডিত বিনোদ বিহারী কাব্যতীর্থ আমার বাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহাকে পাঠাইয়া দিয়াছেন। যৌবন বিনোদের দেহে যে শ্রী দিয়াছিল, এখন আর তাহা নাই। তাহার শিরা সেই নধর কান্তি এখন স্ফীতোদর খর্ব্ব ছন্দ ধারণ করিয়াছে, সে বর্ণের উজ্জল্য আর নাই, সংসার তাপ-দগ্ধ হইয়া ম্লানতা প্রাপ্ত হইয়াছে। তখন বিনোদ আর আমি পল্লীতে পল্লীতে পুথি খুঁজিয়া ঘুরিয়াছি। বিনো-দের বাড়ী ভাটপাড়া, সেখানে সংস্কৃত শকুন্তলার অভিনয় হইত, বিনোদ দুষ্মন্ত-চরিত্রের অভিনয় করিত। মাঠে মাঠে ঘুরিবার সময় বিনোদ কি মিষ্ট স্বরে, "তব কুসুম শরত্বং শীতরশ্মিত্বমিন্দো দ্বয়মেবাযথার্থং দৃশ্যতি মদ্বিধেষু" প্রভৃতি শ্লোক আওড়াইয়া যাইত। কখন ও হাত নাড়িয়া "কুসুমমিব যৌবনং অঙ্গেষু সন্নদ্ধং" প্রভৃতি বলিয়া অধর প্রান্তে হাসির রেখা টানিয়া কোন পল্লীললনার সৌন্দর্য্যের প্রতি সশ্রদ্ধ ইঙ্গিত করিত। পুথিখোঁজা ব্যাপার লইয়া আমাদের যুব-চিত্তের কতইনা নিগূঢ় নিভৃত কক্ষ পরস্পরের নিকট উদ্‌ঘাটিত হইত। সেই হাঠে মাঠে বাটে, পদ্মপলাশ লীলাময়ী বাপী, কুন্দ কোরকের মৃদু নিশ্বাস বাহী সুগন্ধি বায়ু, স্নানরতা পল্লীললনার অসম্বৃত ভাবে বস্ত্র-বিক্ষেপ-কারী অঞ্চলাশ্রিত দুরন্ত শিশু, হল-হস্তে, বিস্ময় চকিত দৃষ্টি কৃষক, রন্ধন শালার ধূম্র-জড়িত দেবী-প্রতিমার ন্যায় সুদর্শন গৃহলক্ষ্মীর উনুন জাগাইবার চেষ্টা, পদ্মপ্রভ কোমল শ্রীপদে নিপীড়িত ঢেকীর দ্রুত উত্থান পতন ও অবগুণ্ঠনবতীদের মৃদু মৃদু আলাপ ও ভূষণ গুঞ্জন, গ্রাম্য বৃদ্ধের চোখের দুলাল শিশুদের কাকলী, কত দৃশ্য, কত মূর্ত্তি আমাদের চক্ষের নিকট

বাইস্কোপের ছবির ন্যায় চলিয়া গিয়াছে, কখনও কল্পনায় দীপটিকে একটু উস্কাইয়া দিয়া গিয়াছে, কখনও চক্ষুদুটি বিমুগ্ধ করিয়াছে, কখনও পরের বাড়ীতে লক্ষ্মীর পদাঙ্ক কতকটা ঈর্ষার উদ্রেক করিয়াছে। বিনোদ ছিল ২১।২২ বৎসর বয়স্ক, আমি ছিলাম ২৪।১৫, সুতরাং আমাদের বন্ধুত্বের রাজযোটক হইতে কোন বাধা হয় নাই।

বিনোদ মাঝে মাঝে আসিয়া ২।৩ মাস থাকিয়া চলিয়া যাইত, আমি বছর ভরিয়া পুঁথি সংগ্রহ করিয়া বেড়াইতাম। সেটা হইল আমার নেশার মত। বাঙ্গলার পল্লী আমায় টানিত। মনে হইত পল্লী লক্ষ্মী কখন ও তাঁহার মালতী ফুল জড়ানো খোপার বেণী খুলিয়া, কখনও আলতা পরা পায়ের পদ্ম-প্রভায় আকর্ষণ করিয়া, কখনও কুসুম-বিজড়িত রৌদ্রাংশুর চুমকি পরানো শ্যাম আঁচলের অসংবৃত শোভায় মুগ্ধ করিয়া কখন, নিবিড় মেঘোপম একরাশ চুল দেখাইয়া, কখনও আঙ্গিনায় পুঞ্জীকৃত সোনার ফসলের দ্বারা প্রলুব্ধ করিয়া, কখনও বাপীনীরে পদ্মবন সমাবৃত পদ্মোপম শ্রীমুখের শোভা দেখাইয়া ও স্ফুরদধরাগ্ররালে ফুল্ল কোরকের হাসির দীপ্তি উদ্ভাসিত করিয়া আমাকে ভুলাইয়া ফেলিতেন। পুঁথি খুজিতে যাইয়া আমি কখনও বৈষ্ণব সাজিয়াই জুতা পিরাণ প্রভৃতি একটা চাকরের হাতে দিয়া, তুলসীর মালা গলায় পরিয়া, কৃষ্ণনামের ছাপে কপাল সুসমলাঞ্ছিত করিয়া, খঞ্জনী হাতে বৈষ্ণববৈষ্ণবীর দলে মিশিয়াছি। কখনও "বড্ড পিপাসা" ভাণ করিয়া কোন সুত্তোর, ধোপা প্রভৃতি অনাচরণীয় জাতীয় লোকের বাড়ীতে যাইয়া পৈতাপ্রকটিত নগ্নদেহে সটান একটা মাদুরের উপর শুইয়া পড়িয়া তাহাদিগের কৃপা ও ভালবাসার উদ্রেক করিয়াছি, ভদ্রলোক সাজিয়া গেলে অনেকস্থলে পল্লীর আতিথ্যের দ্বার উন্মুক্ত হয় নাই। আমি চাষাদের সঙ্গে মিশিতে ভালবাসিতাম; বাঙ্গালা পুথি প্রায়ই নিম্নশ্রেণীর লোকদের ঘরে বেশী পাওয়া যায়। আমার

খুল্লতাত কালাশঙ্কর বাবু অনেকদিন সেটুলমেণ্ট আফিসর ছিলেন, তাহার সঙ্গে কখনও ক্রমাগত হাতীতে ঘুরিয়াছি, কিন্তু সরকারী পিয়নদের চাপরাস প্রভৃতি আসবাব দেখিলে গ্রামবাসীরা ভীত হইত। তাহাদের দ্বারা বরং পুথিসংগ্রহের বাধা হইত, এজন্য আমি একা যাইতাম। কখনও পার্ব্বত্যদেশে ভ্রমণ করিতে করিতে রাত্রি হইয়া গিয়াছে, নিবিড় অন্ধকারে কখনও জল ঝড়, কখনও ভীষণ বনজঙ্গল ভেদ করিয়া অসম সাহস সহকারে রাত্রিকালে চলিয়া গিয়াছি। প্রাণের ভয় ছিল না। মরিলে আবার মাতৃকোল পাইব, এই কল্পনায় আঁধারে বন জঙ্গলের পঙ্কে চলিতাম। আমার মত দুর্ভাগ্য না হইলে কেহ আমার মত আগ্রহে প্রাণের আশা বিসর্জ্জন দিয়া—পুঁথি সংগ্রহ করিতে পারিতেন না। আমি রাস্তায় যাইতে কত চোট পাইয়াছি, আহত স্থানে হাত বুলাইতে যাইয়া চখের জলে ভাসিয়াছি। স্মৃতিতে একখানি কোমল শীর্ণ, স্নেহশীতল হাতের কথা মনে পড়িয়াছে যাহা আমার ব্যথিতস্থানে হাতবুলাইয়া আমার সমস্ত ব্যাধির পক্ষে অমৃত ও আরোগ্যের নিদান স্বরূপ ছিল।

একদিনের কথা মনে আছে। সহর হইতে প্রায় ১৩ মাইল দূরে এক এক বাড়ীতে গেলাম। শুনিয়াছিলাম, সে বাড়ীতে একখানি বড় পুথি ছিল। তখন বেলা একটা, কিছু খাওয়া হয় নাই। এক গয়লানী কুমিল্লায় আমাকে দুধ জোগাইত। তাহারই নাম করিয়া তাহার আত্মীয় গোপের গৃহে প্রবেশ করিলাম। দেখিলাম সেই বাড়ীর পুরুষেরা বাহিরে চলিয়া গিয়াছে। একটি বৃদ্ধা ও তাহার একটি তরুণী নাতনী সেই সেই বাড়ীতে ছিল। সেই মেয়েটির বয়স ১৫।১৬ হইবে। তাহার মূর্ত্তিটি পল্লী রাণীর ন্যায়, কি সুন্দর দুটী ডাগর চোখ! কি সুন্দর তাহার বর্ণ,—সে আমার সঙ্গে ঘোমটা খুলিয়া অবাধে কথা কহিতে লাগিল, বুঝিলাম সে বাড়ীর মেয়ে।

বুড়ি বলিল "বাবু বাড়ীতে আমার ছেলে নেই—পুঁথি এখন দেখাইবে কে ?" সেই মেয়েটি বলিল "উনি ১৩ মাইল হেঁটে এসে বুঝি এই দেড়টার সময় এমনই ফিরে যাবেন ! দেখ্‌ছ না ? ওর মুখ শুকিয়ে গেছে, কিছু খান নি।" বৃদ্ধা তরুণার উক্তিতে পরাস্ত হইল ; সে বলিল "বাবু কিছু খাবেন কি ?" তাঁহার প্রশ্নেব উত্তর শুনিবার জন্য দেখিলাম মেয়েটি তার ডাগর চোখ দুটি আমার মুখের দিকে উৎসুকভাবে ন্যস্ত করিয়া প্রতীক্ষা করিতেছে। আমি সে আতিথ্য উপেক্ষা করিতে পারিলাম না। বলিলাম "তোমাদের ঘরে কি আছে, আমি কি খাইতে পারি ?" বৃদ্ধা বলিল "গাছের ভাল পাকা চাটিম কলা আছে, গয়লার ঘরে ঘন আউটান দুধ আছে, চিঁড়ে আছে, আর খেজুর গুড় আছে।" সেই বিগত মধ্যাহ্নে, ক্ষুৎপিপাসা পীড়িত আমার নিকট খাদ্যের ফর্দ্দটা বেশ উপাদেয়ই বোধ হইল। তখন সেই মেয়েটি কত যত্নে আসন পাতিয়া দিল, একটা গ্লাস খুব ভাল করিয়া মাজিয়া ঘষিয়া চক্‌চকে ঝক্‌ঝকে করিয়া দিল ; কড়া হইতে একটা বড় পুরু সর কলার পাতে করিয়া তুলিয়া আনিল এবং চিঁড়ে গুড় ও দুধ, কলা উপাচার লইয়া আতিথ্য করিতে লাগিল। বৃদ্ধার এ সকল আগ্রহপূর্ণ আতিথ্য ভাল লাগিতেছিল কি না জানি না, কিন্তু সে আমার গলার পৈতা দেখিয়া ভয় খাইয়া গিয়াছিল। সুতরাং প্রকাশ্যভাবে সে আমার খাওয়ার জন্য ব্যস্ততাই দেখাইতে লাগিল।

তরুণা আমার ভোজনান্তে একটা উঁচু মাচা দেখাইয়া বলিল—ঐ দেখুন ঐ মাচার উপর বইখানি রহিয়াছে। দেখিলাম কাষ্ঠের পাটায় আবদ্ধ বড় পুঁথি, চন্দনলিপ্ত দেহও বহু শুষ্ক বিল্বপত্র সমন্বিত হইয়া ঊর্দ্ধে মঞ্চোপরি বিরাজ করিতেছে। একখানি মই লাগাইয়া সেখানি পাড়িলাম। কিন্তু যখন বই নীচে নামাইলাম, তখন ভূতাশ্রিত ব্যক্তি রোঝা আসিলে

যেরূপ চীৎকার করিতে থাকে, বৃদ্ধা সেইরূপ ডাক হাঁক পাড়িতে লাগিল। "ও হচ্ছে আমাদের সাত পুরুষের পুথি, উহা কখনও নামানো হয় না, শনি মঙ্গলবার ফুল ও বেল পাতা, ও চন্দন ছড়াইয়া উহার পূজা করিয়া থাকি। ঐ পুথির ডুরি কখনও খোলা হয় না, আপনার গলায় পৈতা, তা খুলিতে পারেন, কিন্তু যেমন ভাবে আছে, ঠিক তেমনই ভাবে রাখ্‌তে হবে" ইত্যাদি। আমি তখন পুথি পাইয়া সব ভুলিয়া গিয়াছি। এমন কি আমার পার্শ্ববর্ত্তিনী বিলোল-লোচনার কথাও আমার মনে নাই। ডুরি খুলিয়া দেখিলাম পুথিখানি একখানি কৃত্তিবাসী রামায়ণ! যাহা হউক নূতন কিছু পাইলাম না --বলিয়া আক্ষেপ হইলেও যাহা কিছু প্রয়োজনীয় মনে করিলাম, তাহা নোট করিয়া লইলাম।

কিন্তু সেই ডুরি ফিরিয়া বাঁধিবার সময় হইল মুস্কিল। গোপকুলের দুগ্ধাদি খাইয়া কৃষ্ণ এতদূর বলবান হইয়াছিলেন যে তিনি অনায়াসে অঘাসুর বকাসুরকে বধ করিয়া ফেলিয়াছিলেন। ৭।৮ পুরুষ পূর্ব্বে যে আহির-সন্তান এই পুথি ডুরি দিয়া বাঁধিয়াছিল তাহার বোধ হয় শাল-প্রাংশু মহাভুজ ছিল। যেরূপ কষিয়া আটিয়া পুথিখানি বাঁধা হইয়াছিল, তাহার ঘায়ে কাঠের আধ ইঞ্চি ক্ষয় পাইয়া দাগ হইয়া গিয়াছিল। ধন্য সেই দড়ি! তাহা নারকেলের ছোবড়া, শণ কি বর্মকিঙ্করের দাড়ী দিয়া তৈরী হইয়াছিল—তাহা জানি না, কিন্তু সার্দ্ধ তিনশত বৎসর পরেও সেই দড়ি এত শক্ত ছিল যে, যে তাহা বল-প্রয়োগে কাটা যাইতে পারিত, কিছুতেই ছেঁড়া যাইত না। বুড়ী চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল "যেমন করিয়া বাঁধা ছিল তেমন করিয়া বাঁধ" আমার গায়ে কি অসুরের বল যে সেরূপ আঁটিয়া বাঁধিতে পারিব? তথাপি প্রাণপণে দড়ি শক্ত করিয়া আঁটিয়া বাঁধিতে লাগিয়া গেলাম; বুড়ি ক্রমাগত "হইল না" বলিয়া ঘাড় নাড়িয়া "হায় হায়" করিতে লাগিল। আমার হাত লাল হইয়া

গেল, তারপর দুই একটি স্থান হইতে বিন্দু বিন্দু রক্তবাহির হইতে লাগিল। এই সময় তরুণী আসিয়া বলিল "ও কি? আপনার হাত দিয়া যে রক্ত বাহির হইতেছে! একটা দিক দিন আমাকে, আমি গয়লার মেয়ে, আমার হাত আপনার চাইতে শক্ত", এই বলিয়া সে আসিয়া দাঁড়ির এক দিক ধরিল। দুইজনে দড়ি টানিতে লাগিলাম। মাথা নিচু করিয়া খুব জোরে দড়ি টানিবার সময় দুই একবার তাহার কপালের সিন্দুর আমার হাতে লাগিল। তাহার সেই পবিত্র চিহ্নের দাগ হাতে করিয়া আমি পুথির শেষ ডুরি বাঁধিয়া ফেলিলাম। মেয়েটি আসিয়া বলিল "উঃ আপনার হাতে কত রক্ত!" আমি হাসিয়া বলিলাম, "সবগুলি রক্ত নয়?" সে সিন্দুর চিনিতে পারিয়া রঞ্জিত হইল। আমি যখন বাড়ী ফিরিব, তখন প্রায় তিনটি, মেয়েটি আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ তাহাদের বাড়ীর পূর্ব্বদিকের রাস্তা পর্য্যন্ত আসিল, তাহার পর যতই আমি অগ্রসর হইতে লাগিলাম ততই সে এক খানি ছবির মত বৃক্ষান্তরালে মিলাইয়া গেল।

এই সময় রায় বাহাদুর কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয়ের সঙ্গে আমার সর্বদা পত্র ব্যবহার চলিতেছিল। তিনি সর্ব্বদাই আমাকে খুব উৎসাহ দিতেছিলেন। আমার কাজের অন্ত ছিল না। যে কতকদিন পুথি খুঁজিয়া বেড়াইতাম, তখন তো আহার নিদ্রার ঠিক ছিল না, "ঘর কৈনু বাহির, বাহির কৈনু ঘর"—এই অবস্থায় নৌকায় তাঁবুতে, পর্ণকুটীরে যে দিন ভগবান যেরূপ জুটাইতেন, সেইভাবে আড্ডা করিয়া লইতাম। কিন্তু যখন বাড়ীতে থাকিতাম, তখন সন্ধ্যায় মেটে প্রদীপের, ম্লান দীপ সম্মুখে করিয়া বসিতাম—কারণ কেরোসিন আমার চক্ষে সহ্য হইত না, সারারাত্রি মোমবাতি জ্বালাইয়া রাখা পয়সায় কুলাইত না। সলতেটি কাটি দিয়ে মাঝে মাঝে উস্কাইয়া দিয়া, গলিত তাম্রকূটপত্রের ন্যায় প্রাচীন পুথির পাতাগুলি ম্যাগনিফাইং গ্ল্যাসের সাহায্যে পড়িতে থাকিতাম। এক

এ কখানি পাতা পড়িতে দুই ঘণ্টা কাটিয়া যাইত, কারণ যতরূপ পাখী ও চতুষ্পদের পা, ঠোঁট প্রভৃতি আছে, তত প্রকারের অদ্ভুত লিপি সেই সকল পুথিতে পাওয়া যাইত। আমি পড়িতাম ও নোট করিয়া যাইতাম, রাত্রি আড়াইটা বাজিলে আমার স্ত্রী চারটি পোলাও চড়াইয়া দিতেন, কিছু কিছু মাংস পূর্ব্বেই রাঁধা থাকিত। তিনটার সময় পুথি বন্ধ করিয়া চারটার মধ্যে ঐ রান্না খাইয়া শুইয়া পড়িতাম। আর বেলা ৮॥ টার সময় ঘুম হইতে উঠিয়া বাহির ঘরে আসিয়া দেখিতাম বহুলোক অপেক্ষা করিতেছেন, কারণ সেখানে আমার খুব নাম পড়িয়া গিয়াছিল আমি একজন ভাল জ্যোতিষী, কোষ্ঠী দেখাইবার জন্য ও নূতন কোষ্ঠী করিবার জন্য বহুলোক আসিতেন, তার মধ্যে ডিপুটি সবজজ ও মুন্সেফেরা এ বিষয়ে আমাকে বিশেষ আপ্যায়িত করিতেন, তাঁহাদের বান্ধবতার ঋণ শোধ করিতে আমার কম শ্রম স্বীকার করিতে হইত না। ইহা ছাড়া ইংরেজীতে রিপোর্ট ভাল লিখিতে পারি বলিয়া ও আমার একটা নাম পড়িয়া গিয়াছিল, যেহেতু আমি খুড়া কালীশঙ্কর বাবুর সেটলমেণ্টের রিপোর্ট লিখিয়া দিতাম। কাহারও কাজ গিয়াছে, কাহারও কাজ চাই, কাহারও কৈফিয়তের জবাব দিতে হইবে, কাহারও বা সরকারী কার্য্যোপলক্ষে ভ্রমণবৃত্তান্ত আদি দাখিল করিতে হইবে, – এইভাবে রিপোর্ট লিখিবার উমেদার আমার নিকট অনেকে আসিতেন। তাহাদের পদধূলির সম্মান রাখিতে যাইয়া অনেক সময় আহারের অবসর পাইতাম না, স্কুলে যাইবার সময় তাহারা পায়ে পায়ে হাঁটিতেন। এইরূপ বিচিত্র রকমের কাজের তাড়ায় আমি এতটা ব্যস্ত হইয়াছিলাম ও গৃহে নানারূপ কলহ ও অশান্তিতে এতটা বিরক্ত থাকিতাম, যে আমার শরীর যেন কাজের বোঝা আর বহন করিতে চাহিত না।

ইহার মধ্যে আমার মাতুলেরা বহু ঋণগ্রস্ত হইয়া সর্ব্বস্বান্ত হইবার

মধ্যে আসিলেন। মাতুল চন্দ্রমোহন সেন মহাশয় ঢাকা জেলা কোর্টে নামে মাত্র ওকালতী করিতেন; তাঁহার অর্থ উপার্জ্জনের কোনই প্রয়োজন ছিল না; যদি সম্পত্তির সামান্য একটু অংশ ছাড়াইয়া দিতেন, তাহা হইলে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই ঋণদায় হইতে মুক্ত হইতে পারিতেন এবং তাহাতে সম্পত্তির যেটুকু ক্ষতি হইত তাহা এত ক্ষুদ্র যে ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নয়। কিন্তু জমিদারীর কোন অংশ বিক্রয় করার পরামর্শ দিলে তিনি বলিতেন "তোমরা অঙ্গচ্ছেদ (amputation) করিয়া চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতে চাও, আমি তাহাতে রাজী নই।" একএকবার জমিজমা বিক্রয় করিবেন বলিয়া বাহিরে ইচ্ছা প্রকাশ করিতেন, কিন্তু তাহা শুধুই মৌখিক। এইরূপ এক মুহূর্ত্তে তিনি আমায় লিখিয়া পাঠান, "তুমি শীঘ্র ছুটি নিয়ে আসিবে, এবং ভাওয়াল ষ্টেট আমার জমিদারীর কতকটা অংশ ক্রয় করিতে সম্মত হন কিনা, এবং দরসম্বন্ধে তোমার চেষ্টায় আমার পক্ষে কিছু অনুকূলতা হয় কিনা, কালী প্রসন্ন ঘোষ মহাশয়ের দ্বারা সেই চেষ্টা করিয়া দেখিবে।" ভাওয়াল ষ্টেটের ম্যানেজার রায় বাহাদুর কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয় তখন জয়দেবপুরে ছিলেন, আমি আমার পাঁচ বৎসরের শিশু কিরণ চন্দ্রকে লইয়া ঢাকায় রওনা হইলাম। কিরণকে কালীপ্রসন্ন বাবু ক্রোড়ে নিয়া তাহাকে "অধ্যাপক" উপাধি দিয়াছিলেন, ইহা তাহার অবশ্যই স্মরণ নাই, কিন্তু তাহার জীবনে এটি একটি স্মরণীয় ঘটনা।

মাতুলের যে এরূপ সুমতি হইয়াছে ইহাতে আমরা আনন্দিত হইলাম। জয়দেব পুর বেলা ৯টার সময় পৌঁছিলাম। রায়বাহাদুর বহু যত্ন করিয়া আমাকে গ্রহণ করিলেন, দিনের বেলায় কাজকর্ম্মের ভিড়। রাত্রে তাঁহার সঙ্গে সব বিষয়ে আলাপ হইবে, এই ঠিক করিলেন। রাত্রি ৮টা হইতে প্রায় দুইটা পর্য্যন্ত আমরা কথোপকথন করিয়াছিলাম। বাঙ্গালা দেশে তাঁহার মত কথা বার্ত্তার প্রতিভা আমি আর কাহারও দেখি নাই;

তিনি বৃহস্পতির ন্যায় বাগ্মী ছিলেন, কথা বলিবার সময় মনস্বিতায় তাঁহার বৃহৎ চোখ দুটি যেন জ্বলিয়া উঠিত; দুইটি সুন্দর ঠোঁট উৎসাহিত ভাবে কথা বলিবার সময় যেন একটু একটু কাঁপিত, কোন তেজস্বিনী নদীস্রোত পুষ্পিত লতার উপর বহিয়া গেলে যেরূপ কাঁপে। যাহা বলিতেন তাহা বড় বড় সমাসাবদ্ধ শব্দে ঠিক পণ্ডিতের লিখিত ভাষার মত শুনাইত, প্রভেদ এই যে তাহা প্রাণের আবেগ বহণ করিত। অভিধানিক শব্দগুলি তাঁহার ক্রীড়াকন্দুকের মত ছিল। তাঁহার ধনুতে জ্যা দিবার শক্তি অন্য কাহারও ছিল না; গাণ্ডীব যেরূপ পার্থের, বীণা যেরূপ নারদের, তাঁহার ভাষা সেইরূপ তাঁহারই ছিল। তাহা অনুকরণকারীর নৈরাশ্য ও শ্রোতার চির-বিস্ময়। মাতুলের সম্পত্তি সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা বলিয়া তিনি সাহিত্যের কথা পাড়িলেন। চৈতন্য সম্বন্ধে বলিলেন, "মানুষ স্ত্রী পুত্রকে ভালবাসে, সেই ভালবাসায় ছন্ন হইয়া যায় তাহা দেখিয়াছি, কাব্য নাটকে নায়ক নায়িকার প্রেম নানা সৌন্দর্য্যজালে জড়িত করিয়া কবিগণ উপস্থিত করেন, দেখিয়াছি, কিন্তু ঈশ্বরকে —অদৃশ্যকে—যে মানুষ সেই স্ত্রীপুত্র হইতে শতগুণ বেশী ভালবাসিতে পারে, ইহা একমাত্র চৈতন্যদেব জগতে প্রমাণ করিয়াছেন।" এই কথা তিনি "ভক্তির জয়" পুস্তকে শেষে লিখিয়াছিলেন। আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি বৈষ্ণব সাহিত্যের প্রতি এত অনুরাগী কিসে হইলে?"

আমি বলিলাম—"বৈষ্ণব কবিদের মানের পালা শুনিয়াছেন, তাহা প্রায় সমস্ত রাত্রি ধরিয়া গীত হইয়া থাকে। কলহন্তরিতা, খণ্ডিতা, বিপ্রলব্ধা, মাথুর, অভিসার, পূর্ব্বরাগ ইহার প্রত্যেকটি একএকটি সুদীর্ঘ পালা। অন্যান্য কবিরা নায়ক নায়িকার কলহ বর্ণন করিয়াছেন, তাহা নিছক ক্রোধের অভিনয়। প্রণয়ী-প্রণয়িনীর যখন পরস্পরের প্রতি সন্দেহ ও অবিশ্বাস বর্ণনা করিয়াছেন, তখন তাঁহারা দেখাইয়াছেন, প্রেমে পড়িয়া পর-

পরকে খুন করা যায়,—অতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করা যায়। সুতরাং সেই সকল কাব্যের প্রেম-দেবতা অনেক সময় ভূতাশ্রিত হন।

কিন্তু বৈষ্ণব কবিবর্ণিত প্রেমে ক্রোধ মানরূপে ধরা দেয়। উহাতে প্রেমই ক্রোধের ছদ্মবেশে উপস্থিত হয়, উহা যতটা আঘাত করিতে চেষ্টা করে, তাহা হইতে অধিক আঘাত নিজে পায়, উহার প্রধান অস্ত্রশস্ত্র ফুল দিয়া গড়া। বৈষ্ণবকবিবর্ণিত প্রেমে চির পরিত্যাগের নাম মাথুর, উহাতে নাকি প্রেমকে যত পুষ্টি করে, এরূপ আর কিছুতেই করে না। বৈষ্ণব কবির প্রেমে ক্রূর ঠাট্টা ও ব্যাঙ্গোক্তির অভাব নাই কিন্তু সে যেন ফুলদিয়া শূল তৈরী করা। এক কথায় বৈষ্ণবের কাব্যে রাগ, দ্বেষ, কলহ, পরিত্যাগ সকলই আছে, কিন্তু তাহা পার্থিব রাজ্যের নহে ; তাহা ঊর্দ্ধলোকের। সেখানে সমস্ত ইন্দ্রিয়—প্রেমের স্বগণ, সেগুলি অসুর প্রকৃতি ভুলিয়া দেব-প্রকৃতি হইয়াছে। এই পালাগুলির মধ্যে নাট্ট শিল্প, কলাকৌশল, সমস্তই পর্য্যাপ্ত পরিমাণে আছে, কিন্তু তাহাতে হিংসা,দ্বেষ, দেনা পাওনার হিসাব প্রভৃতি "বাজারে" রকমের কিছুই নাই। এ যেন যুথি, জাতি, কুন্দ, বেলা ও মালতীর বাগান, বিচিত্রতায় সুন্দর ; কোনটি শ্বেত, কোনটি লাল, কোনটি নীলাভ, কিন্তু সবগুলি ফুল। কাহারো গন্ধ তীব্র, কাহারো গন্ধ মৃদু, কিন্তু সবগুলি ফুল—এরূপ নিছক্ প্রেমের রাজ্য আর কোন সাহিত্যে আছে কিনা, তাহা আমি জানি না।"

কালীপ্রসন্ন বাবু আমার কথায় সুখী হইলেন। তার পর বঙ্কিমবাবুর কথা পাড়িলেন এবং বলিলেন, "দেখ—আমি পূর্ব্ববঙ্গের লোক বলিয়া ওদিক্ কার সমস্ত লেখকই আমাকে ঈর্ষা কর্‌তেন। কেবল বঙ্কিমবাবু আমারপ্রতি উদারভাব দেখাইতেন, কিন্তু তা ও প্রথম প্রথম। "বান্ধবের" যশ বিস্তার পাইলে তাঁহার সাহিত্য-চক্রে ভ্রমনশীল জ্যোতিষ্কগণের প্ররো-চনায় তিনিও শেষটা আমার প্রতি বিরূদ্ধ হইলেন। একবার আমি

কলিকাতায় গিয়াছিলাম, তখন ইহাঁরা দস্তুর মত আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রটি পাকাইয়া তুলিয়াছেন। আমার লেখার প্রণালী—যাহাতে সংস্কৃত শব্দের ব্যবহার বেশী থাকে—তাই লইয়া আমাকে জব্দ করিবার অভিসন্ধি হইল। বঙ্কিমবাবু আমাকে একটা নির্দ্দিষ্ট দিন প্রাতে তাঁহার বাড়ীতে যাইতে অনুরোধ করিলেন। সেখানে যাইয়া দেখি চন্দ্রবাবু, চন্দ্রশেখরবাবু, মাষ্টার হরপ্রসাদ (বোধ হয়, বয়সে অল্প থাকার দরুণ শাস্ত্রী মহাশয়কে ইনি প্রায়ই আমাদের কাছে "মাষ্টার" বলিয়া উল্লেখ করিতেন) প্রভৃতি অনেক সাহিত্যিক বসিয়া আছেন। আমি বুঝিলাম, বাঙ্গালের বিরুদ্ধে দস্তুর মত একটা ষড়যন্ত্র রহিয়াছে। আমি যাওয়ার পর বঙ্কিমবাবু একখানি কাগজ বাহির করিয়া আমার হাতে দিলেন এবং বলিলেন "এইটিতে স্বাক্ষর করুন।" আমি দেখিলাম, সেইটির নীচে অপরাপর সাহিত্যিকদের সই রহিয়াছে। আমি উহা পড়িয়া দেখিলাম, তাহাতে লিখিত আছে "সর্ব্ব-সাধারণ যেরূপ লেখা বুঝিতে পারে, সেইরূপ লেখাই যুক্তি-যুক্ত।" আমি বলিলাম "এতে আমি কি করিয়া সই করিব? ধরুন, যদি দার্শনিক কথা লিখিতে হয়, তবে তাহার পরিভাষা আছে, তাহা সর্ব্ব-সাধারণের বোধগম্য হইতে পারে না। কেহ যদি বেদসম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখেন, কিংবা অলঙ্কার শাস্ত্র লইয়া বই লেখেন, তবে কি তাহা শিশুর বোধ-গম্য হইবে?" এই বলিয়া তাঁহাদের কাগজটায় আমি আর একটি সূত্র লিখিলাম—"উদ্দিষ্ট বিষয়ের অনুযায়ী ভাষায় পুস্তকাদি রচনা করা উচিত।" এবং সেই লেখাটার নীচে সকলকে স্বাক্ষর করিতে আহ্বান করিলাম, একটা তর্কযুদ্ধ বাধিয়া গেল ও গোলমালে সভাটি ভাঙ্গিয়া গেল। সকলে চলিয়া গেলে বঙ্কিমবাবু আমাকে বলিলেন "ওহে, তুমি যে পদ্মাপাড় হইতে আসিয়া এতশীঘ্র আমাদের দুর্গটা জয় করিয়া যাইবে, ইহারা তাহা হইতে দেবে না।"

আমি জয়দেবপুর হইতে কুমিল্লা হইয়া ঢাকায় চলিয়া আসিলাম।

আমার মামাত এক ভগিনী ছিল, তার নাম সরোজিনী। তাঁর মত সুন্দরী মেয়ে বাঙ্গলা দেশে অল্পই ছিল, আমি ত এপর্য্যন্ত দেখি নাই। কীর্ত্তি-পাশার জমিদার অনারেবল বিনোদ কুমার সেন সেই মেয়েকে দেখিয়া বিবাহ করিতে ইচ্ছা করেন,তখন বিনোদের বয়স ১৯।২০ ; তাঁহাদের পরিবারে কুলীন ছাড়া অন্য কাহারও সঙ্গে বিবাহাদি হইত না। আমার মামারা কুলীন ছিলেন না, কিন্তু বিনোদসুন্দরী খুঁজিয়া বাঙ্গলাদেশময় ঘুরিতেছিলেন, সরোজিনীর মত সুন্দরী তিনি দেখেন নাই। তাঁর সম্পত্তির আয় বাৎসরিক লক্ষাধিক টাকা। তিনি এরূপ সকল সঙ্কল্প প্রকাশ করিতে লাগিলেন যে তাঁহার গুরুজনেরা শেষে এই বিবাহে রাজী হইয়াছিলেন।

(১৭)

কলিকাতায় এক মাস।

এই বিবাহোপলক্ষে আমাকে বরিশাল যাইতে হইয়াছিল, তার পর কলিকাতা হইয়া কুমিল্লা ফিরিয়া আসি। কিন্তু একমাস কাল কলিকাতায় ছিলাম, সে ১৮৯১ সনে। তখন জৈষ্ঠমাস; আমি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্কুলে কোন কাজ পাই কিনা, এই চেষ্টায় তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে গেলাম। বাদুর বাগানের বাড়ীতে মাঝের একটা দ্বিতল ঘরে, চারিদিকে পুস্তকের আলমারীমধ্যে একখানি টেবিল, তার ধারে খানকতক চেয়ার, বিদ্যাসাগর তার এক খানিতে বসিয়া মাথা গুজিয়া কি কাগজ পত্র দেখিতেছিলেন। আমি ও আমার মামাত ভাই মতিলাল দুজনে গিয়াছিলাম। আমরা দুজনে তাহার পায়ে হাত দিয়া প্রণাম করিতে গেলাম; তিনি যেন একটু সত্রস্ত হইয়া পা সরাইয়া নিতে লাগিলেন, কিন্তু ইহার মধ্যেই আমাদের পায়ের ধূলা নেওয়া হইয়া গিয়াছে। আমরা তরুণ যুবক, তাঁহার মুখে "তুই" সম্বোধন মিষ্ট লাগিল। বলিলেন "কি চাস্?" আমি চাকুরী প্রার্থনা করিলাম। তিনি বলিলেন "বাড়ী কোথায়?" ঢাকার জেলায় বাড়ী শুনিয়া বলিলেন "তাই তো তুই যে বাঙ্গাল, তাতো তোর কথার টানেই বুঝিতে পারিয়াছি। এখানকার ছাত্র তোর টিপ্রা জেলার ভিক্টোরিয়া স্কুলের ছাত্র নয়, যে তুই অনার পাশ শুনিয়া চমকে উঠবে। এখানে বড় বড় ওস্তাদ শিক্ষকেরা থাল হইয়া যায়, তারা ক্লাস সাম্‌লিয়ে উঠতে পারে না, তুই বাঙ্গাল, তোকে ত একদিনে পাগল করে ছাড়বে।"

আমি বলিলাম, "ক্লাস পড়াতে দিয়া দেখুন না, বেশ ত, দেখি আপনার ছেলেরা বাঙ্গালকে কি কোরে ঘাল করতে পারে ?"

বিঃ—"তোর তো বেশ সাহস আছে, কিন্তু আমি বিশ্বাস করি না, তুই পারবি। বাঙ্গালের কর্ম্ম নয়; যাহোক তুই যখন চাচ্ছিস, আজ শনিবার—তুই সোমবার দিন ১১টার সময় মেট্রপলিটান স্কুলে যাস—আমি সেই সময় যাব,—তোকে ক্লাস পড়াতে দেব।"

পার্টিসনের পর হইতে বাঙ্গালের উপর এদিককার লোকদের উপদ্রব কতকটা কমিয়া গিয়াছে, নতুবা ময়নাবতীর গানের কবি হইতে চৈতন্যদেব, কবিকঙ্কণ প্রভৃতি সকলেই ত বাঙ্গাল লইয়া খুব মজা করিয়া আসিয়াছেন, রঙ্গমঞ্চে বাঙ্গাল না হইলে ত অর্দ্ধেক আমোদই মাটী।

যদি ও শুনিলাম বাঙ্গাল মাষ্টার মেট্রপলিটানে বড় আমল পায় নাই, তথাপি আমার একটু ভয় হইল না। সোমবার দিন যথাসময়ে স্কুলে গেলাম প্রায় ১৫ মিনিট পড়ে উড়িয়াবাহকের স্কন্ধারূঢ় একখানি পাল্কী স্কুলের গেটে আসিয়া হাজির। তাহার মধ্য হইতে টাক-বিরলকেশ, চটি পায়ে বিদ্যাসাগর মহাশয় বাহির হইলেন। আমায় দেখিয়া বলিলেন, "চল্, তোকে হেড-মাষ্টার মহাশয়ের সঙ্গে দেখা করিয়েই দি।" হেডমাষ্টার মহাশয়কে ডাকাইয়া তিনি লাইব্রেরী রুমে আমার সঙ্গে পরিচিত করিয়া দিলেন, এবং বলিলেন, "তুমি একে প্রথম শ্রেণী ও দ্বিতীয় শ্রেণী পড়াইতে দাও।" হেড মাষ্টার বাবু বলিলেন "আপনি দেখছি ছেলে মানুষ, কি পড়াবেন ?" আমি বলিলাম, "ইংরাজী ও ইতিহাস" প্রথম শ্রেণীতে ইংরেজী পড়াইলাম, —আমার ইংরেজী সাহিত্যের প্রতি বিশেষ অনুরাগ ছিল—ছেলেরা আমার কথা গুলি স্তব্ধ হইয়া শুনিল—বোধ হইল যেন তাদের খুব ভাল লাগিল। কিন্তু শেষ কালে আমি বলিলাম "তোমাদের পড়া দেখছি খুবই কমই হইয়াছে, পরীক্ষা নিকটবর্ত্তী—কি করিয়া সবটা শেষ করিবে ?

যিনি ইংরেজী পড়ান, তিনি বেশ হিসাব ঠিক করিয়া পড়ান নাই।" এই বলিয়া যাই বাহির হইব, দেখিলাম দরজার পাশে হেড-মাষ্টার চুপটি করিয়া দাঁড়াইয়া আমার পড়ানো শুন্‌ছিলেন। তিনিই প্রথম শ্রেণীতে ইংরেজী পড়াইতেন। সুতরাং আমি আমার শেষ মন্তব্যটিতে তাঁকে যে একটু ঘা দিয়াছি, তা তাঁর কর্ণগোচর হইয়াছে ভাবিয়া একটু শঙ্কিত হইলাম। তারপরের ঘণ্টায় দ্বিতীয় শ্রেণীতে ইতিহাস পড়াইলাম। উভয় শ্রেণীর ছাত্রেরাই যে আমার পড়ানোতে বিশেষ প্রীত হইয়াছিল, তাহা আমি সন্ধান করিয়া জানিতে পারিলাম। সুতরাং পরদিন অর্থাৎ মঙ্গলবার খুব গর্ব্ব-ভরে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সুবিখ্যাত চটীলগ্ন পাদযুগ্ম বন্দনা করিয়া স্মিত মুখে তাঁর আদেশ প্রতীক্ষা করিয়া দাঁড়াইলাম। তিনি টেবলের ড্রয়ার হইতে একটা কাগজ বাহির করিয়া আমায় দেখাইলেন—তাহাতে হেড-মাষ্টার লিখিয়াছেন "প্রথম শ্রেণীর ছাত্রেরা খুসী হয় নাই, দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রগণ ভালই বলিয়াছে।"

আমি বিদ্যাসাগর মহাশকে উত্তেজিত কণ্ঠে বলিলাম "এ সকল আপনার হেড মাষ্টারের চালাকি, চলুন আপনি নিজে ছাত্রগণকে জিজ্ঞাসা করিবেন, তারা যদি না বলে যে আমি আপনার হেডমাষ্টার অপেক্ষা ইংরেজী ভাল পড়াইয়াছি—তবে আমি কোন কাজ চাই না। হেডমাষ্টার নিজে ছেলেদের পড়া সম্বন্ধে কতকটা শিথিল, তাই বলিয়াছিলাম। ইহা যে তিনি দূতির মত কপাটের আড়াল থেকে শুন্‌বেন, ইহা আমি জানতেম না—এই জন্য রাগ করে ঐরূপ রিপোর্ট দিয়াছেন।" বিদ্যাসাগর বলিলেন, "তোর ভিতর তেজ আছে, তুই পারবি অন্ততঃ একটা ক্লাস ত খুসী করিয়াছিস্। হেডমাষ্টার নিজে লিখেছে—আমি তা প্রত্যাশা করি নাই। বাঙ্গাল মাষ্টার পেলে ত ছেলেরা তাকে লাড্ডুর মত ব্যবহার করে। যা হৌক, আমি আর কোন খোঁজ নেব না,

তোকে যোগ্য মনে করিলাম। কিন্তু তোর পূর্ব্বে পাঁচ ছয় জন যোগ্যতা দেখিয়েছেন্—এই দেখ তাদের নাম। এরা কাজ পেলে তুই পাবি। আর ১½ মাস ২ মাস পরে আমি তোকে নিতে পারব। তুই মাঝে মাঝে আমার সঙ্গে দেখা করিস্।"

আমি বলিলাম "আমার যে কুমিল্লার স্কুল খুলিয়াছে। আমার ২।১ দিনের মধ্যে যেতে হবে। আপনি আমায় কাজ খালি হ'লে চিঠি লিখবেন।" তিনি ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন "সে হবে না, তোর এখানে থাক্‌তে হবে। এখানে চাকুরী প্রার্থী এত লোক আছে যে কাজ খালি পড়লে তোকে কুমিল্লা হইতে চিঠি লিখিয়া আনাইবার সবুর সইবে না। বিশেষ দশ পনের দিন ক্লাশে পড়া বন্ধ রাখতে পারব না। তুই সেই চাকুরী এস্তাফা দিয়ে যদি এখানে থাক্‌তে পারিস, তবে দুই মাসের মধ্যে কাজ পাবি, এটি আমি বল্‌তে পারি।"

আমি বলিলাম "আগেই সেখানকার কাজ আমি ছেড়ে দিতে পারব না। বিশেষ আমার সেখানে একটা দায়িত্ব আছে। সেখানকার একটা ব্যবস্থা ক'রে তো ছেড়ে দিতে হবে।"

তিনি বলিলেন "তবে আমি আর কি করব ?" আমি পুনরায় তাঁকে প্রণাম করিয়া চলিয়া আসিলাম।

ইহার পর কলিকাতায় দুই তিন দিন ছিলাম। আমার মাসীমা তখন কলিকাতায় ছিলেন। আমার মাসতুত ভাই জগদীশ বাবু প্রেসিডেন্সী কলেজে প্রফেসারী করিতেন ও ছোট ভাই গিরীশ ও হেম এখানে বি, এ পড়িত। সেই বাড়ীতে তখন ১৬।১৭ বছরের আর একটি যুবক থাকিতেন। ইনি আমার স্ত্রীর আপনার মামাত ভাই, এখন ইনি মিষ্টার জে, এন রায় নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। ইনি তখন বিলাত যাওয়ার জন্য সবে পাখা ঝাপটাইতেছিলেন, এবং অনর্গল ইংরেজী কহিয়া

ও বাঙ্গলা কবিতা লিখিয়া,—কখনও বা একপায়ে জুতার এক পাটি, আর এক পায়ে অন্য জুতার আর এক পাটি পরিয়া সহর ভ্রমণ পূর্ব্বক নানা বিচিত্র ভাবে সেই বয়সেই উদীয়মান প্রতিভার প্রমাণ দিতেছিলেন। তিনি যে এ জগতে একটা কাণ্ড না করিয়া ছাড়িবেন না, তাহা আমরা তখনই জানিতাম। তাঁহার প্রতিভা কর্ম্ম-ক্ষেত্রে আজ শত নক্ষত্রের আলোকে প্রকাশ পাইয়াছে।

এই বাড়ীতে এক দিন আমি খাইতে বসিয়াছি, এমন সময় আমার মাসিমা বলিলেন—"তুই হাঁ কর দেখি,তোর গলার মধ্যে কি একটা দেখা যাচ্ছে—খুব বড় হাঁ কর" যাহাতক আমি সেইরূপ হাঁ করিয়াছি, অমনই আমার গলার ভিতর তিনি আধ কোয়া কমলা লেবু ও এক চাক আম প্রবেশ করাইয়া দিলেন,এবং আমি ভাল করিয়া অবস্থাটি বুঝিবার পূর্ব্বেই তাহা গিলিয়া ফেলিলাম। তার পর আমার দুই চোখ হইতে অজস্র অশ্রু পড়িতে লাগিল, আমি বলিলাম—"ছোট মাসী, তুমি কি করলে, মা মরেছেন আজ এই চার বছর, এই কয়েক বছর কমলালেবুর জায়গা শ্রীহট্টে থাকিয়া ও আমি নেবু খাই নাই। এই চার বছর আমি আম খাই নাই, আর জীবনে খাইব না, এইসঙ্কল্প করিয়াছিলাম। তুমি আমার সঙ্কল্প ভাঙ্গলে!" মাসিমা বলিলেন--"আমি তোর মাএর চাইতে কম কিরে? আমার বাড়ীতে এত আম আসে—আর তুই শোকের জন্য আম না খেয়ে থাকবি, এ কি আমার সহ্য হয়?" কলিকাতায় অসময়েও নেবু পাওয়া যায়—এই জন্য দুই ফল সম্বন্ধেই তিনি আমার সঙ্কল্প ভাঙ্গিতে পারিয়াছিলেন।

কলিকাতা হইতে কুমিল্লায় ফিরিবার পূর্ব্বে বঙ্কিম বাবুর সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ করিব, পূর্ব্বেই তাহা স্থির করিয়াছিলাম। এই জন্য বঙ্কিমবাবুর বন্ধু কালীপ্রসন্ন সরকার ডিপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট মহাশয়ের নিকট হইতে এক

খানি পরিচয়-পত্র আনিয়াছিলাম। কালী প্রসন্ন বাবু গীতার ইংরেজী অনুবাদ করিতেছিলেন, আমি এ বিষয়ে তাঁর কতকটা সাহায্য করিয়াছিলাম। কালীপ্রসন্ন বাবু তাঁহার চিঠিতে সে কথা উল্লেখ করিয়াছিলেন। আমি ও আমার মামাত ভাই মতিলাল একদিন বেলা দুইটায় সময় প্রতাপচাটুর্য্যের গলীতে বঙ্কিম বাবুর বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম। যে বাড়ীটা বঙ্কিমবাবুর বাড়ী বলিয়া জানিতে পারিলাম, তাহার দরজার কাছে দাঁড়াইয়া খুব চীৎকার শুনিতে পাইলাম। উঁকি মারিয়া দেখিলাম, এক নগ্ন দেহ গৌরবর্ণ বৃদ্ধ তৎসকাশে দণ্ডায়মান একটি নীরব নত-মস্তক ভৃত্যকে অনর্গল বকুনি দিয়া যাইতেছেন। আমরা দরজায় উঁকি মারিয়া দাঁড়াইয়াছি দেখিয়া তিনি খানিকটা অপ্রতিভ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনারা কাকে চান্?" আমি বলিলাম "বঙ্কিম বাবুকে" তিনি বলিলেন "কোথেকে এসেছেন, কি দরকার?" আমরা উত্তরে বলিলাম, "কুমিল্লা হতে এসেছি, শুধু তাকে দেখব বলে।" বৃদ্ধটি দক্ষিণদিকের সিঁড়িটা দেখাইয়া বলিলেন—"ঐ সিঁড়ি দিয়া উপরে যাইয়া অপেক্ষা করুন।"

আমরা উপরে যাইয়া দেখিলাম, একখানি নাতিবৃহৎ ঘর, তার একদিকে একখানি টেবিল ও তার চার দিকে খান কতক চেয়ার। ঘরে আস্‌বাবের বাহুল্য নাই—যদিও ইহা বৈঠকখানা বলিয়াই বোধ হইল। আমরা বসিবার ২।৩ মিনিট পরেই দেখিলাম, সেই বৃদ্ধ একটা জামা গায়ে চড়াইয়া সভ্য ভব্য হইয়া আসিলেন, তিনিই যে বঙ্কিম বাবু তাহা বুঝিতে বিলম্ব হইল না। তার গোঁপ দাড়ী কামানো, রংটি বেশ ফর্সা, মুখের হাঁ একটু বড়, চক্ষুদুটি উজ্জ্বল কিন্তু বড় নহে ; দীর্ঘাকৃতি, তিনি আসিয়া এক খানি চেয়ারে বসিয়া হাত বাড়াইয়া কালী বাবুর পত্র খানি লইয়া পড়িলেন, এবং তিনি কেমন আছেন জিজ্ঞাসা করিলেন।

কুমিল্লার জলবায়ু, ধান চালের অবস্থা, লোক-সংখ্যা, স্কুল কলেজের কথা প্রভৃতি সমস্ত বিষয়েই আলাপ চলিল। যতবার আমি সাহিত্য সম্বন্ধে আলাপ করিতে চেষ্টা করিলাম, ততবার তিনি সে কথা এড়াইয়া ধ্যানাদি সম্বন্ধে প্রশ্নের অবতারণা করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া আমার তাঁহার লেখনী নিঃসৃত কত প্রতিভা-দীপ্ত রচনার কথাই মনে পড়িতে লাগিল—একবার মনে হইল—"ধীরে রজনী ধীরে, অন্ধ অথচ কুঞ্চিত ভ্রূ, বিকলা অথচ শীর্ণা দূরাগত রাগিণীর ন্যায়, অর্দ্ধবিকসিত কুসুম সুরভির ন্যায় রজনী ধীরে ধীরে জলে নামিতেছে।" আর এক বার মনে পড়িল, "কোকিল তুই একবার ডাক দেখিরে, কণ্ঠ নাই বলিয়া আমি আমার মনের কথা বলিতে পারিলাম না"—এবং পুনরায় "শোন ওসমান, আবার বলি, এই বন্দী আমার প্রাণেশ্বর" প্রভৃতি কত ছত্র মনে পড়িল। শার্দ্দুল চর্ম্ম পরিহিত জীবন্ত শার্দ্দুলের ন্যায় কাপালিককে মনে পড়িল। অগ্নিদেব যাহার "পা দুখানিকে কাষ্ঠ ভ্রমে চিবাইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, কিছু মাত্র রস না পাইয়া অর্দ্ধদগ্ধ অবস্থায় ফেলিয়া গিয়াছেন" সেই "সহর্ণের্ঘঃ" পাঠ নিরত দিগ গজকে মনে পড়িল; এলায়িত কেশা, বনলক্ষীর ন্যায় নির্জ্জন সমুদ্র তীরে কপালকুণ্ডলার বীণা কণ্ঠ নিনাদিত "পথিক, তুমি কি পথ হারিয়েছ" প্রভৃতি মনে পড়িল,—আমার, বড় ইচ্ছা হইয়াছিল, সাহিত্য প্রসঙ্গে ইহার সঙ্গে কিছু কাল আলাপ করি। কিন্তু বঙ্কিম বাবুর শৈল কঠিন গাম্ভীর্য্য বোধ হয় আমার পদ্মাপাড়ী কথার টানে আরো জমাট হইয়া উঠিতেছিল; তিনি যেন মনে করিলেন, আমি একটি কৃষক যুবক, সুতরাং লাঙ্গল, ফাল ও চাষাবাদের কথা ছাড়া আর কিছু বলিবার উপযুক্ত নহি। বিষবৃক্ষ ও কপাল কুণ্ডলার লেখক আমার নিকট এইরূপে দেখা দিলেন; আমি ভাবিয়াছিলাম যদি একবার সাহিত্যের কথা আমার

শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার এম, এ,

সঙ্গে পাড়তেন, তা হলে মারলোর ফষ্ট ও শিলারের এপিসিকাইডস হইতে কবিতা আওড়াইয়া তাঁহাকে আমি আমার বিক্রম দেখাইয়া দিতাম, —চণ্ডীদাস—বিদ্যাপতি—গোবিন্দ দাস যে গীতি-কবিতার রাজা তাহা বুঝাইয়া দিয়া আমি তাঁহার নিকট হইতে বিস্ময় ও প্রীতির স্তোক-বাক্য আদায় করিয়া লইতাম। কিন্তু তিনি আমাকে সে সুযোগ দিলেন না। তিনি শুধু বই লিখিয়াই সাহিত্য-সম্রাট না কথাবার্ত্তায় ও সাহিত্য রস প্রচুর রূপে দিতে পারেন তাহা বুঝিবার সুবিধা পাইলাম না। বঙ্কিম-বাবুকে আমি স্বচক্ষে দেখিয়া আসিলাম কিন্তু তাঁহার বই পড়িয়া তাহার যেরূপ মনে মনে আঁকিয়াছিলাম, সে আমার ধ্যান-লোকের বঙ্কিম-বাবুর কোনই আভাষ সাক্ষাৎকারে পাইলাম না, সুতরাং সাক্ষাৎ বিফল হইল।

আমি কলিকাতা আসিয়া দেখিলাম, রামদয়াল আর ঠিক তেমন নাই; সাহিত্যিক কথা লইয়া যে দিন রাত থাকিত. সে শুধু ধর্ম্ম ধর্ম্ম করিয়া বেড়াইতেছে। আর্য্যমিশান ইনস্টিটিউসনের সে হেডমাষ্টার হইয়াছে, তাহার স্বত্বাধিকারী পঞ্চানন বাবুর নিকট সে দীক্ষা লইয়াছে। এদিকে মহাকালী পাঠশালার মাতাজী এবং আর একটি নবীনা বাঙ্গালী মাতাজী, এই দুই জনে তাঁর উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিতেছেন। সে এমন সকল কথা বলিতে লাগিল, যাহা আমাদের মাথা ডিঙ্গাইয়া চলিয়া যায়। বাঙ্গালী মাতাজীর সঙ্গে সে আমার পরিচয় করাইয়া দিল; আমার ইতিপূর্ব্বে বিশ্বাস ছিল—স্ত্রীলোক ভালবাসার জিনিষ, পূজার জিনিষ। তিনি সুখদুঃখের সঙ্গিনী হইতে পারেন, পালন করিতে পারেন, নিতান্ত ধীর বুদ্ধি ব্যক্তিকেও কবিত্ব-কল্পনা দিয়া স্বপ্নাবিষ্ট করিতে পারেন—কিন্তু শিক্ষা দীক্ষা ও গুরুতর চিন্তা-শীলতায় তিনি কখনই পুরুষের সমকক্ষ হইতে পারেন না। মাতাজীর সঙ্গে ঘনিষ্ট ভাবে মিশিয়া আমার সে ভ্রম

ঘুচিয়া গেল। এক একদিন সন্ধ্যা হইতে সুরু করিয়া রাত্রি একটা পর্য্যন্ত তাঁহার সঙ্গে তর্ক করিয়াছি ; তাঁহার কল্পনা শক্তি অদ্ভুত ছিল, বুদ্ধি ক্ষুর-ধার ছিল। ভাব-রাজ্যের তিনি রাণী ছিলেন। তিনি আমার সামান্য গুণের পক্ষপাতিনী হইয়াছিলেন। কিন্তু আমি তাঁহাকে সাংসারিক এই ধূলিকণাময়, বৈষয়িক বিষয়ে লিপ্ত হিসাব নিকাশ সমাবৃত ভবের বাজারের কেউ বলিয়া মনে করিতাম না ; যেমন সপ্ততন্ত্রীর অতি উচ্চ সুর, তাহা কোকিলের পঞ্চম স্বরের উপরে ওঠে, যেমন পদ্মের সুরভি, মালতী, বেলা প্রভৃতির সুগন্ধকে অতিক্রম করিয়া তাহা উর্দ্ধলোকে চলিয়া যায়, তেমনই ছিল তাঁর জীবন ;—তাহা সংসার ছাপাইয়া,—কেবলই স্বর্গ রাজ্যের কথা লইয়া থাকিত। জীবনে আরও দুই জন স্ত্রীলোককে আমি মানস পটে খুব বড় রেখায় আঁকিয়াছি, কিন্তু ভাব-জগতের এই সাম্রাজ্ঞী—তাঁহার স্বস্থানে অদ্বিতীয়। ভক্তির কথা বলিতে যাইয়া তিনি সংজ্ঞা হারাইয়া ফেলিতেন, তার কথা শুনিতে শুনিতে দিন অতিবাহিত হইয়া যাইত, রাত অতি-বাহিত হইয়া যাইত ; মনোহরসাই কীর্ত্তনের মত তাহা আমায় আকর্ষণ করিত—তাহার যোগশাস্ত্রে অসামান্য জ্ঞান ছিল—আমার মাতুলালয়ের সকলেই তাঁহার নিকট দীক্ষা লইয়াছিল, শুনিয়াছি তাঁহার কতকগুলি অসামান্য শক্তি হইয়াছিল, সে সকল বিভূতি আমি দেখিতে চাহিতাম না। আমি তাঁহার নিকট দীক্ষা লই নাই, আমি যোগতত্ত্ব শুনিতে চাহিতাম না, তাঁহার ভাব ও ভক্তির কথার আবেগে ঝঞ্জাতাড়িত ফুলটির মত আমার মন কোথায় উড়িয়া যাইত ; তিনি বলিতেন—"দীনেশ, তুই আমার নিকট দীক্ষা নিলি না, কিন্তু তথাপি তোকে আমার যত ভাল লাগে—শিষ্যদের কারুকে তেমন লাগে না" এই কথায় আমি ধন্য হইয়া যাইতাম। সংস্কৃত গীতাটি সমস্ত এবং উপনিষদগুলি বহু অংশ তাঁহার মুখস্থ ছিল। সিউলী ফুল যেরূপ প্রভাত বায়ুতে টপ টপ করিয়া মাটীতে পড়ে,

তাঁহার কথার মধ্যে সেইরূপ ব্যাথার সঙ্গে সেই শ্লোক গুলি অজস্র ঝরিয়া পড়িত।

রামদয়ালকে একদিন আমি বলিলাম "দেখ দয়ি, আমি কুমিল্লায় বড় কষ্টে দিন কাটাইয়া থাকি, কতকগুলি জীর্ণ পুথি আমার সম্বল, আমি ইংরেজী পড়া ছাড়িয়া দিয়াছি। পৃথিবীতে আসার পর মা আমায় যে ভাষা শিখাইয়া ছিলেন, আমি তাঁহারই অনুরাগী হইয়া পড়িয়াছি; সেই ভাষার কবিরা আমাকে আনন্দ ও ভাব দিয়া থাকেন, নতুবা নানা কষ্টে আমি মরিয়া যাইতাম। আর এক আমার আশ্রয় আছে তোমার পত্র। তুমি পত্র লিখিলে আমার আবার শৈশবের সুখ-স্বপ্নগুলি ফিরিয়া পাই, জীবনের পবিত্র ব্রতগুলি, উচ্চ আদর্শ সকল মনে উজ্জ্বল হইয়া ওঠে। মনে আছে গেটে প্রতি বৎসররে প্রথমদিন সিলারকে পত্র লিখিতেন, সিলার প্রতি বৎসর গেটেকে পত্র লিখিতেন। পরস্পরের পরিচয় হওয়ার পর থেকে আমরণ এই পত্র ব্যবহার চালাইয়াছিলেন। তুমি প্রতিশ্রুত ছিলে যে আমরা ও এইরূপ করিব। আজ আমি বড় কষ্টে পড়িয়া তোমার নিকট আসিয়াছি। সংসার ত কেবলই পুরাতন কথা ভুলাইয়া দেয়। এই যখন আমরা দুজনে কথা বলিতেছি এর মধ্যেই ত সময় একটা ব্যবধানের প্রাচীর তুলিয়া দিতেছে; তুমি আমি দূরে থাকিলে সপ্তাহে অন্ততঃ তিনখানি চিঠি পরস্পরকে লিখিয়াছি, কিন্তু এখন তোমার চিঠি মাসে একখানির বেশী পাই না। হয়তঃ কালে পত্র লেখালিখি একবারেই বন্ধ হইয়া যাইবে। তোমার সেটা ক্ষতির কারণ না হইতে পারে, কারণ এখন তুমি ধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়াছ; কিন্তু তোমার চিঠি না পাইলে আমি কোন অধঃপাতে যাইব তার ঠিক্ নাই, হয়ত আত্মহত্যাও করিতে পারি। তোমার চিঠিতে অতীতের আদর্শের সঙ্গে আমার বর্ত্তমান জীবনের যোগ রাখিয়াছে। যাহা হউক এস, আমরা আজ সেই পুরাতন প্রতিশ্রুতি

পুনরায় দৃঢ় করি। অন্ততঃ বৎসরের প্রথম দিন আমরা আমরণ পরস্পরকে চিঠি লিখিব।"

রামদয়াল বলিল "আমি সেরূপ প্রতিশ্রুতি আর করিতে পারিব না। আমি সাংসারিক কোন বিষয়েই আর পূর্ব্বের মতন নেই, আমি একটা প্রতিশ্রুতির বোঝা মাথায় চাপাইয়া জীবনকে সাংসারিকতায় আবদ্ধ করিতে পারিব না।"

আমি অনেক সাধিলাম, এমন কি চোখের জল ফেলিলাম, আবেদন নিবেদনে কথাবার্ত্তা করুণ করিয়া তুলিলাম ; ভিক্ষা চাহিলাম কিন্তু নির্লিপ্ত যোগীর মন টলাইতে পারিলাম না। তখন রাগ করিয়া চলিয়া গেলাম। তখন মনে হইল আমি সম্পূর্ণ একা, এজগতে আমার কেউ নাই, যাহাকে প্রাণাপেক্ষা বেশী ভালবাসিয়াছি, সে বৎসরে একখানা চিঠি লিখিবার ভার লইল না ; আমাকে ছাড়িয়া দিল। মাতাজীর নিকটে যাইয়া কাঁদিতে লাগিলাম. তিনি বলিলেন "ও ঐরকম কাঠ খোট্টা, ওর মধ্যে এত টুকু রস নাই।" আমি কুমিল্লা আসিয়া দেখি রামদয়াল আমাকে চিঠি লিখিয়াছে, আর্য্যমিশন ইনষ্টিটিউসনে আমাকে একটা কাজ দিয়াছে, বেতন কুমিল্লায় যাহা পাইতাম, তার চাইতে ১০৲ টাকা বেশী। আমি লিখিলাম— "আমি তোমার সঙ্গে একস্থানে কাজ করিতে পারিব না"— রামদয়ালের শত শত চিঠি পোড়াইয়া ফেলিলাম। অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে ভগবানের নিকট বলিলাম, "আমাকে দুর্দ্দিনে কে রক্ষা করিবে! পৃথিবীর সকলেই ত আমায় একে একে ছাড়িয়া দিয়েছে—আমার মরিবার পথ বলিয়া দাও, আমি কার মুখ চাহিয়া ভাল থাকিব? আমি ভাল হই, মন্দ হই, তাতে ত কারু আসে যায় না। কারু চক্ষু তো—আমি কাঁটা বনে চলিলাম কি ফুলবনে আসিলাম—তা' দেখবার নাই, আমি এখন কি করিব?" তখন চতুর্গুণ পরিশ্রম করিয়া বঙ্গভাষায় ইতিহাস লিখিতে

লাগিলাম, চতুর্গুণ পরিশ্রম করিয়া পুঁথি খুঁজিতে লাগিলাম, প্রাণপাত করিব, এই হইল সঙ্কল্প। এক হয় সাপের মুখে প্রাণ দেব, না হয় খাটিতে খাটিতে প্রাণ দেব। কেউ যখন চাইল না, বৎসরে একখানি চিঠি লিখিবার ভার কেউ নিল না,—আমার জন্ম যখন এতটুকু মমতা পৃথিবীর কারু নাই, তখন মরিয়াই শান্তি লাভ করিব। হে ভগবান, খাটিয়া খাটিয়া প্রাণ দেব। তুমি জগত হইতে আমার স্নেহ-মমতার পাঠ উঠাইয়া নিলে, কিন্তু তোমার পাদপদ্মে এই তুচ্ছ অকেজো জীবনটা ছুড়িয়া ফেলিয়া দেব। এই প্রার্থনা করিয়া কাঁদিতে লাগিলাম।

কুমিল্লা-জীবনের শেষাঙ্ক

এই সময় চন্দ্রকান্তশর্ম্মা নামক এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ভিক্টোরিয়া স্কুলে হেডপণ্ডিত হইয়া আসিলেন। রাণীর দীঘির পাড়েই আমার বাসার নিকট তাঁর বাসা। মনের যখন আমার এই অবস্থা, তখন একদিন শুনিলাম চন্দ্রকান্ত পণ্ডিত গুন্ গুন্ করিয়া গাইতেছেন—"শ্যাম-প্রেম সুখ-সাগরে আমি মীনের মতন ডুবে রইতাম সই।" গান আমার তখনকার ভাব-প্রবণ চিত্তে শেলের মত বিঁধিল, কণ্ঠ স্বরটি কি সুন্দর! এমন সুন্দর স্বর আমি শুনি নাই, বৃদ্ধের কণ্ঠ ঠিক কিশোরীর কণ্ঠের ন্যায়। পণ্ডিত মহাশয়কে ডাকিয়া সেই গান আবার গাইতে বলিলাম, তিনি কৃষ্ণকমলের সেই গানটি সমগ্র গাইলেন। শ্যাম-প্রেমের বড়াই করিয়া জীবন কাটাইয়াছি, শারদ-রৌদ্রের ন্যায় প্রতিকূল ব্যক্তিরা আমাকে দগ্ধ করিয়াছেন—কিন্তু "তখন শ্যাম নবজলধরে থাকত শীতল ছায়া করে,—আমার লাগ্‌ত না সে তাপ গায়" তার পর অক্রূর অগস্ত্য মুনির মত আসিয়া আমার সুখসাগর গণ্ডূষ করিয়া গ্রাস করিলেন, "আমার হয়ে নিল ইন্দু, শুকাইল সিন্ধু—একবিন্দু না রাখিল।" তখন পণ্ডিতকে বিদায় করিয়া চক্ষের জলে ভাসিতে লাগিলাম। আমাকে ও ত ভগবান এত স্নেহ এত প্রেম দেখাইয়া সব হরণ করিয়া লইয়াছেন—একবিন্দুও রাখেন নাই।

"রোজ সন্ধ্যাবেলা সপ্ত-রত্ন দেখিতে যাইতাম, কুমিল্লার পূর্ব্বদিকে—প্রায় এক মাইল হাঁটিয়া গেলে এই প্রাচীন মন্দির। তাহাতে যে কেহ

উঠিতে পারেন. কিন্তু নামিবার পথ পাইবেন না। সিঁড়ি গুলি এমনই আড়ালে আছে—যে তাহা নিতান্ত পরিচিত না হইলে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবার নহে। আমি চোখ বুজিয়া উঠা নামা করিতে পারিতাম, যেহেতু রোজই আমি সেই মন্দিরের উর্দ্ধ তলায় উঠিয়া চতুর্দ্দিকের সেই মেঘের কোলে পাহাড়ের দৃশ্য দেখিতাম,—কোন হতভাগ্য উর্দ্ধ চূড়ার স্বর্ণ কলস চুরি করিবার জন্য প্রাণ ত্যাগ করিয়াছিল, সে খুব বড় বড় পেরেক পুতিয়া সেই মন্দির-গাত্র বাহিয়া উঠিয়াছিল। পেরেকগুলি এখনও পোতা আছে, কিন্তু লোক-লোচনের বিষয়ীভূত হইয়া তাহার পদ স্খলন হইয়াছিল -তদবধি বিগ্রহকে সেখানে না রাখিয়া নিকটবর্ত্তী মন্দিরে নেওয়া হইয়াছে। সম্মুখে দীঘি, তাহা এক হাজার এক কলসী গঙ্গা জলে পবিত্র করা হইয়াছিল। সেই দীঘির পার্শ্বে কয়েক খানি কুটির, তাহাতে একটি বৃদ্ধ বৈষ্ণব বাস করিত। আমি সেই সপ্তরত্নের উপরের তলায় উঠিয়া তার কুটিরের দিকে তাকাইতাম, সে একটি সারেঙ্গ কখনও বা একতারা লইয়া আমার কাছে আসিত; সে চণ্ডীদাসের পদ গান করিয়া আমার হৃদয় জুড়াইয়া দিত। "এঘোর যামিনী, মেঘের ঘটা, কেমনে আইলা বাটে, আঙ্গিনার মাঝে বধূয়া ভিজিছে, দেখে যে পরাণ ফাটে,"—এই গানটি সে গাইত, আর কাঁদিত। সে আমাকে ইহার অর্থ বুঝাইয়া দিত। তাহার মনে পাপের অন্ধকার, বাহিরে ভীষণ দুর্য্যোগ, পাপীর কাছে ভগবান নিত্য আসেন, কিন্তু তাঁর পায়ে কাঁকর বিধে, তার শ্রীঅঙ্গ বৃষ্টিতে ভিজিয়া যায়—তথাপি তিনি আমার মন পাইবার জন্য বাহিরে দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করেন।" বৃদ্ধের সুর খুব মিষ্ট ছিল না, কিন্তু তার ভক্তি এত বেশী ছিল—যে সে যখন গাইত, "বঁধুর পীরিতি আরতি দেখিয়া, মোর মন হেন করে, কলঙ্কের ডালি, মাথায় করিয়া, অনল ভেজাই ঘরে"—তখন যেন যেন প্রাণটা কাঁদিয়া উঠিত, মনে হইত কেন গৃহের

প্রাচীরের ভিতর চিরকাল মাথা খুঁড়িয়া মরিব—তার নাম গান করিতে মুক্ত বায়ুতে বার হয়ে পড়া যাক—লোকে যা বলবার বলুক।

রোজ-রোজই বৃদ্ধের গান শুনিতাম, রোজই তার ভক্তি দেখিয়া ধন্য হইতাম। সে ভক্তি-ধর্ম্মের এরূপ বড় কথা আমাকে বলিত যে আমি অবাক হইয়া যাইতাম, অশিক্ষিত লোকের পক্ষে তাহার চাইতে বিস্ময়কর কিছু কল্পনা করিতে পারি নাই। একদিন এই ভক্তি-মান বৈষ্ণবের কথা বলিয়া চন্দ্রকান্ত পণ্ডিতকে সপ্তয়ত্নে লইয়া গেলাম। চন্দ্রকান্ত পণ্ডিতকে প্রথম গান গাইতে বলা হইল, তাঁহার সুকণ্ঠ বীণাধ্বনির ন্যায় সেই নির্জ্জন প্রদেশকে যেন ঝঙ্কৃত করিয়া তুলিল। তাঁহার সুর মিষ্টত্বের খনি, কিন্তু বৈষ্ণবোচিত ভক্তি তাহাতে বেশী ছিল না। তাঁহার সুর শুনিয়া বুড়ো বৈষ্ণব একবারে ভীত আড়ষ্ট হইয়া গেল—সে কিছুতেই আর গাইতে পারিল না। "দিবা প্রদীপবং" তাহার প্রতিভার লোপ পাইল। কিন্তু আমি বুঝিলাম, যে মহাদান সে আমাকে রোজ রোজ দিত,—তাহার কাছে সুরের ঝঙ্কারের মূল্য অল্প।

কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া স্কুলের খুব ভাল অবস্থা হইল, আমরা কলেজ স্থাপন করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিলাম।

কলেজ করা ঠিক হইল। আনন্দবাবু আমাকেই প্রিন্সিপাল করিবেন স্থির করিলেন, এবং অপরাপর প্রফেসার নিয়োগ এবং এ্যাফিলিয়েসনের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন।

স্বর্গীয় দীননাথ সেন ইনস্পেক্টার তখন ছিলেন পূর্ব্ব বঙ্গের শিক্ষা বিভাগের একচ্ছত্র সম্রাট, তাঁহার মাথাটা ছিল বড় একটা গোয়ালন্দের তরমুজের মত, এত বড় মাথা খুব কমই দেখা যাইত; এত বড় বুদ্ধিমান লোক ও তখন পূর্ব্ব বঙ্গে খুব কম ছিল। তিনি যখন কুমিল্লা, নোয়াখালি, প্রভৃতি অঞ্চলে আসিতেন, তখন আমার বাসায়ই উঠিতেন। একবার

জেলা স্কুলের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগের তদন্ত করিতে আসিয়া আমাদের বাড়ীতে প্রায় পনের দিন ছিলেন, তাঁকে লোকে বাঘের ন্যায় ভয় করিত, কিন্তু আমি শুনিতাম রোজ সন্ধ্যাকালে পূর্ব্বদিকের জানেলাটা খুলিয়া তিনি রাণীর দীঘির নীল জল দেখিতেছেন ও গাইতেছেন "হায়রে দশা কি, তামাসা বাসার জন্য ভাবছ কেনে। হৃদকমলে দিতে বাসা আশা করে কতই জনে।" সুতরাং বুঝিতাম, ভিতরে ভিতরে রসের ফল্গুধারা এহেন অটুট গাম্ভীর্য্যের শৈল-কঠিন হৃদয় দিয়াও বহিয়া যাইতেছে; গোপাল উড়ের চটুল ভাষায় হীরামালিনীর উক্তি পর্য্যন্ত হৃদয়ে হিল্লোল জাগাইতেছে। তিনি আমায় বলিলেন "দীনেশ, তুমি কি কাণ্ডটা করিতেছ, বল দেখি। শুনিয়াছি রাত নাই, দিন নাই, তুমি এই সকল পাহাড়ে দেশের জঙ্গলে জঙ্গলে পুঁথি খুঁজিয়া বেড়াও,—রাত্রি তিনটা পর্য্যন্ত পুঁথি পড়। চক্ষু দুটি যাবে—নতুবা সাপের মুখে—বাঘের মুখে প্রাণ দেবে। বাঙ্গালা ভাষা কি সত্যই এত বড় একটা জিনিষ হয়ে দাঁড়িয়েছে যে এর একটা ইতিহাস লেখা চলে, আর কে সে বই পড়'বে বল দেখি! আমি বাঁচিয়া থাকিতে একখানি পাঠ্য বই লিখে ফেল,—তাতে বেশ দুপয়সা হবে—আর হাড় ভাঙ্গুনি খাটুনি ও খাটতে হবে না" আমি সে কথায় কর্ণপাত করি নাই। পৃথিবীটার সবটা টাকা পয়সার বশীভূত নহে, অন্ততঃ আমার মনটা তখন এমন ছিল, যে দুটো মিষ্ট কথায় তাকে ভুলাইতে পারা যাইত, টাকা এমন কি মোহরটাও আমার কাছে কাণা-কড়ির মত মনে হইত। টাকাতে জীবনের কতকটা সুবিধা হইতে পারে—এখন বুঝিয়াছি, কিন্তু তখন তাহা ও বিশ্বাস করিতাম না।

শুধু দীননাথ সেন মহাশয় নহে, বঙ্গভাষাটা যে একটা ভাষাই নয়, ইহাই ছিল তখনকার ধারণা। ইহার আবার একটা ইতিহাসের কোন

মূল্য আছে,—ইহা বন্ধু ও সুহৃদ্বর্গের মধ্যে কেহই বিশ্বাস করিতেন না। সকলেই আমাকে দুহাতে এই কাজ হইতে নিরস্ত করিতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন। শুধু কলিকাতা হইতে মাঝে মাঝে কেহ কেহ উৎসাহ দিয়া চিঠি লিখিতেন এবং দুই একখানা সংবাদ পত্র আমার উত্তমের সুখ্যাতি করিয়া মাঝে মাঝে অনুকূল মন্তব্য প্রকাশিত করিত। কিন্তু বাহিরের উৎসাহে আমি উৎসাহিত হই নাই, এবং বাহিরের বিরাগ ও প্রতিকূলতায় আমি নিরুৎসাহ হই নাই। আমি বুঝিয়াছিলাম,এই বাঙ্গলাভাষার চর্চ্চাই আমাকে জীবিত রাখিয়াছে, এই কাজ ছাড়িয়া দিলে আমার হাত রিক্ত হইবে, প্রাণ অবলম্বন-শূন্য হইবে এবং যা একটু অবশিষ্ট আনন্দ আছে—তা হারাইয়া হৃদয় হাঁপিয়া উঠিবে। সুতরাং নিন্দা স্তুতি আমার কাছে তুল্য ছিল। কেহ যদি মাতাকে ছেলেটিকে ভাল বাসিতে বলে এবং কেহ যদি নিষেধ করে—তাঁর কাছে সে সকল উপদেশের কোন মূল্য থাকে কি? আমি দিন রাত্রি যে জিনিষ গুলি জপ তপ করিতেছিলাম—কাহারও উপদেশে তাহা বেশী ভাল বাসিতে কিম্বা ছাড়িয়া দিতে আমার শক্তি ছিল না।

টাকার আবশ্যই দরকার হইয়াছিল, পুস্তক ছাপিতে। গ্রীয়ার সাহেব তখন ত্রিপুরার ম্যাজিষ্ট্রেট, তাঁহার নিকট হইতে সুপরিশি চিঠি লইয়া হস্তী-পৃষ্ঠে আগরতলা গেলাম। তখন রাধা রমণ ঘোষ মহাশয় ত্রিপুরার ষ্টেটে সর্ব্বে সর্ব্বা। আমি মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্যের সাক্ষাৎ কারের প্রার্থী হইয়া এত্তেলা দিলাম। মহারাজা আমার খাওয়া দাওয়ার খুব রাজোচিত ব্যবস্থা করিয়া দিয়া আজ কাল করিয়া দেখা করিতে দেরি করিতে লাগিলেন। ইহার মধ্যে পূর্ব্ব বঙ্গের সুবিখ্যাত মল্লবীর শ্যামাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় (যিনি শেষে "সোহং স্বামী" নামে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন) একটা বন্য ব্যাঘ্র লইয়া আগরতলায় আসিয়া উপস্থিত।

শ্যামাকান্ত অতি সুপুরুষ ছিলেন। যদিও তাঁহার বক্ষে অত্যন্ত গুরুভার পাথর পিটিয়া ভাঙ্গা হইত, এবং কুস্তি, ঘুষি, হাতাহাতি-যুদ্ধ এবং দৌড়-ধাপে সাহেবদের মধ্যেও কেহ তাহাকে আঁটিয়া উঠিতে পারিত না, তথাপি তাহার চেহারা দেখিলে ভয় হইত না, বরং ভালবাসিতে ইচ্ছা হইত। বিশাল দুই চক্ষু, মুখ খানি প্রতিভাপূর্ণ, কথা গুলি তেজঃপুঞ্জ; দেখিলেই মনে হইত প্রতিভাশালী পুরুষ। শ্যামাকান্ত আমা অপেক্ষা বড় ছিলেন, কিন্তু তাঁহার পিতা শশীবাবু আমার অপেক্ষা আড়াই গুণ বেশী বয়স হইলেও আমি তাঁহারই বন্ধুত্বাভিমানী ছিলাম। শশীবাবুর চেহারাটি ছিল অনেকটা বঙ্কিম বাবুর মত। বহু লোকে তাঁকে বঙ্কিম বাবু বলিয়া ভুল করিত। তিনি বঙ্কিমবাবু হইতে একটু খর্ব্বকায় ছিলেন।

শ্যামাকান্ত ত্রিপুরা-সরকারে আগে কাজ করিতেন, তার পর বাঘ ভালুক পোষ মানাইয়া সারকাশ করিয়া বেড়াইতেন। উইলসন সারকাশে তিনি দুই এক বছর ১৮০০৲ টাকা মাসিক বেতনে কাজ করিয়াছিলেন। তিনি এবার আগরতলায় আসিয়া আমাকে বলিলেন—"তুমি এখানে কত দিন?" আমি বলিলাম। "এই পনের দিন, রাজার সাক্ষাৎ পাচ্ছি না, অতিশয় ভদ্রতা সহ তিনি দিন ক্রমাগত পিছাইয়া দিতেছেন! তোমাকে ও ভাই কিছু কাল থাকৃতে হবে! আজ এসেই কি দেখা পাবে?"

শ্যামাকান্ত হাসিয়া বল্লেন, "আমি! তুমি পাগল—আমি তোমার মত বসে থাকৃব নাকি?"

আমি বলিলাম—"সাহেবেরা এসে ও যে সহজে দেখা পান না!" শ্যামকান্ত হাসিয়া বলিলেন—"সে দেখা যাবে।" তার পর তিনি কোথায় বাসা করে আছেন, জিজ্ঞাসা করিলাম। উত্তরে তাহার অভ্যস্ত

তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলিলেন—"ভাই, আমি পরের বাসায় উঠে কতগুলি ভাত ডাল, আর মিষ্টি খেয়ে লম্বোদর হয়ে বসে থাক্‌বার ছেলে নই, বিশেষ, সঙ্গে একটা বাঘ আছে—আমার কাছে আসার পূর্ব্বে সে নরমাংস খেয়ে জীবন যাত্রা চালাত—তাহার আতিথ্য করবে কে? আমি তাঁবু খাটীয়ে আছি, রোজ বড় দেখে একটা ছাগল কিনে আনি, তার অর্দ্ধেকটা বাঘকে খাওয়াই আর অর্দ্ধেকটা উনুনে আধ-সিদ্ধ করে নিজে খাই—শাক সবজির মত দুটো ভাত—খেলে ও চলে না খেলে ও চলে।"

তার পরদিন শুনিলাম, মহারাজার নিকট হইতে ২০০০৲ টাকা আদায় করিয়া শ্যামাকান্ত চলিয়া গেছেন। ঘটনাটা হইল এইরূপ; মহারাজার প্রাসাদে সিঁড়ির কাছে মণিপুরী সৈন্য সঙ্গিন লইয়া পাহারা দেয়, শ্যামাকান্ত তার ভীষণ-দর্শন একটা কুকুর লইয়া সেই সিঁড়ির কাছে উপস্থিত হয়। রাধারমণ বাবু বলিলেন "মহারাজার সঙ্গে আজ সাক্ষাৎ হবে না" সে কথায় কর্ণপাত্ না করিয়া সে কুকুর সহ সিঁড়ি বাহিয়া উঠিতে থাকে. মণিপুরী সশস্ত্র প্রহরী তাহাকে বাধা দেয়—তখন তাহাদের দুই তিন জনের সঙ্গীন কাড়িয়া লইয়া সে সেখানে একটা বিষম হল্লা বধাইয়া দেয়—কুকুরটা ঘেউ ঘেউ করিয়া প্রভুর পক্ষ সমর্থন করিয়া তারস্বরে চীৎকার করিতে থাকে। এই অশ্রুত-পূর্ব্ব কলরবে প্রাসাদের সকলে শঙ্কিত হইয়া ওঠে। মহারাজ "কি হইয়াছে?" জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠান এবং যখন ঘটনাটি শুনিলেন, তখন রাধারমণ-বাবুকে বলিলেন—"ওর ভয়ে আমি সর্ব্বদা অস্থির থাকি, ওকে কেন ঠেকিয়ে রাখলে—আসতে দাও।" শ্যামাকান্ত যাইয়া মহারাজাকে বলিল "মহারাজ, আমি বাঘের মুখে হাত ঢুকাইয়া তাহা ফিরিয়া আনিতে শিখিয়াছি, নরখাদক ভীষণ বাঘকে পোষ মানাইয়াছি। মহরাজকে খেলা দেখাইব—আদেশ করুন।" মহারাজ বলিলেন "তুমি কি চাও

বল, আমি বাঘের মুখে ব্রহ্ম-হত্যা দেখতে মোটেই রাজী নই, তুমি কি হ'লে আমায় ছাড়বে তাই বল।" শ্যামাকান্ত বলিল, "মহারাজ, আমি আপনাকে খেলা দেখাব বলিয়া এত দূর আসিয়াছি, সে আশা যদি পূর্ণ না করেন, তবে আমার এই থলিয়াটি পূর্ণ করিয়া দিন, ইহাতে হাজার দুই টাকা ধরিতে পারে।" মহারাজা তখনই দুই হাজার টাকা মঞ্জুর করিয়া দিলেন। শ্যামাকান্ত মিলিটারী কায়দায় মহারাজকে সেলাম করিয়া এবং ডান হাত উঠাইয়া ব্রাহ্মণের মত আশীর্ব্বাদ-সূচক বৃদ্ধাঙ্গুলী কর-তলে ঠেকাইয়া টাকা লইয়া চলিয়া গেল।

আর দুই দিন পরে মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য আমাকে দেখা করিতে অনুমতি দিলেন—সাক্ষাৎকারের যে বিলম্ব, কিন্তু দেখা দিলে দয়ার অবধি নাই। দ্বারদেশে ভিড়, গোলমাল ও নিষেধ বিধি—ইত্যাদি কিন্তু ভিতরে আনন্দ-লোক। মহারাজ আমার সমস্ত খরচ দিতে আদেশ দিলেন, বই তাঁরই নামে উৎসর্গ করিতে অনুমতি চাহিয়া পাইলাম। আগরতলা অবস্থান কালে আমার কলেজ সুহৃৎ অশ্বিনী কুমার বসু এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শশীভূষণ বসু আমাকে বিশেষ আদর অভ্যর্থনা ও সহায়তা করিয়াছিলেন। তখন মহারাজার ত্রিপুরার দেওয়ান ছিলেন রাজমোহন মিত্র, ইনি অত্যন্ত প্রতাপশালী ব্যক্তি ও সজ্জন ছিলেন। তখন শিশির বাবুর "অমিয়নিমাই চরিত" সবে মাত্র বাহির হইয়াছে। আমি এক এক দিন সন্ধ্যাকালে দেওয়ানজীর বাড়ীতে গেলে তিনি আমাকে ঐ বই পড়িয়া শুনাইতে বলিতেন। আমি পড়িতাম ও অনেক ভদ্রলোক সেই খানে বসিয়া সেই পাঠ শুনিতেন। বস্তুতঃ তাঁহারা সকলে একটু গোঁড়া বৈষ্ণব ছিলেন, অমিয়-নিমাই চরিতের ভক্তির দিকটার উপরে সকলে জোর দিতেন, উহার ঐতিহাসিক দিকটার প্রতি কেহই লক্ষ্য করিতেন না।

আমাদের দেশের সাধারণ লোক কোন মহাপুরুষ সম্বন্ধে যে গল্পই হউক না কেন, তাহা নির্ব্বিচারে গ্রহণ করিয়া থাকেন। সত্য এবং অসত্যের মধ্যে তাঁহারা অনেক সময় কোন প্রভেদ দেখেন না। পৌরাণিক যুগের ভক্তির মানদণ্ডই ছিল তাঁহাদের এক মাত্র লক্ষ্য। কত লোক ত চারিদিকে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে, ইহাদের কে হাঁচিল, কে কাশিল তাহা খাটি ঐতিহাসিক সত্য হইলেও ভক্তের নিকট তাহার জানার কি দরকার? কে খাঁড়া ধরিয়া তার সহোদরের শিরোচ্ছেদ করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করিল, কিম্বা জিজিয়া টেক্স বসাইল— তাহার আলোচনা ভক্তের নিকট একান্ত নিস্ফল। কিন্তু মহাদেব যখন সমস্ত জগত রক্ষার জন্য গণ্ডুষ করিয়া সিন্ধুময় গরল পান করিয়া নীলকণ্ঠ হইলেন, কিম্বা একটা বৃহৎ নগরীকে ক্রুদ্ধ দেবরাজ-প্রেরিত বন্যার মুখ হইতে বাঁচাইতে যাইয়া শ্রীকৃষ্ণ কনিষ্ঠ অঙ্গুলীর উপর গোবর্দ্ধন গিরিটাকে ধরিয়া সেই ক্রোধের গগন-ভেদী বর্ষণ ও স্ফুরণ ব্যর্থ করিয়া দিলেন—তখন দেবগণের দয়ার কথা শুনিয়া শ্রোতৃবর্গ ভক্তি-বিমূঢ় ও অশ্রু-প্লাবিত হইয়া গেল। এই কাহিনী বিশ্বাস করিয়া তাহার হৃদয় ভক্তি-গঙ্গার বিধৌত হইয়া গেল—অথচ এসকল কথা-সত্যের ত্রিসীমায় আসিয়া পৌঁছে না, পৌরাণিক গল্পগুলি একান্তরূপে ইতিহাস। বিরোধী-পৌরাণিক যুগে আমাদের ঐতিহাসিক বিবরণের প্রতি একান্ত তাচ্ছিল্য এবং দেবলীলার প্রতি সশ্রদ্ধ অনুরাগ এই কারণে ঘটিয়াছিল। যে কাহিনী চোখের জল আনিতে পারে, নিত্য-ধামের আনন্দ-লোকের আভাষ দেয় মানুষকে সংসারের জ্বালা যন্ত্রনা ভুলাইয়া পর-কুৎসা ও আত্মগৌরব, অনেক সময় যাহা ইতিহাসের ছদ্মবেশে উপস্থিত হয়, তাহার প্রতি হৃদয়কে একবারে বিমুখ করে—তাহাই ছিল সে কালের লক্ষ্য। মানুষ তখন নরলীলা শুনিতে চায় নাই, দেবলীলা শুনিতে চাহিয়াছে।

সুতরাং সম্ভব ও অসম্ভব এই দুইটা জিনিষ তখন নিজ নিজ গণ্ডীর মধ্যে একান্ত ভাবে আবদ্ধ হইয়া পড়ে নাই। ভক্তিই ছিল—তখনকার একমাত্র মাপকাটি। এখনও বঙ্গীয় পল্লী গুলিতে সেই পৌরাণিক যুগেরই জের চলিতেছে এবং মহাপুরুষদের সম্বন্ধে নানারূপ আজগবী গল্পের সৃষ্টি হইতেছে। উত্তরাধিকার-সূত্রে লব্ধ চিরন্তন সংস্কারের হাত এড়াইতে না পারিয়া এখনও কলেজের কোন কোন পড়ুয়া "There are more things in heaven and earth, Horatio, than are dreamt of in your philosophy" সেক্ষ-পীয়রের এই গৎ আওড়াইয়া সেই সকল গল্প-গুজব সমর্থন করিতেছেন।

রাজমোহন মিত্র মহাশয়ের দুই পুত্র যোগেন্দ্র ও উপেন্দ্রের সঙ্গে আমার সেই সময় যে সৌহার্দ্দ জন্মিয়াছিল—তাহা এতকাল পরেও স্নেহ-রস-সিক্ত হইয়া এখনও আমার হৃদয় অধিকার করিয়া আছে। উপেন্দ্র এখন কুমিল্লার উকীল-সরকার।

মহারাজার প্রাইভেট সেক্রেটরী রাধারমণ ঘোষ মহাশয়ের ভ্রাতা প্রাণচৈতন্য ঘোষ, বি, এল কুমিল্লায় একটি প্রেস খুলিয়াছিলেন। তাঁহারই চৈতন্য-প্রেসে "বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে"র প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

কিন্তু পুস্তক প্রকাশ হইবার অব্যবহিত পরেই, অর্থাৎ ১৮৯৬ সনের ৬ই নবেম্বর তারিখে, আমি কুমিল্লা পাবলিক লাইব্রেরীতে বসিয়া ছিলাম, এমন সময়ে মনে হইল আমার মাথা ও শরীরে কিরূপ একটা অসহ্য উদ্বেগ উপস্থিত হইয়াছে। উহা কোন অঙ্গের বেদনা বা জ্বালা-পোড়া নহে, অথচ সমস্ত শরীর ও মন যেন আমার হাত হইতে চলিয়া যাইতেছে,—মনের ভাবগুলি যেন আর আয়ত্ত নাই—এরূপ বোধ করিলাম।

আকাশে সাইক্লোন হইবার পূর্ব্বে যেরূপ দুর্যোগ লক্ষণ প্রকাশ পায়—আমার মস্তিষ্ক ও সমস্ত শরীরে সেইরূপ একটা বিপদ-সূচনা অনুভব করিলাম। বাসায় ফিরিয়া আসিলাম—তখন দেশে কোটা বাড়ী তৈরী করিব, তাহার নক্সা তৈরী হইয়াছিল। ভিক্টোরিয়া স্কুলের স্বত্তাধিকারী আনন্দ বাবু সাহায্য করিবেন স্থির হইয়াছিল। আমার পিতা বিম-বরগা ও ইষ্টক কিনিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন—সুতরাং ব্যয়-বাহুল্য কিছুই হইবার কথা ছিল না। কেরানী লোকনাথ বাবুকে তিন চার মাসের ছুটি দিয়া দেশে পাঠাইব, আনন্দ বাবু স্বয়ং এই ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। বাসায় আসিয়া দেখিলাম, লোকনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নক্সা হাতে বসিয়া আছেন, আমি তাঁহাকে বলিলাম; "বাড়ী আর হইল না, আপনি আনন্দ বাবুকে বলুন—আমি পীড়িত, তিনি একবার আমায় আসিয়া দেখিয়া যাউন।" আনন্দ বাবু আসিলে বলিলাম "আপনি আর একজন হেডমাষ্টার খুঁজুন, আপনার ভাবী কলেজের প্রিন্সিপাল আমি হইতে পারিব না" এই বলিতে বলিতে কাঁদিয়া ফেলিলাম। তিনি অত্যন্ত উৎকণ্ঠার সঙ্গে কি হইয়াছে জিজ্ঞাসা করিলেন? আমি কিছু না বলিতে পারিয়া বিছানায় যাইয়া শুইয়া পড়িলাম! এতদিন প্রাণান্ত পরিশ্রম, কলহ-অশান্তি, শোক ও মর্ম্মবেদনার ফল আজ ফলিল। এত দীর্ঘকালের রাত্রিজাগরণ, সময় সময় পাহার পর্ব্বতে অনাহারে ১৪।১৫ মাইল পর্য্যটন, এবং শরীরের প্রতি একান্ত নিগ্রহ ও অত্যাচারের ফল আজ ফলিল। আমার চক্ষু হইতে নিদ্রা চলিয়া গেল, আহারের রুচি চলিয়া গেল, লিখিবার পড়িবার ক্ষমতা গেল, স্মৃতি-ভ্রংশ হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে দৈহিক ও মনের বল হারাইয়া নিশ্চেষ্ট জড়পিণ্ডবৎ বিছানায় পড়িলাম। আনন্দ বাবুর আগ্রহে কুমিল্লায় যতটা চিকিৎসা চলিতে পারে—তাহা

হইতে লাগিল। তখন কুমিল্লার শ্রেষ্ঠ ডাক্তার ছিলেন প্রকাশ চন্দ্র সেন, তাহা ছাড়া ফ্রান্সিস্ সাহেব—এ বি, রেলওয়ের বড় ডাক্তার ও আমার বন্ধু ছিলেন। মহিম চন্দ্র দাসগুপ্ত ছিলেন বড় কবিরাজ, তাঁহার পুত্র উপেন্দ্র ও ভ্রাতুষ্পুত্র তারক ছিল আমার ছাত্র। এখন উপেন্দ্র আলিপুর কোর্টের একজন সর্ব্ব প্রধান উকিল। হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার ছিলেন, শশীবাবু, ইহাঁরা পর্য্যায় ক্রমে আমাকে চিকিৎসা করিয়াছিলেন, কিন্তু বিশেষ কোন উপকার পাইলাম না। আমায় ধরিয়া তুলিয়া বসাইতে হইত। আমার আত্মীয় হরিকুমার দত্ত জজের নাজির মহাশয় কয়েক জন আদালতের পিয়ন পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। দিনরাত্রি তাহারা আমার পরিচর্য্যা করিত। আমার স্ত্রী অসমর্থ অবস্থা সত্বে ও সারারাত্রি আমায় বাতাস দিতেন, আমার তো এক মুহূর্ত্তের জন্ম ও সারারাত্রি ঘুম হইত না। আমার পরিচর্য্যায় নিরতা থাকিয়া তিনি ও রাত্রে ঘুমাইতে পারিতেন না। কোন শিশুর চীৎকার, পাখীর ডাক শুনিলে আমি অসহ্য যন্ত্রণা বোধ করিতাম, কবিরাজ মহাশয়েরা দিন রাত্রি বরফের অভাবে আমার মাথায় ঘৃত-কমল বাঁধিয়া রাখিতেন। তখন কিরণের বয়স ৪ বৎসর হইবে, একদিন একটা বড় বেলের কাঁটা তার পায়ের গোড়ালীতে এতটা ফুটিয়া গিয়াছিল যে তাহা টানিয়া বার করাতে এক গামলা জল রক্তবর্ণ হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু পাছে তার চীৎকার শুনিয়া আমার ব্যারাম বাড়িয়া যায়, এই ভয়ে সেই চার বছরের শিশু এত যন্ত্রণা সহিয়া ও টু শব্দটি করে নাই। ক্রমাগত পাঁচ সাত দিনরাত্রি একবারে অনিদ্রা অবস্থায় কাটাইয়া আমি এরূপ উৎকট কষ্টবোধ করিয়াছি যে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিয়াছি, "আধ ঘণ্টা ঘুমাইতে দিয়া আমার মারিয়া ফেল।" মাথার অবস্থা এত খারাপ হইয়াছিল যে একদিন কাগজি নেবুর নাম স্মরণ করিতে যাইয়া কপাল হইতে ক্রমাগত স্বেদ বিন্দু পড়িয়া

আমি অজ্ঞানের মত হইয়া পড়িয়াছিলাম এবং আর একদিন হোমিও-প্যাথিক ডাক্তার শশীবাবু নাড়ী ধরিয়া আমার কাছে বসিয়াছিলেন, আমি তাঁহার দাড়ী ধরিয়া গালে চড় মারিবার জন্য একটা দুর্দমনীয় লোভ অনুভব করিতেছিলাম। সত্যই আমার সমস্ত চেষ্টা অতিক্রম করিয়া ডান হাত খানি তাঁহাকে মারিবার জন্য উদ্যত হইয়া উঠিয়াছিল—তখন উৎকট মানসিক চেষ্টা দ্বারা সেই ব্যাপার হইতে ক্ষান্ত হইয়াছিলাম।

ইহার পরে আনন্দবাবু আমার স্ত্রী পুত্রাকন্যাদিগকে আমার শ্বশুর-বাড়ীতে পাঠাইয়া দিয়া আমাকে তাঁহার নিজ বাড়ীতে লইয়া গেলেন, এবং আমার আরোগ্যের জন্য নানারূপ চিকিৎসার ব্যবস্থা করিলেন। একদিন প্রকাশ ডাক্তার মহাশয় আমার অনিদ্রা রোগের জন্য মরফিয়া ব্যবস্থা করিলেন—ইহার পূর্ব্বে ব্রোমাইড ও সালফোনাল দিতেন, মরফিয়া খাওয়ার পর আমি সারা-রাত্রি যে ভাবে কাটাইয়াছিলাম—সেরূপ দুঃসহ কষ্ট বোধ হয় জীবনে অতি অল্পই ভোগ করিয়াছি। পরদিন শুইয়া আছি, আমার মনে হইল কেউ যেন রাস্তায় দৌড়িয়া যাইতে আমাকে বাধ্য করিতেছে, আমি উঠিয়া বসিলাম—ভগবানকে প্রাণপণে ডাকিতে লাগিলাম এবং বলিলাম, "হে ঈশ্বর আমায় পাগল কোরো না, আমাকে অন্ধ-কর, কুষ্ঠ রোগ দাও, কিন্তু মানুষ হইয়া যেন পশু হইয়া না থাকি।" আনন্দ বাবুর কাছে কাঁদিতে লাগিলাম। তিনি বলিলেন "আপনি কি করিয়া পাগল হইবেন? কাউকে এমন দেখিয়াছেন কি যে বিছানায় পড়িয়া পাগল হয়? আপনার উঠিয়া বসিবার শক্তি নাই, এমন অবস্থায় কেউ কি কখন পাগল হইয়াছে, শুনিয়াছেন?" এই কথা শুনিতে শুনিতে আমি উৎকট যন্ত্রণা বোধ করিতে লাগিলাম--হাত মুষ্টি-বদ্ধ হইল, দাঁতি লাগিল এবং অজ্ঞান হইয়া পড়িলাম। কতক্ষণ এইভাবে ছিলাম মনে নাই, জাগিয়া দেখি ডাক্তার কবিরাজে ঘর ভর্ত্তি। তারপর

হইতে শরীর ও মস্তিষ্ক খুব খারাপ হইলে ঐরূপ ফিট হইতে লাগিল, দিনে ৩।৪ বার করিয়া ফিট হইত। ফিটের পরে একটু উপশম বোধ করিতাম।

তার পর আমার স্ত্রী অত্যন্ত উতলা হওয়াতে আমাকে আনন্দবাবু আমার বাসায় পাঠাইয়া দিলেন এবং আবার স্ত্রীপুত্রকন্যার সঙ্গে মিলিত হইলাম। আমার পীড়ার খবর পাইয়া আমার মাসতুত ভাই গিরিশচন্দ্র সেন কুমিল্লায় আসিলেন, তাঁহাকে দেখিয়া আমার প্রাণ জুড়াইয়া গেল—মনে হইল যেন অর্দ্ধেক ব্যারাম কমিয়া গিয়াছে।

এই সময় হইতে আমি জপ আরম্ভ করি। এমন নিশ্চেষ্ট, এমন অকর্ম্মণ্য আমার মত আর কে আছে? এমন উত্থান শক্তি রহিত এমন একান্ত রূপ স্বশক্তির উপর নির্ভরের অযোগ্য আর কে? সুতরাং তাঁহারই উপর নির্ভর করিতে লাগিলাম। রাত্রে ঘুম হইত না, না হইল—অমৃতের খনির সন্ধানে রাত্রি জাগিয়া কাটিতাম, কাশীদাসের মহাভারতের সূচনায় আছে, "সর্ব্বশক্তি বীজ হরি নাম দ্বি অক্ষর", "হরে নামৈব কেবলম্" শাস্ত্রের উক্তি। এই নামের উপর নির্ভর করা ছাড়া আমার আর কি শক্তি ছিল? যখন দুশ্চিন্তাও নৈরাশ্যে হাঁপাইয়া উঠিতাম—দুর্ভাবনার ব্যূহ ভেদ করিয়া মন বাহির হইবার পথ খুঁজিয়া পাইত না, তখন করজোড় করিয়া নাম জপ করিতাম; আমার মনের সমস্ত—দুর্য্যোগ আস্তে আস্তে কাটিয়া যাইত। চণ্ডীদাসের "কেবা শুনাইলে শ্যাম নাম" ছত্র মনে পড়িলে চোখ দিয়ে জল পড়িতে থাকিত। তখন মনে হইল, সংসারে হীরা পাইয়াছিলাম তাহা ছুড়িয়া ফেলিয়া কেন কাচ লইয়া উন্মত্ত হইয়াছিলাম, "হরি হরি," বলিতে প্রকৃতই অপূর্ব্ব শান্তি পাইতাম। মনে স্থির করিলাম এবার ভাল হইলে তাঁহারই পাদপদ্ম আশ্রয় করিব—এই সংসার আর আমাকে আবদ্ধ করিতে পারিবে না, যাহাদের সঙ্গে ঝগড়া করিয়াছি

পায়ে ধরিয়া ক্ষমা চাহিয়া তাহাদের সঙ্গে বিবাদ মিটাইয়া যাইব। শান্তি দ্বারা অশান্তিকে ধ্বংস করিব, প্রেম দ্বারা ইন্দ্রিয় বিজয় করিব পর্ব্বত ও সমুদ্র, মরুভূমি ও উপত্যকা, নগর ও গ্রাম এসমস্ত জুড়িয়া ভগবানের পাদপদ্ম পড়িয়া আছে, আমার চক্ষে সমস্তই তীর্থ,—এই তীর্থে মহানকে দেখিব, সুন্দরকে দেখিব, তাঁহার ভৈরব শঙ্খনিনাদ শুনিব, তাঁহার সুমিষ্ট বাঁশী শুনিব, তাঁহার করপদ্ম লগ্ন পঙ্কজের সুবাসে প্রাণ জুড়াইব।

আমার মন এক ধাপ উঁচুতে উঠিল, বুঝিতে পারিলাম। বুঝিলাম আমার রোগ এইবার সারিয়া যাইবে।

এই উৎকট পীড়ার সময় "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" যে ভাবে শিক্ষিত সমাজে গৃহীত হইল— তাহা আমার পক্ষে বিশেষ গৌরবের কথা। অযাচিত ভাবে কলিকাতা হইতে রাশি রাশি প্রশংসার অতিশয়োক্তি আসিতে লাগিল। রবীন্দ্রবাবু, রামেন্দ্রবাবু, হীরেন্দ্রবাবু, নগেন্দ্রবাবু পুস্তকখানির বিশেষ প্রশংসা করিয়া পত্র লিখিলেন। রামেন্দ্রবাবু অতি অল্পভাষী ছিলেন, কিন্তু তাঁহার লেখনী ছিল ঘোর মুখরা—তিনি আট পৃষ্ঠা ভরিয়া এত প্রশংসার কথা লিখিলেন যে আমি কতকটা লজ্জিত হইলাম। সাহিত্য পত্রিকায় হীরেন্দ্রবাবু সুদীর্ঘ সমালোচনা করিলেন, নব্য ভারতে ক্ষীরোদচন্দ্র রায়ের অভিনন্দনটি খুব হৃদয়গ্রাহী হইল। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের দীর্ঘ সমালোচনা প্রদীপ পত্রিকায় প্রকাশিত হইল। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় কলিকাতা রিভিউ এবং আর একখানি পত্রিকায় বিস্তৃত ভাবে ইংরেজীতে সমালোচনা করিলেন। এই পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির হইলে রবীন্দ্রবাবু বঙ্গদর্শনে অতি বিস্তৃত গবেষণা-মূলক সমালোচনা প্রকাশিত করিয়াছিলেন। চট্টগ্রামের কমিশনার এফ্. এচ্. স্ক্রাইন অতি দীর্ঘ পত্র লিখিয়া আমার অসুস্থতার জন্য সমবেদনা জানাইলেন এবং ডিরেক্টার মার্টিন সাহেবকে আমার সম্বন্ধে নানারূপ অনুরোধ

করিয়া চিঠি লিখিলেন। অনেক প্রসিদ্ধ লেখকের প্রশংসাপূর্ণ সমালোচনা বাহির হইতে লাগিল এবং মাসিক ও সাপ্তাহিক সংবাদ পত্রগুলিতে আমার পীড়ার কথা লইয়া অনেক সহানুভূতির কথা প্রকাশিত হইল।

আমি পাড়া-গাঁয়ের লোক—কলিকাতার প্রসিদ্ধ কবি, সমালোচক ও সম্পাদকের নামের মোহ আমার কাছে কম ছিল না। অতি অল্প সময়ের মধ্যে আমি সর্ব্বত্র পরিচিত হইয়া কতকটা গৌরব অবশ্যই বোধ করিয়াছিলাম, কিন্তু তখন আমি একবারে উত্থান-শক্তি রহিত, অপগণ্ড শিশুর ন্যায় পরের উপর নির্ভরশীল। ক্ষণভঙ্গুর দেহ লইয়া মানুষের গৌরব করিবার কি আছে? এক সময় মনে হইত, এই লোক-প্রশংসা ও যশের মূল্য কি? এই সাংসারিক প্রতিষ্ঠার সোনালী রঙ্গের পর্দ্দাটা সরাইয়া দেখিতাম—উহাও ছেলে ভুলাইবার—খেলা দেওয়ার একটা চাতুরীমাত্র। কখন কখনও সারারাত্রি জপ করিতাম—তখন আঁধার কাটিয়া যেন উষার সোণার আঁচল চোখে ঠেকিত;—ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতাম, আমার খেলনা গুলি সোনা রূপার মোড়ক দিয়া আর লোভনীয় করিয়া আমায় প্রলুব্ধ করিও না—আমাকে তোমার পায়ের কাছে একটুকু জায়গা দাও। মনে স্থির করিয়াছিলাম, ভাল হইলে সন্ন্যাসী হইব। ইহার একটি বর্ণও মিথ্যা নহে, ভগবানের সঙ্গে আমার কি সম্বন্ধ, মনুষ্যও সমাজও জীব-জগতের সঙ্গে আমার কি সম্বন্ধ, আমার প্রকৃত পথ কি? ইহা ভাল করিয়া বুঝিবার জন্য সন্ন্যাস গ্রহণ করিব। জলের মধ্যে হাবুডুবু খাইয়া নদীর রূপ মানুষ বুঝিতে পারে না, ডাঙ্গায় উঠিয়া নদীর মূর্ত্তি ধরা পড়ে, আমি সংসারের বাহিরে যাইয়া সংসারকে চিনিব,দরকার হয় পুনরায় সংসারে ফিরিব, কিন্তু নিজের গন্তব্য পথ আবিষ্কার করিবার পূর্ব্বে নহে।

পীড়া যখন ছয় মাসেও সারিল না, তখন অর্দ্ধবেতনে আনন্দবাবু

আমাকে দেড় বছরের ছুটি মঞ্জুর করিয়া দিলেন। ছয় মাসের ছুটি পূর্ণ বেতনেই পাইয়াছিলাম।

চাঁদপুর আসিয়া ডিপুটি প্রকাশ চন্দ্র সিংহ সুহৃদ্বরের আনুকূল্যে এক খানা বজরা পাইলাম, তাহাতে রাত কাটাইয়া দিলাম। পদ্মার অবাধ-গতি ঊর্ম্মি কল্লোলে—শন্ শন্ বায়ুর শব্দে আমার বহুদিনের বিনিদ্র অক্ষি-পুট বুজিয়া আসিল। ছয় মাস পরে মাতৃক্রোড়ে শিশুর ন্যায় পদ্মাগর্ভে বজরায় আমি ঘুমিয়া পড়িলাম। যদিও ফ্রান্সিস সাহেব আমায় বলিয়াছিলেন 'তোমার মস্তিষ্ক আর ভাল হইবে না,' তথাপি সেদিন মনে হইল ভাল হইলেও হইতে পারি।

পরদিন অশ্রুপূর্ণ চক্ষে স্ত্রীপুত্রদিগের নিকট বিদায় লইলাম। আমার মাসতুত ভাই গিরীশ চন্দ্র আমার স্ত্রীপুত্রদিগকে লইয়া বরিশাল চলিয়া গেলেন। সেখানে আমার জ্যেষ্ঠ (মাসতুত) ভ্রাতা জগদীশচন্দ্র ডিপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট. তাঁহারই কাছে পরিবার থাকিবে, আমি কলিকাতায় থাকিয়া চিকিৎসা চালাইব। কিন্তু পদ্মার পাড়ে বিদায়ের সময় মনে হইল, হয়ত এই শেষ দেখা, হয়ত আর সারিব না। আমি একান্ত নিঃস্ব, আনন্দবাবু মাসিক ৪০৲টাকা দেবেন,তাহাতে কি করিয়া চিকিৎসা চলিবে? এ পীড়া হয়ত আর ভাল হবে না, কতকটা ভাল হইলেও যে আর কাজ কর্ম্মের যোগ্য কখনও হইব না। পীড়া হইবার ছয় মাস পূর্ব্বে আমি স্ত্রীকে বলিয়াছিলাম "দেখ, বেতন, প্রাইভেটে টিউসন, পরীক্ষকের ফি প্রভৃতি লইয়া আমার মাসিক আয় দেড়শত টাকার বেশী নহে, একটি কপর্দ্দকও বাঁচাইতে পারি না, যদি দুমাস পড়িয়া থাক তবে সংসার চলিবে কিসে?" এ কিন্তু শুধু দুমাসের সমস্যা নহে। ক্ষুদ্র খাল কল্পনা করিয়া ভয় পাইয়াছিলাম, এ যে সত্যই সমুদ্রে আসিয়া ডুবিলাম। স্ত্রীপুত্রদের সঙ্গে হয়ত আর দেখা হইবে না। হয়ত একাকী কোথায় প্রাণ

যাইবে। আমার বিচ্ছেদ-বিধুর প্রাণের স্পন্দন কি করিয়া বুঝাইব? সম্মুখে বিস্তৃত পদ্মা, আমি তাহার বক্ষে একা। পদ্মা আমার নৌরাশ্যের গভীর অনন্ত আলখোর ন্যায়, ঘোর তিমিরাবৃত দুঃখ-তরঙ্গশালী অদৃষ্টের ন্যায়, আমি যেন একা তার মধ্যে ভাসিলাম।

তখন প্রাণপণে হরি নাম আঁকড়াইয়া ধরিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম; কখনও দুশ্চিন্তায় দুঃখে মন উতলা হইত, মাখন, কিরণ ও অরুনের মুখ মনে পড়িয় চক্ষে জল আসিত,তখনই ফিট হইত। কিন্তু সেই বিপদে আমি ভগবানের নাম আশ্রয় করিয়া রহিলাম। আমার স্ত্রীপুত্র নাই,আমার পিতা মাতা নাই। বিশাল আলেখ্য হইতে বহুদিনের আঁকা স্নেহমমতার নানা রংএ ফলানো সমস্ত ছবি যেন মুছিয়া গিয়া বিশাল শূন্য পটে শুধু এক হরি নাম আঁকা রহিল, অন্য সমস্ত দিক হইতে চোখ ফিরাইয়া সেই দিকে বদ্ধ-লক্ষ্য হইয়া রহিলাম। অসহ্য সাংসারিক যন্ত্রনা উপস্থিত হইলে আমি কোন চিন্তা করিতাম না। চিন্তা ছাড়া চিন্তা দূর করিতে পারিতাম না, চিন্তা জালে আরও জড়াইয়া পড়িতাম, পীড়া বাড়িত, ফিট হইত। নিজের শক্তি দ্বারা মনকে প্রকৃতস্থ করিবার শক্তি হারাইয়াছিলাম, তাহা বুঝিতে পারিতাম। শিশু যেমন ভয় পাইলে মায়ের গলা জড়াইয়া ধরে, আমি সেই-রূপ উপায়হীন হইয়া নামকে আশ্রয় করিয়াছিলাম। সে নাম কার, তিনি কি করিতে পারেন, তাঁর সঙ্গে আমার সম্বন্ধ কি, এ সকল ভাবিতাম না। কিন্তু নামই সর্ব্বস্ব, একমাত্র সম্বল এই ভাবিয়া জপ করিতাম, রাতদিন জপ করিতাম, চোখের প্রান্তে অশ্রু গড়াইয়া পড়িত।

এই ভাবে কলিকাতায় ৮৫।২ মসজিদ বাড়ী ষ্ট্রীটে মাতুলালয়ে আসিয়া পড়িলাম। বাড়ী খানি বেশ বড় এবং এত সুন্দর যেন একখানি ছবির ন্যায়। উপরকার হলটি মারবেল দেওয়া, নানারূপ আসবাব পূর্ণ, সেই ঘরে স্থান পাইলাম। মাতুল চন্দ্র মোহন ও শ্রীমোহন তখন উভয়েই কলি-

কাতায়, তখন তাহাদের ঋণ দশলক্ষ টাকার উপরে উঠিয়া সর্ব্বস্ব যায় যায়। যেন ভরা গাঙ্গে ঝড় উঠিয়াছে, নৌকাখানি ডুবু ডুবু।

কলিকাতায় আসিয়া ৭।৮ দিন বেশ ছিলাম। আমি আসিয়াছি, সংবাদ শুনিয়া কলিকাতায় অনেক লেখেক আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিলেন, রামেন্দ্র বাবু ও হীরেন্দ্র বাবুকে এই ভাবে প্রথম দেখিলাম। সুরেশ সমাজ পতির সাহিত্যে অনেক লিখিয়াছি, তিনি আসিয়া বন্ধুত্বের অনেকে প্রতিশ্রুতি দিয়া গেলেন। নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়কে সঙ্গে করিয়া হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় আসিলেন। নগেন্দ্রবাবুকে আমরা বড় ভাল লাগিল, অনাড়ম্বর মিষ্ট-ভাষী ও সচ্চরিত্র। সেই দিন হইতে তাঁর অনুরাগী হইয়া পড়িলাম—সে ১৮৯৭ সনের মার্চ্চ মাসে, তদবধি আজ পর্য্যন্ত সেই ভ্রাতৃ-ভাব চলিয়া আসিতেছে। তখন তিনি তেলী পাড়ার একটা ভাঙ্গা বাড়ীতে থাকিতেন, বিশ্বকোষ তখন বোধ হয় 'ট' বর্গে পৌছিয়াছে। তখন তাঁর প্রেস ছিল না। আর্য্য প্রেসে 'বিশ্বকোষ' ছাপা হইত এবং তখনও কায়স্থ-আন্দোলন জাগিয়া ওঠে নাই। শ্যামপুকুর লেনে ঢুকিতে ডান দিকে কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটের উপর যে এক-তল বাড়ীখানি—তাহাতেই পরিষৎ বসিত। তখনও হীরেন বাবু তাঁহার "সুয়ো রাণী" থিউসফির উপর পক্ষপাতিত্ব দেখান নাই। "দুয়োরাণী" অর্থাৎ পরিষৎ তখন তাহাকে সমগ্র ভাবে পাইত। তিনিই পরিষদের তখন প্রধান বীর ছিলেন।

প্রতিভা ও অনুরাগের গাণ্ডীব লইয়া তিনি, রাজা বিনয় কৃষ্ণের বিরুদ্ধে সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ হইয়া পরিষদকে শোভাবাজারের রাজ-বাটীর আওতা হইতে কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীটের একতল গৃহে লইয়া আসিয়াছিলেন। সেই সময় রাজা বাহাদুর 'সাহিত্য সভা'র সৃষ্টি করিয়া মনকে যথাসাধ্য প্রফুল্ল করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন।

কলিকাতা আসার ১০।১২ দিন পর আমার রোগ খুব বাড়িয়া চলিল; এমন কি বসিতেও কষ্ট বোধ হইত, এই সময় সেন্ট্রাল কলেজের অধ্যাপক হাইকোর্টের উকীল যোগেন্দ্রনাথ সেন মহাশয় আমার সঙ্গে দেখা করিতে আইসেন। বাঙ্গলা প্রাচীন সাহিত্য প্রসঙ্গে তাঁর সঙ্গে কথা-বার্ত্তা হয়। তিনি বলেন "ঐ বটতলার ছাপা চাষাদের নাকী সুরে পড়া নাচাড়ী ছন্দের ভিতর কি ছাই ভস্ম আছে, যে আপনি তার জন্য জীবন পাত করিয়া খাটিয়াছেন—আপনি আমাকে—এই কথাটা বুঝাইয়া দিন।" আমি কবিকঙ্কণকে লইয়া বুঝাইতে সুরু করিয়া বলিলাম, "ধরুন কাল-কেতুর চরিত্র। যখন কবিকঙ্কণ তাঁর কাব্য রচনা করেন, তখন কবিরা 'তিল ফুল জিনি নাসা' 'অজানুলম্বিত বাহু' 'গৃধিনী জিনিয়া কর্ণ' 'রাম রম্ভা উরু' এই রূপ বহু সংখ্যক উপমা সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্র হইতে ধার করিয়া রূপবান ও রূপবতী নায়ক ও নায়িকাদিগকে সাজাইতেন। সেই যুগে সংস্কৃতের অলঙ্কার গুলি ডাকের সাজের ন্যায় অতি সস্তাদরে পাওয়া যাইত। যে কোন পল্লী-কবি সেই বাঁধিগৎ গুলি লইয়া পয়ার রচনা করিতে লাগিয়া যাইতেন। ইহার মধ্যে শক্তিশালী কবিকঙ্কণ হঠাৎ আসিয়া কাল কেতুব্যাধকে দাঁড় করিয়া তাহাকে বর্ণনা করিতে বসিলেন। তাহার মাথায় "জালের ছড়ি" বুকের উপর "বাঘের নখ," আর তার "দুই বাহু লোহার সবল।" পাঁচ বৎসর বয়সে সে "শিশু মাঝে যেমন মণ্ডল" ঐ বয়সে সে তাড়িয়া সজারু ধরে ও আকাশে যে পাখী উড়িয়া যায়, বাটুল দিয়া তাঁহাদিগকে লক্ষ করে। আরও একটু বড় হইলে বেশী বয়স্ক ব্যাধ বালকেরাও কেহ মল্ল-যুদ্ধে তার সঙ্গে আঁটিয়া উঠিতে পারিত না। যাকে সে আঁকড়িয়া ধরে "তার হয় জীবন সংশয়।" সে কাব্যের নায়ক হইলেও যে তাহার বর্ণ অনিন্দ্য চম্পক পুষ্পের ন্যায় কিম্বা অগ্নি-অংশু'র ন্যায় হইবে, কবিকঙ্কণ তা হলফ করিয়া স্বীকার

করেন নাই। বরং তাহার বয়সের সঙ্গে সে বাড়িয়া চলিল এই কথা বলিতে যাইয়া তিনি নির্দ্দয় ভাবে "ঘাড়ে যেন হাতী করা" কহিয়া একটা কালো অদ্ভুত জনোয়ার শাবকের সঙ্গে তার উপমা দিয়াছেন; কখনও পরিষ্কার করিয়া তাহার বর্ণের দিকে ইঙ্গিত করিয়া বলিয়াছেন যেন "শ্যাম চামর কুন্তল।"

তাহার ছবিটি কবি একটুও সাজাইতে যান নাই, তাহাকে আঁকিতে যাইয়া অলঙ্কার শাস্ত্র একটিবারও তাহার মনে পড়ে নাই। যদিও তিনি রাজ-কুমারের গৃহ শিক্ষক-ছিলেন, এবং সংস্কৃতে যে তাঁহার অসামান্য অধিকার ছিল তাঁহার কাব্যেই তার অনেক প্রমাণ আছে। ব্যাধ-জগতটাই তিনি প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন এবং সেই জগতের কদর্য্যতা, কুশিক্ষা ইহার কিছুই তিনি বাদ দেন নাই। কালকেতুর ভোজন বর্ণনা, করিতে যাইয়া গ্রাসগুলি তোলে যেন "তে আঁটিয়া তাল" বলিয়া কাব্য নায়কের "ভোজন কুৎসিৎ" বলিয়া ধিক্কার দিতেও ছাড়েন নাই; কিন্তু ব্যাধ-গৃহের পশুর হাড় পূর্ণ অস্পৃশ্য, দারিদ্র্য-পীড়িত, হীন অঙ্গিনায় এই যে কালকেতুকে তিনি উপস্থিত করিয়াছেন, তাহা সমস্ত কদর্য্যতা সত্বেও ভীষ্ম কি রামের মত একটা মহৎ চরিত্রে পরিণত করিয়াছেন, এই খানেই তাঁহার বাহাদুরী। যখন ফুল্লরা তাঁহাকে হীন সন্দেহ করিয়া বলিল "তুমি কোন্ রূপসী কন্যাকে লইয়া আসিয়াছ? দুষ্ট কলিঙ্গ-রাজ তোমায় বধ করিয়া আমার জাতি মারিবে।" এই হীন সন্দেহে কাল-কেতু ক্রুদ্ধ হইল, প্রত্যেক নিরপরাধ ব্যক্তিই তখন সেই সন্দেহে বিরক্ত হইতেন। কালকেতু ক্রোধে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল "মিথ্যা হলে চোয়াড়ে কাটিব তোর নাসা" অবশ্য ভদ্র ভাবে সে তার প্রেয়সীর মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া সৌজন্য-পূর্ণ কথা বলিতে শেখে নাই। কিন্তু সে যে নিরপরাধ, তাহা এই কথায় চাষার ভাষায় খুব স্পষ্ট করিয়াই

বুঝাইয়াছে। মোট কথা, কবিকঙ্কণ এক মুহূর্ত্তও ভুলিয়া যান নাই—যে তিনি ব্যাধের চিত্র আঁকিতেছেন। তাহাকে শাস্ত্রের নিয়ম মানিয়া নায়ক করিতে যান নাই. যাঁহারা সেরূপ নায়ক চাহিবেন, তাহারা রূপ-গোস্বামী কৃত 'উজ্জ্বল নীলমণি' পড়ুন। সেই সকল নায়কের লক্ষণের একটিও কালকেতুতে নাই, অথচ কালকেতু মস্ত বড় কাব্য-নায়ক হইয়া আছে। কালকেতু ভগবতীতে অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া তাহার কুটির ত্যাগ করিতে বলিল। এমন কি তাহার যে সামান্য শাস্ত্র জ্ঞান ছিল তাহা দিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিল যে স্ত্রীলোকের স্বামীর ঘর ছাড়িয়া অন্যত্র রাত্রি যাপন উচিত নহে—এইরূপ অপরাধে সীতারও বিপদ ঘটিয়াছিল। ভগবতীকে সে স্বামীর বাড়ী পৌছাইয়া দেবে কিন্তু একা নহে, "ফুল্লরা চলুক সাথে—চল বন্ধু জন পথে" একাকী নির্জ্জন পথে নহে—স্বজনগণ যে পথে থাকেন—ফুল্লরাকে সঙ্গিনী করিয়া সে সেই পথে তাঁহাকে লইয়া যাইবে। ব্যাধ-নায়কের নৈতিক দৃষ্টির যে তীক্ষ্ণতা দেখিতে পাই, তাহা গ্রাম্য ভাষায় ব্যক্ত হইলেও খুব বড় জিনিষ। ব্যাধের কথায় ভগবতী কোন রূপ কর্ণপাত করিলেন না, তখন গণিকা ভ্রমপূর্ব্বক সূর্য্যকে সাক্ষী করিয়া সে তাঁহাকে বধ করিতে উদ্যত হইল—"ভানু সাক্ষী করি বীর ছুড়িলেক শর।" কিন্তু ধনুতে শর আটকাইয়া গেল। তখন রূপসী বলিলেন "আমি ভগবতী"- কালকেতু বিশ্বাস করিল না, "আমার মত পাপী, হীন জাতীয় হিংস্রপ্রকৃতি ব্যক্তি কি দেব-দয়ার কখনও প্রত্যাশা করিতে পারে সে যে একবারে অসম্ভব। তুমি হয়তঃ যাদুমন্ত্র জান, এইজন্য আমার শর ছুড়িবার শক্তি লোপ করিয়াছ।" যাঁহারা জপ তপ করিয়া মনে করেন তাঁহারা কত ধার্ম্মিক, তাঁদের সঙ্গে কালকেতুর তুলনা করুন। ইহার চরিত্র প্রকৃতই সাধু, কিন্তু সে হীনজাতীয় এবং তাহার ব্যবসায়টা হেয়, এজন্য সে বুঝিতে পারে নাই যে তাহার এমন কোন গুণ আছে যাতে করে

দেবী আসিয়া স্বয়ং তাকে কৃপা করিতে পারেন। এই একান্ত নিরভিমান স্বীয় হীনত্ব বোধে চূড়ান্ত বিনয়ী ব্যক্তিই যে প্রকৃত পক্ষে দেবীর কৃপার যোগ্য, তাহা কবি বুঝাইয়া দিয়াছেন।

তার পর দেবী নিজে কাঁধে করিয়া মোহরের কলসী লইয়া যাইতেছেন, তখন "মনে মনে মহাবীর করেন যুকতি। ধন ঘড়া লইয়া পাছে পালায় পার্ব্বতী।" সুতরাং সে যে অশিক্ষিত কুসংস্কারবদ্ধ একটা জানোয়ার-বিশেষ, এক মুহূর্ত্ত কবি তাহা আমাদিগকে ভুলিতে দেন নাই। মুরারী শীল তাহাকে কিছু পয়সা ধারিত, অঙ্গুরীয় ভাঙ্গাইতে যখন সে তাহার নিকট গেল, তখন সে অন্দরে ঢুকিয়া লুকাইয়া রহিল এবং বেনেনী আসিয়া বলিল "আজি ঘরে নাহিক পোদ্দার" কিন্তু অঙ্গুরীয়কের কথা জানিতে পারিয়া মুরারি খিড়কির পথে হাজির হইয়া কালকেতুকে উল্টো দোষ দিয়া বলিল "শুন শুন ভাইপো—এবে নাহি দেখিতো"—এ তোর কেমন ব্যবহার।" কিন্তু কালকেতু উদার ও সরল প্রকৃতি। সে মুরারির কপটতা বুঝিতে চেষ্টা করিল না, বরং সে কাজের ভিড়ে আসিতে পারে নাই, তাই বলিয়া ক্ষমা চাহিল। সর্ব্বত্র গ্রাম্য ভাষায় অমার্জ্জিত বর্ণে, মোটা বাঁশের তুলি দিয়া কবিচিত্রকর যে ছবিগুলি আঁকিয়াছেন তাহা বড় বড়। অভদ্র জীবনের চাল-চিত্র, কিন্তু ভিতরকার ভদ্রতা সেই বাহিরের নেংটীর অভদ্রতাকে আশ্চর্য্য ভাবে পাছে ফেলিয়া দিয়াছে। ফুল্লরা এই কালকেতুর যোগ্য স্ত্রী তাহার পদ্মপলাশ চক্ষু অথবা তিলফুল-বিনিন্দিত নাসিকা এবং কাদম্বিনী কেশের কোন উল্লেখ নাই, কবি লিখিয়াছেন—"এই কন্যা রূপে গুণে নামেতে ফুল্লরা, কিনিতে বেচিতে ভাল পারয়ে পশারা। রন্ধন করিতে এই কন্যা ভাল জানে। বন্ধুগণ মিলিয়া ইহার গুণ গানে।" ফুল্লরা তালপাতের ছাউনি, ভাঙ্গা ঘরে থাকিত, তাহার মধ্য-স্থলে ভেরাণ্ডার থাম ছিল। তাহা

বৈশাখী ঝড়ে রোজ ভাঙ্গিয়া পড়িত এবং "বৃষ্টি হলে কুড়্যায় ভাসিয়া যায় বাণ," জ্যৈষ্ঠ মাসে সে বইচির ফল খাইয়া একরূপ উপবাস করিয়া কাটাইত, এবং যখন মাংসের পশরা মাথায় করিয়া বাজারে যাইত, তখন "দেখিতে দেখিতে চিলে করে আধসারি।" শীত কালে সকলেই গরম বস্ত্রাদি পড়িত, কিন্তু "অভাগী ফুল্লরা পরে হরিণের ছড়।" আশ্বিন মাসে পূজায় বলিদানের মাংস গৃহে গৃহে, ফুল্লরার মাংস বিকাইত না, তার কুড়ে ঘরে একটা গর্ত্ত ছিল, তাহাতে আমানি রাখিত, ও তাহাই খাইয়া জীবন—যাত্রা নির্ব্বাহ করিত, এক খানা মাটীর থালা কিনিবার ও কড়ি কুলাইত না। বসন্ত কালে মন্দ মন্দ সমীরণে মালতী কুসুম পরাগে ভ্রমর প্রণ ভাবে মগ্ন হইত, যুবক যুবতীরা মদনোৎসবে মাতিয়া যাইত, কিন্তু "অভাগী ফুল্লরা করে উদরের চিন্তা।" এই নিদারুণ দুঃখ-চিত্রের বিভীষিকার মধ্য দিয়া কবি প্রেমের জয় দেখাইয়াছেন। যখন ভগবতী বলিলেন, "দেখ আমার অঙ্গের বহুমূল্য অলঙ্কার- আমি তোমার সমস্ত দুঃখ দূর করিব।" এত কষ্ট সহিয়া যে ফুল্লরার ধৈর্য্য অটুট ছিল, সে ফুল্লরা ভগবতীর এই কথায় কাঁদিয়া ফেলিল—তাহার দারিদ্র্য থাকুক, তাহার উপবাস শত গুণে ভাল, সে চায় না স্বামীর অধিকার অপরকে ছাড়িয়া দিতে—সে তা পারিবে না। সমস্ত দুঃখের মধ্যে তার প্রাণ-জুড়ানো সামগ্রী, সমস্ত ব্যাথার মধ্যে শান্তি,—তার ঐ স্বামীর প্রেম; সে জল ঝড় সহিবে, নিজে না খাইয়া স্বামীকে খাওয়াইবে—সে হরিণের ছড় পরিবে, বইচির ফল খাইয়া উপবাস করিবে—কিন্তু স্বামীর প্রেমের ভাগ বসাইতে সে দেবে না, সে নির্লজ্জার মত এ সকল কথা বলে নাই—কিন্তু ভগবতী যখন কিছুতেই ছাড়বেন না—তখন সে চুপ করিয়া কাঁদিতে লাগিল—

এবং—

"কাঁদিতে কাঁদিতে রামা করিল গমন।
শীঘ্র গতি গোলা হাটে দিল দরশন॥
গদ গদ বচন চক্ষেতে বহে নীর।
ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করেন মহাবীর॥
শাশুরী ননদ নাই, নাই তোর সতা।
কার সঙ্গে ঝগড়া করি চক্ষু কৈলি রাতা॥

কোন নায়িকা এই ব্যাধ-মেয়ের মত প্রেম ও সাধুতা দেখাইতে পারিয়াছে?

সেদিন আমার মাথার উৎকট ব্যধি সত্বেও মুখ খুলিয়া গিয়াছিল;—তারপর সেক্সপীয়র হইতে সুরু করিয়া আমি টেনিসন পর্য্যন্ত অনেক কবিরে কবিত্বের বিশ্লেষণ করিলাম। আমার উপর যোগেন্দ্রবাবুর একটা শ্রদ্ধার ভাব হইল—বুঝিতে পারিলাম।

মস্ত বড় বক্তৃতা করার দরুণ পীড়া বাড়িয়া মড়ার মত বিছানায় পড়িয়া রহিলাম। দিন রাত্রি একটুও ঘুম হইল না। পরদিন দেখি যোগনবাবু আবার আসিয়াছেন, তিনি বলিলেন "ক্ষুদিরাম বাবু আপনাকে সেণ্ট্রাল কলেজের" উপরের শ্রেণী গুলিতে ইংরেজী সাহিত্য পড়াইতে নিযুক্ত করিতে চান, আপনি প্রস্তুত থাকিলে শীঘ্রই নিয়োগ-পত্র পাঠাইবেন।

আমি কাতর স্বরে বলিলাম, "আমি উঠিতে বসিতে পারি না,—আমি জীবনে যে কখনও কাজ করিবার যোগ্য হইব—তাহার সম্ভাবনা নাই। ক্ষুদিরাম বাবুকে আমার নমস্কার ও ধন্যবাদ দিবেন।" যোগেন্দ্র বাবু সহানুভূতি দেখাইয়া দুঃখের সহিত বিদায় লইলেন।

এর পর আমার পীড়া এতই বৃদ্ধি পাইল যে মনে হইল, শীঘ্রই জীবন শেষ হইতে পারে, তখন আমার মাতুল চন্দ্রমোহন সেন আমার স্ত্রী-

পুত্রদিগকে পাঠাইয়া দিবার জন্য জগদীশ দাদার নিকট তার করিয়া দিলেন।

তাঁহারা সকলে আসিলে মাতুলালয়ে স্থানাভাব জনিত অসুবিধা হইতে লাগিল, আমি আমার মাতুল ভাই হেমকে বলিলাম, "তুই আমার জন্য বাড়ী খুঁজিয়া ঠিককর। প্রায় দেড়মাস এখানে রহিলাম, এখন আর মামারবাড়ীর সেরূপ শ্রী নাই, মামাত ভাইএরা কর্ত্তা হইয়াছে। এখানে আর থাকব না।" হেম বলিল—"তোমার হাতে কিছু নাই; সপরিবারে নিঃস্বম্বল অবস্থায় বাড়ী করিয়া কি ভাবে চলিবে?" আনন্দ বাবু তিন-মাসের অর্দ্ধেক বেতন ১২০ টাকা পাঠাইয়াছিলেন, তাহা হইতে খরচ যাইয়া ৭৬ টাকা কয়েক আনা বাকী ছিল আমি হেমের হাতে দিলাম।" হেম বলিল এতে কি হইবে? যা হোক যখন জেদ করিতেছে,তখন বাসা করিয়া দেই। তারপরে যা হবার হবে।" হেম তখন বি এ পাশ করিয়া 'ল' পড়িতেছি সে সন্ধ্যাকালে বাড়ী ঠিক করিয়া আসিল, রাজাবাগান জংসন রোড ১৪ নম্বরের বাড়ী. ভাড়া মাসিক ২২ টাকা।

পরদিন সেই বাড়ীতে উঠিয়া গেলাম। হেম বাজারের প্রয়োজনীয় জিনিষগুলি কিনিয়া আনিয়া ৪৩ টাকা আমার হাতে দিল, কারণ আমার ঘটি বাটী বিছানা পত্র ও অপরাপর সমস্ত জিনিষই চন্দ্রমোহন দাস দাদা-মহাশয়ের বাটীতে কুমিল্লায় ফেলিয়া আসিয়াছিলাম। ইহা হইতে বাড়ী ভাড়া ২২ টাকা দিয়া মোট ২১ টাকা হাতে রহিল।

আমি আমার এক বিশেষ বাল্যবন্ধু পাল্লিসারকে আমার সঙ্গে দেখা করিতে চিঠি লিখিলাম। ইনি পাল্লিসারী করিয়া বিস্তর টাকা করিয়া-ছিলেন। তাঁহাকে বলিলাম, "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" প্রথম সংস্করণে ছয়শত ছাপা হইয়াছিল, তাহার রাজ সংস্করণের ১০০ শত বন্ধু বান্ধব ও সাহিত্যিক গণকে উপহার দিয়াছি। তারপর ত্রিপুরা রাজার ব্যয়ে বই

ছাপা হইয়াছে, রাজসরকারেরও অনেককে দিতে হইয়াছে। এখন বিক্রয় করিবার মতন ৪০০ বই আমার কাছে আছে। বইএর প্রশংসা চারিদিকেই হইয়াছে। পূর্ব্ববঙ্গের ইনস্পেকটার দীননাথ সেন সারকুলার দিয়াছেন যে প্রত্যেক স্কুলের একখানি কিনিতে হইবে। এই পুস্তকের প্রতি খণ্ডের মূল্য ৩৲ টাকা। স্কুলগুলি এখন বন্ধ, জৈষ্ঠমাস—স্কুল খুলিলেই বই বিক্রীত হইয়া যাইবে।" তাঁহাকে দীনবাবুর সারকুলার ও নানা পত্রিকায় প্রকাশিত সমালোচনা গুলি দেখাইলাম এবং আরও বলিলাম, "আমার অবস্থা অতি শোচনীয় ১৫।২০ টাকা হাতে আছে, তা ছাড়া কুমিল্লার অর্দ্ধেক বেতন তিন মাসের টাকা আগ্রিম লইয়া আসিয়াছি, এ কয়েকটা টাকা ফুরাইলে আমরা না খাইয়া মরিব, তুমি আমার বাল্য-সুহৃদ, বইগুলি কিনিয়া নেও। এগুলি স্কুলে স্কুলেই কাটিয়া যাইবে, বাহিরে বিক্রয়ের দরকার হইবে না।"

পত্রিসার মহাশয় বলিলেন, "তুমি কি চাও"। আমি বলিলাম "চারিশত খণ্ড পুস্তকের মূল্য হয় ১২০০ শত টাকা, আমি ছয়শত টাকা অগ্রিম পাইলে ছাড়িয়া দিতে পারি।" তিনি বলিলেন "এ বেশ ভাল প্রস্তাব, আমি এই দরেই কিনিয়া নেব।" আমি খুব উৎসাহিত হইলাম। ছয়শত টাকা পাইলে, তারপর আর দুইমাস পর হইতে ৪০৲ টাকা করিয়া অর্দ্ধ বেতন পাইব, তাহা হইলে ইহাতেই আমার বৎসর চলিয়া যাইবে। কিন্তু পাত্রিসার মহাশয় বাড়ী যাইয়া এক চিঠি লিখিলেন, "এখন আমার একটু টানাটানির সময়, তোমাকে নগদ দুইশত টাকা দেব এবং তারপর ছয় মাসের মধ্যে বাকী চারিশত টাকা শোধ করিব।" আমি ভাবিলাম "২০০৲ টাকা ও তো কিছু কম নহে" তখন আমার হাতের টাকা ত আরও চের কমিয়া গিয়াছে। সুতরাং তাড়াতাড়ি তাহাতেই 'কবুল আছি' বলিয়া চিঠি লিখিলাম। আমার আগ্রহাতিশয় দেখিয়া সম্ভবতঃ পাত্রিসারের ভয় হইল।

তিনি ভাবিলেন "যা বলি, তাতেই যখন রাজি হয়, তখন বোধহয় কোন ফাঁকি আছে, বই বিক্রী হইবে না।" নিশ্চয়ই এইরূপ আশঙ্কায় তিনি শেষে আমাকে বজ্রপাতের ন্যায় এই সংবাদ অতি সংক্ষেপে জানাইয়া লিখিলেন "বই এখন নেওয়ার আমার সুবিধা হইবে না।" মনে আছে সেদিন শনিবার, আমার সম্বল আর তিনটি রৌপ্যচক্রে আসিয়া ঠেকিয়াছিল। "কাল চলিয়া যাইবে, কিন্তু পরশ্ব কি গতি হইবে।" এই ভাবিতে লাগিলাম। স্ত্রীকে এ সকল কথার কিছুই ব'ল নাই। টাকার ভাবনা কোন কালেই আমার মনের উপর বড় বেশী অত্যাচার করে নাই। সেদিন ও বেশিক্ষণ ভাবিলাম না। কিন্তু খাওয়া দাওয়ার প্রবৃত্তি চলিয়া গেল। আহার প্রস্তুত হইয়াছিল, পেটের অসুখের ভান করিয়া খাইলাম না, স্ত্রীকে খাইতে বলিয়া নিশ্চেষ্ট ভাবে বিছানায় পড়িয়া রহিলাম। ভাবিলাম সংসারের কোন কাজে আমাকে ভগবান লাগাইবেন না—যখন পশুর মতই যদি জীবন রক্ষা করিতে হয়, তখন দূর্ব্বাঘাসের চিন্তা করিলে কি হইবে? আমার নিজ পরিবারবর্গের অন্নসংস্থান করিবার সামর্থ্য নাই—তিনটি শরণাগতকে আশ্রয় দিয়াছি, তাহাদিগকে ক্ষুধার সময় বলিতে হইবে, অন্যত্র যাইয়া খাও, আধকাল গেলে পরশ্বই আমার এই অবস্থায় পড়িতে হইবে, তখন এ জীবনের জন্য আমার দুশ্চিন্তা কেন? আমি উপলক্ষ্য হইয়া থাকিতে চাই না, তোমার ভার তুমি লও।" এই ভাবিয়া চক্ষু বুজিলাম, বুঝিলাম, দুই গণ্ড অশ্রুতে ভাসিয়া গেল। মা বাবাকে মনে পড়িল; মনে মনে প্রার্থনা করিতে লাগিলাম। "যে যেখানে দেবতা আছ, আমাকে লজ্জা হইতে রক্ষাকর—আমি সারা জীবন কুলির মত খাটিয়াছি, প্রাণপাত করিয়া পরিশ্রম করিয়া অসমর্থ হইয়া পড়িয়াছি, এখন ছেলেকে স্ত্রীকে বলিব, আজকার চাউল হইবে না, এই নিদারুণ লজ্জা পাইবার পূর্ব্বে আমার প্রাণ লও, এই

অশান্তি হইতে আমাকে শান্তিধামে লইয়া যাও।" আমার সমস্ত প্রাণ আবার ব্যাকুল হইয়া হরিনামের আশ্রয় লইল। আমি প্রত্যেক বার আমার নাম-দেবতাকে অশ্রু অভিষিক্ত করিতে লাগিলাম। মনে শান্তি আসিল, এমন একটা ভাব উপস্থিত হইল, যাহাতে সুখ দুঃখ কিছু নাই, জীবনমরণের চিন্তানাই—কেবলই মধুর। "মধুরং মধুরং" তাঁর নাম আমার নিকট অমৃতের অমৃত বলিয়া মনে হইল। ক্ষুধা তৃষ্ণা ভুলিয়া গেলাম। আমার স্ত্রী ভাত খাইয়া দুঃখার্ত্ত ভাবে আসিয়া বলিলেন,"পেটের অসুখ কি করিয়াছে? চারটি ভাত খুব নরম করিয়া রাঁধিয়া দিব কি?" আমি স্ত্রীর মুখ দেখিয়া কি এক আনন্দ পাইলাম! ছেলেদের দেখিয়া কি এক আনন্দ পাইলাম! বড় দুঃখের পঙ্কে এই আনন্দ পঙ্কজ জন্মিয়াছিল—ইহা জীবন সমস্যার এক অপূর্ব্ব অনাস্বাদিত সুখের সমাধান।

এই সময় ছয় বৎসরের শিশু কিরণ একখানি চিঠি লইয়া ছুটিয়া আসিল। আমাকে বলিল "রেজেষ্ট্রী চিঠি, সই দাও।" চিঠি খুলিয়া দেখিলাম, সোদর তুল্য সুহৃদ কুমুদবন্ধু বসু আমাকে চিঠি লিখিয়াছেন। তিনি চাঁটগা ডিভিসনের স্কুলের এসিসট্যাণ্ট ইনস্পেক্টর "দীনেশ দীনু বাবুর সারকুলার দেখাইয়া আমি তোমার পুস্তক বিক্রয়ের ব্যবস্থা ঠিক করিয়াছি, এই সঙ্গে দেড়শত টাকার নোট পাঠাইলাম। তুমি ৩০০ বই পার্শেলে পাঠাইয়া দিবে, বই পাইলে বাকী দাম পাঠাইব,—একজন ভদ্রলোক এই জন্য খাটিতেছেন, তাঁহাকে ৫০৲ টাকা কমিসন দিতে হইবে। আমার ডিভিসনেই এই ৪০০ বই কাটিয়া যাইবে। সুতরাং তুমি আমার নিকট ১০০০ টাকা পাইবে।" দেড় শত টাকার নোট গুণিবার সময় চক্ষু হইতে অশ্রুর বেগ কিছুতেই থামাইতে পারিলাম না, স্ত্রীর দিক হইতে মুখ সরাইয়া অশ্রু মুছিতে লাগিলাম। এ পত্র কুমুদ বাবুর না কাহার বুঝিতে পারিলাম না; কুমুদবাবুকে হরকরা বলিয়া মনে হইল। আমার

মনের দুঃখ কে যেন কি ভাবে জানিতে পারিয়া তাঁহার দয়া আমাকে বুঝাইয়া দিলেন। কে যেন কানের কাছে চুপে চুপে বলিলেন "আমি আছি।"

কুমুদবাবুর স্নেহের কথা কি বলিব? কুমিল্লায় যখন নিতান্ত পীড়িত হইয়াছিলাম তখন তিনি ছুটি লইয়া দুইবার আমাকে দেখিতে আসিয়াছিলেন। দুইবারে তাঁহার নিজের পকেট হইতে পাথেয় প্রায় ১০০ টাকা খরচ করিয়াছিলেন। তিনি আমার আনন্দের সঙ্গী ছিলেন, দুঃখের দুঃখী ছিলেন, এখনও তিনি তাই আছেন। যখন ইংরাজীতে History of Bengali Language and Literature লিখি, তখন তিনি দেড়মাস বাড়ীঘর ছাড়িয়া কলিকাতায় আসিয়া আমার কাছে ছিলেন, তিনি ইংরাজীতে বিশেষ প্রাজ্ঞ, পুস্তকখানির আদ্যন্ত ভাল করিয়া পড়িয়া দিয়াছিলেন এবং কোন কোন স্থানে ইংরাজী শুদ্ধ করিয়াছিলেন।

তিনজন শরণাগতের কথা লিখিয়াছি। যখন আমি নিতান্ত অভাবে ছিলাম—তখন একদিন বাঁকুড়াজেলা পাত্রসায়ের গ্রামবাসী রামকুমার দত্ত (তন্তুবায়) আমার সঙ্গে দেখা করিয়া বলিল, "বাবু, আমি আমার স্ত্রী ও একটি সাত বছরের ছেলে আজ দুই দিন কিছু খাই নাই, আমাদের একটু আশ্রয় দেবেন কি? যদি চাকর করিয়া রাখেন তবে আমাকে তিনটি টাকা মাহিনা দেবেন, আর দুইজনকে কিছু দিতে হবে না, তারা শুধু খাইয়া পরিয়া থাকিবে, এবং কাজ করিবে।" হেম বলিল "না, বাপু, এখানে হবে না; বাবু নিজেই পরিবার পালতে পারেন না, শয্যাগত কাতর; আবার তোমাদের তিনজন চালাইবেন কি করিয়া?" আমি বলিলাম "না হেম, থাক্‌তে দে; আমাকে যিনি পালন কচ্ছেন ওদেরেও তিনি করবেন। আমি তো আর নিজে রোজগার কচ্ছি না যে নিজের ইচ্ছানুসারে কাউকে তাড়িয়ে কাউকে রাখব। তিনি যখন এদের পাঠাইয়া

দিয়াছেন—আমাকে দীনহীন জানিয়া ও এই পাড়ার এত লোক থাকতেও আমার কাছে পাঠাইয়া দিয়াছেন, তখন আমি ইহাদের কিছুতেই তাড়াইয়া দিব না, ইহারা তাঁহার অসময়ের দান।"

রামকুমারকে আমি পুথি সংগ্রহ কার্য্য শিখাইয়াছিলাম। হরপ্রসাদ বাবু, চিত্তরঞ্জন দাশ, নগেন্দ্রনাথবসু, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি মহাশয়দের নিকট আমি চিঠি লিখিয়া ইহাঁকে পুস্তক ও প্রাচীন চিত্র-সংগ্রহে নিযুক্ত করিয়া দেই। সি, আর, দাশের বাড়ীর সমস্ত বাঙ্গলা প্রাচীন পুথি, নগেন্দ্র বাবুর ও সাহিত্য পরিষদের প্রায় সমস্ত পুথি ইহার সংগৃহীত। বিচিত্র বর্ণ রঞ্জিত ছবি শুদ্ধ প্রাচীন পুথির পাটা ও হাতীর দাঁতের প্রাচীন মূর্ত্তি অবনীন্দ্র বাবু ইহাকে দিয়া সংগ্রহ করিয়াছিলেন। নগেন্দ্রবাবুর পুঁথিগুলি তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিক্রয় করিয়াছেন। রামকুমার বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরীতে বিস্তর পুস্তক বিক্রয় করে, গত বৎসর সে মৃত্যুমুখে পড়িয়াছে। তাহার ছেলে অবিনাশচন্দ্র দত্ত এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য পুঁথি সংগ্রহ করিতেছে, এবং আজ কালকার বাজারে তাঁত চালাইয়াও রোজগার করিতেছে, তাঁতীর ছেলেকে আমি নিজের ব্যবসায় ভুলিতে দেই নাই। রামকুমারকে আমি এমনই তৈরী করিয়া দিয়াছিলাম যে সে মাসে ১৫০।২০০, শত টাকা ও রোজগার করিয়াছে।

আরও পাঁচ ছয় মাস পরে অর্থাৎ পীড়া সুরু হইবার প্রায় একবৎসর পরে আমি একটু একটু হাঁটিতে পারিতাম, হয়ত ২।৩ মিনিট, তা আবার যখন শরীর খুব ভাল থাকিত তখন,—অধিকাংশ সময়ই আমি বিছানায় পড়িয়া থাকিতাম। একদিন আমি রাজাবাগান জংসন রোড দিয়া কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট পর্য্যন্ত হাঁটিয়া আসিয়াছিলাম; আমার বাসা বাড়ী হইতে কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট ২।৩ মিনিটের পথ। যেখানে আসিয়া আমি দাঁড়াইয়াছিলাম, তাহার সম্মুখেই শ্রীযুক্ত ডাঃ চন্দ্রশেখরকালীর ডিসপেন্সরী;

তিনি আমাকে দেখিয়া আহ্বান করিলেন, এবং জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনার বাড়ী কোথায়?" আমি বলিলাম "সুয়াপুর, ঢাকা" তিনি বলিলেন, "আপনার পিতার নাম কি ঈশ্বরচন্দ্র সেন?" আমি অনুকূল উত্তর দিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি কি করিয়া জানিতে পারিলেন?" তিনি বলিলেন "আমি তাঁহার নিকট পড়িয়াছি, যখন ছাত্র ছিলাম তখন তাঁর বয়স আপনার মতই ছিল,আমার আপনাকে দেখিয়া বোধ হইয়াছিল, ঠিক মাষ্টার মহাশয় দাঁড়াইয়া আছেন।" ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কথা কিছু ছিল না। শৈশব হইতে আমি অনেকবার ঐরূপ কথা শুনিয়া আসিয়াছি, একবার মানিকগঞ্জ রাস্তায় বেড়াইতে ছিলাম, তখন আমার বয়স আট নয়, সেই সময় দুইজন মুন্সেফ ছড়ি ঘুরাইতে ঘুরাইতে কথা বলিয়া যাইতেছিলেন। একজন আমাকে দেখিয়া অপরকে বলিলেন "এ ছেলেটি ঈশ্বর বাবুর ছেলে না হইয়া যায় না, কি আশ্চর্য্য সাদৃশ্য!" তার পর তাঁরা আমাকে ডাকিয়া অনেক মুন্সেফী জেরা করিয়াছিলেন।

ইহার কিছুদিন পরে অরুণের জ্বর হইল। চন্দ্রশেখর বাবুকে ডাকাইলাম। তাঁহাকে ফি দিতে গেলে তিনি বলিলেন, "ভাই, তুমি যে সপরিবারে আমার বাড়ীতে উঠ নাই, এতেই আমাকে অনেক খরচ হইতে মুক্তি দিয়াছ। কারণ তুমি সবটি শুদ্ধ আমার বাসায় গেলে আমার সাধ্য থাকৃত না তোমাকে নিষেধ করা,তোমার সঙ্গে আমার কি সম্বন্ধ, তা তুমি জাননা"। চিরদিনই তিনি আমাকে উপকার করিয়া আসিয়াছেন। কতবার অর্থ সাহায্য করিয়াছেন। গত বৎসর আমার স্ত্রীর ভয়ানক অসুখ হইয়াছিল। তিনি অসমর্থ শরীরে বেহালা যাইয়া আমার রথাকৃতি ত্রিতল বাড়ীর ছোট সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া উর্দ্ধতলায় হাঁপাইতে হাঁপাইতে উঠিয়াছেন, একবার নহে, বহুবার। শৈশবের স্মৃতি মধুর ভাবে তার হৃদয়ে আঁকা আছে, তাঁহার বাড়ী ধামরাই-গ্রামের কথা বলিতে গেলে আর কথা

ফুরাইতে চায় না। এখন তাঁর চেহারাটি ঠিক শিব ঠাকুরের মত হইয়া গিয়াছে; উজ্জল শ্যামবর্ণ; আবক্ষ-লম্বিত দাড়ি, সবগুলি পাকিয়া গিয়াছে, মুখের কৌমার্য্য এ বয়সেও কমে নাই; চোখ নাকের গড়ন প্রতিভা-সূচক, এতবড় একটা লাঠি লইয়া যাতায়াত করেন যে সেটি চাঁদ সদাগরের হিন্তালের প্রসিদ্ধ লাঠির সঙ্গেই তুলনা হইতে পারে। বাঙ্গালী সৈনিকের ইতিহাস-বিশ্রুত রায়বাঁশের পরে সেরূপ লাঠি আর কেহ ব্যবহার করে নাই। পুলিসের রেগুলেসন লাঠির মাথা ফাটাইয়া দিতে পারে চন্দ্রশেখর বাবুর লাঠি। রুদ্রাক্ষমালা গলায় পরেন, কপালে সময়ে সময়ে রুলী থাকে; দাড়ী গোঁপ, রুলি,রুদ্রাক্ষ প্রভৃতি আসবাবের সহযোগে লম্বোদর গজাননের মত মূর্ত্তি খানি দেখিলে মনে হয় এখন মন্দির তৈরী করিয়া প্রতিষ্ঠা করিলেই হয়। বৎসর ৫।৭ হইলে আমি উহাঁর বাড়ীতে যাইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশিকা পরীক্ষার্থীদের মধ্যে যে বাঙ্গলায় প্রথম হইবে তাহার জন্য বৎসর বৎসর একটি স্বর্ণপদকের মূল্য ২০০০, টাকার চেক লইয়া আসিয়াছিলাম। উহা তাঁহার পিতা ও মাতার নামাঙ্কিত।

অরুণ জ্বরে ৩৫ দিন ভুগিয়া পথ্য পাইল। চন্দ্রশেখর বাবু রোজই আসিতেন। আমি নিদারুণ রোগে কাতর, তারপর সারারাত্র অরুণের শয্যাপার্শ্বে জাগিয়া বসিয়া থাকিতাম। কি কষ্ট যে গিয়াছে তাহা আর কি বলিব! ইহার মধ্যে একদিন চন্দ্রশেখর বাবুর বাড়ীতে জগদ্ধাত্রী পূজার উপলক্ষে গিয়াছিলাম, আমি সুধু গায়ে চটী পায়ে যাইয়া তাঁহার বাহির বাড়ীতে বসিয়াছিলাম, দেখিলাম কয়েক জন যুবক কথোপকথন করিতেছেন। তার মধ্যে একটি বিএ উপাধিধারী তরুণ যুবক খুব আসর জমকাইয়া বঙ্গভাষার সম্বন্ধে গবেষণা করিতেছেন। তিনি বঙ্গভাষা সম্বন্ধে এরূপ অনর্গল বক্তৃতা করিয়া যাইতেছেন যে অপর যুবককেরা হাঁ করিয়া তাঁহার মুখের কথা যেন গিলিয়া খাইতেছেন। বিষয়টিতে আমি একটু

আকৃষ্ট না হইয়া পারিলাম না। হঠাৎ একটা কথার মুখে আমি বলিলাম "মহাশয়। আপনি যে সকল কথা বলিতেছেন—তাহা ভুল?" তিনি ক্ষেপিয়া গিয়া ভুল দেখাইতে বলিলেন, আমি দুইচারিটি কথায় তাঁহার ভুল দেখাইয়া দিলাম। তিনি বলিলেন, "একথাই নয়, দীনেশ বাবুর বঙ্গভাষায় যাহা লেখা আছে আমি তাহাই বলিয়াছি.ঐ বই এখন অথরিটি, আপনি নিশ্চয়ই উহা পড়েন নাই।" আমি বলিলাম "ঐ পুস্তক প্রকাশ হওয়ার পর নূতন কতকগুলি তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে—সেই তত্ত্বগুলির আলোকে বইখানির সংশোধন আবশ্যক।" এই কথায় বক্তা খুব চটিয়া গেলেন, বলিলেন "দীনেশ বাবুর উপরে সংশোধন?" অপরাপর যুবকেরা বলিলেন "ও কথা বল্‌বেন না মহাশয়. দীনেশ বাবুর পুস্তকে প্রাচীন সাহিত্য সম্বন্ধে শেষ কথা বলা হইয়াছে।" যখন তাঁহারা এইভাবে কলরব করিয়া সর্ব্বসম্মতিক্রমে আমাকে নিরস্ত করিয়া দিতেছিলেন, এমন সময় চন্দ্রশেখর বাবু তাঁহার ভুঁড়ি পুরোভাগে করিয়া স্মিতমুখে উপস্থিত হইয়া বলিলেন "এই যে দীনেশ! কতক্ষণ হল এসেছ?" এবং যুবকদিগের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "তোমরা বুঝি এঁকে চেন না। ইনি হচ্ছেন বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের দীনেশচন্দ্র।" তখন যুবকদের অনেক সৌজন্য ও ক্ষমা-প্রার্থনা দ্বারা আমি অভিনন্দিত হইলাম।

এই সময় ডাক্তার নীলরতন সরকার মহাশয় আমার বাড়ীতে আসিয়া অনাহুত ভাবে আমার চিকিৎসার ভার গ্রহণ করিতে অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। তিনি আমার বঙ্গভাষার উন্নতি কল্পে পরিশ্রমের কথা অনেক প্রসংশোক্তি দ্বারা বাড়াইয়া বলিলেন, "আমাদের যথাসাধ্য সহায়তা করা উচিত। আপনি এ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা করিতে চান, তাহার সম্পূর্ণ ভার আমি লইব। আর যদি আয়ুর্ব্বেদিক চিকিৎসার মত হয়, তবে বলুন, আমি বিজয়রত্ন সেন মহাশয়কে আনিয়া আপনার চিকিৎসায় নিযুক্ত

করিয়া দেই, আপনার কোন খরচ লাগিবে না; তিনি আমার বিশেষ বন্ধু। ভগবান যে কতদিকে কতজনের দ্বারা আমার খোঁজ লইতেছিলেন! মারিয়া ধরিয়া মাতা যেরূপ শিশুকে স্তন্য দান করেন, আমাকে যে সেইরূপ রোগযন্ত্রনা দিয়া যেন আবার স্নেহার্দ্র হইয়া চুম্বন পূর্ব্বক নিজের অসীম দয়া বুঝাইয়া যাইতেছেন, তাঁহার সেই দয়া যেন প্রত্যক্ষ করিতে লাগিলাম।

কবিরাজী চিকিৎসারই মত হইল, নীলরতন বাবু বিজয়বাবুকে সঙ্গে করিয়া আনিলেন। বিজয় বাবুর পুত্র হেমচন্দ্র বিদ্যমান, হেমচন্দ্র যদি আর একটু দীর্ঘ হইতেন, ও তাঁহার মুখ চোখের যদি আর একটু দীপ্তি বেশী থাকিত, তবে তাঁহাকে ঠিক পিতার প্রতিচিত্র বলিয়া মনে হইত, এখনও খুব আশ্চর্য্য সাদৃশ্য আছে, সন্দেহ নাই।

বিজয় কবিরাজ মহাশয়ের উদারতার ঋণ কি করিয়া ভুলিব? যাঁহারা আমার বিপদের সময় অযাচিত ভাবে আমার সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদের ঋণ কি করিয়া শোধ করিব? অনেকে তো আমার ঋণ পাশে বদ্ধ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। যিনি ইঁহাদিগকে ডাকিয়া আনিয়া আমার ভার দিয়াছিলেন, তাঁহার চরণপদ্মে কোটী নমস্কার পূর্ব্বক তাঁহাদের মঙ্গল কামনা ভিন্ন আমি আর কি করিতে পারিয়াছি!"

এই সময় বনোওয়ারী লাল গোস্বামী (শান্তিপুরের জয় গোপাল গোস্বামীর পুত্র) "খিচুরী" নামক এক ব্যঙ্গ-কাব্য প্রচার করেন, তিনি এই পুস্তকে বঙ্গের তৎকালীন লেখকদের লইয়া আচ্ছা রঙ্গ করিয়াছিলেন, সে সময়ে বইখানির বেশ প্রতিপত্তি হইয়াছিল। এই পুস্তকে তাঁহার ব্যঙ্গের তালিকায় আমিও পড়িয়া গিয়াছিলাম। আমার চোখ দুটি কি জানি কেন তার ভাল লাগিয়াছিল, কিন্তু আমার দাশরথী রায়ের

সমালোচনা বোধহয় তাঁর মোটেই ভাল লাগেনাই। তিনি আমার সম্বন্ধে অনেক কথাই লিখিয়াছিলেন, তার দুটিছত্র মনে আছে:—

"চক্ষু দুটি পটল চেরা প্রতিভাতে আঁকা।
বল্লে পরে রাগ করিবেন, পথ ধরেছেন বাঁকা॥

অরুণের জ্বর লইয়া রাত্রি জাগরণ ও সেবা শুশ্রূষা এবং আরও কয়েকটি কারণে আমি আবার শয্যাশায়ী হইলাম ; একটি কারণ,আমি গাড়ী করিয়া একজনের সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিলাম ; ফলে গাড়ীর ঝাঁকুনীতে আমার শরীর অত্যন্ত খারাপ হইল। দিনরাত্রি মাথায় বরফ দিয়া রাখিতাম। তারপর তিনমাস এমন ছিলাম যে এ ঘর হইতে ও ঘরে যাইবার আমার সাধ্য ছিল না। এই সময় ভ্রাতা হেমচন্দ্র ছায়ার ন্যায় আমার কাছে কাছে ছিল, ও পাড়ার মাতঙ্গিনী পালিত নামক এক যুবক দয়া করিয়া আমার চিঠিপত্র গুলি লিখিয়া দিতেন।

১৮৯৮ সনে কলিকাতায় ভয়ানক ভূমিকম্প হয়। বোধ হয় আষাঢ় মাস, আমার সেই পরমা সুন্দরী মামাত ভগিনী সরোজিনী আমার পীড়ার সংবাদ শুনিয়া আমায় দেখিতে আসিয়াছিল, তাহার ও মাঝে মাঝে ফিট হইত ; ইহার মধ্যে আমার মামাত ভাই দৈবকী লালের (এখন নারায়ণ গঞ্জের মুন্সেফ) স্ত্রীর হিষ্টিরিয়ার ব্যারাম হয়। বধূ এমন সকল কথা কহিতে থাকেন যাহাতে অনেকের বিশ্বাস হয়,যে তাঁহার উপর প্রেতাশ্রয় হইয়াছে। এখানে অনেক ডাক্তারি চিকিৎসায় যখন কোন ফল হইল না, তখন মাতুল মহাশয়েরা নৈহাটী হইতে এক ভূতের ওঝা লইয়া এলেন। সে বড় সঙ্গিন ব্যক্তি, সে নানারূপ মন্ত্রতন্ত্র আওড়াইতে আওড়াইতে যাহা বলিতে লাগিল, বধুটি তাহাতে একান্ত ভয়ের চিহ্ন দেখাইতে লাগিলেন এবং প্রেতের ভূমিকা অভিনয় করিয়া শেষে চলিয়া যাইতে স্বীকার করিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় বউ সত্যই ভাল হইয়া গেলেন।

ওঝার প্রতিপত্তি আমাদের বাড়ীতে খুব বাড়িয়া গেল, সে গোপনে আমার ছোট মাতুলকে বলিল "আপনাদের বাড়ীর আর দুই জনের উপর ভূতের দৃষ্টি আছে", একজন সরোজিনী ও আর একজন আমি—এই দুইজনকেই সে ভূতাশ্রিত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিল, সে মন্ত্রতন্ত্র ও বিবিধ প্রক্রিয়া দ্বারা আমাদের ভূত তাড়াইয়া দিতে পারে এবং স্নায়বীর দুর্ব্বলতা-জনিত ফিট বলিয়া যাহা ডাক্তাররা বলিয়াছেন—সে তাহা অনায়াসে ভাল করিয়া দিবে—বলিয়া দম্ভ করিতে লাগিল। সরোজিনী ও আমি পরামর্শ করিয়া স্থির করিলাম যে অবধি সেই ওঝা থাকিবে—তদবধি সে বাড়ীতে আমরা কিছুতেই যাইব না।

সেই ভূমিকম্পের দিন আমি সরোজিনী ও হেম রাজাবাগানের বাসায় একত্র হইয়া এই সকল কথা লইয়া কৌতুক করিতেছিলাম। সরোজিনী আমার জন্য ভাল নেংড়া আম লইয়া আসিয়াছিল, সে আমাকে কাটিয়া দিতেছিল, আমি খাইতে ছিলাম, এমন সময় সমস্ত বাড়ী কাঁপিয়া উঠিল। ঝড়ের সময় কলার পাত যেরূপ থরথর করিয়া কাঁপে, সেইরূপ কাঁপিয়া উঠিল; মনে হইল যেন দ্বিতল বাড়ীর মাথাটা ধরিয়া কেউ ঝাঁকুনি দিতে লাগিল, মুহূর্ত্তের মধ্যে শতশত শঙ্খ বাজিয়া উঠিল এবং কোন কোন বাড়ী পড়িয়া যাইবার ভীষণ শব্দে কর্ণে তালি লাগিল।

সরোজিনীর ফিট হওয়ার উপক্রম হইল, আমি হাটিতে পারি না, আমাদিগকে দুইজনকে দুইহাতে ধরিয়া এবং ছেলেদিগকে আগে আগে তাড়াইয়া লইয়া হেম বাড়ী হইতে বাহিরে লইয়া আসিল,—বাড়ীর সম্মুখে একটা ছোট খোলা মাঠ ছিল (যাহার উপর ডিরেকটারের পার্সনাল এসিসটেণ্ট অম্বিকা বসু মহাশয় পরে বাড়ী করিয়াছিলেন) সেই খানে যাইয়া দাঁড়াইলাম। আমি ও সরোজিনী উভয়েই বেশীক্ষণ দাঁড়াইতে পারিলাম না, আমি বসিয়া পড়িলাম, সরোজিনী শুইয়া পড়িল। তখনও বাড়ীখানি

গ্রন্থকারের মামাত ভগিনী সরোজিনী দেবী

তাসের ঘরের মত দুলিতেছিল, আশে পাশের মেয়েরা রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িয়াছিলেন। কিন্তু আমি দেখিলাম আমার স্ত্রী নাই, তখন হেমকে বলিলাম,"তিনি লজ্জাশীলা হইয়া হয়ত কোন ঘরে বসিয়া আছেন।" তখন সেই পতনোন্মুখ গৃহের মধ্যে প্রাণের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া হেম ঢুকিয়া পড়িল এবং দ্বিতলের একটা ঘর হইতে হিড়হিড় করিয়া আমার স্ত্রীকে টানিয়া বাহিরে লইয়া আসিল। বাড়ীখানি পড়িতে পড়িতে রহিয়া গেল, মনে হইল কেউ যেন "তিষ্ঠ" বলিয়া কম্পিতা ধরিত্রীকে স্থির করিয়া ফেলিলেন।

পাড়ায় আমাকে সেদিন অনেকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "ঐ ঘাষের উপর যে রমণী পড়িয়াছিলেন, উনি আপনার কে? আমাদের মনে হইল যেন একটা বিদ্যুৎ মাটিতে পড়িয়া আছে, এমন সুন্দরী বাঙ্গালীর ঘরে দেখা যায় না।" তাঁরা সরোজিনীকে দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছিলেন। এ কিছু নূতন নহে, তাহাকে দেখিয়া অনেকেই ইহার পূর্ব্বে চমৎকৃত হইয়াছেন।

ইহার কিছু পরে কলিকাতায় প্লেগরোগের শুভাগমনের আশঙ্কায় সহরে হুলস্থূল পড়িয়া গেল। শীঘ্রই 'কোয়ারেণ্টাইন' বসিবে, এই জনরবে কলিকাতা হইতে লোক পালাইতে সুরু করিল। তেমন ভয় কলিকাতায় কেহ আর দেখিয়াছেন কিনা, জানি না। ছেলে, বুড়ো, শিক্ষিত, অশিক্ষিত সকলে ভয়ে আড়ষ্ট, এরূপ সার্ব্বজনীন ভীতি কলিকাতার ন্যায় সহরে যে কি আকার ধারণ করিতে পারে, তাহা লিখিয়া বুঝানো শক্ত। কলিকাতা হইতে শত শত সহস্র সহস্র লোক ছুটিয়া পালাইতে লাগিল। কুম্ভবেলা বিশৃঙ্খল হইলে,সমুদ্র তীর অতিক্রম করিয়া ছুটিলে.বোধ হয় সেই দৃশ্যের কতকটা কল্পনা করা যায়। রেল গাড়ীতে স্থানাভাব, পথের ভিঁড় ঠেলিয়া যাওয়া অসম্ভব; এক মহাজনতা যেন পথ না পাইয়া দুর্দ্দমনীয়

বেগে ছুটিতেছে, যেন কোন রাজরাজ্যেশ্বরের অক্ষৌহিণী সৈন্য রণে ভঙ্গ দিয়া পালাইতেছে।

(১৮)

ফরিদপুরে

আমি অশক্ত, আমি কোথায় যাইব ? কে লইয়া যাইবে ? মাতুলেরা চলিলেন, তাঁহারা বলিলেন "তুমি হেমকে লইয়া ষ্টেসনে যেও।" ইহার মধ্যে অরুণের উরু দেশের ঊর্দ্ধমূলে সন্ধি একটু ফুলিয়া বেদনা হইল, তাহার বয়স তখন ছয়। আমরা তাহাকে খুঁজিয়া পাই নাই, অবশেষে দেখিলাম, সে একটা তক্তাপোশের নীচে পালাইয়া আছে। প্লেগ মনে করিয়া পাছে তাহাকে ধরিয়া লইয়া যায়, ছয় বৎসরের ছেলের প্রাণে সেই আতঙ্ক হইয়াছে।

এই অবস্থায় হেম আমাদিগকে লইয়া ষ্টেসনে উপস্থিত হইল। ভয়ঙ্কর ভিঁড়ে মাতুলেরা কোন রকমে জিনিষপত্র তোলাইয়া গাড়ীতে উঠিলেন, কিন্তু আমার কথা ভুলিয়া গিয়াছিলেন। যখন গাড়ী ছাড়িয়া দিল, তখন তাঁহারা একজন বাজার-সরকারকে রাখিয়া গেলেন, আমাকে পরের ট্রেনে লইয়া আসিতে। আমি বিপদ সমুদ্রে পড়িলাম। কোথায় যাইব ? কে লইয়া যাইবে ? সেই সরকারের আমার পরিবার সহ আমাকে লইয়া যাইবার মত বুদ্ধি, ক্ষিপ্রকারিতা ও শক্তি কিছুই ছিল না, সে একটা মুটের মত ছিল। শেয়ালদা ষ্টেশনে পড়িয়া মনে হইল আমি বৈতরণীর পাড়ে আসিয়াছি, সম্মুখে যমরাজের বাড়ী।

সুয়াপুরের ঘরগুলি সমস্তই পড়িয়া গিয়াছিল—সেখানে পাকা ঘর তুলিবার সঙ্কল্পে খড়ো-ঘরগুলি মেরামত না করিয়া নষ্ট করিয়া ফেলিয়া ছিলাম। মামারা হয়তঃ আমার পীড়া অসাধ্য জানিয়া আমাকে ভয়ে ত্যাগ করিয়া গেলেন। দেখিলাম মাথার উপর নীলবর্ণ ছাদ—তাহা আকাশ, সেখানে শত শত নক্ষত্র, সেইগুলিই আমার আলো। আমার এই মুক্তাকাশ নিম্নে স্থান—আর কোথায়ও কোন সম্বন্ধ নাই। হেম

এমন সময় বিদায় লইতে আসিয়া আমার অবস্থা দেখিয়া স্তব্ধ হইয়া গেল। আমি কোন কথা বলিলাম না, তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলাম। সে বলিল, "তুমি কেঁদ না—আমি তোমাকে ফেলিয়া কোথায়ও যাব না। আমার পরিবারেরা কলিকাতায় আছেন, আমার এখুনি যাওয়ার কথা—এই ঘোর আশঙ্কার সময় আমি ফিরিয়া না গেলে তাঁহারা যে অবস্থায় রাত কাটাইবেন, তাহা বুঝিতে পার, আমি মনে করিয়াছিলাম তোমাকে এখানে পৌছিয়া দিয়া রাত বারটার গাড়ীতে তাদের লইয়া যাইব। কিন্তু তোমাকে মামারা যে এরূপ নির্দ্দয়ভাবে ফেলিয়া যাইবেন, এ তো জানা ছিল না, তোমাকে আমি গোয়ালন্দ পৌছিয়া দিয়া ফরিদপুরের ষ্টিমারে রওনা করিয়া দিয়া ফিরিব—সেইখান থেকে সরকারমহাশয় তোমাকে লইয়া যাইবেন, আমি ফরিদপুর তারা-কুমার বাবুকে আজ রাত্রেই তার করিয়া দিব, ষ্টীমার ঘাটে তোমার জন্য প্রতীক্ষা করিতে।" আমি বলিলাম, "দাদার পরিবার, তোর পরিবার—এই দুইদিনে যে কলিকাতায় ভয়ে মরিয়া যাইবে।" সে বলিল "তার ঠিক তোমার মত নিরুপায় নয়—লোকজন বাড়ীতে আছে—কিন্তু না হ'লেই বা কি? আমি কোন্ প্রাণে তোমাকে এ অবস্থায় ফেলিয়া যাব? যখন সম্মুখে কর্ত্তব্য এরূপ ভাবে উপস্থিত হয়, তখন সেটাকে দুর্ভাবনা ভেবে কখনই অগ্রাহ্য করা সঙ্গত নহে।"

হেম অতিশয় নম্র প্রকৃতির লোক, এমন মিষ্টস্বভাবের লোক বড় বেশী দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু তার মত সাহস, উপস্থিত বুদ্ধি ও বীরোচিত কার্য্য কলাপও আমি খুব কম দেখিয়াছি। অপগণ্ড শিশু যেরূপ মাতৃক্রোড়ে আশ্রয় লয়, আমি সেইভাবে তাঁহার পরিচালনায় উপর নিঃসহায় ভাবে নিজকে ছাড়িয়া দিয়া নাম জপ করিতে লাগিয়া গেলাম।

গোয়ালন্দ যাইয়া প্রাতে হেম আমাকে ষ্টীমারে উঠাইয়া দিল, সঙ্গে স্ত্রী পুত্রাদি ও সরকার মহাশয়। হেম বিদায় কালে অশ্রু রুদ্ধকণ্ঠে আমাকে সাহস দিয়া গেল। আমার সহোদর ভাই নাই, কিন্তু হেমের অপেক্ষা কোন্ সহোদর বেশী স্নেহশীল হইতে পারিত?

পদ্মায় দেড়বৎসর পূর্ব্বে একবার ভাসিয়াছিলাম, আবার সেই-পদ্মায়। রোগ সারিবার যে কোন উপক্রম হইয়াছে, তাহা তো বোধ হইল না। ফরিদপুর আমার ভগিনীপতি তারাকুমার রায় সবজজের সেরেস্তাদার, ৫৮৲ টাকা বেতন পান। তাঁহার পুত্র কন্যা ও জামতা প্রভৃতিতে সংসারটি নিতান্ত ছোট নহে। ঐ অল্প বেতনে অনেক কায়ক্লেশে চলে, এই ভগিনী আর আমি যমজ। আমাকে দেখিয়া তাঁহাদের একটু ভয় হওয়া খুব স্বাভাবিক, যেহেতু তাঁহারা শুনিয়াছিলেন, আমি বহুদিন রোগে ভুগিতেছি, ডাক্তাররা বলিয়াছেন 'রোগ সারিবে না', অথচ পুত্র কন্যায় আমার সংসারটিও নিতান্ত ছোট নহে, আমি একবারে নিঃস্ব। তাহাদের ভয়ের আভাষ বুঝিয়া আমি তারাকুমার বাবুকে পাঁচশত কয়েক টাকা দিলাম। পুস্তক বিক্রয়লব্ধ টাকার সেই অংশ অবশিষ্ট ছিল। টাকা পাইয়া তারাকুমার বাবুর ভয় দূর হইল। তিনি খুব আদর দেখাইতে লাগিলেন। কিন্তু এই টাকা দেওয়ার পূর্ব্বে তাঁহার ছোট বাড়ীতে আমাদের সঙ্কুলান হইবে না, এবং তিনি আমাদিগকে একটা ভার বোধ করিতে পারেন, এই আশঙ্কায় স্থানান্তরে যাইবার কল্পনা করিয়া ছিলাম। মাতুলদিগকে চিঠি লিখিয়া এই দুঃসময়ে জবাব পাই-লাম না। আর একজন আত্মীয়কে চিঠি লিখিয়া ছিলাম, তিনি নানা ওজুহাতে আমাকে এড়াইলেন। কিন্তু কবি দীনেশ চরণ বসু মহাশয়কে বিপদে পড়িয়া (তিনি কায়স্থ হইলেও) আশ্রয় প্রার্থনা পূর্ব্বক চিঠি লিখিয়া-

ছিলাম, তাহার উত্তরটি আমি এখন পর্য্যন্ত রাখিয়াছি—তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

"বহু দিনের পর তোমার পত্র পাইয়া সুখী হওয়া দূরে থাক তোমার পীড়ার এখন অরোগ্য হয় নাই জানিতে পারিয়া বড়ই দুঃখিত হইলাম। কিন্তু তুমি আমাকে পরমাত্মীয় জ্ঞান করিয়া যে এই পত্র খানি লিখিয়াছ, তজ্জন্য যে কত দূর সুখী হইলাম, তাহা বলিতে পারি না। আমার এখানে তুমি সপরিবারে যত দিন ইচ্ছা থাকিতে পার, তাহাতে আমার অপার অনন্দ ভিন্ন কোন প্রকারের অসুবিধা হইবে না। ভূমিকম্পের পূর্ব্বে হইলে তোমাকে অধিকতর সুবিধা দিতে পারিতাম। তথাচ এইক্ষুদ্র গৃহের বর্ত্তমান অবস্থায় আন্তরিক যত্ন ও স্নেহ দ্বারা যাহা কিছু হইতে পারে তাহার ত্রুটি হইবে না। তুমি যত শীঘ্র পার সপরিবারে রওনা হইয়া অসিবে। ষ্টিমারে আসিলে এলাচিপুরের টিকিট কাটিবে। পূর্ব্বে জানিতে পারিলে (আরচা) ষ্টেসনে পাল্কী ইত্যাদির বন্দোবস্ত করিয়া রাখা যাইতে পারে। চাকরাণী পাওয়া কঠিন। শূদ্র চাকর একজন একরূপ স্থির করিয়া রাখিলাম। মনে কোন রূপ ভিন্ন ভাব না ভাবিয়া অন্য কাহারও কথায় কথায় কর্ণপাত না করিয়া সরল স্নেহের আবেগে যেরূপ পত্র লিখিয়াছ, তাহার বশবর্ত্তী হইয়া এখানে আসিবে, এবং আমাদিগকে সুখী করিবে।

যাহা হউক, তারাকুমার বাবু যখন তথায়ই থাকিতে বিশেষ অনুরোধ করিতে লাগিলেন, তখন দীনেশ বসু মহাশয়ের সাদর আমন্ত্রণ গ্রহণ করিতে পারিলাম না, কিন্তু চিঠির উত্তর দিতে ইতস্ততঃ করিতে লাগিলাম; তিনি তাগিদ দিয়া আর একখানি স্নিগ্ধ পত্র লিখিলেন, সেই পত্রের উত্তর দিতে যাইব, এমন সময় তাঁহার স্ত্রীর পত্র পাইলাম, তিনি তাঁহার মৃত্যু সংবাদ দিয়াছেন। দীনেশ বাবুর বয়স ৪০এর কিছু উপরে হইয়াছিল—শরীর খুব ভাল ছিল। তিনি 'জুরি' হইয়া ঢাকায় চলিয়া-

ছিলেন, পথে রাত্রে নৌকায় কলেরা হয়। যেদিন প্রাতে সুস্থদেহে প্রফুল্ল চিত্তে বাড়ী হইতে রওনা হইয়াছিলেন—তার পরদিন বেলা তিনটার সময় মাঝি তাহার মৃত দেহ লইয়া বাড়ীতে আসিল, সে বোধ হয় ১৮৯৮ সনের আষাঢ় মাসে।

এই অভাবনীয় সংবাদে যে আমি কিরূপ মর্ম্মাহত হইয়াছিলাম, তাহা লিখিতে পারি না। আমার তিন চার রাত্রি ঘুম হয় নাই, এবং তাঁহার মুখ মনে পড়িলেই ফিট হইত। স্নায়বীয় দুর্ব্বলতার জন্য অল্পতেই আমি একবারে বিহ্বল হইয়া পড়িতাম।

ফরিদপুর আসিয়া দুইজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তির আদর স্নেহ লাভ করিলাম। তখন শ্রীযুক্ত কিরণ চন্দ্র দে ফরিদপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট। তিনি আমার অবস্থা দেখিয়া নানাস্থানে চিঠি লিখিয়া আমার সাহায্যার্থ অর্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। আর এক জন আমার পূর্ব্ব সুহৃদ বরদা চরণ মিত্র মহাশয়। আমি বিছানায় পড়িয়াছিলাম, অতি কষ্টে কখনও কখনও একটু হাঁটিয়া প্রতিবাসী অনাথবন্ধু কবিরাজ মহাশয়ের বাড়ীতে যাইয়া বসিয়া সেতার বাজাইতাম, কখনও বা দিগম্বর সান্ন্যাল মহাশয়ের এবং অম্বিকাচরণ মজুমদার মহাশয়ের বাড়ীতে যাইয়া গল্প করিতাম। ইহাঁদের বাড়ী আমাদের বাসা হইতে ২।১ মিনিটের পথ দূরে ছিল। বরদা চরণ মিত্র ছিলেন তখন ফরিদপুরের বাবা জজ, তিনি প্রায়ই আমাকে দেখিতে সেই পর্ণ কুটিরে আসিয়া প্রায় ২।৩ ঘণ্টা কাটাইয়া যাইতেন। এতাদৃশ ব্যক্তি আমাকে দেখিতে আসাতে সহরে আমার নাম এরূপ প্রচার হইয়া গেল যে বহু সম্ভ্রান্ত উকিল, ডিপুটী, জমিদার আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন। বরদা মিত্র মহাশয় দে সাহেবের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া সাহিত্যিক পেন্সনের জন্য গভর্ণমেণ্টে আরজি করিবার জন্য আমাকে উপদেশ দিলেন। তখন গ্রিয়ারসন সাহেব ভাষাতত্ত্ব

অনুসন্ধান করিবার জন্য গভর্ণমেণ্ট হইতে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তিনি শিমলায় থাকিতেন। তিনি 'বঙ্গভাষা সাহিত্য' পড়িয়া আমার প্রতি বিশেষ অনুরাগী হইয়াছিলেন; তিনি লিখিলেন—"আপনি যদি বৃত্তির জন্য আবেদন করেন, তবে আমি সমর্থন করিব।" এই চিঠি দেখিয়া শ্রীযুক্ত কিরণ চন্দ্র দে এবং মিত্র মহোদয় খুব জোর পাইলেন, এবং আমার আবেদন পত্রের উপর অনুকূল মন্তব্য লিখিয়া উপরে পাঠাইয়া দিলেন। তার পর কমিসনর স্যাভেজ, সাহেব ফরিদপুর পরিদর্শন করিতে আসিলে আমি উঁহাদের উপদেশ মত পাল্কীতে চড়িয়া তাহার সঙ্গে দেখা করিলাম, দেখিলাম তিনি নাম (savage) দিয়া ভীতি উৎপাদন করিলেও অতি মৃদু ও দয়ালু স্বভাব। আমার অবস্থা জানিয়া দুঃখ প্রকাশ করিলেন এবং আবেদন পত্র সমর্থন করিতে সম্মত হইলেন। এই ভাবে সরকার হইতে আমার ২৫৲ টাকা বৃত্তি মঞ্জুর হইয়া আসিল ১৮৯৯ সনে। মঞ্জুরী হইবার সংবাদটি হরপ্রসাদ শাস্ত্রী আমাকে জানাইয়াছিলেন। সাহিত্যিক বৃত্তি বঙ্গদেশে এই প্রথম। তার পর কবিবর হেমচন্দ্র পাইয়াছিলেন, তাহাও সেই ২৫৲ টাকা।

মিত্র মহাশয়কে আমি বলিলাম "আমার কন্যা মাখন ১২।১৩ বৎসর বয়স্কা হইল, ইহার বিবাহের উপায় কি?" তখনও বিবাহের বাজারে বরের দর এতটা চড়িয়া উঠে নাই। আমরা কুলীন, অকুলীনদের আমাদের উপর তখনও একটা নেশা ছিল, সুতরাং পৈত্রিক রক্তের গুণে তখনও একটু নীচে নামিলে বিশেষ অর্থের প্রয়োজন হইত না। যাহা হউক কন্যা বিবাহ তখনও একটা ব্যাপারে দাঁড়াইয়াছিল। মিত্র মহাশয় তাঁহার কোর্টের উকিল দিগকে ডাকাইয়া বলিলেন "দীনেশবাবু City of Glasgow, লাইফ এ্যাসিয়রেন্স কোম্পানির এজেণ্ট, আপনারা প্রত্যেকে একটা বীমা করুন।" তিনি নিজে বার হাজার টাকার বীমা

করিলেন, এবং তাঁহার অনুরোধে অনেক উকিল, ডিপুটি ও মুন্সেফ বীমা করিলেন। আমার ইহাঁদিগকে লইয়া ডাক্তার সাহেবের ওখানে অনেক সময় যাইতে হয় নাই, মিত্র মহাশয় ডাক্তার সাহেবকে দিয়া আমার কাজ যতটা লঘু হওয়ার সম্ভব তাহা করাইয়া দিয়াছিলেন। আমি দুইমাসের মধ্যে এই বীমার কাজে এগার শত টাকা পাইয়াছিলাম। কন্যা-বিবাহ ফরিদপুর বল্লভদি গ্রামে ঠিক হইয়া গেল। বর কুলদাকুমার সেনরায় মাইনর পরীক্ষায় ঢাকা ডিভিসনে প্রথম হইয়া পাঁচ টাকা বৃত্তি পাইয়াছিলেন এবং ম্যাট্রিকুলেসন পরীক্ষায় মাদারীপুর স্কুল হইতে দশটাক বৃত্তি লাভ করিয়া কলিকাতায় এল, এ পড়িতেছিলেন। ইহাদের বাড়ীর অবস্থাও মোটামুটি মন্দ ছিল না। আমাকে অনেকটা নীচে নামিয়া এই সম্বন্ধ করিতে হইয়াছিল। বিবাহের ঘটক ছিলেন বল্লভদি গ্রামের রাজেন্দ্র গুপ্ত। ইনি এখন মুন্সেফী করিতেছেন। বিবাহে ঠিক এগার শত টাকাই ব্যয় হইল।

এই সময়ে রমণী মোহন ঘোষ নামক এক তরুণ বয়স্ক উকিল, আমার নিকটে সর্ব্বদা আসিতেন। তিনি খুব ভাল কবিতা লিখিতে পারিতেন, রবি বাবুর প্রায় সমস্ত কবিতা তার মুখস্থ ছিল; তাঁহার নিজের ভাষায় ও রবি-বীণার একটা ঝংকার মাঝে মাঝে বাজিয়া উঠিত, কিন্তু নিভৃত পল্লীর সিউলী ফুলের গন্ধ, কেঁয়ার সুবাস, ও পল্লী বালিকাদের স্নেহার্দ্র হৃদয়ের পবিত্রতা লইয়া যখন রমণী কবিতা লিখিতেন, তখন তাহার নিজস্ব একটা রাগিণী ফুটিয়া উঠিত,—সেটা আমার কাছে এত মনোহর লাগিত, যে মনে হইতে যেন সমস্ত পল্লী-প্রাণের রস দিয়া তাহা কোমল-স্নিগ্ধ করা হইয়াছে। রমণীর চেহারাটা কতকটা নামের উপযোগী, গোঁপ না থাকিলে তাঁহাকে মেয়েলোক বলিয়া ভুল হইতে পারিত. এবং স্বরটিও ছিল মেয়েলী ধরণের, ইদৃশ ব্যক্তি যে ওকালতিতে পশার জমাইতে পারি-

বেন না, তাহা বুঝিতে কাহারও বিলম্ব হওয়ার কথা নহে। অথচ রমণী এরূপ দ্রুত ইংরেজী ও বাঙ্গালা লিখিতে পারিতেন, যে তাঁহার অসামান্য মনস্বীতা কাহারও অগোচর ছিল না। আমি নিজ হাতে লিখিতে পারিতাম না, বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের দ্বিতীয় সংস্করণটি প্রবৃদ্ধ আকারে বাহির করিব, এই ছিল আমার লক্ষ্য। উপেন্দ্র নামক এক যুবক এবং রমণীকে দিয়া আমি যে কত লেখা লিখাইয়াছি, তাঁহাদের নিকট আমার ঋণ একরূপ অপরিশোধনীয়। আমি প্রায়ই মিত্রমহাশয়কে রমণীর কথা বলিতাম, তিনি রমণীর কবিতা পড়িয়া যেরূপ সুখী হইতেন, তাঁহার ওকালতির বিড়ম্বনা শুনিয়া তেমনই দুঃখিত হইতেন। তিনি রমণীকে একটা কমিশন দেন, তাহাতে সে ৬০০ শত টাকা উপার্জ্জন করে। রমণী মোহন ঘোষ এখন সাহিত্যিক জগতে সুপরিচিত কবি এবং বোম্বের পোষ্ট মাষ্টার জেনারল। এত বড় পদ পাইয়াও রমণী যেমন তেমনই আছেন। সেই মেয়েলী ঢঙ্গের মধুর কল-হাসি, মৃদু-কথা, বন্ধুবর্গের সহিত প্রাণ-জড়ানো ভাবে মেলা-মিশা।

কুমিল্লার প্রসিদ্ধ উকীল দিগম্বর সান্ন্যাল সম্বন্ধে আমি 'প্রদীপে' দীর্ঘ জীবনী লিখিয়াছিলাম, তাহা আমার 'সুকথা' নামক পুস্তকে পুনর্বার মুদ্রিত হইয়াছে। কোন জেলা কোর্টের উকীল তাঁহার মত ৩।৪ হাজার টাকা মাস উপার্জ্জন করিয়াছেন বলিয়া আমি জানি না। তিনি ছিলেন উকিল শিরোমণি—সাধু-শিরোমণি, বিনয়ের খনি, শুচিতার আদর্শ। জঙ্গল ও কাঁটা বনে ত পৃথিবী আচ্ছন্ন, ইহার মধ্যে যেমন একটা বনমল্লিকা বা যুথিকা ফুটিয়া প্রমাণ করে,—পৃথিবীর সবই কাঁটা নহে,—এখানেও শোভা সুগন্ধ আছে—আদালতের নানাছল, অভিসন্ধি ও কুটিলতার ভিতর তেমনই কেমন করিয়া দিগম্বর বাবু উদিত হইয়া প্রমাণ করিয়াছিলেন—এখানে সকলই ছল চাতুরী নহে, এ জায়গায়ও ভগবান

একবারে ভুলিয়া যান নাই। দিগম্বর বাবুর চেহারা অনেকটা স্যার গুরুদাসের মত ছিল, তিনি নিজেও একথা বলিয়াছেন, যে বহুলোকে তাঁহাদের এই সাদৃশ্যের কথা উল্লেখ করিতেন। দিগম্বর বাবু আমাকে ছেলের মত ভালবাসিতেন,—নিজে কাছে বসিয়া আমাকে খাওয়াইতেন, তাঁহারও হঠাৎ মৃত্যু আমাকে অভিভূত করিয় ছিল। এই ক্ষুদ্রাকৃতি, অতি নম্রপ্রকৃতি, বিনয়ী অথচ তেজস্বী উকিল যখন কুমিল্লা আদালতের একচ্ছত্র সম্রাট ছিলেন,তখন দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছিলেন কংগ্রেশ-বিশ্রুত দেশমান্য অম্বিকা মজুমদার—শাল প্রাংশু মহাভুজ দীর্ঘাকৃতি—এই মহাশয়ের অদ্বৈতাচার্য্যের মতই "পক্ক কেশ পক্ক দাড়ি বড় মোহিনীয়। দাড়ি পড়িয়াছে, তাঁর হৃদয় ছাড়িয়া।"

অম্বিকা বাবুর ধর্মমত, প্রায় নাস্তিক বাদের কাছা-কাছি, মিলের মতন তিনি নীতি শাস্ত্রটাকেই চরম মনে করিতেন, আমার সঙ্গে তাঁহার এই লইয়া তর্ক-যুদ্ধ চলিত। তিনি বক্তৃতার রাজা, রাজনৈতিক আন্দোলনের পাণ্ডা, দেশ-উদ্বোধন-মন্দিরের অন্যতম প্রবীন পুরোহিত। কিন্তু রাজনীতি আমাকে কখনও আকর্ষণ করে নাই, বিশেষ আমি একরূপ শয্যাশায়ী হইয়া দিন কাটাইতাম, সুতরাং তাহার ইংরেজী বক্তৃতা শোনা আমার ভাগ্যে ঘটে নাই, কিন্তু মিত্র মহাশয় কিংবা দে সাহেব (ঠিক মনে পড়িল না) যখন ফরিদপুর ছাড়িয়া যান, তখন সেই বিদায়-সভায় আমি বহু কষ্টে উপস্থিত হইয়াছিলাম, অম্বিকা বাবু সেদিন মাত্র দুএক মিনিট বাঙ্গলা-ভাষায় বক্তৃতা করিয়াছিলেন সেই দুই এক মিনিটেই তিনি শ্রোতৃবর্গের মন হরণ করিয়া লইয়াছিলেন, অন্ততঃ আমার। তিনি একটি ফুলের মালা লইয়া বিদ্যারোমুখ মহোদয়কে পরাইয়া দেওয়ার সময় বলিয়াছিলেন, "আমরা আপনাকে আর কি দিব? কিন্তু এই যাহা দিতেছি, ইহার মত উৎকৃষ্ট পৃথিবীতে কিছু নাই, এই ফুলের মালাই সর্ব্বোতোভাবে আপনার যোগ্য।"

ফরিদপুরের আইন-আকাশের অপরাপর জ্যোতিষ্কগণের মধ্যে আমার তাৎকালিক বন্ধু পূর্ণ মৈত্রেয় ও মথুর মৈত্রের উল্লেখযোগ্য, ইঁহারা এখন সেখানকার বড় উকিল। ঢাকায় নবরায়ের বাড়ীতে থাকিয়া বহুদিন যাঁহার সঙ্গে কাটাইয়াছিলাম, সেই কৈলাসচন্দ্র দাস তখন কথঞ্চিৎ জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছিলেন, এখন তাঁহার প্রতিভা ফুটিয়া উঠিয়াছে, তিনি উকীল-সরকার। সতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় ফরিদপুর-বার ছাড়িয়া দিয়া হাইকোর্টে আসিয়াছেন, তিনি তখন বাঙ্গলায় অনেক প্রবন্ধ লিখিতেন, সুতরাং ওকালতি জমাইতে পারেন নাই। এখানে তিনি কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটের উপর শ্যামবাজার ট্রামের আড্ডার নিকট বাড় করিয়াছেন। একদিন দেখিলাম, তিনি একটি ফুটফুটে ছোট্ট মেয়ে লইয়া ট্রামে যাইতেছেন, আমি সেই ট্রামের আরোহী ছিলাম। মেয়েটির মুখে চোখে লাবণ্য ঢল ঢল, তাহার বয়স ৭।৮, আমি বলিলাম "এটি বুঝি মেয়ে ?" সতীশ বাবু হাসিয়া গোপনে বলিলেন, "এ মেয়েটির বাপ মা কেউ নাই, আমার সঙ্গে এর কোন সম্বন্ধ নাই, তবে ইঁহার বাপ-মা মরিবার সময় ইহাকে লালন-পালনের ভার আমাকে দিয়া গিয়াছেন,— মেয়েট জানে আমি ইহার পিতা, আগাছাটি এরূপ ভাবে জুড়িয়া গেছে, যে আমাদের সংসারের পক্ষে একে এড়ানো আর সম্ভবপর হইবে না।" দেখিলাম মেয়েটি সহসা সতীশ বাবুর গলা জড়াইয়া ধরিয়া হীরেন্দ্র বাবুদের বাড়ীর পুতুল গুলি দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিল "বাবা এটা কাদের বাড়ী," আমি দেখিলাম মেয়েই হইয়া গেছে বটে। ইহার পাঁচ সাত বৎসরের পরে দেখিলাম, সতীশ বাবুর বাড়ীতেই মেয়েটি অন্দরে বাহিরে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। মাথায় ঘোমটা নাই, কপালের সিন্দুর বিন্দু স্পর্শ করিয়া শাড়ীর একটা পাড় রহিয়াছে। সতীশ বাবুকে বলিলাম, ইহার বিবাহ কোথায় দিয়াছেন ?" তিনি হাসিয়া বলিলেন— "আমার জ্যেষ্ঠ পুত্রের সঙ্গে।"

ভাদ্রমাসে আমার পীড়া বড়ই বাড়িয়া গেল। আবার বিছানায় পড়িয়া রহিলাম; এই সময়ে একটা সাপ আমার শোবার ঘরের দাওয়ার কাছে কিলবিল করিয়া বৃষ্টিতে চলিয়া গেল, কেন জানি না। আমার মন সাপের ভয়ে অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়িল। তার পরদিন খড়ো ঘরের চালে আর একটা সাপ দেখিলাম, সেটা আমার বিছানার দিকে চাহিয়া ভয় দেখাইতে লাগিল। এই ভয় আমাকে এতদূর পাইয়া বসিল যে আমি সর্ব্বত্র সাপ দেখিতে লাগিলাম, বাহিরে ত এই দুটি মাত্র সাপ দেখিয়াছিলাম, কিন্তু মনের ভিতরে অসংখ্য সাপ আনাগোনা করিতে লাগিল। মশারির দড়িটা সাপ হইয়া দুলিতে লাগিল, চটিপায়ে দিতে মনে হইল যেন উহার মধ্যে পা ঢুকাইলেই পা যাইয়া সাপে ঠেকিবে, পায়ে ঠাণ্ডা জল লাগিলে মনে হইতে লাগিল, সাপে পাখানি জড়াইয়া ধরিয়াছে। সেই দিন দৈব ক্রমে আর দুইটি ঘটনা ঘটিল, যাহাতে আমার সর্প-ভীতি দ্বিগুণ বাড়াইয়া দিল। দুপ্রহরে একটি ভদ্রলোক আসিয়া আমার কাছে অনেক সাপের কেচ্ছা বর্ণনা করিয়া গেলেন, আমি যে সাপের ভয়ে ভীত তাহা কাহাকেও বলি নাই। তাঁর প্রত্যেক কথায় আমার যে ভয় হইতেছিল—তাহা আমার বুঝাইবার শক্তি নাই। আমার মনে হইল যেন তাঁহার বর্ণিত প্রত্যেকটি সাপ ফনা দোলাইয়া আমার পায়ের কাছে বসিয়া আছে এবং আমার আত্মাপুরুষ তাহাদের ভয়ে কম্পিত হইতেছে। তিনি চলিয়া গেলে বেদেরা "সাপের খেলা "দেখবে গো" চীৎকার করিয়া ঝালি মাথায় আমাদের বাড়ীর কাছ দিয়া চলিয়া গেল। কিরণ আসিয়া আমাকে ধরিল "বাবা, সাপের খেলা দেখবো" আমি তাকে এমন ধমক্ দিয়াছিলাম যে সে ভয়ে আতকে উঠেছিল। আমার স্ত্রী বলিলেন "ওরা শিশু, সাপের খেলা দেখতে চেয়েছে, কি অন্যায়টা করেছে? তাতে তুমি এমন চীৎকার কচ্ছ, যেন

কি একটা ভয়ানক কাণ্ড করেছে।" আমি লজ্জিত হইলাম, কিন্তু আমার অন্তর্য্যামী জানেন, চীৎকার আমি করি নাই, আমাকে ভয়ের যে দেবতা পাইয়া বসিয়াছিল, এ তারই চীৎকার।

কয়েক রাত্রি চোখ বুজিতে পারি নাই, যতবার চোখ বুজিতে চেষ্টা করিয়াছি, মনে হইয়াছে পায়ের কাছে সাপ কুণ্ডলী পাকাইয়া আছে, চোখ বুজিলেই কামড়াইবে। উপেন্দ্রবাবু আসিয়া 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে'র দ্বিতীয় সংস্করণের জন্য কাপি লিখিতে লাগিলেন, একটা লাল কালীর দোত থেকে কালী তুলিতেছিলেন, আমার মনে হইল সেগুলি সাপের রক্ত। শুধু মনে হওয়া নয়, এক একটি অক্ষর লাল কালীতে লিখিতেছিলেন আর আমার পঞ্চপ্রাণ ভয়ে কাঁপিতেছিল। এর পর লোকের চোখের কোণে একটু রক্তিমা থাকিলে ভয় হইত, মনে হইত যেন উহা সর্প-চক্ষু।

আমি যে কি উৎকট যন্ত্রনায় ছিলাম তা বলিতে পারি না, এদিকে হাঁটিবার শক্তি একবারে লোপ পাইল। এই সাপের ভয়ের কথা কাউকে বলিলাম না—তা হ'লেই তো সকলে হাতে তালি দিয়া বলিবে "ক্ষেপিয়া গেছে।" জপ করিতে চেষ্টা পাইতাম, কিন্তু হরিনাম ছাপাইয়া গোখরার চোখ দুটি আমার মন অধিকার করিয়া বসিত। মুখে হরিনাম আসিত না!

এই উৎকট যন্ত্রণা প্রায় ১৫ দিন ছিল; শেষে তাহা এরূপ অসহ্য হইয়াছিল যে আমি প্রাণপণে ভগবানকে ডাকিয়া বলিতাম "আমি চিন্তার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে পারিতেছি না—তুমি আমাকে মারিয়া ফেল—এরূপ মৃত্যু যন্ত্রণা দিও না"। একদিন সন্ধ্যার পর ভাত খাইয়া শুইয়া পড়িলাম। পা ধুইয়া ছিলাম, মনে হইল যেন একটা বরফের মত ঠাণ্ডা, কালীর মত কালো সাপ আমার পা-দুটি জড়াইয়া আছে, বুকের ভিতর অসহ্য কষ্ট হইতেছে। "আমার কে কোথায়

আছ—আমাকে রক্ষা কর” বলিয়া কাঁদিতে লাগিলাম। ধীরে ধীরে চোখ দুটি বুজিয়া আসিল, নিঃস্বসহায়ের—নিরালম্বের—একান্ত বিপন্নের নির্ভরের অশ্রু চোখের কোলে গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। আমার একটু তন্দ্রা আসিল, তখন কে যেন আমাকে ডাকিল, সে স্বর আমার এখনও মনে আছে,—তাহা কঠোর হইয়া ও কোমল, ক্রুদ্ধ হইয়া ও স্নেহার্দ্র, বাহিরের হইয়া একান্ত আপনার জনের মত। স্পষ্ট শুনিলাম “তুই মনসাদেবীকে গালাগালি করেছিস্; জানিস না যারা কুঁড়ে ঘরে থেকে সাপের ভয়ে অস্থির হয়, তারা ভয়ে ‘মা’মা’ বলে আর্ত্তস্বরে ডাকিয়া মনসা দেবীর শরণ নেয়, যে পাদ পীঠ শত শত ভক্তের অশ্রুতে সিক্ত, শত শত লোক যে মঙ্গল-ঘটে অর্ঘ্য দিয়া শান্তি পায়, তুই স্পর্দ্ধা ও হঠকারিতার সহিত তাহাকে ব্যঙ্গ করেছিস্, লোকের প্রাণ যেখানে আর্ত্ত হইয়া, অসহ্য কষ্ট পাইয়া, ফুল বিল্বদল লইয়া একান্ত নির্ভরশীল হইয়া তীর্থযাত্রী হয়, তখনকার তাদের শুচিতা, ভক্তি ও বিশ্বাস তুই দেখ্‌লি না,—সেইখানে বুট জুতা পায়ে হটকারিতার সহ পূজার ফুল মাড়াইয়া এলি।” ঠিক এই কথা গুলি না হতে পারে, কিন্তু এ ভাবের কথা। সেই তীব্র ভৎসনার সুরেও মনে ভক্তি হইল। জাগিয়া দেখিলাম কেউ নাই, কেবল আমার চোখ দিয়া জল পড়িতেছে ও মুখে অলক্ষিত ভাবে ‘মা ‘মা’ ডাক উচ্চারিত হইতেছে, এবং আমার মুক্ত জানেলার পথে সদ্যপ্রস্ফুট সিউলী ফুলের ঘ্রাণে দিক আমোদিত করিতেছে, মনে হইল, যিনি আসিয়াছিলেন, উহা তাঁহারই অঙ্গ-গন্ধ।

জাগিয়া অশ্রু কম্পিত কণ্ঠে আমার মেয়ে মাখনকে বলিলাম, একটা মোম বাতি জ্বালিতে, ও আমার বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বইখানি দিতে। তখন যেখানে যেখানে মনসা দেবীর নিন্দা করিয়াছিলাম, অপরাপর ঠাকুর দেবতার নিন্দা করিয়াছিলাম, তাহা সমস্ত কাটিয়া ফেলিলাম। দেখিলাম

মনসাদেবীকে লইয়া আমি কত বিদ্রূপই না করিয়াছিলাম! "তাঁহার মত দুষ্ট মেয়ে দেবলোকে নাই" "কাণার গীত এক কাণী প্রথম রচনা করেন" ইত্যাদি প্রকারের ব্যঙ্গোক্তিই করিয়াছিলাম। চোখের জল মুছিতে মুছিতে সে গুলি কাটিয়া ফেলিলাম। আমার মাস্তিষ্কের বিকৃতি-জাত সেই সর্পজগৎ হঠাৎ কোথায় চলিয়া গেল, তার পর দিনও একটু ভয় ছিল, কিন্তু তৃতীয় দিনে আমি সম্পূর্ণ নির্ভয় হইলাম। সেই দিনে একটি টাকা মনসা দেবীর মানৎ করিয়া তুলিয়া রাখিয়াছিলাম। এই ঘটনাটির পূর্ণ বিবরণ আমি 'উপাসনা' পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছিলাম। কিন্তু সেই সংখ্যা উপাসনা কিছুতেই সংগ্রহ করিতে পারিলাম না। যদি পাইতাম, তবে এইখানে সেটি উদ্ধৃত করিয়া দিতাম—নূতন করিয়া লিখিতাম না। এই ঘটনার কয়েক মাস পরে আমি কলিকাতায় এক ছোট বাসায় ছাদের উপর শুইয়াছিলাম, আমার স্ত্রী আমার পাশেই শুইয়াছিলেন। রাত্রি প্রায় দেড় টার সময় একটা ভয়ানক শীতল স্পর্শ অনুভব করিয়া আমি জাগিয়া উঠিলাম,তখন জ্যোৎস্না ছাদের উপর আলো ছড়াইয়া দিয়াছে—দেখিলাম, একটা কৃষ্ণ সর্প আমার গা ঘেঁষিয়া ঘনিষ্টতা করিতে চেষ্টা পাইতেছে, আমার স্ত্রীকে জাগাইলাম। তিনি চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন, ভাবিলেন বুঝি সাপে আমাকে কামড়াইয়াছে, কিন্তু সাপ আমায় কমেড়ায় নাই। অথচ এ সময়ও আমার কোন ভয়ই হইল না, হাতে তালি দিয়া সাপ তাড়াইয়া দিলাম। যদি ঐ ঘটনাটি আমার সেই সময়ে হইত, তা হলে বোধ হয় ভয়েই মরিয়া যাইতাম। ইহার দেড় বৎসর পরে আমি 'বেহুলা' বই লিখিয়াছিলাম, ৩।৪ বছরের মধ্যে তাহার ২০।২২ হাজার কপি কাটিয়া গিয়াছিল,। আমার মন এই পুস্তক লব্ধ অর্থ মনসাদেবীর দান বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিল, একথা বলিলে যাহারা আমাকে উপহাস করিবেন,—তাঁহাদের সঙ্গে আমার ঝগড়া নাই। আমার বন্ধু বৃদ্ধ

ঐতিহাসিক বেভারেজ সাহেব লিখিয়াছিলেন, মনসাদেবীর পূজা মানসিক দুর্ব্বলতা, হয়ত তাহাই। কিন্তু যাহা আমাকে বল দিয়াছিল, রোগের সময় উৎকট অমৃততুল্য ভেষজের কার্য্য করিয়াছিল, আমি কখনই তৎসম্বন্ধে অন্যের উপদেশ গ্রহণ করিব না। তিনি যে ভাবেই আসুন না কেন, তিনি পরম অনুকম্পা করিয়া আমাকে রক্ষা করিতে আসিয়াছিলেন, তাহা আমি ভগবানের প্রকাশ বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছি।

এই ভাদ্র মাসেই আমি ভগবানের দত্ত আর একটি মহাপ্রসাদ পাইয়াছিলাম—তাহা বিনয়ের ন্যায় পুত্র লাভ। জীবনের সমস্ত সৌভাগ্যের মধ্যে যে সৌভাগ্য পূর্ণ শ্রীভূষিত হইয়া আমার জীবন অমৃতময় করিয়াছে—তাহা বিনয়রূপে প্রকাশ ভগবৎদয়া।

এ পর্য্যন্ত কবিরাজ বিজয়বাবু সপ্তাহে সপ্তাহে আমাকে তৈল ঔষধ পাঠাইয়া দিতেছিলেন। পীড়ার উপশম হউক আর না হউক, আমি তাহা ব্যবহার করিতেছিলাম। এই সময়ে শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ মজুমদার মহাশয়ের বাড়ীতে যোগীন্দ্র কবিরাজ মহাশয়ের সঙ্গে আমার আলাপ হয়। তিনি ফরিদপুর ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের মেম্বর এবং সেই সূত্রে ফরিদপুর যাতায়াত করিতেন। অল্প দিনের মধ্যেই বুঝিতে পারিলাম, ইনি বিদ্যা বুদ্ধি, খ্যাতি প্রভৃতি সর্ব্ব বিষয়ে মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ দ্বারকানাথ সেন মহাশয়ের যোগ্য পুত্র। আমাদের অল্প সময়ের সাক্ষাৎকারেই পরস্পরের প্রতি অনুরাগ হইল, সে অনুরাগের ফল জীবন-ব্যাপী বান্ধবতা ও ভ্রাতৃ-ভাব। ইহা কথার কথা নহে, বোধ হয় খুব কম ভ্রাতাই ভ্রাতার জন্য এত করে, যোগীন্দ্র কবিরাজ আমার জন্য যাহা করিয়াছেন, খুব কম বন্ধুই এরূপ অবিচ্ছিন্ন ভাবে বন্ধুর হিতে রত থাকেন। ফরিদপুর থাকার সময় ডিপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহ মহাশয়ের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়। তখন তিনি "উড়িষ্যার চিত্র" লিখিতেছিলেন। ডিপুটি শ্রেণীতে শ্রীযুক্ত

বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য এবং শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র নাথ সিংহ এই দুই জন তাঁহাদের ডিপুটি পদোচিত চির-বিশ্রুত শার্দ্দূলবিক্রমের নাম হাসাইয়াছেন। ইঁহারা নিতান্তই ভাল মানুষ। যতীন্দ্রবাবু অতি সাদাসিধে লোক, কিন্তু উড়িষ্যার চিত্র পড়িয়া বোঝা যায়,ইনি বিলক্ষণরূপ পরের টিকি নাড়া দিতে জানেন। ইনি গোঁড়া হিন্দু, অথচ ইহার ধ্রুবতারা পড়িয়া দেখা যায়, ইংরেজী উপন্যাসের নকলে ইনি বেশ বিলাতী প্রেম-সমুদ্রে ঢেউ তুলিতে জানেন। ইনি পূজা আহ্নিক লইয়া ব্যস্ত এবং হাঁচি ও টিকটিকির শব্দ ঋষিবাক্যের ন্যায় অমোঘ মনে করেন, অথচ এক খানি উপন্যাসে তিনি একটি চরিত্রকে পঞ্জিকার নিষিদ্ধ দিনে খাদ্যাখাদ্যের বিচার মানিয়া চলার দরুণ পরিহাস করিতে কসুর করেন নাই। যতীন্দ্র বাবুর বাহির দেখিয়া ভিতর বুঝিবার উপায় নাই, প্রত্যুত লেখায় ও ব্যবহারে সামঞ্জস্য থাকা সর্ব্বদাই একটা অপরিহার্য্য নিয়ম নহে। যতীন্দ্র বাবুর পরিহাস-রসিকতার শক্তি বেশ তীব্র, তাঁহার লেখার ভঙ্গীটি চমৎকার, কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা মনোরম তাঁহার নির্ম্মল প্রীতিপূর্ণ সঙ্গ। বিশ্বেশ্বর বাবু ও যতীন্দ্রবাবু সাহিত্যক গুণে আমাদিগকে যতটা মুগ্ধ করেন,তদপেক্ষা চরিত্র-গুণে বেশী প্রীতি আকর্ষণ করিয়া থাকেন। তাই বলিয়া বিশুবাবুর মৌলিক গবেষণা শক্তিটি কম নহে। তিনি ময়নামতীর গান লইয়া দস্তুর মত মল্লযুদ্ধ করিতেছেন। এ বিষয়ে যে তিনি জয়ী হইবেন, তাহাতে আমার কোন সন্দেহ নাই।

---

(১৯)

কলিকাতায়।

১৯০০ সনের কার্ত্তিক কি অগ্রহায়ণ মাসে আমি সপরিবারে কলিকাতায় ফিরিয়া আসি। নগেন্দ্র নাথ বসু মহাশয় শ্যাম-পুকুর ষ্ট্রীটে ১১৲ টাকা মাসিক ভাড়ায় আমার জন্য এক খানি বাড়ী ঠিক করেন, উহার উপরে ৮×১০ ফিট এই মাপের দুই খানি ঘর ছিল, তৎসংলগ্ন একটী ছাদ ছিল এবং নীচে একখানি রান্না ঘর ও এক খানি বাহিরের ঘর ছিল, তাহা পূর্ব্বোক্ত মাপের, নীচে বাড়ী-সংলগ্ন একটী সন্দেশের দোকান।

প্রথমবার কলিকাতায় যখন ছিলাম, তখন রোজ সন্ধ্যাবেলা নগেন-বাবু আমাকে দেখিতে আসিতেন, রোগের শয্যায় সান্ত্বনা দিতেন, অভাবে পড়িলে ভৃত্যাদি পাঠাইয়া সহায়তা করিতেন, এবারও তাই।

শ্যাম পুকুরের ঐ বাড়ীটায় আসা অবধি ছেলেরা সর্ব্বদা ব্যারামে ভুগিত। রোজ যোগীন্দ্র কবিরাজ মহাশয় দেখিতে আসিতেন। তাঁহার সঙ্গে যতই ঘনিষ্ঠতা বাড়িয়া চলিল, ততই তাঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হইতে লাগিলাম। এদিকে এম, এ, পাশ, মেডিকেল কলেজে চার বছর পড়িয়াছেন,—কবিরাজী শাস্ত্রে তাঁহার এতটা অধিকার যে কোন রোগের লক্ষণ বলিলে তিনি চরক, সুশ্রুত কি বাগভট হইতে সেই লক্ষণ অনুযায়ী শ্লোক বলিতে থাকেন। সমস্ত আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রটি যেন নখাগ্রে, কিন্তু ইহাতে আমি তাঁহার প্রতিভার প্রতি সশ্রদ্ধ হইয়াছি বটে, আকৃষ্ট হই নাই; কিন্তু

যখন তিনি সমস্ত শকুন্তলা, সমস্ত উত্তররামচরিত মুখস্থ বলিতেন, প্রাকৃত ভষায় কথোপকথন পর্য্যন্ত বাদ পড়িত না, স্বয়ং দেবী ভারতীর ন্যায় বিশুদ্ধ উচ্চারণ ও সুকণ্ঠের ঝংকার সহিত শ্লোক বলিয়া যাইতেন, তখন বিস্ময় অভিভূত, বুঝিতাম বেদ কি করিয়া শুধু স্মৃতি-শক্তির বলে বংশ-পরম্পরায় চলিয়া আসিতেছে, ইনি প্রাচীন স্মার্ত্ত-শিরোমণিদেরই বংশধর। কোন দিন "ইত্থং নিশম্য দেবানাং বচাংসি মধুসূদনঃ। চকার কোপং শম্ভুশ্চ ভ্রূকুটিকুটিলাননৌ॥" হইতে সমস্ত চণ্ডী আওড়াইয়া যাইতেন, কখন ও "অবিদিত গত যামা" প্রভৃতি উত্তরচরিত্রের শ্লোক পড়িয়া অশ্রু-কণ্ঠ হইতেন, কারণ ইহার কিছু পূর্ব্বে তাঁহার স্ত্রী-বিয়োগ হইয়াছিল। তিনি অনর্গল হিন্দী ও সংস্কৃতে বক্তৃতা করিতে পারেন, ইংরাজীতেও তাঁহার বাগ্মিতা প্রশংসনীয়। আমি তাঁহার গুণমুগ্ধ হইলাম। যে কোন কঠিন রোগ হইত, তিনি আমার ভয় দেখিলে হাসিয়া বলিতেন "কিং কুর্ব্বন্তি গ্রহাঃ সর্ব্বে যস্য কেন্দ্রে বৃহস্পতিঃ" আমার বড় মেয়ে একবার মরিবার মুখে পড়িয়া তাঁহার চিকিৎসায় বাঁচিয়া গেল। সেই বাড়ীতে আমার প্রত্যেক ছেলেই কোন না কোন উৎকট রোগে পড়িয়াছে, তিনি চিকিৎসা করিয়া সারাইয়াছেন এবং মাঝে মাঝে যেরূপ মেঘের পশ্চাতে এভারেষ্টের শৃঙ্গ দেখা যায়, তেমনি তাঁহাকে আগে পাঠাইয়া শৈল বিশাল-দেহ গাম্ভীর্য্যের প্রতিমূর্ত্তি মহামহোপাধ্যায় দ্বারকানাথ উদিত হইতেন। ইহাঁদের দুইজনকে দেখিলেই আমাদের বাড়ীর রোগগুলি যেন আপনা আপনি পলাইয়া যাইত।

যোগীন্দ্রবাবুর ঔষধে, বিশেষ তাঁহার প্রদত্ত ষট্‌পল ঘৃতে আমি অনেকটা উপশম বোধ করিলাম।

কিন্তু প্রায় ছয় সাত মাস পূর্ব্ব হইতে আমি নিজের চিকিৎসা নিজে করিতেছিলাম। আমি সংযমে দীক্ষিত হইতেছিলাম, শুধু ইন্দ্রিয়-সংযম

মহে, বাক্যে-ব্যবহারে ও চিন্তায়। আমি বুঝিলাম, যদি কুচিন্তা মুহূর্ত্তেও স্থান দেই, তাহার অবশ্যম্ভাবী ফলে আমার স্বাস্থ্য ও শান্তি নষ্ট হয়। সেই চিন্তা প্রবল হইয়া কার্য্যে পরিণত না হইতে পারে, কিন্তু তাহা আমার অনিষ্ট না করিয়া ছাড়ে না; সুতরাং কুচিন্তার পথে মনকে পাহাড়া দিতে শিখাইলাম। আরও দেখিলাম, বন্ধুগণের সঙ্গে কথায় বার্ত্তায় অনেক সময় গল্পের স্রোতে পড়িয়া কত কথা বলিয়া ফেলি, যাহাতে সৎ-অসৎ দুইরকমের জিনিষই থাকে, অনেক কথা বলি, যা না বলিলে ভাল ছিল, পর-কুৎসায় অলক্ষিতভাবে যোগ দেই, তখন বাক্যে সাবধান হইতে চেষ্টা করিতে লাগিলাম। ব্যবহারিক জীবনের প্রতিও লক্ষ্য পড়িল। এক কথায় পরের দোষ, পরের কথা লইয়া ব্যস্ত ছিলাম, শিশু যেরূপ প্রজাপতির ডানা ছিঁড়িয়া আমোদ বোধ করে, সেইরূপ পরের চরিত্র ও শিক্ষা-দীক্ষা লইয়া ক্রূঢ়ভাবে মন্তব্য প্রকাশ করিয়া আনন্দ পাইতাম, এখন নিজের দিকে চোখ পড়িল।

এই চেষ্টা শুধু নৈতিক সূত্র অবলম্বন করিয়া পুষ্ট হইতে পারে না। আমি নাম জপ করিতে লাগিলাম,প্রতি রাত্রে শুইবার সময় চিন্তা করিতাম কি কথা দিন ভরিয়া বলিয়াছি, তাহার কোনটি না বলিলে চলিত, কি কাজ করিয়াছি যাহা যোগ্য হয় নাই, কাহার মনে ব্যথা দিয়াছি, কাহার অপকার করিয়াছি, পরের উপকার করিবার কোন সুযোগ হারাইয়াছি। যেখানে ত্রুটি হইয়াছে, সেইখানে জোর হাত করিয়া নামের পেছনে পেছনে ছুটিয়াছি, এবং বলিয়াছি "আমার রক্ষা কর, কাল যেন এমনটি না হয়।"

সর্ব্বদা চণ্ডীদাস ও সংস্কৃত রামায়ণ পড়িতাম। ঋষ্যমূক পর্ব্বতের উপর বর্ষা ও শরতের খেলা, পম্পা তড়াগের অপূর্ব্ব দৃশ্যাবলী, রামের বীরমূর্ত্তি,—লঙ্কাকাণ্ডে নহে, কিন্তু যেখানে তিনি সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া

কৈকেয়ীকে বলিতেছেন, "বিদ্ধিমাং ঋষিভিস্তুল্যং বিমলম্ ধর্ম্মমাশ্রিতম্," এবং শোকক্লিষ্ট দশরথের পদপ্রান্তে দাঁড়াইয়া বারংবার সান্ত্বনা দিতেছেন "ময়া বিসৃষ্টা বসুধা ভরতায় প্রদীয়তাম্" এই পড়িয়া মনে হইত, আমিতো সেই দেশের মানুষ, যে দেশের লোক প্রাকৃতিক অফুরন্ত সৌন্দর্য্যের মধ্যে এইরূপ বিশাল মানব-আদর্শ আঁকিয়া গিয়াছেন!

চণ্ডীদাস লিখিয়াছেন "আমি ভাবিয়া দেখিলাম, শ্যামবঁধু বিনে গতি আর কেহ নয়।" আমার প্রাণ এই ছত্রের সাড়া দিয়া বলিত "শ্যামবঁধু বিনে গতি আর কেহ নয়।" কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন ছিল এই শিক্ষা "আমি শ্যাম অনুরাগে এ দেহ সঁপিনু তিল-তুলসী দিয়া।" তিল তুলসী দিয়া যে দান করা যায়—তাহা আর ফিরাইয়া পাওয়া যায় না। আমি কি তাঁহাকে এ দেহ তাঁর প্রীতির জন্য দিতে পারিব না? সে যে বড় শক্ত দান। আমি এমন কথা বলিব না যাহা তাঁর অপ্রীতিকর হইবে, এমন কাজ করিব না যাহা তার প্রিয় নহে, নিজের সুখের জন্য কিছু করিব না, তাঁর প্রীতির জন্য কাজ করিব। এ না হ'লে নির্ব্যূঢ় সত্ত্বে তাঁহাকে আর দেহ কি করিয়া দিতে পারিলাম? সুতরাং তিনি যদি এ দেহের প্রভু হন, স্বামী হইয়া যদি এই দেহ গ্রহণ করেন, তবে ইহার সুখ-দুঃখ ধ্বংস কিছুতেই আমাকে পাইবে না। এ শিক্ষা কি সম্পূর্ণ করিতে পারিব? শুধু সোপানে পা দিয়াছি মাত্র; ইহা কি কখন বলিতে পারিব—"আমি নিজ সুখ দুঃখ কিছু না জানি। তোমার কুশলে কুশল মানি।" নিজ সুখ-দুঃখ তাঁহার প্রীতিতে ডুবাইয়া কবে এত বড় কথা বলিবার অধিকার হইবে?

সংযম ও জপধারা প্রায় আড়াই বৎসর পরে আমি আবার কিছু কিছু করিয়া নিজ হাতে লিখিতে শক্তিলাভ করিলাম, পাঁচসাত মিনিট হাঁটিতে পারিলাম। যদিও ট্র্যামে উঠিলে—যানের ক্ষিপ্রগতিতে আমার পীড়া

ক্ষুধা পাইত, ঘণ্টায় ঘণ্টায় কিছু না খাইলে ফিট হইবার উপক্রম হইত, তথাপি ধীরে ধীরে যে একটু আরোগ্যের পথে আসিলাম, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

ইহার পূর্ব্বেই সন্তোষের জমিদার প্রমথনাথ রায় চৌধুরী মহাশয় 'পদ্মা' নামক কাব্য লিখিয়া—তরুণ বয়সে সরস্বতীর কুঞ্জে একটা জায়গা দখল করিয়া বসিয়াছিলেন। আমি মুখে বলিয়া পরের হাত লিখাইয়া এই কাব্যের সমালোচনা প্রকাশিত করিয়াছিলাম। সে প্রবন্ধ যত দূর মনে হয়, 'প্রদীপে' প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহার পূর্ব্বে বহুদিন আমার কোনো প্রবন্ধ আর কোনো কাগজে বাহির হয় নাই। বামাবোধিনী পত্রিকায় প্রমথবাবুর সম্বন্ধে আর একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম।

এবার কলিকাতায় আসিয়া দেখিলাম সমস্ত সাহিত্যিকগণ আমার ব্যথার ব্যথী। হীরেন্দ্রবাবু আমাকে প্রায়ই দেখিতে আসিতেন, তাঁহার সহিত যখনই দেখা হইয়াছে, তখনই কোন না কোন লাভ হইয়াছে—সে লাভ চূড়ান্ত লাভ—তাহা আধ্যাত্মিক জগতের। নাটোরের কোন সাহিত্যিক কনফারেন্সে তিনি গিয়াছিলেন, সেই ভূমিকম্পের সময়। পাকা বাড়ী কাঁপিতেছিল—সকলে সে বাড়ী ত্যাগ করিল, কিন্তু হীরেনবাবু "বৎবিধের্নসিস্থিতম্" বলিয়া নির্ভীকভাবে বসিয়া রহিলেন,—এই এক চিত্র। সেই ভূমিকম্পের সময় আমার মাতামহ গোকুলমুন্সী মহাশয় তাঁহার প্রকাণ্ড বাড়ীতে ছিলেন, দিনের মধ্যে রোজ ৪।৫ বার ভূমিকম্প হইত, তাঁহার নাটমন্দির ও নহবৎখানা ভাঙ্গিয়া পড়িল—তাঁহার ঘরের জানেলা দরজা ঘন ঘন কাঁপিয়া উঠিত,—বাড়ীর চাকর, দারোয়ান, পাহারা, বরকন্দাজ, নায়েব এবং সন্ততিবর্গ সকলে পালাইয়া গেল। কিন্তু তিনি তাঁহার দ্বিতল গৃহের বিশাল হল-ঘরে একা নির্ভীকচিত্তে বসিয়া রহিলেন। তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী জমিদার রামকৃষ্ণমুন্সীর বাড়ী যে অঞ্চলে—

সেখানে ভূমিকম্প হয় নাই—সুতরাং তিনি গৃহ ছাড়েন নাই। "রামকৃষ্ণ বলিবে গোকুল ভয়ে বাড়ী ছাড়িয়া গেল, এই অপমানের থেকে মৃত্যু ভাল।" নবতিবৎসর বয়স্ক বৃদ্ধের এই বীরত্ব রাজসিক বীরত্ব, কিন্তু হীরেনবাবুর এই সাত্ত্বিক বীরত্বের তুলনা কোথায়? একটি চিত্র স্বপ্রতিষ্ঠার আর একটিতে ভগবানের প্রতি পূর্ণ নির্ভর। কলিকাতায় যখন প্লেগ লাগিল, তাঁহার বাড়ীর চাকরবাকরদের মধ্যে সেই রোগ দেখা দিল—তখন ও হীরেনবাবুর সেই একই প্রশান্ত ভাব—সেই "যৎবিধেমনসিস্থিতম্" আমি যতবার ভয় পাইয়া বিচলিত হইয়া তাঁহার নিকট যাইতাম, ততবার দেখিতাম, নির্লিপ্ত পুরুষের ন্যায় তিনি বসিয়া আছেন, তাহার শৈল মহান গাম্ভীর্য্য ও অবিঘ্নিত শান্তির ছবি দেখিলে আমার ভিতরকার ঝড় থামিয়া যাইত,—রুদ্রবেশে প্রভঞ্জন হিমালয়ের গায় ঠেকিয়া যেরূপ ব্যর্থ হইয়া যায়—সেইরূপ তাঁহার বাড়ীর বিপদ আপদ সমস্ত তাঁহাকে একটুও বিচলিত করিতে পারিত না। এই বিকল্পবিহীনতা তাঁহার মহা দান। যখনই তাঁর সঙ্গে দেখা হইয়াছে এই মহাদানের কণিকা তাঁহার নিকট হইতে লইয়া আসিয়াছি। যখনই ভয়ের কথা বলিয়া তাঁহাকে বিচলিত করিয়া তুলিব, মনে ভাবিয়া গিয়াছি, তখনই তাহাকে ধীর, স্থির, শান্ত, সমাহিত ও আত্মস্থ দেখিয়াছি, উপনিষদের শ্লোক আবৃত্তি করিতে শুনিয়াছি, মিষ্টে ভরপুর পাইয়াছি—অপর রাজ্যের আলোকমণ্ডিত দেখিয়াছি। সভা-সমিতিতে তিনি যে পক্ষ অবলম্বন করিয়াছেন, সে পক্ষের জয়ে অবশ্যম্ভাবী। প্রতিপক্ষের মস্তক তাঁহার নিকট নত হইয়াছে, তাহার বিজয়শ্রীযুক্ত উপসংহারের পর আর কেহ উঠিতে সাহস করে নাই—অথচ তিনি যাঁহাদের বিরুদ্ধে কথা বলিয়াছেন,তাঁহারা ও তাহাকে শ্রদ্ধা করিয়াছে; তাঁহার ভাষায় গ্রাম্যতা; অন্যায় আক্রমণ ও শ্লেষ কিছুই থাকিত না। শরৎশাস্ত্রীর সঙ্গে বাঙ্গলাভাষা লইয়া সাহিত্য-পরিষদে

তাঁহার অনেক বিতর্ক হইয়াছে। তাঁহাকে তিনি প্রকারান্তরে মূর্খ, অজ্ঞ সকলই বলিয়াছেন কিন্তু তাঁহার ভাষার বাহাদুরী এই যে তিনি তীক্ষ্ণ বাণগুলি যেন সরভাজার মোড়কে আবৃত করিয়া ব্যবহার করেন—কাহারও তাহাতে মনে কষ্ট হয় না, অভিমান আহত হয় না। শরৎশাস্ত্রীর সংস্কৃতের জ্ঞানের মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করিয়া একদা তিনি বলিলেন" কিন্তু শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত মহাশয় য়ুরোপীয় ভাষাতত্ত্ব পড়েন নাই, এখনকার পণ্ডিতেরা যে সকল সূত্র আবিষ্কার করিয়াছেন, বহু ভাষার যে তুলনামূলক মানদণ্ড স্থির করিয়াছেন, শাস্ত্রীমহাশয়ের তাহা জানা নাই, এইখানে শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত মহাশয়ের সঙ্গে আমাদের বিরোধ মিটিবার নহে।" এইভাবের কথাগুলি প্রীতির রসান দিয়া এমনই মিষ্টভাবে তিনি বলিয়া গেলেন যে শরৎশাস্ত্রী নিজেও প্রীত হইলেন। মনু যে বলিয়াছেন সত্য বলিতে হইবে ও প্রিয় কথাও বলিতে হইবে, তাহা হীরেন্দ্রবাবু যে ভাবে পারিয়াছেন, তাহার দৃষ্টান্ত বিরল। ইহার একমাত্র গোপনীয় সূত্র এই যে হীরেনবাবুর চিত্ত ভগবানে স্থিত, তাহার কোন স্থানে বিদ্বেষ নাই।

এই সময়ে নগাধিরাজের ডিক্সনারি অভিধানের মত সুরেশ-সমাজপতি মহাশয় আমাদের বাড়ীতে প্রায়ই আসিতেন, এবং আমার পীড়ার অবস্থা ও আর্থিক অভাব দেখিয়া চিরবন্ধুত্বের প্রতিশ্রুতি দিয়া আপ্যায়িত করিয়া যাইতেন। কিন্তু যখন আমি একটু একটু করিয়া ভাল হইতে লাগিলাম ও মূল্য লইয়া বিবিধ পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখিতে লাগিলাম, তখন তিনি ততটা সহৃদয়তা রক্ষা করিতে পারিলেন না। বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের জন্ত রামেন্দ্রবাবু ও সুরেশ সমাজপতি ভারতমিহির মুদ্রাযন্ত্রের সত্বাধিকারী কালীনারায়ণ সান্যাল মহাশয়কে ঠিক করিয়া দিয়াছিলেন, এই ঋণ আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছি। কিন্তু যতই সাংসারিক ব্যয় নির্ব্বাহকল্পে আমি প্রাণান্ত পরিশ্রম করিয়া অপরাপর পত্রিকার প্রবন্ধ

লিখিতে লাগিলাম, ততই সাহিত্য-পত্রিকায় শবের ন্যায় আমার প্রবন্ধাদির ব্যবচ্ছেদ চলিতে লাগিল। আমি অসমর্থ, ব্যাধিপীড়িত, নাতিক্ষুদ্র একটী পরিবারের ভারে ব্যতিব্যস্ত, আমি কেমন করিয়া বিনামূল্যে সাহিত্যে প্রবন্ধ লিখিব? কুমিল্লা থাকিতে আমি সাহিত্যে লিখিতাম, তাহার অর্থ এইরূপ শুনিয়াছিলাম, যে সাহিত্যপত্রে আমার প্রবন্ধগুলি মুদ্রিত করিয়া সম্পাদক আমার মত অকৃতীকে সাহিত্য জগতে প্রচারিত করিয়া দিয়াছেন এবং সেই কৃতজ্ঞতায় উক্ত পত্রিকায় চিরকাল আমি বিনা পারিশ্রমিকে লিখিতে বাধ্য। আমি উক্ত পত্রিকায় প্রায় প্রতিমাসে প্রকাশিত দারুণ শ্লেষ সহ্য করিয়াও তাহাতে দুইএকটি প্রবন্ধ না লিখিয়াছি এমন নহে। কিন্তু বেশী লিখিতে পারি নাই। যাহাহউক আমি যত কষ্ট পাইয়াছি, তাহা আমি আর মনে স্থান দিব না, এখন সুরেশবাবু স্বর্গগত। তিনি স্বর্গ হইতে আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। আমি রবি-বাবুর কথায় ভগবানকে প্রার্থনা করিয়া জানাইতেছি "যে কেহ মোরে দিয়াছ দুঃখ, চিনায়েছ পথ তাঁর, তাহারে নমি আমি।"

শ্রদ্ধেয় বিপিনচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় মানসী ও মর্ম্মবানীতে সুরেশবাবুর কথা উল্লেখ করিয়া যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহাতে অনেক ভুল ছিল,—সুরেশ বাবুর জীবিত কালেই আমি তাহার প্রতিবাদ করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম, কিন্তু দুঃখের বিষয় মানসীও মর্ম্ম বানীর আফিস হইতে কোন সুরেশ-ভক্ত লোক আমার প্রতিবাদটির উপর যথেচ্ছারূপ কলম চালাইয়া উহাকে বিকৃত করিয়া প্রকাশিত করিয়াছিলেন। এইরূপ অপ্রীতিকর বিষয় লইয়া ঘাটাঘাটী করিতে অনিচ্ছুক হইয়া আমি নীরব ছিলাম। সুরেশ বাবু আমার প্রতি অনুকূল-প্রতিকূল যাহাই থাকুন না কেন, আমি তাঁহার পদধূলি আমার বাড়ীতে সর্ব্বদাই পাইতাম, এবং সাহিত্যের জন্য প্রবন্ধের দাবী তিনি কখনই

ছাড়িতেন না। মৃত্যুর দুই এক বৎসর পূর্ব্বেও তিনি বেহালা যাইয়া আমাকে প্রবন্ধের জন্য তাগিদ দিয়াছিলেন।

আমার কাছে এই সময় সর্ব্বদা আসিতেন ব্যোমকেশ মুস্তফি। তাঁহার মত সুদর্শন, প্রিয় ভাষী, অনুরক্ত বন্ধু কোথায় পাইব? আমরা পরস্পরকে "তুমি" বলিয়া সম্বোধন করিতাম। পৃথিবীর যে বন্ধু যাহা করিবেন, ব্যোমকেশ অযাচিত ভাবে যাইয়া তাহার সাহায্য করিতে দাঁড়াইত। এত কর্ত্তব্যের ভার কেহই একাকী সম্পাদন করিতে সমর্থ হইতে পারেন না। তাহার শরীর ভাল ছিল না—সুতরাং প্রায়ই সে প্রতিশ্রুত কার্য্যের সবটা করিতে না পারিয়া সলজ্জ ও সপ্রতিভ হইয়া ক্ষমা চাহিত। সাহিত্য-পরিষদের জন্য তাঁহার খাটুনির অবধি ছিল না। এবং পরিষদের ইষ্টের জন্য সে ডাকাতি করিতেও বোধ হয় পশ্চাৎ পদ হইত না। একবার সে আমার বাড়িতে ডাকাতের মত পড়িয়া আমার ৭০।৭৫ খানি ভারতী দস্যুর মত লুণ্ঠন করিয়া লইয়া যায়, ইহার পরে সে আসিলে আমি পুস্তকের ঘরের চাবি বন্ধ করিয়া ফেলিতাম। তাহার মৃত্যুর দুইদিন পূর্ব্বে সে আমাকে নিজ হাতে যে চিঠি লিখিয়া ছিল, তাহা আমার কাছে আছে। মৃত্যুর-আরম্ভ হইয়া তাহার দক্ষিণ হস্ত কাঁপিতে কাঁপিতে লেখনী চালাইয়াছিল,চিঠিখানির আকা বাঁকা অক্ষর সেই করুণ ইতিহাস প্রমাণ করিতেছে। আমি প্রবেশিকা পরীক্ষার বাঙ্গালার প্রধান পরীক্ষক ছিলাম। সেও সেইবার পরীক্ষক ছিল, সে কাজ সারিতে না পারিয়া ত্রুটি স্বীকার করিতে করিতে এই কর্ম্ম-ক্ষেত্র হইতে চলিয়া গেল। শ্রদ্ধাস্পদ চন্দ্রনাথ বসুর পুত্র হরনাথ ও আমি তাঁহার সেই অবশিষ্ট কাজ সারিয়া লইয়াছিলাম। প্রফুল্ল কুসুমটি যেরূপ হাসিতে হাসিতে বৃন্তচ্যুত হইয়া পড়ে, সেইরূপ বঙ্গীয় সাহিত্য পারিষৎ অধিষ্ঠিত ভারতীয় সেবায় সে হাসিতে হাসিতে প্রাণপাত করিয়া চলিয়া গিয়াছে।

১৮০০ খৃষ্টাব্দে আমি যোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাবুদের সঙ্গে প্রথম পরিচয়

শ্রীশ্রীদুর্গা

রায় সাহেব তোমার উপদেশ মত

[illegible]

135 Upper Circular Road

মৃত্যুর কয়েক দিন পূর্ব্বে লিখিত ব্যোমকেশ মুস্তফি মহাশয়ের চিঠি।
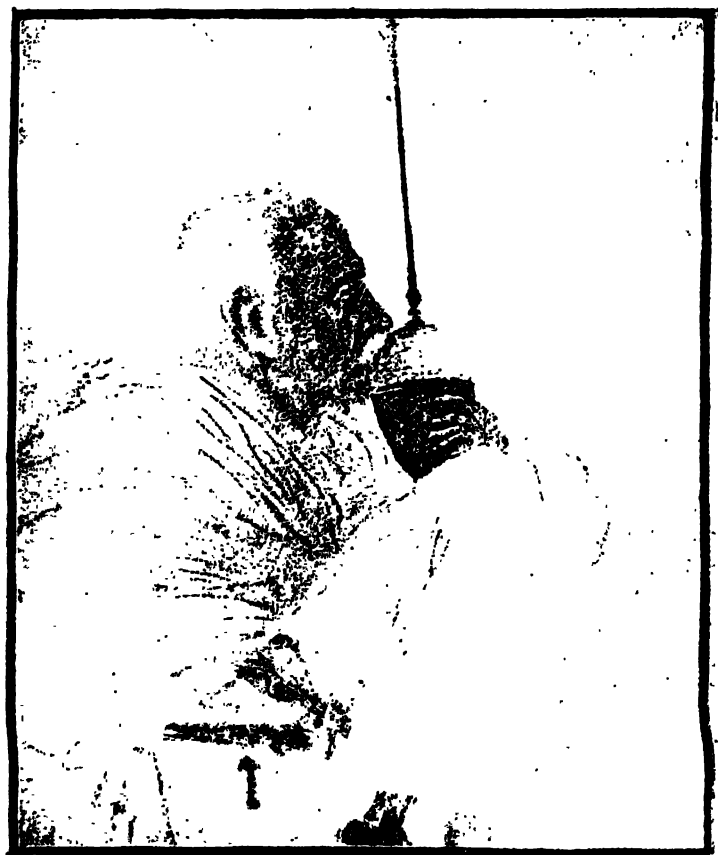
মতিলাল চক্রবর্ত্তী।

(শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত চিত্র হইতে)

লাভ করি। পাল্কী করিয়া গগন বাবুদের বাড়িতে যাইয়া দেখিলাম, তিনটি ধ্যানী বুদ্ধের মত, গগনেন্দ্র, অবনীন্দ্র, সমরেন্দ্র তিন ভাই আলখাল্লা পরিয়া বসিয়া আছেন। গগনবাবু জ্যেষ্ঠ হইলেও দেখিতে সর্ব্ব কনিষ্ঠের মত, খর্ব্বাকৃতি গৌরবর্ণ। অবনীন্দ্রবাবু সর্ব্বকনিষ্ঠ হইলেও সর্ব্বজ্যেষ্ঠের মত দেখিতে, দীর্ঘাকৃতি,উজ্জ্বল শ্যাম-রূপ। তিন ভাইএরই হাসি মুখ। অবনীন্দ্র-বাবুর হাস্যে মাঝে মাঝে একটু সরল ব্যঙ্গের ভাব ফুটিয়া উঠে। ইঁহারা আমাকে নানারূপ সাহায্য করিয়া মাসিক একটা বৃত্তির ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। তদবধি ইঁহাদের সঙ্গে আমার ঘনিষ্টতা বাড়িয়া চলিয়াছে; আমার আপদে বিপদে সর্ব্বদা ইঁহাদিগকে পাইয়াছি। অবনীন্দ্রবাবু তখন হ্যাভেল সাহেবকে লইয়া দেশীয় চিত্র-শালার পত্তন দিতেছিলেন, তখনই তাঁহার সুবিখ্যাত 'বিরহী যক্ষ' 'বুদ্ধ ও সুজাতা' 'ইংরেজের হাতে সাহ আলম' প্রভৃতি চিত্র অঙ্কিত হইয়া গিয়াছিল। একটা রূপা-বাঁধা হুকা হাতে, ইঁহাদের আশ্রিত মতিবাবু নামক একটি বৃদ্ধব্রাহ্মণ সর্ব্বদা কাছে বসিয়া থাকিতেন। মতিবাবু গভর্ণমেণ্ট হইতে কিছু পেন্সন পাই-তেন, এবং গগন বাবুদের নানা কাজের ভার লইয়া সম্পাদন করিতেন। ধরুন, যেমন ইঁহারা অভিনয় করিবেন, তাহার প্ল্যাটফরম্ তৈরী করিতে হইবে; ষ্টার, মিনার্ভা কিম্বা অপর কোন নাট্য-সম্প্রদায় যদি ইঁহাদের বাড়ীতে অভিনয় দেখাইতে আহুত হইতেন, তবে চালা-ঘর ও রঙ্গমঞ্চ বাঁধিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে, মতিবাবুই ছিলেন কর্ম্মকর্ত্তা। ইহা ছাড়া বাবুরা সর্ব্বদা বাঙ্গলা বই কিনিতেন, মতিবাবু গুরুদাসবাবুর দোকান হইতে তাহা আনিয়া দিতেন। এই সকল ব্যাপার লইয়া গগনবাবুরা ইঁহাকে প্রায়ই ক্ষেপাইয়া পাগল করিয়া তুলিতেন। "আজ কত লাভ হইল?" প্রশ্ন হইলেই মতিবাবু চটিয়া লাল হইয়া যাহা ইচ্ছা তাই বকিতে থাকিতেন। গগন বাবুরা তাঁহার গালাগালিটা বেশ হাসিতে হাসিতে সহিয়া লইতেন,

যেহেতু মতিবাবু ছিলেন তাঁহাদের পিতৃ-সহচর। উত্তর কালে গগনেন্দ্র-বাবু বিদ্রূপ চিত্র আঁকিয়া খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন, কিন্তু তিনি তাঁহার হাত পাকাইয়া লইয়াছেন, মতিবাবুকে দিয়া। মতিবাবু যখন যেভাবে বসিতেন, যে ভঙ্গী করিয়া কথা কহিতেন, হুকাটি নামাইতেন, কিম্বা হুকা ধরিয়া যে ভাবে নিবিষ্ট হইয়া তন্দ্রা উপভোগ করিতেন, তাঁহার সেই ভাবের শত শত ছবি গগনবাবু আঁকিয়াছেন। "রাইফেল রেঞ্জে" যেরূপ গোরা সৈনিকেরা লক্ষ্য স্থির করিয়া হাত ঠিক করিয়া লয়, মতিবাবু ছিলেন গগনবাবুর সেইরূপ চিত্র-লক্ষ্য। তাঁহার হাতে মতিবাবুর যে সকল ছবি আঁকা হইয়াছে, বোধ হয় স্বয়ং সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মাও তাহা দেখিয়া অবাক হইয়া যাইতেন; তাঁহার সৃষ্টির এরূপ হুবহু নকল হইতে পারে,ইহা এই সকল ছবি না দেখিলে তিনি ও বিশ্বাস করিতে পারিতেন না। অবনীন্দ্র বাবু সর্ব্বদা তাঁহার লেখা ও ছবি লইয়া ব্যস্ত থাকিতেন। তাঁহার চিত্রে রঙের কোমল খেলা ও মৃদু মাধুরী দেখিয়া সমস্ত য়ুরোপ মুগ্ধ হইয়াছে। তাঁহার বাঙ্গলা রচনায় পল্লী-সৌন্দর্য্যের যে মোহিনী আছে, সে যাদুকরী বিদ্যা তাঁহার নিজস্ব, অপর কোন লেখক এপর্য্যন্ত তাঁহার সঙ্গে এ বিষয়ে আঁটিয়া উঠিতে পারেন নাই। তিনি কলম ও তুলি দিয়া কেবলই ছবি আঁকিয়া যান। প্রাকৃতিক দৃশ্য বর্ণন করিতে গেলে নিত্য-প্রত্যক্ষ অবজ্ঞাত ক্ষুদ্র বিষয় গুলি তাঁহার হাতে আশ্চর্য্য সুন্দর কোন স্বপ্নের ন্যায় হইয়া উপস্থিত হয়,তাহা সাহিত্যে শিল্পের কি উচ্চ স্থান তাহা নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত করে। তাঁহার রাজস্থানের কাহিনীগুলিতে ভাটিয়াল সুরের মত একটা করুণ সুর আছে, তাহা তাঁহার সুকোমল হৃদয়ের ব্যঞ্জনা করিতেছে। বিরহী যক্ষের চিত্রটিতে যে লাল রঙের আভা যক্ষের কপালের চন্দন-ফোটায়, ও স্নিগ্ধ সূর্য্যাস্তে ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা কালিদাসের স্পষ্টতম ব্যাখ্যা। বোধ হয় মল্লীনাথ যাহা বুঝাইতে পারিতেন না, চিত্রকর

তাহা বুঝাইয়াছেন। 'বুদ্ধ ও সুজাতা' চিত্রে ভক্তি-বিনম্রা ললনার প্রণতি ও সাদর নিমন্ত্রণ নারীহৃদয়কে যেন একটা পুষ্পিত লতার ন্যায় প্রত্যক্ষ করিয়া দেখাইতেছে,--ভক্তি যেন রূপ ধারণ করিয়া সৌন্দর্য্যের ক্ষেত্রে আত্ম-প্রকাশ করিতেছে।

অবনীন্দ্র বাবু সেই একভাবেই আছেন, সেই একলক্ষ্য। চেহারা ও যে ২০ বৎসরে বেশী পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তাহা নহে। মাঝে সি, আই, ই, উপাধি পাওয়ার পরে একটু বাঁকিয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু সেই বঙ্কিমত্ব বাতরোগে কিম্বা বাঁকা শ্যামের শ্রী দেহে ফলাইবার জন্য সে সম্বন্ধে মত ভেদ আছে। আমার বিশ্বাস সরকারী উপাধির গুরু ভার সহ্য করিতে না পারিয়া এরূপ হইয়াছিলেন। ব্যঙ্গ ছাড়িয়া দিলে, বাত রোগ তাহার দেহটি কিছু কালের জন্য টানিয়া ধরিয়া আবার ছাড়িয়া দিয়াছে—এখন আবার সেই হাসি প্রফুল্ল-মুখে স্নিগ্ধ মধুর চাউনি লইয়া সম্পূর্ণ ঋজু দেহে তিনি বিদ্যমান আছেন।

কিন্তু গগনবাবুর খেয়ালের অন্ত নাই। সহসা স্বদেশী চিত্রের প্রতি অনুরাগের মাত্রা চড়িয়া গেল,অমনই প্রাচীন বড় বড় বহুমূল্য বিলাতী ছবি তিনি নাবাইয়া ফেলাইয়া তাহার জায়গায় অজান্তা গুহার চিত্র,ক্যাট সুটা নামক জাপানি চিত্রকর অঙ্কিত রামায়নের চিত্র, কৃষ্ণের রাস-লীলার চিত্র দিয়া তিনি দেয়াল ছাইয়া ফেলিলেন। কৃষ্ণ পাথর ও অষ্ট ধাতুর প্রাচীন মূর্ত্তি, এবং মোগলাই চিত্রের সন্ধানে লোক নিযুক্ত করিয়া সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। যখন যে খেয়াল গগন বাবুর মাথায় আসে তাহা যেন তাঁহাকে একবারে পাইয়া বসে। এই খেয়াল একটু "মন্দা" না পড়িতে পড়িতেই, তিনি তাঁহার হল-ঘরটির পরিবর্ত্তন করিতে লাগিয়া গেলেন;নীচেকার ঘরটা ছাড়িয়া দিয়া উপুরের ঘরটায় আসিলেন,এবং বৎসরে দুবার করিয়া দেয়া-লের চিত্রিত লতাফুল গুলি নূতন করিয়া আঁকাইতে লাগিলেন। ঠিক কোন

উৎসবের সময় সেরূপ লোকজন ব্যস্ত হইয়া কাজ করে,চিরকালটা ইনি সেই ভাবে কাটাইয়া আসিতেছেন। ঠাকুর-বংশের পুরাতত্ত্ব সম্বলিত চিঠি-পত্র লইয়া সে গুলি টাইপ করিতে এক সময় লাগিয়া গিয়াছিলেন সে সময়ে তাঁহার অন্য কোন দিকে দৃষ্টিই ছিলনা,—তারপর বিনা-তারে টেলিগ্রাফীর ব্যবস্থা করিয়া এঘর হইতে ওঘরে কথা বার্ত্তা চালাইয়া কতকদিনের জন্য তাহাই একটা উৎসবে পরিণত করিয়া ফেলিলেন। এই সময় নন্দলালবসু চিত্র-শিক্ষার জন্য আসিলেন। তুলির বড় বড় টানে তিনি এমনই ছবি আঁকিতে লাগিলেন যে তাহা আমাদের বিস্ময়ের সামগ্রী হইয়া দাঁড়াইল—তাঁর সকল ছবিতেই মৌলিকত্ব থাকিত। অভিমানিনী কৈকয়ীর ছবিতে তাঁহার লাল রঙ্গের শাড়ীর লহরে লহরে যেন রাগের রঙ্গিমা ফুটিয়া উঠিয়া জ্বলন্ত অভিমানকে আঁকিয়া ফেলিল, এবং মৃত সতীর একখানি হস্ত রজত গিরিনিভ স্বামীর পদস্পর্শ করিয়া দেখাইল যে মৃত্যুর পরও অনুরাগ চলিয়া যায় নাই। গগন বাবু ও অবনী বাবু নন্দলালকে দিয়া অজান্তার ছবির প্রতি-লিপি আঁকাইতে লাগিলেন—এই ভাবে স্বদেশী চিত্রশালার পরম সম্পদ রচিত হইতে লাগিল।

গগনবাবুর শেষ প্রিয়তমা হইয়া চুম্বন গ্রহণ করিলেন চিত্রকলা, তাহা বিদ্রূপে যেমনই কৌতুক ও হাস্যের উৎস, আবার ভক্তি-সাধনা ও কবিত্বে তেমনই চিত্তাকর্ষক। সমাজের সমস্ত ছলনা, কপটতা ও ভাণ, তাঁহার চোখে যেমন স্পষ্ট করিয়া ধরা পড়িয়াছে,বাঙ্গালী আর কোন চিত্রকরের বোধ হয় সেরূপ পড়ে নাই। হাস্যরস ক্ষণ-স্থায়ী,কিন্তু ব্যঙ্গরসের ছবি আঁকিয়া গগনবাবু নীতিজ্ঞের পদ গ্রহণ করিয়াছেন, এ চাণক্যের শ্লোক নহে,চিত্রকরের চাবুক—ইহা কম তীব্র নহে। গগনবাবু চৈতন্যের ছবি আঁকিয়া মন্দির-যাত্রীর ভিড় দেখাইয়া প্রেমও ভক্তির পথে যে ইঙ্গিত করিয়াছেন,তাহা ভাবুককে বিস্মিত এবং কবিকে উদ্বোধিত করিবার শক্তি রাখে।

গগন বাবুর নানা খেয়ালের মধ্যে যে কর্ম্মঠতা ও উদ্যম দৃষ্টি হয়, তাহা তাঁহার ক্ষিপ্র, অসহিষ্ণু প্রতিভাকে বিশেষ ভাবে প্রতিপন্ন করিয়া দেখাই-তেছে। ঠাকুরবংশে ইহাঁরমত বিচিত্র মনস্বিতা আমি খুব অল্পই দেখিয়াছি। বাহিরে একথা কেহ হয়ত স্বীকার করিবেন কিনা জানি না, কিন্তু দৈনন্দিন প্রত্যেক ঘটনায় যে ইনি কত বিচিত্র ভাবে এই প্রতিভার পরিচয় দিয়া থাকেন, তাহা আমার চির বিস্ময়কর। তিনি যেন নিত্যই নূতন যুগের লোক, সভ্যতার আতুর-ঘরে নিত্য জন্ম গ্রহণ করিতেছেন। তাঁহার গত জীবনের পত্রগুলি দিবাশেষে রোজই শুষ্ক হইয়া ঝরিয়া পড়িতেছে এবং প্রতিদিন প্রত্যুষে নূতন জীবন সদ্য স্ফুট কুসুমের ন্যায় নূতন সৌন্দর্য্য লইয়া জন্ম গ্রহণ করিতেছে। তিনি তাঁহার মন্দিরে বাসি-ফুল রাখিয়া আবর্জ্জনার সৃষ্টি করেন না, নূতনের জন্য তাঁহার গৃহে সর্ব্বদা অভ্যর্থনার জায়গা হইতেছে। তাঁহার মনস্বিতার বহু লক্ষণের মধ্যে, তাঁহার জীবন-ইতিহাসের পত্রগুলির নিত্য ওলট-পালটের মধ্যে একটা জিনিষ স্থায়ী দেখিয়াছি—তাহা তাঁহার সহৃদয়তা। সম্পূর্ণ রূপে প্রতিদান, প্রতিষ্ঠা ও সাংসারিক চিন্তার উর্দ্ধলোকে থাকিয়া এই সহৃদয়তা দুঃখীর ব্যথায় অতি গোপনে আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে।

ইহাঁদের তিন ভ্রাতার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অল্পভাষী সমরেন্দ্র। ইনি একান্ত ভাবে অনাড়ম্বর, অনেক সময় ইহাঁর মুখে কথাটি নাই। কিন্তু হৃদয়ের সমস্ত অসমাপ্ত কথা একটা সরল হাসিতে বোধ হয় বাক্যাবলী হইতে ও বেশী ব্যক্ত করে। সেই হাসিতে শুধু তাঁহার ঠোঁট দুটি উজ্জ্বল হয় না, গোঁপ জোড়া পর্য্যন্ত হাসিয়া ওঠে। অনেক সময় মনে হইবে যে ইনি কিছুই জানেন না, একান্ত নীরিহ ভাল মানুষ। কিন্তু ভাব-রাজ্যের ডুবারু হইয়া কেহ এই প্রশান্ত জলরাশির মধ্যে প্রবেশ করিলে অনেক রত্ন পাইবেন। ইনি দিনরাত্রি পুস্তক পড়েন; ভারত-ইতিহাস সম্বন্ধে

ইহার জ্ঞান অসাধারণ। সাধারণত ইনি জমিদারির কাজ কর্ম্ম দেখেন, বলিয়া ইহার শিক্ষা কাহারও অপেক্ষা কম নহে।

আমি এই তিন ভ্রাতার সৌহার্দ্দ্য লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছি। মহারাজ মনীন্দ্রচন্দ্র, গগনবাবু,কালি কৃষ্ণ ঠাকুর,প্রমথ নাথ রায় চৌধুরি,রাজা মন্মথ-রায়চৌধুরি, ত্রিপুরেশ্বর এবং শরৎ কুমার রায় এক সময়ে আমাকে মাসিক বৃত্তি দিয়াছিলেন। আমি দুরবস্থার সময় ইহাদের সাহায্য লাভ করিয়াছি। এখনও ত্রিপুরেশ্বর এবং কাশিমবাজারের মহারাজা সেই বৃত্তি চালাইতেছেন।

বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির হইবার পর আমার প্রতি বঙ্গীয় সমাজ সহৃদয়তার পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। কত লোকের নিকট যে অযাচিত ভাবে সাহায্য পাইয়াছি, তাহা লিখিয়া শেষ করিতে পারিব না। ছোট লাট্ উড্‌বারণ সাহেব স্বয়ং আমার জন্য মহারাজ মনীন্দ্র নন্দী এবং অপর দুই একজন মহারাজকে অনুরোধ করিয়া ছিলেন। চিফ্ সেক্রেটারী ম্যাক্‌ফার্সে´ন সাহেব অনেক স্থান হইতে আমার জন্য সাহায্য আদায় করিয়া পাঠাইয়াছেন। বরদাচরণ মিত্র মহোদয় ময়ুরভঞ্জাধিপতির নিকট হইতে ১০০০, টাকা আদায় করিয়া আমাকে প্রদান করেন। এমনও হইয়াছে যে অযাচিত ভাবে কোন কোন ভদ্রলোক আমার সঙ্গে দেখা করিয়া ১০০।২০০, শত টাকা অতি বিনয়ের সঙ্গে দিয়া গিয়াছেন। রবীন্দ্রবাবু গগনবাবুকে একবার মাত্র আমার কথা বলিয়াছেন, গগনবাবুর সহৃদয়তার তুলনা নাই, আমি না চাহিতেই তিনি আমার বাড়ী নির্ম্মানের জন্য ১৮০০, টাকা দিয়াছিলেন। প্রাণের আশা ছাড়িয়া দিয়া রাতদিন খাটিয়া আমি বঙ্গ-ভারতীর এক কালে সেবা করিয়াছিলাম, দেবী আমাকে লুকাইয়া অজস্র দান করিতেছিলেন। ১৯০৫।৬ খৃষ্টাব্দ

পর্য্যন্ত আমি একরূপ শয্যাগত পীড়িত অবস্থায়ই ছিলাম, কারণ তখন দুই চারিদিন বাহিরে একটু ভ্রমণাদি করিতে পারিলেও মোটামুটি অনেক সময়ই বিছানায় পড়িয়া থাকিতাম, কিন্তু তখন লিখিবার শক্তি ফিরিয়া পাইয়াছিলাম। প্রবন্ধাদি লিখিয়া মাসিক ১৫০।২০০, টাকা উপার্জ্জন করিতে লাগিলাম। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য পুস্তকের উৎসাহবর্দ্ধন জন্য ও আমার রোগ-ক্লেশে সহানুভূতি দেখাইয়া আমাকে যাঁহারা সাহায্য দিয়াছিলেন,তাহাদের সেই অর্থের পরিমাণ ১০,০০০,টাকার কম হয় নাই, সুতরাং এই সময়ে আমার আর্থিক অভাব দূর হইয়া হাতে কয়েক হাজার টাকা জমিয়াছিল।

যখন একান্ত বিপন্ন হইয়া কলিকাতায় চলিয়া আসি,তখন নগেন্দ্রবাবুর (প্রাচ্য বিদ্যামহার্ণব) ন্যায় রামেন্দ্রবাবুও আমাকে সর্ব্বদা দেখিতে আসিতেন। কি করিয়া তিনি আমার সাহায্য করিবেন, সাহিত্যিক গৌরব দিবেন—তাহাই ছিল তাঁর সর্ব্বদা চেষ্টার বিষয়। তিনি আমাকে সাহিত্য পরিষদের বিশিষ্ট সভ্য করিবেন—সেই উদ্যোগ করিতে লাগিলেন, যে সভায় এই প্রস্তাব উত্থাপন করিবেন,—সেই সভায় সুরেশ সমাজপতি উপস্থিত ছিলেন, তিনি তাঁহার প্রস্তাবে বাধা দিবেন বলিয়া রামেন্দ্রবাবুকে ভয় দেখাইলেন। যদিও বিশিষ্ট সভ্য সম্বন্ধে তখনও খুব কড়াকড়ি নিয়ম হয় নাই, তথাপি এইরূপ প্রস্তাব সর্ব্বজনসম্মত হইলেই শোভন হয়। তিনি আমাকে দুঃখের সঙ্গে বলিলেন—"এই বাধা দেওয়ার মুখে প্রস্তাবটি এখন আর করিতে চাই না।" আমি বলিলাম,"বিশিষ্ট সভ্য না হইলে আমি মরিয়া যাইব না, আপনি কেন এজন্য দুঃখিত হইতেছেন?" কিন্তু তিনি অতিশয় লজ্জিত হইয়া তাহার পরের সভায় "বিশেষ সভ্য" নামক এক শ্রেণীর সভ্যসৃষ্টি করিয়া সর্ব্বাগ্রে আমার নাম করিবেন, স্থির করিলেন। সুরেশবাবু আমাকে বলিলেন, "কানা ফকির ভিক্ মাঙ্গে—এখন বাপ

বিশেষ সভ্য তালিকা ভুক্ত হউন গিয়া, আমি এবার বাধা দিব না।" আমি রামেন্দ্রবাবুকে বলিলাম "যদি আপনি আমার নাম বিশেষ সভ্যরূপে প্রস্তাব করেন, তবে আমি দাঁড়াইয়া অস্বীকার করিব।" সুতরাং আমি বিশেষ সভ্যভুক্ত হইলাম না—আবদুলকরিম,অতুল গোস্বামী প্রভৃতি কয়েকজনের নাম বোধ হয় সেইবার প্রস্তাবিত হইয়াছিল। রামেন্দ্রবাবুর বাড়ীতে একদিন আমি প্রাতে উপস্থিত হইয়াছিলাম। তিনি কষ্টে সৃষ্টে ভুঁড়িটা সরাইয়া তাঁহার নিকট আমার একটা জায়গা করিয়া দিয়া একটা উপাধান অবলম্বন করতঃ জলমগ্ন ব্যক্তি যেরূপ কাষ্ঠখণ্ড ধরিয়া থাকে সেইভাবে রহিলেন। আমি বলিলাম "কি জন্য আমার তলব হইয়াছে?" তিনি বলিলেন, "আমি একটি লোকের প্রতীক্ষা করিতেছি,তিনি আসুন,তারপর বলিব।" কথাবার্ত্তা তিনি খুব কমই বলিতেন, যেখানে কথার দরকার, সেখানে শুধু মৃদুহাসি এবং ভাবের আধিক্য হইলে উচ্চহাস্য। এই হাসি দ্বারা তিনি আদর-আপ্যায়ন বুঝাইতেন,বিদায় গ্রহণের ভদ্রতা জানাইতেন, প্রাণের সহৃদয়তা বুঝাইতেন,—হাসিই ছিল তাঁর সম্বল। তাঁর প্রাণের কথা ঐ হাসিতে যত বোঝা যাইত, কথায় বোধ হয় ততটা বুঝাইতে পারিতেন না।

এমন সময় একটি ধীর স্থির যুবক তথায় আসিলেন, অতি সাধারণ বেশ-ভূষা, গৌরবর্ণ, মুখচোখে অধ্যবসায় ও তেজ—এবং সকলের অপেক্ষা একটা স্থিরপ্রতিজ্ঞ, সহৃদয় চরিত্র-দৃঢ়তার ব্যঞ্জনা পরিস্ফুট। রামেন্দ্র বাবুকে ইঁহাকে আদর করিয়া কাছে বসাইলেন এবং আমাকে পরিচয় দিয়া বলিলেন, "ইনি দীঘাপাতিয়ার কুমার শরৎচন্দ্র রায়। ইনি আপনার সঙ্গে গোপনে কি কথা বলিবেন" আমি কুমার বাহাদুরের সঙ্গে সেই ঘরের একটা নিভৃত স্থানে দাঁড়াইলাম। কুমার বাহাদুর বলিলেন "আমি আপনার 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' পড়িয়াছি, রামেন্দ্রবাবু আমাকে আপনার

অবস্থা বলিয়াছেন—যদি অনুমতি দেন, তবে আমি আপনাকে সামান্য কিছু সাহায্য করিতে চাই।" এই বলিয়া ৫০০,টাকার নোট আমার হাতে দিলেন—"আব মাসিক ২০ টাকা করিয়া সাহায্য করিতে চাই, গ্রহণ করিবেন কি ?" আমি নির্ব্বাক হইয়া কৃতজ্ঞতার ভাষা খুঁজিতেছিলাম। এমন সময় রামেন্দ্রবাবুর আহ্বান হইল; দেখিলাম এই সাহায্য দিতে দেখিয়া তাঁহার মুখে আনন্দ ও স্ফূর্ত্তি খেলিতেছে।

কুমার শরৎকুমার রায় বাহাদুরের সঙ্গে আমার অত্যন্ত ঘনিষ্টতা হইল। তিনি বঙ্গের ইতিহাস-সেবায় জীবন সমর্পণ করিয়াছেন; এরূপ অনন্ত অনুরাগ খুব কমই দেখা যায়। তাঁহার মুক্তহস্ত দানে একসময় সাহিত্য-পরিষদ্ যথেষ্ট পুষ্টিলাভ করিয়াছে। বীরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির প্রতিষ্ঠা করিয়া তিনি অকাতরে অর্থব্যয় করিয়াছেন। তাঁহার দান আছে—ঘোষনা নাই, তাহার কথা অতি স্পষ্ট,—মিথ্যা ভদ্রতা এবং মিষ্টভাষা দ্বারা তিনি কাহাকেও কখন প্রলুব্ধ করেন না; যাহা করিবেন তাহা প্রাণপণে গোপনে নিজকে সম্পূর্ণ আড়ালে রাখিয়া করিয়া থাকেন। তিনি বাঙ্গালা অনেকগুলি উপন্যাস লিখিয়াছেন, দুই একখানি ছাপা হইয়াছিল। এই লেখাগুলি আমি পড়িয়া দেখিয়াছি, সাধারণ উপন্যাস গুলি হইতে এইগুলিতে অনেক বেশী কৃতিত্ব আছে। কিন্তু বিদ্যাচর্চ্চার জন্য অসংখ্য টাকা দান করিয়াও ইনি নিজের লেখা ছাপাইতে ব্যয় করিতে বিশেষ সম্মত নহেন। তাঁহার বিনম্র প্রতিভার লাজুকতা যেমনই মধুর, বঙ্গীয় ঐতিহাসিক চর্চ্চার প্রাণ স্বরূপ হইয়াও নিজের যশের ডঙ্কানিনাদ শুনিতে সম্পূর্ণ নিস্পৃহতা ও তেমনই মধুর। তিনি প্রেরণা দিয়া যাঁহাদিগকে দিয়া কার্য্য করান, স্বীয় প্রাপ্য যশের মুকুট তাহাদিগের মস্তকে পরাইয়া সুখী হইয়া থাকেন। আমাকে তিনি ৪।৫ বৎসর মাসিক ২০, টাকা বৃত্তি দিয়া সাহায্য করিয়াছিলেন। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা কুমার

হেমেন্দ্রকুমার জ্যোতিষ ও চিত্রাঙ্কনে ব্যস্ত—কুমার শরৎকুমারের ন্যায় তিনি হয়ত দৃঢ়-চরিত্র নহেন, কিন্তু এমন মধুর বিনয় ও অমায়িকতা এমন শেফালী-শুভ্র নির্ম্মলতা খুব অল্পই পাওয়া যায়।

কুমার শরৎকুমার কবিকঙ্কণের হস্ত লিখিত পুঁথিখানি সংগ্রহ করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টিত হইলেন,—তিনি এবং রামেন্দ্রবাবু বিচারপতি সারদা-চরণ মিত্র মহাশয়কে ধরিয়া বহু চেষ্টার ফলে পুঁথিখানি সংগ্রহ করিলেন। পুঁথিখানি নকল করাইয়া সম্পাদন করিবার ভার হইল আমার উপর। আমি প্রিয়নাথ ভট্টাচার্য্যকে দিয়া তাহা নকল করাইতে লাগিলাম। এই পুঁথি কবিকঙ্কণের হাতের লেখা বলিয়া আমার বোধ হয় নাই। পূর্ব্ব ও পশ্চাৎভাগের কয়েকটি পাতা নাই; সুতরাং সন তারিখের সন্ধান পাওয়া যায় না। তবে এই পুস্তকের মধ্যে যে মুকুন্দরামের হাতে লেখা আছে, তাহাতে আমার সন্দেহ রহিল না। পুঁথিখানি তালপাতায় লেখা। অক্ষরগুলি সুন্দর,—ভাল লেখক দিয়াই কবিকঙ্কণ নকল করাইয়াছিলেন, পরন্তু লেখাগুলির মাঝে মাঝে, আমার যতদূর মনে পড়ে,—লাল কালীতে সংশোধন আছে, কোন কোন স্থানে সম্পূর্ণ ছত্র পরিবর্ত্তন করিয়া নূতন ছত্র লিখিত হইয়াছে। স্বয়ং কবি ছাড়া অন্য কেহ এরূপভাবে তাঁহার লেখায় কলম চালাইয়াছেন সম্ভব নহে। সংশোধিত ছত্র কবির নিজ হাতের লেখা বলিয়াই বোধ হয়, সে লেখাগুলি তত সুন্দর নয়, বামুনপণ্ডিতের লেখার মত কতকটা জড়ান লেখা। এই পুঁথির মধ্যে একখানা দলিল ছিল, তাহা আমি দেখিয়াছি;—সেই দলিলে দেখা যায়, বাঁরাখাঁ নামক কোন শাসনভার প্রাপ্ত ব্যক্তি মুকুন্দরামের পুত্র শিবরামকে কয়েক বিঘা নিষ্কর জমি দান করিয়াছিলেন,দলিলের তারিখ ১৬৪০খৃঃআমরা কেতকীদাস-ক্ষেমানন্দের মনসাদেবীর ভাসানে এই 'বাঁরাখাঁর' নাম পাইয়াছি, শেষোক্ত কবি লিখিয়াছেন, বাঁরাখাঁ যুদ্ধে নিহত হইলে পর তিনি মনসা মঙ্গল রচনা

সুরু করেন। মুকুন্দরাম-স্থাপিত সিংহবাহিনীর মন্দিরেই এই পুস্তক পূজিত হইতেছিল এবং মুকুন্দরামের বংশীয়দের এবং দামুন্যাগ্রামের অপরাপর লোকের বিশ্বাস যে পুথিখানি মুকুন্দরামের নিজের। সুতরাং যখন শিব-রামের দলিল ঐ পুঁথির মধ্যে ছিল, এবং বাড়ীর প্রবাদ যে পুঁথিখানি স্বয়ং কবির এবং যখন পূর্ব্বোক্তভাবের সংশোধন কাব্যের মধ্যে পাওয়া যাইতেছে, তখন পুস্তখানি অবশ্য মুকুন্দরামের বলিয়া আমরা মানিয়া লইলাম। কিন্তু সংশোধনের অংশ ছাড়া অন্য কোন অংশ কবির স্বহস্ত-লিখিত বলিয়া আমার বিশ্বাস হয় না।

এই পুঁথিখানি মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর পাঁচ শত টাকা এবং গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় তিন শত টাকা মূল্যে ক্রয় করিবার অভিপ্রায় আমার নিকট ব্যক্ত করেন। আমি রামেন্দ্রবাবুকে তাহা বলিয়াছিলাম। কবিকঙ্কণের বংশধর যোগেন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় ঐ পুঁথি ফিরাইয়া লইবার জন্য কলিকাতায় আসিয়া আমার বাড়ীতেই ছিলেন। কবিকঙ্কণের বংশধর বলিয়া আমি তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিতাম, যদিও পূর্ব্ব-পুরুষ প্রাপ্ত এই বংশ-গৌরব ছাড়া তাঁহার মধ্যে কোনই প্রশংসনীয় গুণ দেখি নাই। বয়স প্রায় ৭০, আমার ছেলেদেরে দিয়া দিন রাত্র তামাক সাজাই-তেন ও কাসিয়া কাসিয়া ধূমোদ্গীরণ করিতেন,—পানরসসিক্ত নিষ্ঠীবন দ্বারা আমার নূতন বাড়ীখানির দেয়াল রঞ্জিত করিতেন এবং কোন স্থানে বাহির হইয়া গেলে যত রাজ্যের ধূলি ও কাদাতে ছিন্ন চটির অভ্যন্তরস্থ শ্রীপাদপদ্ম লাঞ্ছিত করিয়া সেই লাঞ্ছনার পর্য্যাপ্ত ভাগ আমার শয্যায় প্রদান-পূর্ব্বক অকুণ্ঠিত চিত্তে বিরাজ করিতেন।

পুঁথি নকল হইয়া গেল, কিন্তু তখনও মিলাইতে পারি নাই। ইতি-মধ্যে রামেন্দ্রবাবু আমাকে তাড়া দিয়া বলিলেন—"কই, শাস্ত্র শীঘ্র কাজ সারিয়া ফেলুন, যোগেন্দ্র ভট্টাচার্য্য পুঁথির জন্য তাড়া দিচ্ছেন, বই শীঘ্র

ফেরৎ দিতে হবে।” ইহার মধ্যে উক্ত ভট্টাচার্য্য একদিন আমায় বলিলেন “দীনেশবাবু, আমাব বড় বাজারের এক শিষ্য বইখানি দেখিতে চাহিতেছে—মহাপুরুষের হস্তাক্ষর, সে দেখিয়া পুণ্য অর্জ্জন করিতে চায়—দুই এক দিনের জন্ত দিন্, আমি তাঁহাকে দেখাইয়া আনি।” তাঁহার বই তাঁহাকে দেব, ইহাতে কি আপত্তি হইতে পারে, কিন্তু আমি সাহিত্য-পরিষৎ হইতে রসিদ দিয়া বই আনিয়াছিলাম—তাঁহাকে একখানি রসিদ দিয়া বই নিতে বলিলাম। কি ভাগ্য এই রসিদ আমি লইয়াছিলাম! যোগেন্দ্র ভট্টাচার্য্য খানিকটা ইতস্ততঃ করিয়া রসিদ লিখিয়া দিলেন—কিন্তু নামের একটা অংশ রূপান্তর করিলেন,তাহা আমি তখন ধরিতে পারি নাই—“নাথের” জাগায় বোধ হয় “চন্দ্র” করিয়াছিলেন। বই পর দিন ফিরাইয়া দেওয়ার কথা—কিন্তু যোগেন্দ্র ভট্টাচার্য্য যে সেই দিন অন্তর্হিত হইলেন—তারপর আর আমার বাড়ীতে ফিরিয়া আসেন নাই। দুই তিন দিন পরে নগেন্দ্রবাবু আমাকে বলিলেন“শুনিলাম,রামেন্দ্রবাবু দুই শত টাকা মূল্যে যোগেন্দ্র ভট্টাচার্য্যের নিকট হইতে সাহিত্য পরিষদের জন্ত পুঁথিখানি কিনিয়াছেন।” আমি ভাবিলাম, ভট্টাচার্য্য বোধ হয় তাঁহাকে পুথি দিয়া মূল্য লইয়া বাড়ী চলিয়া গিয়াছে। তথাপি রামেন্দ্রবাবুকে চিঠি লিখিলাম “বই যদি আপনাকে দিয়া গিয়া থাকে তবে আমাকে ফেরৎ দেবেন,—কারণ এখনও আসল দেখিয়া নকল মিলানো হয় নাই।” এই পত্র পাওয়া মাত্র রামেন্দ্রবাবু জ্বর গায়ে গাড়ী করিয়া আমার নিকট আসিয়া বলিলেন—“আপনি কেন বই দিলেন? সে আমার নিকট হইতে দুই শত টাকা লইয়া গিয়াছে, আপনার কাছে বই আছে ভাবিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া টাকা দিয়াছি।” আমি তাঁহাকে রসিদখানি দিলাম, তাঁহাকেও ভট্টাচার্য্য আর একখানি দুই শত টাকা প্রাপ্তির রসিদ দিয়াছেন সে রসিদ তিনি আমাকে দেখাইলেন। আমি বলিলাম “আপনি এই

যে কারবারটা করিলেন, ঘৃণাক্ষরে তাহা আমাকে জানিতে দিলেন না, অথচ যোগেন্দ্র ভট্টাচার্য্যকে শীঘ্র বই ফিরাইয়া দিতে হইবে বলিয়া আপনি আমাকে তাগিদ দিতেছিলেন। বইখানি সত্যই ফিরাইয়া দিয়াছি কিনা, তাহা না জানিয়া আপনি আগেই টাকা দিয়া সাফ হইলেন।"

তিনি বলিলেন, "সাহিত্য পরিষৎ হইতে আপনি পুঁথি পাইয়াছেন—সাহিত্য পরিষদে পুঁথি দেবেন—তাহাকে দেওয়ার অধিকার আপনার কিরূপে হইল?" আমি বলিলাম—"পুঁথি তো আর সাহিত্য পরিষদের নহে,—তাঁহারই পুঁথি, সে যদি দুই এক দিনের জন্য কার্য্যবশতঃ চায়—তবে রসিদ লইয়া দিয়া যে আমি কি অন্যায় করিয়াছি তাহা বুঝিতে পারি না। এই বইখানির দাম পাঁচ শত টাকা পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল,—তাহা আপনি জানিতেন, অথচ গরীব ব্রাহ্মণকে—কবিকঙ্কণের বংশধরকে জানিয়া শুনিয়া তিন শত টাকা কমে আপনি একটা রফা করিয়াছেন, ব্যবসায়ীর পক্ষে একথা কিছু দোষের নহে, কিন্তু আপনার মত লোকের পক্ষে এটা শোভন নহে। সাহিত্য পরিষদের দু পয়সা লাভ দেখাইতে যাইয়া গরীব ব্রাহ্মণের ক্ষতি করিতে গিয়াছেন, সে আপনার উপর এক কাটী; ফাঁকে পাইয়া জব্দ করিয়াছে।" রামেন্দ্রবাবুর মুখে সে দিন আর হাসি দেখিলাম না; তিনি মাঝে মাঝে কৃত্রিম রাগ প্রকাশ করিয়া চক্ষুর তারা উর্দ্ধে উঠাইতেন,—তাহাতে ছদ্মবেশী ক্রোধের অভিনয়টা বেশ কৌতুকাবহ হইত,—এই ভাবে চোখের তারা উর্দ্ধে উঠাইয়া তিনি ক্ষুব্ধ চিত্তে গাড়ীতে যাইয়া উঠিলেন।

ইহার কয়েক মাস পরে লালবাজার পুলিশ কোর্টে যাইয়া সাক্ষীর সমন পাইয়া দেখি, ৭২ বৎসরের বৃদ্ধ যোগেন্দ্র ভট্টাচার্য্য, তাহার ৯২ বৎসরের মাতাকে সঙ্গে করিয়া উভয়ে মড়ার মতন কোর্টের বারেণ্ডার উপর চোখ উল্টাইয়া পড়িয়াছে; বঙ্গীয় প্রাচীন কবিদের অনুরক্ত,

তাঁহাদের কীর্ত্তি-রক্ষণ-শীল ও পৃষ্ঠ-পোষক সাহিত্য পরিষদের হস্তে কবি-কঙ্কণের বংশধরের এই লাঞ্ছনা দেখিয়া ক্ষুব্ধ হইলাম। আমি ভট্টাচার্য্যকে মিষ্ট কথা বলিতে গেলাম, সে আসন্ন-মৃত্যু ব্যক্তির ন্যায় অস্ফুট স্বরে বলিল—"আপনি সরিয়া যান্—সাহিত্য পরিষদের লোকগুলি রাক্ষস, আপনারা কি মনস্থ করিয়াছেন, গরীব ব্রাহ্মণ কয়েকটা টাকা লইয়াছিল, ঘর বাড়ী বিক্রয় করিয়া টাকা আদায় করিলেই ত পারিতেন, কন্যাদায় গ্রস্ত হইয়া দিক্-বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া একটা কাজ করিয়াছি, তাহার ফলে আজ ফৌজদারীতে টানিয়া আনিয়া আমাকে আমার মাতার সহিত বধ করিতে উদ্যত: হইয়াছেন।" এই বলিয়া সে চোখ বুজিল ও ঘৃণায় আর আমার সঙ্গে কথা বলিল না। আমরা সাক্ষ্য দিলাম, কিন্তু সে যে প্রতারণা করিয়াছে—ইহা সাব্যস্ত হইল না,—জ্ঞাতিরা তাহার হাত হইতে পুঁথি ছিনাইয়া লইয়া গিয়াছিল—কারণ একা তাহার বই বিক্রয় করিবার কোন অধিকার ছিল না। এইরূপ কোন একটা আকার ধারণ করিয়া মোকদ্দমাটা নিষ্পত্তি হইয়া গেল ও ভট্টাচার্য্য বেকসুর খালাস পাইল। তাহার বিরুদ্ধে পারিষৎ আর দেওয়ানী করিতে পারেন নাই—কারণ ইহার অল্প পরেই সংবাদ আসিল—ভট্টাচার্য্য শুধু রামেন্দ্রবাবুকে নয়, তাঁহার আত্মীয় স্বজন সকলকে ফাঁকি দিয়া সংসার হইতে চলিয়া গিয়াছে।

রামেন্দ্রবাবুর হাতের লেখা পড়া যাইত না; এইজন্য আমি এক পোষ্ট কার্ডের মধ্য হিজি বিজি লিখিয়া—মাঝে মাঝে তার দুই একটা বঙ্গাক্ষর ছিল—চিঠিখানির উপরে urgent লিখিয়া তাঁহাকে পাঠাইয়াছিলাম। তিনি গাড়ী করিয়া ঐ পত্র আমাকে দিয়া পড়াইয়া লইতে আসিয়াছিলেন, আমি হাসিতে হাসিতে সব কথা বলিয়া ফেলিলে তিনি "নির্দ্দহন্নিব চক্ষুষা" অভিনয় করিয়া আমার ভয় অপেক্ষা কৌতুকেরই বেশী উদ্রেক করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার "ত্রিপুরং জম্বুবং পূর্ব্বং রুদ্রস্যেব বভৌ

তন্থঃ"এই ভাব দর্শনে আমার ছোট ছোট ছেলেরা ভয় পাইয়া পলাইয়াছিল।

এই সকল কৌতুক ও আমোদ-প্রমোদ যাহা লইয়া শৈশবে মাতুলালয়ে নিত্য ব্যস্ত থাকিতাম—তাহা রোগ অভাব ও নানা ক্লেশের মধ্যে ও আমায় সময় সময় পাইয়া বসিত। একদিন ১লা এপ্রিল উপলক্ষে আমার ভায়রা ভাই রণদা প্রসাদ গুপ্তকে (জুবিলি আর্ট একাডেমির প্রিন্সিপাল) এক আত্মীয়াকে দিয়া আমার বড় মেয়ের নামে এই চিঠি দিলাম— "মেসো মহাশয়, বাবা হঠাৎ হার্টফেল করিয়া মারা পড়িয়াছেন" ১লা এপ্রেল সন্ধ্যাবেলা রণদা ও তাহার স্ত্রী হেমনলিনী দেবী চোখের জল মুছিতে মুছিতে দীর্ঘ নিশ্বাস প্রভৃতির দ্বারা শোক সূচনা করিয়া আসা মাত্র আমাকে দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইয়াছিল, তাহাতে আমি মনে করিয়াছিলাম বাঁচিয়া থাকাটা আমার পক্ষে ভারি অন্যায় হইয়াছে।

এই সময় কলিকাতা প্লেগের উৎপাত হওয়াতে আমি শ্যামপুকুর লেনের বাড়ী ছাড়িয়া লাউডন ষ্ট্রীটে ত্রিপুরার মহারাজার ভাড়াটে বাড়ীতে গেলাম। সেই বাড়ীর ভাড়া মাসিক বার শত টাকা। মহারাজা রাধা কিশোর মাণিক্য আমাকে সেই বাড়ীতে দয়া করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। মহারাজার দক্ষিণ হস্ত ছিলেন তখন আমার বাল্য সুহৃদ কর্ণেল মহিমচন্দ্র। অতি উদার চরিত্রের লোক, বাঙ্গলা লিখিতে—সুনিপুন, বেশ কথাগুলি জোটে, রাজনীতি ক্ষেত্রে ব্যস্ত না থাকিলে মহিম ভাল লেখক বলিয়া পরিচিত হইতে পারিতেন। রাজবাড়ীর লোকদিগের মধ্যে মহারাজ-কুমার নবদ্বীপচন্দ্র ছাড়া আমি এরূপ শিক্ষিত কায়দা দুরস্ত, মনস্বী ব্যক্তি আর দেখি নাই। মহিম আমার চিরউপকারী বন্ধু, মহারাজ রাধাকিশোর মাণিক্য আমাকে অনেক আর্থিক সাহায্য করিয়াছেন,— ত্রিপুরার রাজবাড়ীর সঙ্গে আমার চিরকালের একটা কৃতজ্ঞতা ও স্নেহ-মূলক

সম্বন্ধ আছে। অন্যত্র আমার অভিমান আছে, প্রতিষ্ঠা ও নিজপদমর্য্যাদার জ্ঞান আছে, কিন্তু ত্রিপুর রাজপ্রসাদে আমার প্রাণ বিকাইয়া গিয়াছে—সেখানে বিপদে পড়িয়া সাহায্য চাহিতে ও চাহিয়া সহায়তা না পাইলেও আমি কখনই লজ্জা বোধ করিব না; দুঃখে পড়িলে মহিমের কাঁধে মুখ লুকাইয়া কাঁদিয়াও সান্ত্বনা পাইয়া থাকি।

লাউডনষ্ট্রীটের বাড়িতে আসার দুই দিন পরে দেখিলাম, একজন ফিরিঙ্গী খিড়কীর দরজা দিয়া ঢুকিয়া বাড়ীর বৈদ্যুতিক আলোর তার কাটিয়া দিয়া চলিয়া গেল। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, পুরীটা আঁধার করিয়া ছেলে পেলে শুদ্ধ আমাদিগকে মারিয়া ফেলিবার উদ্যোগ করিতেছ নাকি? সে বলিল ত্রিপুর রাজ তাহাদের প্রায় এক বছরের বিল দেন নাই। আমি বলিলাম "তোমরা যা করিলে, তাতে যে আর কোন কালে বিলের টাকা পাইবে—তাহা মনে হয় না। কারণ রাজা আর ২।৩ বছরের মধ্যে যে এ বাড়ীতে আসিবেন তাহার সম্ভাবনা নাই।" আমি শেষে তাহাকে বুঝাইয়া বলিলাম, তুমি তারটা জুড়িয়া দিয়া যাও, আমি চেষ্টা করিয়া দেখি টাকা আদায় করিয়া দিতে পারি কি না। সে খানিকটা নীরব থাকিয়া শেষে তারটা আবার জুড়িয়া দিয়া চলিয়া গেল। আমি মহিমকে লেখা মাত্র বিলের টাকা চলিয়া আসিল। লাউডনষ্ট্রীটের আর এক বিপদ ছিল। চারিদিকে বড় বড় সাহেবের বাড়ি, আমাদের ছেলেদের কেউ কাঁদিয়া উঠিলে প্রতিবাসী সাহেবদের ছেলেরা বন্দুক দেখাইয়া গুলি করিবার ভয় দেখাইত। গুলি করাটা কিছুই আশ্চর্য্যের বিষয় নহে—কারণ তাহাদের হাত হইতে ফস্‌কিয়া গুলিটা চলিয়া আসিলে অনবধানতার ওজুহতে আইন তাহাদিগকে ছাড়িয়া দেবে, শুধু ক্ষুদ্রজীবী বাঙ্গালী শিশুর প্রাণটা পিতামাতাকে শোকে ভাসাইয়া যে চলিয়া যাইবে তাহা আর ফিরিবে না। ছেলেরা ভয়ে অস্থির হইয়া থাকিত,

তাহাদের পিতা মাতার ভয়ও কম ছিল না ;—ব্যথা, কষ্ট ও শত রকমের যন্ত্রণায় শিশুরা মুখ-ভঙ্গী করিয়া কান্নার অভিনয় করিত—ভয়ে কণ্ঠ হইতে স্বর উত্থিত হইত না। লাউডন ষ্ট্রীটের তৃতীয় বিপদ, নাপিতেরা গোঁপ কামাইয়া আট আনা চাহিত, বড় বড় সাহেবরা তাদের হাতে খেউরি হইয়া টাকাটা পকেট হইতে ফেলাইয়া দিতেন ; আমি এত দর কি করিয়া দিব ? সুতরাং মনে করিলাম মুনি গোঁসাইদের কিংবা ব্রাহ্মদের নকল করিয়া শ্মশ্রু গুম্ফরাজিত মুখশ্রী লইয়া নরসুন্দর-নন্দনদের ফাঁকি দিব।

কিন্তু চতুর্থ বিপদ—সত্য সত্যই একটা বিপ্লব উপস্থিত করিল। প্লেগের ভয়ে গগনবাবুরা যোড়াসাঁকোর বাড়ী ছাড়িয়া লাউডন ষ্ট্রীটের নিকট একটা বাড়ী ভাড়া করিয়া তথায় আসিলেন ; গগনবাবুর বড় ছেলে গুপুর সেই বারে বিবাহ হইয়াছিল। তাঁহার বয়স ছিল ১৬।১৭, ঠাকুরবংশ সৌন্দর্য্যের খ্যাতিতে সর্ব্বত্র পরিচিত,—এই বংশে ও গুপুর মত সুন্দর ছেলে খুব কম জন্মিয়াছে। গুপুর বিবাহে গগনবাবু বোধ হয় ৫০০০০৲ টাকার বেশী খরচ করিয়াছিলেন। পরিচিত আত্মীয় বন্ধুবান্ধবদের সকলকে নানা কারু-কার্য্যে পূর্ণ থালা ও অপরাপর তৈজস পত্র বিতরণ করিয়াছিলেন। সাহেব-পাড়ায় আসিয়া গুপুর টাইফড্ জ্বর হয়, এবং ৮।১০ দিন পরে তাহার মৃত্যু হয়।

এই অতীব শোকাবহ ঘটনায় গগনবাবুরা যোড়াসাঁকোর বাড়ীতে ফিরিয়া আসেন। তাঁহাদিগকে সর্ব্বদাই বিষন্ন দেখিতাম। আমি একদিন বলিলাম,—"আপনারা যদি সান্ত্বনা চান, তবে আমি একজন ভাল কথককে নিযুক্ত করিতে পারি, তাঁহার কথায় আপনারা শান্তি পাইবেন।" সমুদ্রে পতিত ব্যক্তি যেরূপ তৃণটিকে ও আশ্রয় করিতে হাত বাড়ায়, গগনবাবু এই প্রস্তাবটির সফলতা সম্বন্ধে আস্থা-হীন হইয়া ও ইহাতে রাজী হইলেন। বাড়ীর মেয়েরা সাগ্রহে এই প্রস্তাবে সায়

দিলেন। আমি ক্ষেত্রনাথ চূড়ামণিকে এই ভাবে তাঁহাদের বাড়ীতে লইয়া আসিলাম। মাথায় মস্তবড় টাক—বিশাল হাঁ, যেন জহ্নু মুণি সমুদ্র গ্রাস করিবেন, বর্ণটি জলোকালীব মত, বিশাল ভুঁড়ি লইয়া চটী পায়ে কথক-প্রবর গামছাখানি দিয়া বারংবার মুখ মুছিতে মুছিতে ব্যাসাসনে, আসিয়া বসিলেন। কিন্তু কথা বলিবার ইহার আশ্চর্য্য শক্তি ছিল, প্রথম দিনই আসর জমিয়া গেল। গগনবাবুদের বাড়ীতে ছেলে বুড়ো সকলে মৌতাত ধরিলেন—সন্ধ্যায় বড় হলঘরটায় ক্ষেত্রচূড়ামণির কালো কণ্ঠে ঔজ্জ্বল্য প্রদান করিয়া ফুলের মালা দুলিতে থাকিত, এবং তিনি ধ্রুব, প্রহ্লাদ, জড়ভরত, দক্ষযজ্ঞ, রুক্মিণীহরণ, বকাসুর বধ প্রভৃতি কত পালা যে বলিয়া যাইতেন, তাহার অবধি ছিল না। তিনি কথায় কথায় ছবি আঁকিয়া যাইতেন ; বর্ণনার ছটায় মেঘ, বৃষ্টি, বসন্ত, সমীরণ, এবং পদ্মবন যেন চোখের সম্মুখে উপস্থিত করিতেন—কখনও শ্রোতৃবর্গ অশ্রুসিক্ত হইয়াছে, কখনও ও হাসির স্রোতে ভাসিয়া গিয়াছে। এরূপ অপরূপ বক্তাকে পাইয়া ধর্ম্মের কথায় পৌরাণিক প্রসঙ্গে মন হইতে শোক ধীরে ধীরে মুছিয়া যাইতে লাগিল, তাঁহার বাক্‌ছটায় অঙ্কিত চিত্র হইতে আমি 'ধরা দ্রোণ' 'জড়ভরত' ও 'সতীর' মাল্ মসলা সংগ্রহ করিতে লাগিলাম। প্রায় এক-মাসের মধ্যে গগনবাবুর মন এরূপ লঘু হইয়া গেল, যে যখন ক্ষেত্র-কথক কথা বলিতেন, তখন গগনবাবু লুকাইয়া তাঁহার চেহারা ও ভঙ্গীগুলি আঁকিতেন। এপর্য্যন্ত মতিবাবু ছিলেন তাঁর অঙ্কনের প্রধান লক্ষ্য, এখন হইতে ক্ষেত্রচূড়ামণি এই ক্ষেত্রে মতিবাবুর ভাগী হইলেন। ক্ষেত্র-কথকের উপার্জ্জন ও কম হইত না। বামণভিক্ষা প্রভৃতি পালায় বাড়ীর মেয়েরা তাঁহাকে গহনা, মোহর ও টাকা দিতেন,—দুইমাসে তাঁহাকে ভুঁড়ি বাড়িয়া গেল, চেহারার চিকনাই হইল, কালো রংটা শ্যামাভ হইল। তাঁহার উপার্জ্জন দেখিয়া মতিবাবুর ঈর্ষা হইত। তিনি বঙ্কি

ক্ষেত্র চূড়ামণি কথক

(শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত চিত্র হইতে)

স্তেন, "আপনারা শোনেন নাই—তাই! পেনেটিতে এক কথক আছেন, তিনি যখন কথা বলেন, তখন শ্রোতারা কখনও হাসিতে হাসিতে গড়াগড়ি যান, করুণ-রস বর্ণনা কালে স্ত্রীলোকেরা মূর্চ্ছা যায়,—পুরুষেরা মাটীতে মাথা খুঁড়িতে থাকে, আপনারা এক ক্ষেত্রকেই চিনিয়াছেন ভারি তো চূড়ামণি!" তখনই সেই পেনেটির কথককে আনা হইল, তিনি কিছু মাত্র জমাইতে পারিলেন না। কিন্তু মতিবাবু দমিবার ছেলে নন—বলিলেন, "বামুণ বুড়া হয়ে গেছে, দাঁত পড়ে গেছে, সেরূপ আর শক্তি নাই। কিন্তু বেনেটোলায় এক কথক এসেছেন, তিনি নাকি পুত্রশোকীকেও হাসাইতে পারেন।" আসিলেন সেই বেনেটোলার কথক—কিন্তু ক্ষেত্র-কথকের পায়ের নখের কাছে তিনি দাঁড়াইতে পারিলেন না। এই ভাবে আর দুইমাসের মধ্যে ২৫।২৬ জন কথক মতিবাবু আস্ফালন করিতে করিতে লইয়া আসিলেন,—কিন্তু ক্ষেত্রকথক কলিকাতার কথকমণ্ডলীর চূড়ার কৌস্তভমণি হইয়া রহিলেন, তাঁহার আসন কেউ টলাইতে পারিলেন না। একমাত্র শ্যামবাজারের কৃষ্ণকথক ক্ষেত্র চূড়ামণির প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। কিন্তু তিনি নানাকারণে আমাদের আহ্বানে প্রতিদ্বন্দীতার ক্ষেত্রে কথকতার পরীক্ষা দিতে রাজি হইলেন না।

ইহার মধ্যে রবীন্দ্রবাবু গগনবাবুকে কুষ্টিয়া-নিবাসী শিবুকীর্ত্তনিয়ার কথা বলিলেন। শিবু আসিল। ভিনি, ভিডি, ভিসি, আমি আসিলাম, আমি দেখিলাম, আমি জয় করিলাম। প্রথম দিন গোষ্ঠ গাহিয়াই সে সভা মাৎ করিয়া দিল, আর কি কথকতা দাঁড়াইতে পারে? তাবৎ একতারা যে পর্য্যন্ত বীণা না আসিয়াছে, তাবৎ মল্লিকার বাস যে পর্য্যন্ত গোলাপ তাহার মাদকতা লইয়া না ছুটিয়াছে। মনোহরসাহী একটানে কথকতা উড়াইয়া লইয়া গেল। শিবু বৃন্দা-দূতির মত হাত নাড়িয়া ব্যাজোক্তি করিতে পারিত, গুন্ গুন্ করিয়া ভ্রমরের মত বিলাপের সুরে গুঞ্জন

করিতে পারিত,—প্রেমের উচ্ছ্বাসে পাগলের মত প্রলাপ বকিয়া শ্রোতাকে পাগল করিতে পারিত। সে হঠাৎ গাইতে গাইতে গান অসমাপ্ত রাখিয়া শুধু হাতের ভঙ্গী দিয়া বাকী টুকু বুঝাইয়া দিত, তার চেহারাটা ছিল ক্ষুদ্র একটা হাতীর মত, হাতী যেমন শুঁড় দোলাইয়া বাঁশীর সুরে নাচিতে থাকে, শিবু সেইরূপ ভুড়ি দোলাইয়া হাত প্রসারণ করিয়া যে কত ভঙ্গীতে শ্রোতার মন ভুলাইত তাহা আর কি বলিব! শিশুর দল হইতে সুরু করিয়া বৃদ্ধ দ্বিজেন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত তাঁহার গান শুনিয়া কাঁদিতেন।

একদিন রবীন্দ্রবাবু বলিলেন, "শিবু তুমি তো খুব ওস্তাদ, তোমার পূর্ব্বরাগ, মাথুর এগুলি না হয় বুঝিলাম, কিন্তু ব্রাহ্ম-মেয়েরা থাকবেন— তুমি 'খণ্ডিতা'র পদ গাইবে কিরূপে? দেখ যেন হাটে হাঁড়ি না ভাঙ্গে।" শিবু যোড়হাত করিয়া বলিল "হুজুর শুনবেন, এসকল আমাদের ভক্তির কথা—এতে কি কোন দোষের কারণ থাকতে পারে?"

সেই দিন শিবু খণ্ডিতার পালা গাহিল। প্রথমেই আসরে আসিয়া শিবু চৈতন্য-চরিতামৃত হইতে পদ উদ্ধৃত করিয়া বুঝাইল, গানে গানে বুঝাইল, যাহারা আত্মেন্দ্রিয়ের বশীভূত তাহারা প্রেম—নির্ম্মল ভগবৎপ্রেম বোঝে না। কিন্তু ভগবান কি তাই বলিয়া তাহাকে কি ছাড়িয়া দেন? কামুক ভগবানের বুকে নখাঘাত করে—তাঁহাকে আঁচড়াইয়া কামড়িয়া দেয়—তবু দয়ার আধার ভগবান তাঁহার কাছে যান। প্রেমিক দুঃখ করিয়া বলেন, "তোমার জীব তোমাকে কত কষ্ট দিতেছে!" এই কথা গুলি শিবু এমন চমৎকার করিয়া বুঝাইল যে ভগবানের অসীম দয়ার রাজ্য—এবং তাহাতে পাপীকৃত অপরাধের চিত্র যেন স্পষ্ট হইয়া শ্রোতৃ-বর্গকে এক উর্দ্ধতন রাজ্যে লইয়া গেল, তার পর যখন সেই ব্যাখ্যার আলোকে সে চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে নখাহত, দংশিত কৃষ্ণের শ্যামলরূপ

শিব কীর্ত্তনীয়া

(শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর-অঙ্কিত চিত্র হইতে)

আঁকিয়া দেখাইল, তখন কোন অপবিত্রতার লেশ সেই সকল পদে স্পর্শিল না,—সমস্তই যেন মনকে এক ঊর্দ্ধ-রাজ্যের স্বর্গীয় সংগীতের ঝঙ্কারে মাতাইয়া তুলিল।

ক্ষেত্র-চূড়ামণির পশার শিবু আসিয়া এই ভাবে মাটী করিয়া দিয়া গেল। ক্ষেত্র-কথক আমার নিকট প্রায়ই আক্ষেপ করিয়া বলিতেন, "তাই তো দীনেশ বাবু, শিবু এসে আমার বাঁধা আসরটা নষ্ট করিয়া দিয়ে গেল।"

আজ শিবুও নাই, ক্ষেত্রকথক ও নাই, কিন্তু গগনবাবুর পুরাতন চিত্র-খাতায় ইহাদের ছবি নানা ভঙ্গীতে আঁকা আছে, তাহা একটা দেখিবার জিনিষ বটে।

একদিন চন্দ্রশেখর কালী ডাক্তার মহাশয় আমাকে বলিয়াছিলেন, "পৃথিবীতে আমি ছুটি জিনিষ ভালবাসি, হোমিওপ্যাথী ও মনোহর সাই গান।"

শিবুর পরে আমি গণেশের কীর্ত্তন শুনিয়াছি। শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাস গণেশের কীর্ত্তনে মাতিয়া গিয়াছেন। গণেশ বেশ গায়—বিশিষ্ট লোকের আসরে গণেশ গাহিবার যোগ্য। সুরটি মেয়েদের মত মিষ্ট,—ভাবও বেশ লাগাইতে পারে। কিন্তু শিবুর ভাব, ভঙ্গী ও উন্মাদনা গণেশের নাই, গণেশ অনেকটা সভ্য-রকমের গায়ক। কিন্তু কীর্ত্তন গায়কের রাজা গৌর দাস। গৌরদাস রাত্রি ৯টায় জপ করিতে বসে, রাত্রি তিনটায় জপ শেষ হয়—সমস্ত সময়ই প্রায় কাঁদিতে থাকে,—পার্শ্বে তাহার যুবতী স্ত্রী ঘুমাইয়া থাকে, শুনিয়াছি গৌরদাস তাঁহার দিকে দৃক্‌পাত ও করে না। তাহার জপমালা একটা গোখরা-সাপের মত, এত বড় তুলসীর মালা আমি দেখি নাই; সে থলি হইতে সেটি বাহির করিলে ছেলেরা ভয় পায়, ঐ জপ-মালাটা গৌরদাসের প্রাণ, সে নিঃসন্তান। আমি আধুনিক শিক্ষিত ব্যক্তি-

দিগকে কি করিয়া বুঝাইব যে ঐ জপমালা গৌরদাসের সন্তান ও স্ত্রী প্রভৃতি সকলের স্থান পূরণ করিয়াছে। তার চেহারাটা দাঁড় কাকের মত, কথা-বার্ত্তায় কতকটা পাগলের মত—সে আসিয়া হয়ত আমার সোনার চস্‌মাটা ধরিয়া টানাটানি আরম্ভ করিল, না হয় আমার আলোয়ান খানা লইয়া নিজে গায় দিয়া হাসিতে লাগিয়া গেল। এদিকে সে এতবড় হিসাবী, যে আসরে যদিও একচ্ছত্র সম্রাট, তথাপি গান গাহিয়া যাহা পায় দলের লোকেরা হয়ত সবটাই ফাঁকি দিয়া লইয়া যায়—গৌরদাসের হয়ত অন্ন জোটে না।

কিন্তু এসকল সত্বেও এই গৌরদাসের মত লোককে যে দিন শিক্ষিত সমাজ চিনিবে, সেই দিন তাঁহাদের শিক্ষা সম্পূর্ণ হইবে। বড় বড় ইংরেজী পুস্তকের গৎ আওড়াইয়া চম্‌কাইয়া দেওয়ার যুগ চলিয়া গিয়াছে। বাঙ্গালা দেশের সভ্যতার সার--যাহা ৭।৮ হাজার বছর যাবৎ চলিয়া আসিয়াছে,তাহার কতক কতক বৈষ্ণবদিগের সহজ-সম্প্রদায়ের পুস্তকে আছে। বটতলা কিছু কিছু ছাপাইয়া রাখিয়াছে। যাহাকে আমরা নিম্নশ্রেণী বলি, তাহারাই এই পুস্তক গুলির পাঠক। মহাযান সম্প্রদায়ের মতগুলি তন্ত্রের ভিতর দিয়া পরিশুদ্ধ হইয়া কিরূপ অপূর্ব্ব প্রেমধর্ম্মে পরিণত হইয়াছে, যাহা শুনিলে যুরপীয় দার্শনিকের বিস্ময় জন্মিবে, তাহার বোদ্ধা আমাদের জন-সাধারণ। শিক্ষিত সম্প্রদায় এখনও তাহার খবর পান নাই, অনেক সময় সেগুলি সম্প্রদায়-বিশেষের পারিভাষিক শব্দপূর্ণ, সে ভাষার নাম 'সন্ধ্যাভাষা' তাহা অপরের দুর্ব্বোধ্য। গৌরদাস যখন গান গায় তখন চৈতন্য-চরিতামৃতের প্রকৃত ব্যাখ্যা হয়। বহু কথা যাহা আজীবন বৈষ্ণবপদ ঘাটিয়া আমি বুঝিতে পারি নাই—গৌরদাস গান গাহিয়া তাহা আমাকে বুঝাইয়াছে। পদাবলীর টীকা হইয়া গিয়াছে। চণ্ডীদাসাদির যে টীকা রাধামোহন ঠাকুর সংস্কৃতে পদামৃত সমুদ্রে করিয়াছেন—তাহা হইতে উৎকৃষ্ট টীকা গায়কেরা

করিয়াছেন, তাহা গানে গানে মুখে মুখে চলিয়া আসিয়াছে--সেই টীকার নাম আখর। গৌরদাস এই আখরের রাজা ; সে যখন গোষ্ঠ গানকরে, তখন যেন কোন যাদু কাটির স্পর্শে চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতি সজীব হইয়া আসরে উপস্থিত হন। এরূপ অপূর্ব্ব হইতে অপূর্ব্ব কিছু আমি শুনি নাই। কালিদাস, বাল্মীকিকে হার মানাইয়া দেয় এই কীর্ত্তন। সেই কালো, কঙ্কালসার, রেখাগ্রস্ত কপাল, একান্ত নিরীহ, ব্যক্তি যখন আসরে আসিয়া দাঁড়ায়, তখন যেন দেবী ভারতী স্বয়ং বীণা লইয়া সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়ান। কীর্ত্তন শুধু গান নহে, ইহা উপনিষদের সময় হইতে বৌদ্ধ জগতের মধ্যদিয়া ভারতীয় যত ধর্ম্মমত হইয়াছে তাহার হৃদয়গ্রাহী সরল ব্যাখ্যা,তাহা সমস্ত ধর্ম্মের প্রাণ—হিন্দুসভ্যতার রাগ-রাগিনীতে মূর্ত্তিমান প্রকাশ। গৌরদাস পাগল, হাতে তালি ও বাহাবার চোটে সে হয়ত বক্তৃতা আরদ্ধ করিয়া দিল, তখন গান মাটি হইয়া গেল। তেজস্বী ঘোড়ার যেরূপ রাস ধরিয়া রাখা চাই,—গৌরদাসকে সেই রূপে গানের মধ্যেই রাখিয়া দেওয়ার চেষ্টা দরকার। ইতর শ্রেণীর শ্রোতারা ব্যাখ্যা শুনিয়া হাতে তালি দিয়া গৌরদাসকে বিপথে লইয়া গিয়া তাহার গান মাটি করিয়া ফেলে। এই একরূপ নিরক্ষর বৈষ্ণব ভিখারী কেমন করিয়া হিন্দুর দার্শনিক তত্ত্বের অতি সূক্ষ্ম বিষয় গুলি এরূপ মন ভুলানো গানে পরিণত করিয়া ফেলিল—তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় বটে। আখর গুলির কতক সে পূর্ব্ব পুরুষদের নিকট হইতে পাইয়াছে সত্য, কিন্তু অধিকাংশ আখর সে জপের নিকট পাইয়াছে—কৃষ্ণ-ভক্তিতে ভরপুর তাঁহার স্বীয় নয়নাশ্রুর নিকট পাইয়াছে। বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস ও গোবিন্দ দাসের পদ পাইলে তাহার মনের বীণা ঝংকার দিয়া বাজিয়া উঠে তাহার আখর গুলি সেই ঝঙ্কার হইতে উৎপন্ন। সে আসরে একাই একশ। শিবু, গণেশ তাহার ছাত্র হইবার যোগ্য। তাহার খোলের হাত এত দুরন্ত, যে সে যখন খোলওয়ালার ব্যর্থতায় চটিয়া গিয়া শিখাটা

দোলাইতে দোলাইতে খোলে চাটি দেয়, তখন খোল যেন মানুষের ভাষা শিখিয়া কথা বলিতে থাকে।

আমাদের নকল বাণী-প্রিয় দেশ গৌরদাসের মত ব্যক্তিকে চিনিল না। আমাদের ঘরের কাছে নিরন্ন গায়ক খোল-করতাল-মন্দিরার সঙ্গে হিন্দুর সুপ্রসিদ্ধ অথচ চির জীবন্ত, অতি সূক্ষ্ম অথচ অতি সরস, অতি-দার্শনিক হইয়া অতি মধুর, সারগর্ভ অথচ সকরুণ—যে শিক্ষা বেদ বেদান্তের সার, যাহা চৈতন্য জীবনের সাক্ষাৎ প্রকাশ, চরিতামৃতের মর্ম্ম—তাহা বুঝাইতে চাহিয়া দ্বার ঠেলিয়া প্রবেশ চাহিতেছে, আমরা বিদেশী শিক্ষার মোহে নেংটী পরা ভিখারী মনে করিয়া তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিতেছি। এইরূপে আমরা আমাদের দেশ-লক্ষ্মীকে পদে পদে অপমান করিতেছি। আমাদের আঙ্গিনা হইতে সেই লক্ষ্মীর অলক্তক রাগরঞ্জিত পায়ের ছাপ মুছিয়া ফেলিয়া কতকগুলি বিলাতী কচু টবে সাজাইয়া রাখিয়া "আমার দেশ" গান ধরিয়া বিলাতী সুরে বিষম চীৎকার করিতেছি—এই আমাদের দেশ-হিতৈষিতা ও স্বদেশ-ভক্তি।

আমাদের সঙ্গে অপরাপর দেশের তফাৎ এইখানে—আমাদের কুশিক্ষার ঘুটচক্রে—দেশের যাহা বড় তাহা ছোট হইয়া গিয়াছে, ঠাকুর কুকুর হইয়াছে, যাহা কিছু নগণ্য, ক্ষুদ্র - তাহাই দীর্ঘ তালতরুবৎ আকাশ স্পর্শ করিয়া উঠিয়াছে। আমরা রামচন্দ্রকে ছাড়িয়া ডুবালকে লইয়া বড়াই করিতে শিখিয়াছি।

আমি আর একটি কীর্ত্তন-গায়কের নাম করিব, তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ সঞ্জীব চন্দ্রের পুত্র—জ্যোতিশ্চন্দ্র। জ্যোতিশের ভক্তি এতবড় যে কীর্ত্তন গাহিতে যাইয়া তিনি কাঁদিয়া আকুল হন, তাঁহার ভক্তিপূর্ণ আবেগ ও মন ভুলানো কীর্ত্তনগানে শ্রোতৃবর্গ মাতিয়া উঠে। তিনি পুলিসের উচ্চ কর্ম্মচারী ছিলেন। বীরভূমিতে থাকা কালীন তিনি ময়নাডাল প্রভৃতি

স্থান হইতে কীর্ত্তন শিখিয়া আসিয়াছেন। তিনি বৈষ্ণব-পদে মসগুল হইয়া আছেন, কাহারও কীর্ত্তন শুনিতে যান না, কেবল গৌরদাসের নাম শুনিলে উন্মত্ত হইয়া রাতদিন গ্রাহ্য না করিয়া ছুটিয়া যান। গৌরদাসের বাড়ী নবদ্বীপ বক-পাড়ায়। কিন্তু সে কলিকাতায় শ্যাম-বাজার কাণা-রাজার বাগানে সস্ত্রীক বাস করিতেছে।

এদেশের এই রীতি যে মহা-কবি যে কাব্য রচনা করিয়া গেলেন, তাঁহার ভাব সাধরণ্যে বুঝাইতে গায়কেরা উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া যায়, এইভাবে চণ্ডীমঙ্গল, রামমঙ্গলের উৎপত্তি। দেশেটা এই ভাবে একটা কাব্যের জগৎ হইয়া পড়িয়াছে। আমাদের বাল্মীকি ধূর্জ্জটির জটাবদ্ধ হইয়া থাকেন নাই—সেক্ষপীয়রাদিকে ইংরেজজাতি একরূপ শেল্ফে তুলিয়া রাখিয়াছেন, কচিৎ কোন পরিশ্রমী পাঠক তাহার পাতা উল্টাইয়া গবেষণা করিয়া থাকেন, কিন্তু গায়কেরা আমাদের দেশে ভগীরথের মত পল্লীর দুয়ারে দুয়ারে কাব্যগঙ্গাকে বহাইয়া দেন। সর্ব্বাপেক্ষা হিন্দুর প্রাণ-ভাণ্ডা-রের অমূল্য হীরামাণিক লইয়া গৃহে গৃহে হরিলুট দিতেছেন, কীর্ত্তণ গায়কেরা। এই সকল চিরন্তনী মহাশক্তি, যাহা আমাদের সামাজিক জীবনকে ঘিরিয়া রাখিয়াছে, যাহার অপর্য্যাপ্ত মহাদানে এই সমাজ সরস হইয়াছিল, যাহা হইতে কাব্য-ভাবের পুষ্পবৃষ্টি নিরন্তর হইয়াছে, শিক্ষাভিমানীর অব-হেলা ও তাচ্ছল্যে তাহার মূল পর্য্যন্ত শুকাইয়া উঠিয়াছে—এইরূপ গায়ক-সৃষ্ট,সার্ব্বজনী শিক্ষা—সভ্যতার বিস্তার—প্রায় আর পৃথিবীর কোন স্থানে নাই। জাতীয় শিক্ষার এই মুকুটমণি কি খসিয়া পড়িবে? ইঁহারা কাব্যগুলিকে জীবিত রাখিয়াছেন, তাহাদের সর্ব্বকালের করিয়া রাখিয়া-ছেন—চৈতন্য প্রভুর শ্রীমুখ আরতির পঞ্চ-প্রদীপে আলোকিত করিয়া দেখাইয়াছেন,—আজ জাতীয় শিক্ষা কি ইহাদিগকে বাদ দিয়া সফলতার চেষ্টা করিবে!

বাড়ীতে এই সময় সকলেরই অসুখ চলিতেছিল। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দেও যে আমি খুব ভাল শোধরাইতে পারিয়াছিলাম, তাহা নহে। যদি ও চলিতে ফিরিতে শক্তি হইয়াছিল, সে শক্তি হঠাৎ পাইতাম, আবার হঠাৎ খোওয়াইয়া বসিতাম। এমন মাস যায় নাই, যাহাতে অন্ততঃ সাত আট দিন একবারে সামর্থ্যশূন্য হইয়া বিছানায় পড়িয়া না রহিয়াছি—কোন কোন মাসের প্রায় সব কটা দিনই রোগের শয্যায় শুইয়া—জানেলা পথে রাস্তা দিয়া লোকের আনাগোনা, গো,-শকট—অশ্ব-শকট-চালকের বিচিত্র মুখভঙ্গী ও মূক পশুর উপর কষাঘাত প্রত্যক্ষ করিয়াছি, পাল্কী-বাহকের দুর্ব্বোধ্য সমস্বরে উচ্চারিত উড়িয়া বুলি ও তালে তালে পা ফেলা—নিতান্ত কৌতুকাবহ ব্যাপারের ন্যায় লক্ষ্য করিয়াছি। যখন খুব ভাল থাকিতাম, তখনও এক মাইলের বেশী হাঁটিতে পারিতাম না। এই সময় আমার কন্যা ব্রজবালা-দেবীর মৃত্যু হয়—সে দশ বছরে পা দিয়াছিল; আমি আমার ছেলে মেয়েদের একটা কণ্ডাক্ট-রেজিষ্টার করিয়াছিলাম—তাহাতে সে প্রায়ই প্রথম থাকিত। সে ছিল শ্যামাঙ্গী, কিন্তু এরূপ মৃদু-স্বভাবের মেয়ে, সেরূপ ভীরু প্রায় দেখা যায় না; সে একা ঘরে থাকিলে নিজের একটা ছায়া দেখিয়া চমকিয়া উঠিত,—তাই ভাবি—যে আঁধার রাজ্যের নামে বড় বড় বীর আতঙ্কিত হয়—সেই রাজ্যে এই ভীরু শিশু একা কেমন করিয়া থাকিবে? সে ছায়ার ন্যায় আমার পাছে পাছে থাকিত, নিজের স্নেহশীল কচি হাত দুখানি দিয়া আমার শয্যা প্রস্তুত করিত ও পরিশ্রান্ত হইয়া বাড়ী ফিড়িয়া আসিলে আমাকে হাওয়া করিত—আমার বস্ত্রাদি সাজাইয়া রাখিত। তাঁহার জন্য কবিরাজ যোগীন্দ্রনাথ সেন এবং তাঁহার পিতৃদেব নিঃস্বার্থভাবে যতদূর সাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য এই দুই মহারথী প্রাণপণে যম-রাজের সঙ্গে জুঝিয়াও তাহাকে রাখিতে পারিলেন না। ৪৯ দিন জ্বরে ভুগিয়া এক মঙ্গলবার

অপরাহ্নে সে চলিয়া গেল—প্রাণ-ত্যাগের মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত সে তাহার মায়ের দিকে স্নেহনির্ভরশীল পরম করুণ দৃষ্টিতে চাহিয়া ছিল, সেই দৃষ্টি এখন পর্য্যন্ত আমাদের বুকে শেলের মত বিঁধিয়া আছে। সে নিবেদিতার স্কুলে পড়িত—তাহার আঁকা ছবি, এবং লেখার খাতা নিবেদিতা একখানি সহানুভূতিপূর্ণ চিঠি লিখিয়া আমায় পাঠাইয়া দিয়াছিলেন।

সে টাইফড জ্বরে মৃত্যু মুখে পতিত হয়। এক ঘরে যখন সে নিদারুণ জ্বরে ইহসংসারের দ্বার ডিঙ্গাইয়া যাইবার উপক্রম করিতেছিল—তখন অন্য ঘরে পাঁচ বৎসরের ছেলে বিনয় সেই ক্রূর টাইফড জ্বরে আক্রান্ত হইয়া পিতামাতার বিরল-সঙ্গের জন্য হাঁপাইতেছিল—উৎকট অবস্থায় ব্রজ-বালাকে ছাড়িয়া আমরা তাহার প্রতি মনোযোগী হইতে পারি নাই। তাহাকে বাড়ী হইতে বিদায় করিয়া দিয়া বিনয়ের অবস্থা দেখিয়া ভীত হইলাম। কবিরাজ মহাশয় আর্ত্ত কণ্ঠে বিদায় গ্রহণ করিলেন, যাঁহাকে ধন্বন্তরী জ্ঞানে চিকিৎসার ভার দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতাম,—তাঁহার উপর সেরূপ বিশ্বাস আর রাখিতে পারিলাম না। রাত্রে বিনয়ের অবস্থা এমন হইল যে সে রাত্রিই তাহাকে রাখা যায় কিনা—সন্দেহের স্থল হইল; পাড়ার হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার কৃষ্ণবাবু দেখিতেছিলেন। রাত্রে তাঁহার নিকট হইতে বারংবার ঔষধ আনিতে লাগিলাম। কিন্তু তিনি কিছুতেই রাত্রিকালে রোগী দেখেন না বলিয়া আসিতে রাজী হইলেন না। সে নিদারুণ বাত্র কোনক্রমে কাটিয়া গেল; পর দিন প্রত্যূষে বাড়ী হইতে বাহির হইলাম, বাড়ীর দ্বারদেশে একটি ক্ষুদ্র ঘট দেখিয়া অশ্রুতে মুখ ভাসিয়া গেল, সেই ঘটরূপে—মৃত শিশু যেন আমার গৃহে তাহার শোক-স্মৃতি রাখিয়া গেছে, পার্শ্বে একটা গলির মধ্যে দেখিলাম তার শয্যা,—আমার পা যেন আর চলিতে চায় না। চোখের জল মুছিতে মুছিতে বড় রাস্তার বাহির হইয়া দেখিলাম, মিউনিসিপালিটি রাস্তার গাছ গুলির

বড় বড় ডাল কাটিয়া ছাটিয়া দিয়াছেন। নিতান্ত পরিচিত পথ অপরিচিতের মত বোধ হইল, জনপূর্ণ পথ শূন্য মনে হইল। চন্দ্রশেখরবাবুর বাড়ীতে যাইয়া শুনিলাম, তিনি রোগীর আহ্বানে মফঃস্বলে চলিয়া গিয়াছেন। আমার মাথায় যেন বাজ পড়িল; মনে হইল যেন ভগবান সব দিক হতে আমায় ছাড়িয়া দিলেন, তখন চিরদিন যাহা করিতে চেষ্টা পাইয়াছি. তাহাই করিলাম "তুমি ছাড়িয়া দিতে পার, আমি তোমাকে ছাড়িয়া দিলে কি লইয়া থাকিব?" এই ভাবে নির্ভর করিয়া তাঁহার পাদপদ্ম মনে মনে আকড়াইয়া ধরিতে চেষ্টা করিলাম। বাড়ীতে আসিয়া দেখি, ভ্রাতা গিরীশচন্দ্র সতীশ বরাট ডাক্তার মহাশয়কে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছেন। এখন সতীশবাবু কলিকাতার উত্তর ভাগের একজন নামজাদা ডাক্তার, কিন্তু তখনও তিনি ফুটিয়া উঠেন নাই। আমি গিরীশকে বলিলাম, "ইঁহার উপর এই সঙ্গীন রোগীর ভার দিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারি কি?" সতীশ বলিলেন "আমি এখন ঔষধ দিচ্ছি, এর পরে ডি, এন রায় কি প্রতাপ মজুমদারকে বৈকালে কি কাল আনা যাইবে।" আশ্চর্য্যের বিষয় ১৭ দিন যাবৎ যে জ্বর ১০৫এর নীচে নামে নাই, গত রাত্রে যে রোগীর ৫০।৬০ বার রক্ত দাস্ত হইয়াছে, এক মাত্রা ঔষধ সেবনে জ্বর ১০২ ডিগ্রিতে নাবিয়া আসিল, এবং পেট ও অনেক ভাল হইল। তারপর দিন শ্যাম-পুকুরের বাড়ী ছাড়িয়া শিশু-বিনয়কে অতি সাবধানে পাল্কীতে চড়াইয়া কড়িয়াপুকুরের এক নূতন বড় রকমের ভাড়াটে বাটীতে লইয়া আসিলাম, তখন ইহার ভাড়া ছিল ৩৫৲ টাকা; এখন বোধ হয় ১২০, টাকা হইয়াছে।

সতীশের চিকিৎসায় বিশেষ উপকার পাওয়াতে তাঁহারই উপর চিকিৎসার ভার রহিল। কিন্তু ২।৪ দিন পরে ভয়ানক বিভীষিকা দেখিলাম। আমার স্ত্রীর কলেরা হইল, এবং আমার চতুর্থ পুত্র বিনোদ (তখন

২১/২ বৎসর বয়স্ক) হারাইয়া গেল, এদিকে নানা উদ্বেগে নিজ হাতে টোস্তে বার্লি জ্বাল দিতে যাইয়া স্পিরিটের আগুণে রুগ্ন শিশু বিনয়ের মাথার চুল পোড়াইয়া ফেলিলাম ও আমার হাত পুড়িয়া গেল। বিনোদের জন্য হেম-গিরীশ, প্রভৃতি ভ্রাতৃবর্গ খুঁজিয়া হয়রাণ হইল। আমি শয্যাগত হইয়া পড়িলাম, কে দেয় পথ্য, কে দেয় ঔষধ? স্ত্রীর অবস্থা খারাপ হইতে চলিল,—এক মাত্র ভৃত্যটিকে গিরীশচন্দ্র প্রহার করাতে সে পলাইয়া গেল,—এই একটা দিন চির-জীবনের স্মরণীয়। যখন বিপদ আসে—তখন তাহা শিলাবৃষ্টির মত আইসে। আমি নিরুপায় হইয়া কর্ণধারকে হাল ছাড়িয়া দিলাম—"মাঝি তোর বেঠা নেরে, আমি আর বাইতে পারি না।"

দুশ্চিন্তায় ও শোকে আমার স্ত্রী এতদূর অন্য-মনস্কা হইলেন, যে তাঁহার কলেরা সারিয়া যাইবার মধ্যে হইল; সতীশকে ছোট ভাইয়ের মত কাছে কাছে পাইয়াছিলাম, বিপদের দিন মনে হইতে যেরূপ কষ্ট হয়—বিপদের সময়ের বান্ধবতার স্মৃতি আবার তেমনই মহার্ঘ্য। পুলিসে খবর গেল, নানারূপ সন্ধান হইতে লাগিল, ছয় সাত ঘণ্টার পর সন্ধ্যাকালে নিকারি পাড়ার ভোলা মিস্ত্রি বিনোদকে কোলে করিয়া উপস্থিত হইল। আমি ঝাঁপাইয়া পড়িয়া ভোলোকে আলিঙ্গন দিলাম। আমার স্ত্রী আনন্দে কাঁদিতে লাগিলেন। ভোলা মিস্ত্রি আমার বাড়ী তৈয়ারী করিতেছিল, সে বিনোদকে চিনিত। সে সন্ধ্যাকালে দেখিতে পাইল, শিশু একটা ছড়ি হাতে নিকারী-পাড়ায় এক মুসলমানের বাড়ীর ঘরের দেয়ালে গা ঠেকাইয়া কাঁদিতেছে এবং অনেক লোক তাকে বেষ্টন করিয়া নানা প্রশ্ন করিতেছে,—কিন্তু তাহার কান্না বোঝা যাইতেছে—কথা বোঝা যাইতেছে না, আড়াই বছরের ছেলের ভাষার অর্থ কোন অভিধানেও থাকার কথা নহে।

সতীশের চিকিৎসার ছয় মাস পরে বিনয় সারিয়া উঠিল। তারপর শ্রীচন্দ্রের ও সুধীরচন্দ্রকে সেই পীড়া আক্রমণ করিল। অত্যন্ত সংকটাপন্ন অবস্থা হইতে সতীশ তাহাদিগকে বাঁচাইয়া আমাকে ফেরৎ দিয়াছেন। টাইফড রোগ চিকিৎসায় তাঁহার মত কৃতী চিকিৎসক আমি দেখি নাই। আমার বাড়ী ছাড়াও তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। প্রাচ্য-বিদ্যার্ণব মহাশয়ের বাড়ীতে ও সতীশ সেইরূপ আশ্চর্য্যজনক কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন—শ্মশান-যাত্রীকে মায়ের কোলে ফিরাইয়া দিয়াছেন।

এই সময়ে শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র বিচারপতি মহাশয়ের বিশেষ উদ্যোগে সামাজিক আন্দোলন জাগিয়া উঠিল। নগেন্দ্র বাবু 'কায়স্থ কারিকা' লিখিলেন এবং তিনি এই আন্দোলনের প্রাণস্বরূপ হইলেন। বিষয় সংক্রান্ত তাবৎ ব্যাপারে তাহার মত বোদ্ধা আমি খুব কম লোকই দেখিয়াছি, তথাপি আমার কথার উপর কেন জানি তাঁহার অখণ্ড বিশ্বাস ছিল, তিনি সকল বিষয়েই আমার পরামর্শ লইয়া চলিতেন।

তিনি উপবীত গ্রহণ করিবেন কিনা এই লইয়া দোমনা ছিলেন। আমার পীড়াপীড়িতে শেষে পৈতা গ্রহণ করা ঠিক করিয়া ফেলিলেন। বৈদ্য ও ব্রাহ্মণ-সমাজে আমি এজন্য নিন্দিত হইব, আমি জানিতাম। কিন্তু যখন কেহ তাঁহা[illegible] পথ কি আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, তখন আমি সাম্প্রদায়িকতা দ্বারা নিজকে অন্ধ করিয়া বন্ধুকে অশুভ পন্থা দেখাইতে প্রস্তুত হইতে পারি নাই। ব্রাহ্মণদের অনেকে যে এক সময় পৈতা সর্ব্বদা গলায় পরিতেন না, তাহার প্রমাণ আমি যথেষ্ট পাইয়াছি। এই নগেন্দ্রবাবুর বাড়ীতেই একজন নেপালবাসী করাত্রী একবার কাঠ চিরিতে ছিল, সে খুব লোভনীয় বড় বড় রুটি তৈরী করিত। আমি তাঁহাকে আমার জন্য সেইরূপ কয়েকখানি রুটি তৈরি করিতে

বলিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম "তোমারা কোন জাত ?" সে বলিল "ব্রাহ্মণ", আমি তার পৈতা দেখিতে চাহিলে সে বলিল, "আমার পৈতা নাই, আমি কাঠ চেরার কাজ করি, আমার পতার কি দরকার, ? আমার কনিষ্ঠ সহোদর যজন যাজন করে—তার গলার পৈতা আছে।" একটা ঐতিহাসিক তত্ত্ব এই কথায় আমার নিকট প্রকাশিত হইল। যদিও ক্ষুদ্র হউক এই পৈতাটার ভার দিনরাত্রি কাঁধে করিয়া রাখিবার দরকার কিছু ছিল না, দরকার না হইলে মানুষ একটা বাহুল্যের প্রশ্রয় দেয় না। পৈতার নাম যজ্ঞোপবীত। শ্রাদ্ধাদি কার্য্যের সময় যজন যাজন উপলক্ষেও যজ্ঞের জন্য এই ধর্ম্মচিহ্নের ব্যবহার হইত। যাঁহারা পুরোহিত, তাঁহাদের পৈতা সর্ব্বদা গলায় রাখার দরকার হইত—কিন্তু অপরাপর ব্রাহ্মণেরা সময়ে এই চিহ্ন ধারণ করিতেন, সময়ে ছাড়িয়া দিতেন। ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম ব্রাহ্মণ জাতিকে সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র-গৌরবে বঙ্গদেশে প্রতিষ্ঠা করিবার পর, ব্রাহ্মণমাত্রেরই উহা এদেশে অপরিহার্য্য সঙ্গী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহার পূর্ব্বের পৈতা সম্বন্ধে কোন কড়াকড়ি নিয়ম ছিল না। এজন্য বারেন্দ্র ব্রাহ্মণেরা যে একসময় পৈতা ত্যাগ করিয়াছিলেন, "তাহা পৈতা ছাড়ি পৈতা লয়—বৈদিকে দেয় পাতি" এই পরিচিত প্রবাদ বাক্যে পাওয়া যাইতেছে। বিজয়গুপ্তের মনসাদেবীর ভাসানে মুসলমানকৃত অত্যাচার বর্ণন প্রসঙ্গে লিখিত আছে "বাছিয়া ব্রাহ্মণ লয় পৈতা যার কাঁধে। প্যায়দাগণ নাগ পাইলে হাতে গলায় বাঁধে।" ইহা দ্বারা দেখা যায় যে তাহারা শুধু সেই সকল ব্রাহ্মণকে ধরিয়াছিল, যাহাদের গলায় পৈতা ছিল। সুতরাং সকল ব্রাহ্মণের গলায় পৈতা ছিল না। মানিক চন্দ্ররাজার গানে দৃষ্ট হয় ব্রাহ্মণ রাজসভায় আহুত হইলে উত্তরীয়ের ন্যায় পৈতাগাছা ও পরিতেন, তাহা তাঁহার গল-লগ্ন থাকিত না। লোচন-দাসের চৈতন্যমঙ্গলে দেখা যাইতেছে, চৈতন্য প্রভু পূর্ব্ববঙ্গে ব্রাহ্মণের

প্রাকালে স্বীয় পৈতাগাছা কণ্ঠ হইতে তুলিয়া তাঁহার স্ত্রী লক্ষ্মীদেবীকে স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ উপহার দিয়া গেলেন। সুতরাং পৈতা, ছাড়া, আর ধরা— এটা শুধু সামাজিক ব্যাপার। আমি নগেনবাবুকে বলিলাম, "শুনিয়াছি, উত্তর পশ্চিমের লালাকায়েতেরা আপনাদিগকে কায়েৎ বলিয়া স্বীকার করেন না। বাঙ্গালার ব্রাহ্মণাদি সমস্ত জাতিকে তাহারা ঠেকাইয়া রাখিয়াছেন। কিন্তু ভারতবর্ষের খণ্ড খণ্ড জাতিগুলি যদি এক হইতে পারে—সেটাও যে জাতীয় ঐক্যের পথে একটা মস্ত বড় লাভ। যদি উপবীত গ্রহণ করিলে লালাকায়েতেরা আপনাদিগকে স্বজাতি বলিয়া স্বীকার করেন—তবে সংখ্যাবলে আপনারা বলীয়ান হইয়া উঠিবেন। আমাদের এই ছিন্নবিচ্ছিন্ন সমাজের কোন এক শ্রেণী যদি এই ভাবে বড় হয়—তাহা সকলের পক্ষেই কল্যাণকর হইবে। দ্বিতীয়তঃ কে কোন জাতি কে জানে? সমাজে বিশুদ্ধ বলিয়া গণ্য ব্রাহ্মণের শিরার রক্ত পরীক্ষা করিলে উহা অবিমিশ্র বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে না। যখন আদম হাল চষিতেন এবং হেবা তাঁত বুনিতেন, তখন কে ছিল ব্রাহ্মণ আর কে ছিল শূদ্র! কিন্তু এখন যদি আপনারা আপনাদিগকে ক্ষত্রিয় বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে পারেন—তবে শুধু নামটির জোরে ক্ষাত্রতেজ আপনাদের সমাজদেহে কিছু না কিছু সঞ্চারিত হইবে, এবং আচার শুদ্ধতার দিকে ও একটা লক্ষ্য পড়িবে—এদিক দিয়াও তো মস্ত বড় লাভ।"

আমার উৎসাহে নগেন্দ্রবাবু উপবীত গ্রহণ করিলেন, কিন্তু ঠিক পৈতা দেওয়ার মুখে পুরোহিতেরা প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও পলাইয়া গেলেন। নগেন্দ্র বাবুর সমস্ত উদ্যোগ পণ্ড হইবার মধ্যে আসিল। তাঁহার মুখখানি ভয়ে ও লজ্জায় ছোট হইয়া গেল, দেখিয়া আমি অতিশয় ব্যথিত হইলাম। আমি রাস্তা হইতে কোটালিপাড়ার বিখ্যাত চৌধুরী বংশোদ্ভব রামকৃষ্ণ-পণ্ডিতকে গামছা জড়াইয়া বলপূর্ব্বক ধরিয়া আনিলাম, এবং যে পর্য্যন্ত

নগেন্দ্রবাবুর উপবীত কার্য্য শেষ না হইল, সে পর্য্যন্ত তাঁহাকে চোখের আড়াল হইতে দেই নাই। তিনি বারংবার পলাইবার জন্য এ দরজা সে দরজায় ঢু মারিতে ছিলেন। এই পৌরহিত্যের দরুণ বৈশ্যদের যাঁহারা যাঁহারা তাঁহাকে প্রণামী দিতেন. তাঁহারা তাহা বন্ধ করিয়া দিলেন। রামকৃষ্ণ চৌধুরী এইজন্য বৎসর বৎসর আমার নিকট খেসারৎ আদায় না করিয়া ছাড়িতেন না।

ইহার পর অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়ের পুত্রের সঙ্গে নগেন্দ্রবাবুর কন্যার বিবাহ আমিই স্থির করিয়া দেই। অক্ষয়বাবু ছিলেন পৈতা-বিরোধী—আমি তাঁহাকে অনেক তর্ক-বিতর্ক করিয়া এই বিবাহে সম্মত করাইয়াছিলাম। কিন্তু বিবাহ-বাসরে শ্রদ্ধেয় সরকার মহাশয়ের আনীত ব্রাহ্মণেরা নগেন্দ্রবাবুর বাড়ীতে কিছুতেই খাইবেন না, স্থির করিয়া আমার বাড়ীতে আসিয়া জলযোগ করিতে চাহিলেন। আমি তাঁহাদিগকে বুঝাইলাম—এতকাল শূদ্রদিগের পৌরহিত্য করিয়া তাঁহারা হীন কাজ করিয়াছেন, এখন কায়স্থেরা যখন ক্ষত্রিয় ও উপবীতধারী হইলেন,—তখন তাঁহারা অশূদ্র-প্রতিগ্রাহী হইয়া পবিত্র হইবেন। ইহাতে তাঁহারা কেন বিরক্ত হইতেছেন? এই সকল কথায় তাঁহারা প্রীত হইয়া নগেন্দ্রবাবুর বাড়ীতে যাইয়া আহারাদি করিলেন।

বৈশ্য-সমাজ আমার উপর বিরক্ত হইলেন, আমি বৈশ্য-সভার সম্পাদক ছিলাম। কৈফিয়ৎ স্বরূপ আমি বলিলাম, "আমাদের এই সামাজিক পদ-মর্য্যাদার উদ্ধার কল্পে যে জাতিই যে চেষ্টা করিতেছেন—তাহা তাঁহাদের পক্ষে কল্যাণকর, পরন্তু সমস্ত হিন্দু সমাজের পক্ষেও তাহা শুভ। আমরা ভাই ভাইয়ের মত পরস্পরকে ধরিয়া তুলিব—কায়স্থ ক্ষত্রিয় হইলে আমাদের অনিষ্ট কি? ঈর্ষা-দ্বেষে সমাজ নষ্ট হইবার পথে দাঁড়াইয়াছে। আমরা এই ক্ষেত্র হইতে যথাসাধ্য কাঁটা তুলিয়া ফেলিব, কাঁটা বনে জল সেচন

করিয়া তাহা পোষণ করিব না। পরস্পরের কপালে পরস্পরে গৌরব-চন্দনের কোঁটা আঁকিয়া প্রীতি-সূত্রে আবদ্ধ হইব। আমি এই বিষয়ে অনুকূলতা দেখাইয়া কি অন্যায় করিয়াছি, বুঝাইয়া দিন্।"

কিন্তু ইহার পরে বিশ্বকোষে 'বৈদ্য' শব্দ লইয়া বিদ্বেষপূর্ণ একটা কুৎসাকর প্রবন্ধ প্রকাশিত হইল। প্রবন্ধ-প্রকাশের প্রায় ছয় মাস পরে উহা আমি প্রথম দেখিলাম। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখ ও ক্ষোভের সহিত শুনিলাম, ঐ প্রবন্ধটি আমি লিখিয়াছি বলিয়া কেহ কেহ প্রচার করিয়াছেন। বৈদ্য-সম্প্রদায়ের কেহ কেহ আমাকে কায়স্থদের অনুকূল জানিয়া এমন একটা নিতান্ত অস্বাভাবিক ও অমূলক কথাও বিশ্বাস করিয়াছিলেন। পৃথিবীতে ফুল ছড়াইলে প্রতিদানে ফুল পাওয়া যায় না, অনেক সময়ে কপালে শূল ঘটে, এই পৃথিবী বড় বিষম স্থান।

অক্ষয় সরকার মহাশয়ের সঙ্গে বি, এ পরীক্ষার পরীক্ষকতার সাহচর্য্যে আমি ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হইয়াছিলাম। বিরাট—বপু, শ্বেত দাড়ী,—যেন মনুষ্য-জগতের পাহাড়-পর্ব্বত, অল্পভাষী কিন্তু যখন সাহিত্যিক প্রসঙ্গে কথা বলিতেন, তখন দুইটী চক্ষু যেন প্রতিভায় জ্বলিয়া উঠিত। বঙ্কিম-বাবুর প্রিয় বন্ধু ইনি ও চন্দ্রনাথ বসু উভয়ের রচনাই এক সময় বঙ্গ-দর্শন অলঙ্কৃত করিয়াছে। যখন বাঙ্গালী ইংরেজী সাহিত্যের অনুরাগে অন্ধ হইয়া দেশীয় পুঁথিগুলিকে তামাক-পাতার মত অশ্রদ্ধের মনে করিত, তখন ইনি ইংরেজী সাহিত্যানুরাগী হইয়া ও তারতম্যে বাঙ্গালা গীতি-কবিতার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিয়াছিলেন,—ইনি কবির গানের "হাসি হাসি যখন সে আসি বলে। সে হাসি দেখি ভাসি নয়ন জলে" প্রভৃতি চিত্রের বঙ্গীয় কুল-বধূর সলজ্জ গণ্ডের রক্তিমা আঁকিয়া দেখাইয়া-ছিলেন। ইংরেজী কবিদের কাছে যে বাঙ্গলার কবিওয়ালা শুধু দাঁড়াইতে পারে তাহা নহে, তাঁহাদিগকে এমন বীণার সুর শুনাইয়া দিতে পারে,

যাহা 'বে অফ্ বিস্কে' কিম্বা 'ইংলিশ চানেলের' পারে কখনও বাজে নাই—এই কথা অক্ষয়বাবু সর্ব্বপ্রথম বুঝাইয়াছিলেন। চন্দ্রবাবু সংস্কৃত-সাহিত্যের দিক দিয়া হিন্দু আদর্শের শ্রেষ্ঠত্ব বুঝাইয়াছিলেন। চন্দ্রশেখরবাবু সুকোমল চিত্তবৃত্তির খেলা খেলিয়া বৈষ্ণব কবিগণের কাব্যটি নূতন করিয়া আধুনিক গদ্য-ছন্দে নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। আর্য্য-দর্শনের যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ রাজ-নীতির ক্ষেত্রে বিদেশী ক্ষাত্র তেজ বাঙ্গলায় আমদানী করিয়া পাশুপত অস্ত্রের সন্ধান করিতেছিলেন। আমি ইহাঁদের প্রত্যেকের সঙ্গেই ঘনিষ্ঠভাবে মিশিয়াছি। গত যুগ ইহাঁদের সঙ্গে চলিয়া গিয়াছে,—সাহিত্য-ক্ষেত্রে ইহাঁদের অগাধ পাণ্ডিত্য এ যুগের লেখকগণের মধ্যে নাই। ইহাঁদের কাছে বসিলে, কথায় মুগ্ধ হইতে হইত। ইহাঁরা বিদ্যার গৌরবে গৌরবান্বিত ছিলেন—ইঁহাদের তুলনায় এখনকার লেখকেরা হাল্কা,—সে পাণ্ডিত্য, সে পুরুষোচিত তেজ, সে গাম্ভীর্য্য এখন সাহিত্য-ক্ষেত্রে পাওয়ার আশা বৃথা। তাঁহারা ছিলেন সাহিত্যের প্রতিষ্ঠাতা, পর্ব্বত ভাঙ্গিয়া ইহাঁরা পথ করিয়া দিয়া গিয়াছেন—তাই এখনকার নির্ঝর-নিনাদ ও মৃদুতরঙ্গের গান আমরা শুনিতেছি। চন্দ্রশেখরবাবু একদিন প্রায় তিন ঘণ্টাকাল তাঁহার 'উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম' লেখার ইতিহাস আমাকে বলিয়াছিলেন। সে যে কি উন্মাদনাময় ইতিহাস! মনে হইয়াছিল যেন বাল্মীকির কাব্য কিংবা নারদের বীণা ধ্বনি শুনিতেছি। কি করিয়া তিনি বাঙ্গলা সাহিত্যের পথে আসিলেন, বঙ্কিমবাবুর সঙ্গে পরিচিত হইলেন, স্ত্রী-হারা হইয়া আহার নিদ্রাশূন্য বিরহী যক্ষের মত শুকাইয়া কাঠ হইয়া গেলেন—সমস্ত বলিয়াছিলেন, তেমন কথায় মোহিনী অল্পই শুনিয়াছি। চন্দ্রশেখর-বাবু শুধু নহেন, বঙ্কিম-যুগের প্রায় সকলেই এইরূপ কথা ও পাণ্ডিত্য দ্বারা, বিস্মিত, স্তব্ধ এবং মুগ্ধ করিতে পারিতেন। একালের লেখকেরা মেয়েলী ছন্দে কথা কহেন, মেয়েলী ঢঙ্গে কোঁকড়াইয়া চুল গ্রীবার উপর

ফেলিয়া দেন,—কথার চাতুরী ও বাক্‌ছল দ্বারা মনোরঞ্জন করেন—কিন্তু এই নারায়ণী সৈন্যের সুদর্শন চক্রের প্রভাব স্বীকার করিয়া ও সেই গাণ্ডীবীদিগকে মনে পড়ে, যাঁহারা ধনুতে জ্যা আরোপণ করিলে অর্দ্ধ বিশ্ব চমৎকৃত হইত এবং অক্ষৌহিণী সৈন্য শুধু ধনুর টঙ্কারের রব শুনিয়া রণক্ষেত্র হইতে পলাইয়া যাইত।

একটা কথা লিখিতে ভুলিয়া গিয়াছি। ফরিদপুর হইতে কলিকাতায় আসিয়া আমি,কর্ণেল মহিমচন্দ্র ঠাকুর এবং সুরেশচন্দ্র সমাজপতির সঙ্গে অন্ধ কবি হেমচন্দ্রকে দেখিতে গিয়াছিলাম। হেমচন্দ্রের কবিতার প্রতি বাল্যকালে আমাদের যে অনুরাগ ছিল—এখনকার ছেলেদের তাহার কিছুই নাই। শৈশবে মাণিকগঞ্জ স্কুলে আমরা তাঁহার"সুদূর পশ্চিমে ছাড়িয়া গান্ধার, ছাড়িয়া পারস্য আরব কান্তার" প্রভৃতি কাব্য আবৃত্তি করিতাম, পূর্ণবাবু মাষ্টারমহাশয় সেগুলি আমাদের তরুণ কণ্ঠে গানের সুরে ধরাইয়া দিয়াছিলেন! যৌবনে "আবার গগনে কেন সুধাংশু উদয় রে" প্রভৃতি পদ আওড়াইয়া আমরা নিরাশ প্রণয়ী সাজিয়াছি। কলেজে পড়ার সময় দশমহাবিদ্যার "রে সতী রে সতী, কাঁদিল পশুপতি—পাগল শিব প্রমথেশ" প্রভৃতি ছন্দাত্মক কবিতা লঘু-গুরু মাত্রা ঠিক করিয়া আবৃত্তি-কৌশল দেখাইয়াছি। তারপর কুমিল্লা থাকিতে বরদাচরণ মিত্র মহাশয় উত্তেজিত ও বিস্ময়াভিভূত ভাবে হেমবাবুর 'বৃত্রাসুর-বধ' কাব্যের কবিত্ব ব্যবচ্ছেদ করিয়া দেখাইতেন। তাঁহার মতে 'বৃত্র-সংহার' কাব্যের মত কাব্য বাঙ্গলায় হয় নাই। মেঘনাদ বধ কাব্যের সঙ্গে তিনি তুলনামূলক সমালোচনা করিতেন, এবং পদে পদে হেম-কবির মহাকাব্যের সৌন্দর্য্য আবিষ্কার করিতেন। বৃত্রাসুরের গৌরব লঙ্কেশ্বরের নাই, এবং শচীর বিরাট-চিত্রের নিকট প্রমীলা সীতা ও মন্দোদরী হীন-প্রভ,—হেম-কবি অতি অল্প কথায় খুব বড় বড় চিত্র ফলাইতে পারেন, মাটি চিত্রের

যে কৌশল তিনি দেখাইয়াছেন, তার নিকট মেঘনাদ-বধ দিবা-প্রদীপবৎ ম্লান হইয়া গিয়াছে, এই ছিল তাঁহার মত। নীলকণ্ঠ মজুমদার মহাশয় আমাদের শিক্ষক ছিলেন, তিনি দশ-মহাবিদ্যাকে মানব সমাজের ক্রমোন্নতির আধ্যাত্মিক আলেখ্যস্বরূপ গ্রহণ করিয়া সুদীর্ঘ সমালোচনা করিয়াছিলেন। এই বড় বড় সমালোচকগণের মতকে যাঁহার কাব্য এতটা অনুকূল ও বিস্ময়াবিষ্ট করিয়াছিল—তাঁহার কবি-প্রতিভা অবশ্যই বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইবার সামগ্রী।

তখনও সাহিত্যিক জগতের রবি মধ্যাহ্ন-গগনে উদিত হইয়া অপরাপর জ্যোতিষ্কমণ্ডলীকে সম্পূর্ণরূপে নিষ্প্রভ করিয়া দেন নাই। তখনও হেমবাবুর যশ ডঙ্কানিনাদে বিঘোষিত হইত, "বিংশতি কোটী মানবের বাস" শুনিলে বঙ্গ-যুবকের শিরায় রক্ত উষ্ণ হইয়া উঠিত।

এই কবিবরকে দেখিতে উৎসুক হইয়া আমি অসুস্থ শরীরে ও এক খানি গাড়ী করিয়া সঙ্গিদ্বয় সহ খিদিরপুর রওনা হইলাম। তখন শীতকাল, বেলা দুইটা, কি তিনটার সময় প্রকাণ্ড বাপীনীর-বিধৌত, মধ্যাহ্ন-রৌদ্র-স্পৃষ্ট মধুর শীতোষ্ণ বায়ু-প্রবাহে সুখানুভব করিয়া একখানি বৃহৎ দ্বিতল বাড়ীর সম্মুখীন হইলাম। পুকুরটির উত্তর পাড়ে বাড়ীটি চিত্র-পটের ন্যায়,—বড় হইলেও বাড়ীখানি যেন অনাদরে শ্রীহীন হইয়া আছে, গৃহ-স্বামীর দৃষ্টি নাই বলিয়াই এই দুর্গতি, বুঝিতে পারিলাম। বেশী লোক জন নাই, আমরা সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিলাম। সম্মুখের হল-ঘরটি হইতে পুকুরটি বড় সুন্দর দেখাইল, ঘর খানি যেন দক্ষিণানিল উপভোগ করিবার জন্য সেই দিকে মুখ ফিরাইয়া বসিয়া আছে। একটা মলিন টেবিল ও দুই চারি খানি চেয়ার পূর্ব্ব কোণে, এবং হলের অপর প্রান্তে একখানি সামান্য তক্তপোষ, তাহার উপরে তোষক ও চাদর অবশ্যই আছে, কিন্তু তাহা এত মলিন ও ছিন্ন যে

কবি-রাজের চক্ষু থাকিলে তিনি তাহা কখনই ব্যবহার করিতেন না, মনে হইল তাঁহার তো চক্ষু নাই—এবং তাঁহাকে দেখিবার ও কোন চক্ষু নাই।

কবিবর সেই ম্লান শয্যার উপর খাটো একখানি মলিন কাপড় পরিয়া বসিয়া ছিলেন, শ্যামবর্ণ, ঈষৎ স্থূলাকৃতি। সুরেশবাবু মহিমঠাকুরের পরিচয় দিলেন। ত্রিপুর-রাজের ষ্টেট হইতে কবিবরের জন্য একটা বৃত্তি মঞ্জুর হইয়াছিল, এজন্য তিনি মহিমকে ধন্যবাদ দিলেন, আমার কথা শুনিয়া বলিলেন "এর ও তো আমার মত ২৫৲ টাকার একটা বৃত্তি গভর্ণমেণ্ট দিয়াছেন!" এই বলিয়া কিছু কাল চুপ করিয়া শেষে বলিলেন, "আপনারা কেন আসিয়াছেন?" আমি বলিলাম, "আপনাকে দেখতে আসিয়াছি।" এই কথা শুনিয়া তাহার ঠোঁট দু'খানি কাঁপিয়া উঠিল, হঠাৎ কণ্ঠ স্বর পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল, এবং অশ্রুরুদ্ধ স্বরে বলিলেন "কি দেখ্‌তে এসেছেন?" এই বলিয়া আর নিজকে সাম্‌লাইতে পারিলেন না, প্রায় ৫ মিনিট কাল বালকের মত কাঁদিতে লাগিলেন। তাঁহার সঙ্গে আর আলাপ করিতে পারিলাম না। কিন্তু "কি দেখ্‌তে এসেছেন" কম্পিত কণ্ঠের এই উক্তি ও অন্ধ চক্ষুর সেই অজস্র অশ্রু অনেক কথা অতি স্পষ্ট ভাবে বুঝাইয়া দিল,—বুঝিলাম যে তাজমহল ভাঙ্গিয়া গেলে তাহার চূর্ণ বিচূর্ণ প্রস্তর দেখিতে আমরা আসিয়াছি; রাজ-রাজেশ্বর পথের ভিখারীর মত রাস্তায় দাঁড়াইয়া হাত পাতিয়া মুষ্টি ভিক্ষা লইতেছেন, তাই দেখিতে আসিয়াছি। শীতকালে পত্র-সার শেফালিকাতরুকে দেখিতে আসিয়াছি। সে করুণ কাহিনী কথায় বুঝাই-বার নহে, অশ্রুই তাহার একমাত্র ভাষা। সেই অশ্রুতে আমরা সব কথা বুঝিলাম। কবিবরের হৃদয়ের অন্তস্তলের ব্যথা করুণ ভাবে, সম্পূর্ণ ভাবে আমাদের কাছে ব্যক্ত হইয়া পড়িল। আমরা ও সাশ্রুনেত্রে স্তব্ধ

হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। তারপর তাঁকে প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলাম। সেই করুণ দৃশ্য এখনও ভুলিতে পারি নাই, হেম-কবির যত কাব্য পড়িয়াছি, তাহার মধ্যে তাঁহার জীবনের এই শেষ পত্রের ন্যায় কোনটিই বোধ হয় এত মর্ম্মস্পর্শী নহে।

১৯১০ সনে আমি আবার কর্ম্মঠতা ফিরিয়া পাইয়াছিলাম। কত যে প্রবন্ধ লিখিয়াছি তাহা মনে নাই। প্রবন্ধ লিখিয়া যাহা পাইতাম, প্রধানতঃ তাহাতেই সমস্ত সাংসারিক খরচ পত্র চলিয়া যাইত। প্রতি প্রবন্ধের জন্য ২০৲ হইতে ৫০৲ পর্য্যন্ত পাইয়াছি। নিতান্ত ছোট প্রবন্ধ ১০৲।১২৲ টাকায় ও লিখিয়াছি। দাসী, প্রদীপ, প্রবাসী, বঙ্গ দর্শন, ভারতী, জন্মভূমি, সাহিত্য, বামাবোধিনী প্রভৃতি কত পত্রিকায় যে কত প্রবন্ধ লিখিয়াছি; তাহা এখন স্মরণ নাই। ভগবান্ যখন আমাকে একটু স্বাস্থ্যের মুখ দেখাইয়াছেন তখন কখনও আমি বসিয়া থাকি নাই।

কুমিল্লায় ১৮৯৬ সনে যখন আমি উৎকট রোগ-শয্যায় পড়িয়াছিলাম, এবং যখন বঙ্গভাষা ও সাহিত্য প্রথম প্রকাশিত হয়,—সেই সময় অর্থাৎ ২৫ বৎসর পূর্ব্বে, আমি রবীন্দ্র বাবুর একখানি চিঠি পাইয়াছিলাম। তাহা একটা গৌরবের জিনিষ বলিয়া আমি অনেক দিন রাখিয়া দিয়াছিলাম। ছোট একখানি কাগজ দোভাঁজ করিয়া মুক্তার মত হরফে কবিবর লিখিয়াছিলেন, সেই প্রত্যেকটি হরফ আমার নিকট মুক্তার মত মূল্যবান বলিয়া মনে হইয়াছিল। বঙ্গ-সাহিত্যের রাজার অভিনন্দন সেই রাজ্যে নূতন প্রবেশার্থীর পক্ষে কত আদর-সম্মানের, তাহা সহজেই অনুমেয়। প্রথমবার কলিকাতায় আসিয়া একটি বছর ছিলাম, তখন আমি শয্যাগত, —রবীন্দ্র বাবুর সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ হয় নাই। ফরিদপুর থাকা কালে তিনি তাঁহার 'কণিকা' আমাকে উপহার পাঠাইয়াছিলেন, আমার মন্তব্য সম্বলিত চিঠির উত্তরে বাং ১৩০৭সনের ৩০শে ভাদ্র তারিখে তিনি লিখিয়া-

ছিলেন—"আপনার সমালোচনাটি কবির পক্ষে যে কত উপাদেয় হইয়াছে, তাহা ব্যক্ত করিতে পারি না। অসুস্থ শরীরে যে এই পত্রখানি লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, সে জন্য আমার অন্তরের ধন্যবাদ জানিবেন। কিছু দিনের জন্য কলিকাতায় গিয়াছিলাম। যখন আপনার খবর পাইলাম, তখন আর সাক্ষাৎ করিবার সময় ছিল না।" তারপর তিনি আমাকে শিলাইদহ যাইতে আমন্ত্রণ করিয়া চিঠির উপসংহার করিলেন।

এই সময় হইতে আমাদের পরস্পারের মধ্যে ঘনিষ্ঠ ভাবে পত্র-ব্যবহার চলিয়াছিল। ১৯০১ সনে কলিকাতায় ফিরিয়া যাইয়া আমি যোড়াসাঁকোর বাড়ীতে তাঁহার সঙ্গে দেখা করি। রবিবাবু শ্রেষ্ঠ কবি শ্রেষ্ঠ লেখক; অপরাপর লেখকের কাব্য পড়িলেই তাঁর মধ্যে যাহা ভাল তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু রবীন্দ্রবাবুর সমস্ত লেখা পাঠ করিলেও তাঁর সম্বন্ধে অনেক জানিবার বাকী থাকে; তিনি রূপ দিয়া চক্ষু ভুলান, "গুণে আঁখি ঝরে।" কণ্ঠস্বরের মিষ্টত্ব, বন্ধুর সহৃদয়তা ও ঋষি তুল্য ধর্ম্ম-ভাব দিয়া মন হরণ করেন,—তাঁহার সঙ্গে ঘনিষ্ট ভাবে মিশিবার পর অন্য সমস্ত প্রসঙ্গ ছায়ার ন্যায় মন হইতে চলিয়া যায়, এবং ছবির মত তিনি সমগ্র মনটি দখল করিয়া বসেন। কত দিন আমার ন্যায় শ্রোতার সম্মুখে সারাটি দিন বীণা-নিন্দিত স্বরে তিনি গান গাইয়া কাটাইয়াছেন,—কত দিন সাহিত্য-ধর্ম্ম-সমাজ নীতি সম্বন্ধে আলোচনা চলিয়াছে; তিনি নিত্যই নূতন হইয়া দেখা দিয়াছেন! রূপ ছন্দ ও চিত্ত হারী নানা গুণে তিনি আমার মত বহু লোককে ভুলাইয়া রাখিয়া ছিলেন। রবীন্দ্র বাবু ভদ্রতা ও সৌজন্যের খাতিরে কখনই লোক-মতকে গ্রাহ্য করিয়া লন না—ঠাকুরবাড়ীর সর্ব্বত্র একটা মৃদু-মধুর সৌজন্য আছে, পাছে পরের মনে আঘাত লাগে, এজন্য ঐ বাড়ীর কেহ কোন ভদ্র ব্যক্তির কথার প্রতিবাদ করেন না। কিন্তু রবিবাবু অতি মিষ্টভাষী হইয়া ও অন্যায় কথার প্রতিবাদী,

যাহা তিনি ভাল বলিয়া মনে করেন না, তাহা তাঁহার প্রতিভা ও ব্যক্তিত্বের পূর্ণ জোরে প্রতিবাদ করেন। গল্পচ্ছলে নানা কথা কহিবার সময়ও—তাঁহার সেই প্রখর স্বাতন্ত্র্য সর্ব্বদা জাগরূক থাকে। তাঁহার স্নিগ্ধ শ্লেষ ও বাক্‌চাতুরী অনেকেই টের পাইবেন, যাহাকে ইংরেজীতে pun বলে, তিনি কথাবার্ত্তায় অলঙ্কার-শাস্ত্রের সেই ধারাটি সর্ব্বদা ব্যবহার করেন। তাঁহার সম্পাদকতার সময় শৈলেশ তাঁহাকে না জানাইয়া নিজকে সহঃ-সম্পাদক বলিয়া বঙ্গদর্শনের মুখ-পত্রে ঘোষণা করিয়াছিলেন। আমি বলিলাম "শৈলেশ ত আপনার সহঃ সম্পাদক হইয়াছেন।" তিনি বলিলেন, "সহ" নহে "দুঃসহ"। কোন এক লোকের নাম ছিল—কয়েকটি কড়ি, বোধ হয় তিনকড়ি টিনকড়ি হইবে, সেই ব্যক্তির মতামত লইয়া কথা হইতেছিল,,—কেউ কেউ তাহার মতটির উপর খুব বেশী মূল্য দিতেছিলেন। রবিবাবু বলিলেন "উঁহার বাপ মায়ের চাইতে ও কি আপনারা উঁহাকে বেশী জানেন? তাঁহারা তো উঁহার প্রকৃত মূল্য ধার্য্য করিয়া রাখিয়াছেন।" বহুকাল হইতেই তাঁহার দর্শন-কামী ব্যক্তিগণ বাড়ীতে ভিড় করিয়া থাকেন। কেহ কেহ কিছুতেই উঠিতে চান না, স্নানের সময় অতিবাহিত হইয়া যায়, তথাপি বসিয়াই থাকিবেন। একদিন ঐরূপ এক ব্যক্তি বসিয়াছিলেন,—আমার দিকে মুখ ফিরাইয়া গোপনে জিজ্ঞাসা করিলেন "ইহাঁর নাম কি?" আমি বলিলাম "বসন্ত—" তিনি বলিলেন—"হয়েছে! 'বসন্তকে' উঠাবেন কি করে?" কথার এই চাতুরী তিনি মিষ্টভাবে—নিপুণ ভাবে এত বহুল পরিমাণে দেখাইয়া থাকেন, যে তাহাতে বাঙ্গলা ভাষার প্রতি শব্দটির প্রতি যে তাঁহার সর্ব্বদা লক্ষ্য—তাহা টের পাওয়া যায়।

আমার সঙ্গে পরিচয়ের পর তিনি 'চোখের বালি' লিখিতে সুরু করেন। একবার তিনি আমাকে বোলপুরে যাইতে সাদরআহ্বান পাঠাইয়া লিখিয়া-

ছিলেন,—(১২ই বৈশাখ, ১৩০৯) "আপনি এবার আমার এলাকার মধ্যে আসিয়া পড়িলে তাহার পরে যে কাণ্ডটা করা যাইবে সে আমার মনেই আছে। তাই বলিয়া বিনোদিনীর রহস্য-নিকেতনে আপনাকে অকালে প্রবেশ করিতে দেওয়া আমার সম্পাদক-ধর্ম্ম-সঙ্গত হইবে কি না, তাহা এখনো স্থির করিয়া উঠিতে পারিতেছি না। যাহা হউক আর বিলম্ব করিবেন না—পুঁথি পত্র সহ লুপমেলের গাড়িতে চড়িয়া বসুন, তাহার পরে আর আপনাকে কে নিবারণ করিতে পারে?" কিন্তু 'চোখের বালি' তিনি কিস্তিতে কিস্তিতে বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে আমাকে পড়িয়া শুনাইয়াছিলেন,বিনোদিনীর রহস্য-নিকেতনেআমাকে প্রবেশাধিকার দিয়াছিলেন। গোরার ও অনেকটা ছাপা হইবার পূর্ব্বে আমি তাঁহার মুখে শুনিয়াছিলাম। প্রেম খুব বড় বড় তুলিতে মোটা মোটা রেখায় আমাদের সাহিত্যে ইতি পূর্ব্বে আঁকা হইয়াছে। খুব গভীর ভাবের সঙ্গে অসামান্য সৌন্দর্য্য জ্ঞানের পরিচয় বৈষ্ণব কবিরা দিয়াছেন,—কিন্তু বিনোদিনী প্রভৃতি চিত্রের মধ্যে যে খোদ-কারী আছে, তাহা একান্ত অভিনব, এ যেন ঢাকাই সেকরার তারের কাজ,—প্রেম জিনিষটাকে কারু-কার্য্যের এমন নিপুণ সৌন্দর্য্য দিয়া তিনি আঁকিয়াছেন, যে তাহা চোখ বাঁধিয়া দেয়। প্রেমিকার চুলের গন্ধ, পঠিত পুস্তকের উপর সুগন্ধ তেলের দাগ, এবং মনস্তত্ত্বের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কোমল রেখা—স্বপ্নের জিনিষ, যেন অলক্তকের আলপনার মত, তাহা বিধিসৃষ্ট নারীকে নূতন করিয়া দেখাইতেছে।

এই শিল্প-কলা বঙ্গসাহিত্যে এক নূতন যুগ আনায়ন করিয়াছে। আমি নৌকাডুবি,চোখের বালি ও গোরা পড়ি নাই,রবিবাবুর মুখে শুনিয়া-ছিলাম, তেমন আগ্রহে ইহার পূর্ব্বে কোন বই শুনি নাই। কবির লেখা গীত হয় নাই, বাদিত হয় নাই, কিন্তু তথাপি বীণাবেণুর কথাই সর্ব্বদা মনে জাগাইয়া দিয়াছে—যেন বীণাপাণি নূপুর শিঞ্জিত পদে নৃত্য করিতে

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

করিতে চলিয়া যাইতেছেন, এই পুস্তকত্রয়ের নর্ত্তনশীল গদ্য ছন্দের গতি আমার নিকট তেমনই বোধ হইতেছিল। আমি নৈতিক আদর্শের কথা আনিব না,—অপেক্ষাকৃত অল্পদরের লেখকরা যখন রসের নামে ব্যভি-চারের প্রশ্রয় দেয়—তখন সে রসের নাম হয় বীভৎস। কিন্তু প্রকৃতই যদি কেহ সুরসিক হন, তবে তিনি মানুষের মনটা লইয়া পুতুল খেলা খেলিতে পারেন—তাহাও কি আবার যুক্তি দ্বারা প্রতিপন্ন করিতে হইবে?

রবিবাবু দয়া করিয়া অনেকবার আমাদের বাড়ীতে আসিয়াছেন, একবার আমার ৫ বৎসরের পুত্র বিনয় তাঁর লম্বা চুল গুলি লইয়া মাথাটা রবিবাবুর পায়ের উপর রাখিয়া আবদার করিয়া ধরিয়াছিল, "আমায় বোলপুরে লইয়া যাও।" রবিবাবু তাকে বড় হইলে নিয়ে যাবেন, এই আশ্বাস দিয়াছিলেন। সে কথা এখনও তাঁর মনে আছে, ঐ ছেলেটির কথা অনেকবার তিনি আমায় জিজ্ঞাসা করিতেন।

রবীন্দ্রবাবুর সর্ব্বাপেক্ষা চিত্তাকর্ষক গুণ—তাঁহার ভগবৎপ্রীতি, ইহাই তাহার নৈবেদ্য, গীতাঞ্জলি, খেয়া প্রভৃতি কাব্যের ছত্র গুলিকে এত উজ্জল করিয়াছে। এই ভগবৎ-প্রীতি—তাঁহাকে মনুষ্য সমাজ হইতে স্বতন্ত্র করিয়া দেয় নাই, বরং সমস্ত মনুষ্য-সমাজ, এমন কি প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীর সঙ্গে তাঁহার নৈকট্য ঘনীভূত করিয়া আনন্দরস-সিক্ত করিয়া দিয়াছে—ইহা শুধু তাঁহার কবিতার কথা নহে, ইহা শুধু প্রতিভার স্ফুরিত আক-স্মিক আলো নহে—ইহা তাঁহার জীবনের কথা, তাঁহার সাধনা.—তাঁহার বহু চিঠিপত্র আমার নিকট আছে; এই পত্রগুলিতে অনেকের মধ্যেই সেই সাধকের তপস্যা ব্যক্ত হইয়াছে। তাঁহার বিরুদ্ধে একবার কোন লোক বদ্ধপরিকর হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন এবং ক্রমাগত বিদ্বেষের বিষ পত্রিকায় বর্ষণ করিতেছিলেন। আমি তৎপ্রসঙ্গে তাঁহাকে লিখিয়াছিলাম, উত্তরে তিনি

লিখিয়াছিলেন (২০শে বৈশাখ ১৩০৯) "পত্রে আপনি যে কথার আভাস মাত্র দিয়া চুপ করিয়াছেন, সে কথাটা আমার গোচর হইয়াছে। লেখাটা আমি পড়ি নাই—আমার দৃষ্টিপথে আনিতে নিষেধ করিয়াছি, কারণ লেখক-জাতির অভিমান সহজেই আঘাত পায়, অথচ এরূপ আঘাতের মধ্যে লজ্জার কারণ আছে। নিজকে সেই গ্লানিকর অবস্থা হইতে রক্ষা করিবার জন্য আমি কথিত বা লিখিত গালিমন্দের কথা হইতে দূরে থাকিতে চেষ্টা করি। বিদ্বেষে কোন সুখ নাই, কোন শ্লাঘা নাই, এই জন্য বিদ্বেষটার প্রতিও যাহাতে বিদ্বেষ না আসে, আমি তাহার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়া থাকি। জীবন প্রদীপের তেল ত খুব বেশী নয়, সবই যদি রোষে দ্বেষে হুহুঃ শব্দে জ্বালাইয়া ফেলি, তবে ভালবাসার কাজে এবং ভগবানের আরতির বেলায় কি করিব ?"

এই ক্ষমা ও উচ্চ প্রীতির ভাবই কবি-দ্বিজেন্দ্রলাল সম্পর্কেও রবীন্দ্র-বাবুর মনে জাগিয়াছিল, তিনি আমাকে লিখিয়াছিলেন (১৩ই কার্ত্তিক ১৩১৩) "আমার কাব্য সম্বন্ধে দ্বিজেন্দ্রলাল রায় মহাশয় যে সকল অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা লইয়া বাদ-প্রতিবাদ করিবার কোন প্রয়োজন নাই। আমরা বৃথা সকল জিনিষকে বাড়াইয়া দেখিয়া নিজের মধ্যে অশান্তি ও বিরোধের সৃষ্টি করি। জগতে আমার রচনা খুব একটা গুরুতর ব্যাপার নহে, তাহার সমালোচনা ও তথৈবচ। তা ছাড়া সাহিত্য-সম্বন্ধে যাঁহার যেরূপ মত থাকে থাক্ না ; সেই তুচ্ছ বিষয় লইয়া কলহের সৃষ্টি করিতে হইবে নাকি ? আমার লেখা দ্বিজেন্দ্রবাবুর ভাল লাগে না, কিন্তু তাঁহার লেখা আমার ভাল লাগে, অতএব আমিই জিতিয়াছি—আমি তাঁহাকে আঘাত করিতে চাই না।"

আমার ছেলে অরুণকে তাঁহার হাতে সঁপিয়া দিয়াছিলাম। তাহাকে লইয়া রবীন্দ্রবাবুর সঙ্গে আমার একটা মনান্তর হইয়াছিল। দোষ হয়ত

আমারই ছিল, কিন্তু কোন কোন চক্রীলোক নানা অমূলক কথা আমার সম্বন্ধে প্রচার করিয়া এই মনোমালিন্যটা বাড়াইতে চেষ্টা করেন। কিন্তু রবীন্দ্রবাবু চিরকালই বন্ধুবৎসল, উদারপ্রকৃতি, তাঁহার মনের দুর্য্যোগ শীঘ্রই কাটিয়া যায়। এতদুপলক্ষে তিনি আমাকে যে দীর্ঘ পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা পড়িয়া আমি অশ্রু সংবরণ করিতে পারি নাই। উত্তেজনার সময় কেহ নিজের দোষ স্বীকার করিতে চান না, কিন্তু রবিবাবুর দেবপ্রকৃতি সেই উত্তেজনার সময় কিরূপ বিনয় ও ক্ষমা ভূষিত হইয়া আমার চক্ষে আবিষ্কৃত হইয়াছিল, তাহা সেই পত্রের সামান্য অংশ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি "যদি অজ্ঞানে অথবা ভ্রমক্রমে আপনার মনোবেদনার কারণ হইয়া থাকি, তবে শত সহস্রবার আপনাকে প্রণিপাত করিয়া আপনার মার্জ্জনা ভিক্ষা করি। আমার দোষ যথেষ্ট আছে, সেজন্য সংসারে আমি প্রশ্রয় পাই নাই। প্রত্যাশাও করি না। আপনাদের সকলের কাছে পরমেশ্বর আমার মাথা হেঁট করিয়া দিন, আমাকে এমন জায়গায় দাঁড় করান যেখানে আপনাদের কৃপা পাত্র হইতে পারি, কিন্তু চিরদিন আপনাদের অসহ্য মনস্তাপের কারণ হইয়া আপনাদিগকে অন্যায়ে উত্তেজিত করিতে থাকিব, ইহাই না ঘটে, এই আমার অন্তরের প্রার্থনা। আমি রাগ করিয়া আপনার সঙ্গে বিবাদ করিব না—আমি নত হইয়া আপনার বিচার গ্রহণ করিব।"

ক্ষুদ্র ব্যক্তির নিকট এই মহান নতি কত বড় মহত্ত্বের পরিচায়ক। তাঁহার সুদীর্ঘ অনেক পত্র আমার কাছে আছে—অনেকগুলি হারাইয়াগিয়াছে, সর্ব্বত্রই তাঁহার উদারতা ও প্রীতি প্রতিবিম্বিত। তিনি খুব বড় রাজ্যের আবহাওয়া পাইয়া থাকেন, শুধু তিনিই এই ছোট রাজ্যে সেই উচ্চদরের বার্ত্তা বহন করিয়া আনিতে পারেন।

ইহার পর বহুবৎসর চলিয়া গেল। ঘটনাচক্রে আমি তাঁহার সঙ্গ-সুখ

হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়িলাম। কিন্তু তাঁহার স্মৃতি আমার নিকট সর্ব্বদাই উৎকৃষ্ট চিন্তার প্রেরণা--স্বর্গীয় শুভবার্ত্তার ইঙ্গিত। আমি প্রাচীন বঙ্গীয়কাব্য সমূহ হইতে একটা বড় সংগ্রহ-গ্রন্থ সঙ্কলন করিব এইজন্য তিনি স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে অনুরোধ করিয়াছিলেন এবং আমাকে লিখিয়াছিলেন—(১৬ই কার্ত্তিক, ১৩১৩) "প্রাচীন কবিতা-সংগ্রহের যে প্রস্তাব আপনার নিকট করিয়াছি, তাহা একান্তই প্রয়োজনীয় এবং আপনি ছাড়া আর কাহারো দ্বারা সাধ্য নহে। স্থির করিয়াছিলাম, কয়েক মাস আমিই আপনাকে সাহায্য করিব,কিন্তু এখানে (বোলপুরে) নূতন ছাত্র ও রোগীদের জন্য ইমারত ঘর তৈরি করিতে হইতেছে, তাহাতে বিস্তর খরচ পড়িবে। অতএব এখন কিছুকাল আমার সম্বল কিছুই থাকিবে না। তাহার পর বহু ব্যয়ে বই ছাপাই এমন শক্তি আমার নাই। ত্রিপুরা হইতে অর্থ সাহায্য সম্প্রতি কোন মতেই প্রত্যাশা করা যায় না। নাটোরকে টাকার কথা বলিতে আমি কুণ্ঠিত। যদি গগনেরা এই ভার লইতেন, তবে বড় সুখের হইত।"

তাঁহার এষ্টিমেট্ ছিল লক্ষ টাকা। বিশ্ববিত্তালয় খুব বৃহদাকারে পুস্তক না ছাপাইয়া অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রভাবে "বঙ্গসাহিত্য পরিচয়" প্রকাশিত করিয়াছেন, তাহারই পত্র সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ১৯১৪। রবীন্দ্রবাবু আমাকে কতটা সম্মান দিতেন, তাহা ব্যোমকেশের নিকট যে একখানি পোষ্টকার্ড লিখিয়াছিলেন, তাহা হইতে বুঝা যাইবে। উহা ১৯০৫ সনের ৭ই মার্চ্চ তারিখের লেখা। তিনি "সফলতার সদুপায়" নামক এক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। সেই সম্বন্ধে লিখিতেছেন—"মিনার্ভার চেয়ে কার্জ্জেনে বেশী জায়গা আছে। আমার প্রবন্ধটির নাম "সফলতার সদুপায়"। সভাপতি মেজদাদা হইলে কোন মতেই চলিবে না। বরং নাটোরের মহারাজা হইলে ভাল। নতুবা হীরেন্দ্রবাবু, ত্রিবেদী মহাশয়, বা দীনেশবাবুকে

ধরিবে।" ব্যোমকেশ আমাকে ধরিতে আসিয়া চিঠিখানি আমার নিকট ফেলিয়া গিয়াছিল, তদবধি উহা আমার নিকটই আছে। আমি অত্যন্ত অসুস্থ ছিলাম, সুতরাং রবীন্দ্রবাবুর বক্তৃতার সভায় সভাপতিত্বের গৌরব পাইলাম না। তখনও আমি ইংরেজী কোন পুস্তকই রচনা করি নাই, 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' লিখিয়া সাহিত্য রাজ্যের প্রবেশিকা উত্তীর্ণ হইয়াছিলাম মাত্র, তথাপি রবীন্দ্রবাবু আমার সামান্য সাহিত্যিক গুণের এতটা পক্ষপাতী হইয়াছিলেন। বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইলে তিনি অতি দীর্ঘ সমালোচনা করিয়াছিলেন, ও রামায়ণী কথার শুধু ভূমিকা নহে, তাহার প্রত্যেকটি চরিত্র সম্বন্ধে এরূপ সকল মন্তব্য লিখিয়াছিলেন, যাহাতে গ্রন্থকার অত্যন্ত উপকৃত এবং উৎসাহিত হইয়াছিলেন।

যখন আমি বঙ্গভাষার ইতিহাস ইংরেজীতে লিখিতে আরম্ভ করি, তখন কি ভাবে লিখিতে হইবে তৎসম্বন্ধে অনেক উপদেশ রবীন্দ্রবাবু দিয়াছিলেন। সাহিত্য এক একটা যুগের প্রতিবিম্ব স্বরূপ, সেই যুগের আদর্শ, রুচি ও নীতিজ্ঞান সাময়িক সাহিত্যে অভিব্যক্ত হয়। প্রধান প্রধান লেখকেরা এক এক যুগের কম্পাসের কাঁটার ন্যায় সেই যুগের জাতীয় চরিত্রের দিকে ইঙ্গিত করিয়া দেখাইয়া থাকেন। সুতরাং কোন প্রধান লেখককে ব্যক্তিগত ভাবে প্রশংসা বা নিন্দাবাদ না করিয়া তাঁহার মধ্যে যুগ-লক্ষণ কি পাওয়া যায়, তাহাই নির্দেশ করা বিধেয়। এক এক যুগের শিক্ষা দীক্ষার ঐতিহাসিক কারণ গুলি বিবৃত করিয়া কবিগণকে সেই শিক্ষা-দীক্ষার পাণ্ডা স্বরূপ দাঁড় করিয়া তাঁহার প্রসঙ্গে সমস্ত জাতির চরিত্র নির্দেশ করা ঐতিহাসিকের কর্তব্য—নতুবা কোন একটি লোককে—তাঁহার যুগ হইতে পৃথক করিয়া আনিয়া বর্ত্তমান কালের নৈতিক কি সামাজিক রুচির মাপকাটি দিয়া বিচার করা সঙ্গত নহে। আমার "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" পুস্তকে কবিগণের আলোচনা কতকটা

ব্যক্তিগত ভাবে হইয়াছিল—কিন্তু ইংরেজী ইতিহাস খানায় রবীন্দ্র বাবুর উপদেশ অনুসারে আমি নূতন পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছিলাম। তিনি শেষোক্ত পুস্তকের অবলম্বিত প্রথার পক্ষপাতী হইয়াছিলেন। যে সকল কবি ঝড়ের মত তাঁহাদের ব্যক্তিগত ভাবের আতিশয্যে পাঠক-চিত্তকে উলট-পালট ও অভিভূত করিয়া ফেলেন—রবীন্দ্র তাঁহাদিগের অনুরক্ত নহেন। তিনি সেই সকল কবির পক্ষপাতী যাঁহারা বর্ণিত বিষয়টিকে প্রাধান্য দিয়া নিজকে একবারে আড়াল করিয়া রাখিতে পারেন,—এই জন্য তিনি বাইরণ জাতীয় কবির কবিত্ব স্বীকার করেন না, বাল্মীকির মত বিষয়ে-গৌরবে সম্পূর্ণ আত্মহারা কবির অনুরাগী।

১৯০৯ সনের শীতকালে একবার বোলপুরে গিয়াছিলাম। অরুণকে সেই খানে পাঠাইবার পর মাঝে মাঝে শান্তিনিকেতনে আমি যাইতাম। অতবড় খোলা জায়গা কখনই আমাকে আকর্ষণ করে না, এসম্বন্ধে অনেকের সঙ্গে আমার মত-ভেদ,—যার যেরূপ রুচি, কি করিতে পারা যায়, আমার কাছে পল্লী ভাল লাগে,আশ্রম ও শূন্য ময়দানে গেলে আমার প্রাণ হা হা করিয়া উঠে।

সেই বার নাটোরের মহারাজ জগদীন্দ্রকে তথায় দেখিলাম। কেহ না বলিয়া দিলে তিনি রাজা কি প্রজা তাহা বুঝিবার উপায় নাই। তিনি ছোট বড়র তারতম্য করেন না, সকলের সঙ্গেই গলায় গলায় ভাব,—সাহিত্যিক শক্তি ভগবান তাঁহাকে এতটা দিয়াছেন, যে তাঁহার লেখা পড়িলেই যে তিনি একজন শক্তিশালী লেখক তাহা তৎক্ষণাৎ বোঝা যায়—গদ্য লেখায় তিনি প্রচুর কবিত্বের আমদানী করেন, সেই কবিত্বের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ ক্ষম কবি-দৃষ্টি ও হৃদয়ের কৌমার্য্য ধরা পড়ে। তাঁহার রাজত্ব যতটা তদীয় বিশাল ভূখণ্ডের উপর, তাহা অপেক্ষা বহু সংখ্যক বন্ধু হৃদয়ের উপর বেশী। বন্ধুবর্গ লইয়া কৌতুক ও আমোদ করিয়া

তিনি নিত্য উৎসবের সৃষ্টি করেন, সেই উৎসব হরি-লুটের মত, ছোট বড় কেহই প্রসাদ হইতে বঞ্চিত হয় না। বোলপুর গিয়া আমার ফিটের পীড়া হইল, কতকটা সময় অজ্ঞান হইয়া রহিলাম—জ্ঞানলাভের পর দেখিলাম মহারাজ জগদীন্দ্র শিয়রে বসিয়া। তিনি রবীন্দ্রবাবুর সঙ্গে একটা নূতন মজার ফন্দী পাকাইতেছিলেন। কতগুলি নূতন কাপড় আনিয়া ছোপ দিয়া গেরুয়া রং ধরাইলেন, একতারা ও খঞ্জনীর ব্যবস্থা হইল। মতলবটা এই হইল, মহারাজা গেরুয়া পরিয়া গুরু সাজিয়া চোখ বুজিয়া থাকিবেন, রবিবাবু ও শিবধন বিদ্যার্ণব চেলা সাজিয়া একজন খঞ্জনী ও অপরে একতারা লইয়া পল্লীতে পল্লীতে ঘুরিবেন। শিবধনের বয়স ছিল ত্রিশ এবং তিনিও সুকণ্ঠ ছিলেন। কোন একটা গাছতলায় মৌনী বাবা বসিয়া থাকিবেন,আর চেলারা পল্লীতে ঘুরিয়া ভিক্ষা করিয়া যাহা আনিবেন, তাহাই শিবধন রাঁধিয়া সকলের আহারের ব্যবস্থা করিবেন। গুপ্তভাবে একখানা গো-শকট অপেক্ষা করিতে থাকিবে। চার পাঁচ পল্লী পর্য্যটন করিবার পর ঐ গোযানে আরোহণ করিয়া মহাপুরুষেরা আবার অন্য এক কেন্দ্রে গমন করিয়া ভিক্ষুধর্ম্মের চর্চ্চা করিবেন। এই অভিযানে মোট ১৫ দিন ব্যয় করিয়া তাঁহারা বোলপুরে ফিরিবেন। শিবধন আমার নিকট অনেক কান্নাকাটী করিতে লাগিলেন, তিনি বলিলেন, "রাজা মহা-রাজার খেয়াল,—এঁরা এত কষ্ট সইতে পারিবেন কেন? কোথায় কোন পল্লীতে যাইয়া হাল্লাক হইয়া পড়িবেন, তখন আমার খিদমদগারী করিতে হইবে, এবং এরূপ ভারি ভারি লোকের বাহন হওয়ার বিপদে তাল রাখিতে হইবে। গণদেবতারা যে মুষিকটির কাঁধে কেন চাপিতেছেন, বুঝিতে পারি না।" কিন্তু প্রকাশ্যে মহারাজার প্রতিকূলতা করা তাঁহার সাহসে কুলায় নাই, যখনই মহারাজা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, "কি হে পণ্ডিত—এতবড় একটা আনন্দ প্যাঁচার মত মুখ করিয়া মাটি করিয়া

ফেলিবে নাকি ?" তখন শিবধন ঘাড় চুলকাইতে চুলকাইতে বলিয়াছেন—"না মহারাজ, রাজেন্দ্র সঙ্গমে—দীন যথা ধায় দূর তীর্থ দরশনে।" কিন্তু সে যাত্রা এই মতলব টিকিল না। রবীন্দ্রবাবু অসুখ করিয়া বসিলেন। যতই সন্ন্যাস গ্রহণের সময় নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল—ততই বোধ হয় জঙ্গলে জঙ্গলে হিমের মধ্যে নগ্নপদে ঘুরিবার আশঙ্কায় তাঁহার শরীর খারাপ হইল—শেষে সর্দ্দি ও পরে জ্বর করিয়া বসিয়া বোলপুরের মাঠে প্রস্তাবটি মাটি করিয়া ফেলিলেন।

মহারাজা কলিকাতায় নিজ বাড়ীতে বৈষ্ণব সাজিয়া গিয়া নিজের ম্যানেজারের সঙ্গে ঝগড়া করিয়া রাণীমহাশয়কে গান শুনাইয়া আসিয়াছিলেন। অবশ্য যতীনবসু প্রভৃতি দলের বন্ধুরাই পুরোভাগে ছিলেন—তাঁহারা ঘটা করিয়া তিলক কাটিয়া গুম্ফ কামাইয়া, তুলসীর মালা ধারণ পূর্ব্বক—ছদ্মবেশটার ভূমিকা খুব উৎকৃষ্ট ভাবে অভিনয় করিয়াছিলেন, কিন্তু বৈষ্ণববেশী মহারাজও তাঁহাদের মধ্যে ছিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয়, বাড়ীর কেউ মহারাজাকে এপর্য্যন্ত চিনিতে পারেন নাই।

শান্তিনিকেতন হইতে গো-শকটে বোলপুর রওনা হইলাম. দুপ্রহরের সময়। তখন চটীপায় মহারাজা আমার সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন—আমি অতিশয় কুণ্ঠার সঙ্গে বলিলাম "মহারাজ, আমি গাড়ীতে আর আপনি হেঁটে যাচ্ছেন, এটা বড়ই বিসদৃশ দেখাইতেছে। তিনি বলিলেন "তুমি যে রাজ-তক্তার যাচ্ছ, তার লোভ দেখাইয়া আমার মাথাটা ঘুরিয়ে দিও না।" দেড় মাইল পদব্রজে হেঁটে তিনি দুইখানি সেকেণ্ডক্লাসের টিকিট কিনে আমার সঙ্গে তাঁহার ছেলেদের মাষ্টার রজনীবাবুকে দিয়া কলিকাতায় পাঠাইলেন। আমি পীড়িত, একজ একা আমাকে ছাড়িয়া দিলেন না। ইহার বহুদিন পরে বোধ হয় ১৯১৫ সনে হইবে, রাজ্যবাসের জন্মোৎসব সম্পাদনার্থে কুলিয়া গ্রামে একটা মস্তমী সভার অধিবেশন হয়,—তাঁহার

সভাপতি হইয়াছিলেন স্যার আশুতোষ। আমি; জলধর দা (হিমালয়-লেখক); খগেনবাবু (অধ্যাপক), আর কয়েকজন সাহিত্যিক একখানি দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় যাইতেছিলাম। হঠাৎ মহারাজ জগদীন্দ্র প্রথম শ্রেণীর কামরা হইতে অবতরণ করিয়া আমাদের কামরায় আসিলেন এবং বলিলেন "একা একা প্রাণ হাঁফিয়ে উঠ ছিল, বাঁচলুম," এই বলিয়া আমার দিকে বিস্ময়সূচক দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। একটু বিস্ময়ের বিষয় যে না হইয়াছিল তাহা নহে, আমি তাঁহার দৃষ্টির বেগে সঙ্কুচিত হইয়া পড়িতে ছিলাম। আমার পরণে ছিল একখানি ভাল কোঁচান ঢাকাই ধুতি, গায়ে একটা নূতন সিল্কের পঞ্জাবী ও ভাল ফুলদার সিল্কের চাদর, পায়ে এক জোড়া নূতন পম্পস্ু ছিল এবং পথে এক বন্ধু আমার জামার একটা বোতামের কাছে সপত্র একটা মল্লিকা ফুলের গুচ্ছ আটকাইয়া দিয়াছিলেন, হাতে একখানি সরু রূপার মুখ ছড়ি ছিল। মহারাজ সকল ভুলিয়া আমার রূপ মাধুরী পান করিতে লাগিলেন, আমি প্রমাদ গণিলাম। তখন তিনি গোপনে যতীনবন্ধুকে উস্কাইয়া দিলেন, তাঁর বামাকণ্ঠ অনেকেই শুনিয়াছেন। ইনি ব্যাঘ্রবৎ লাফাইয়া উঠিয়া আমাকে লক্ষ্য করিয়া বিবাহ-মঙ্গল গাইতে লাগিলেন। আমি হইলাম বর—আর স্বয়ং মহারাজা হইতে আরম্ভ করিয়া সকলে মিলিয়া দোহারী করিতে লাগিলেন, কখনও আমার মুখের কাছে আঙুলগুলি নানারূপ মুদ্রার ছলে ঘুরাইতে লাগিলেন, কখনও "বাহাবা"র সঙ্গে উচ্চহাস্যে আমার হৃদকম্প উপস্থিত করিতে লাগিলেন। প্রায় দুই ঘণ্টাকাল তাঁহারা আমাকে লইয়া যেরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহা আমার একটি স্মরণীয় ঘটনা হইয়া আছে। জলধর দা অতি নীরিহ ভাল মানুষ, কিন্তু সেদিন মহারাজের উত্তেজনায় তিনিও ব্যাঘ্র হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। তিনি কানে একটু খাটো, এইজন্য বোধ হয় এইরূপ সচীৎকার উৎসব তাঁর খুব পছন্দ হয়, কারণ শুধু কথাবার্তা বলিলে অনেক কথা

তাঁহাকে এড়াইয়া যায়। তার পর যখন ফুলিয়ার নিকট যাইয়া গাড়ী থামিল—তখন মহারাজার প্রবর্ত্তনায় সকলে মিলিয়া আমার গঙ্গাযাত্রার উদ্যোগ করিয়াছিলেন।

২।৩ বৎসর হইল বেহালা মহাকালী পাঠশালায় পুরস্কার বিতরণে সভাপতিত্বে আহ্বান করিয়া আমি চৌরঙ্গীতে মহারাজার সঙ্গে সন্ধ্যা ৮—৩০ টার সময় দেখা করিয়াছিলাম। তখন দরজায় খাড়া পাহারা রাখিয়া মহারাজা আমাকে রাত্রি ১২টা পর্য্যন্ত রাখিয়া দিয়াছিলেন, ফলে আমাকে ট্রাম না পাওয়াতে গাড়ী করিয়া বেহালা যাইতে হইয়াছিল। কিন্তু এই সকল উৎপাৎ যে কত মধুর—তাহা কথায় বুঝাইবার নহে। ভাগবতের ৯ম ১০ম স্কন্ধেতো এই সকল উৎপাতের কথা লইয়াই। এমন শিশু-সুলভ কমনীয়তা আমি আর কাহারও দেখি নাই—কি লেখায়, কি ব্যবহারে—কি সহৃদয়তায়। একদিনে তিনি যেন কতদিনের আপনার হইয়া পড়েন। রাজরাজেশ্বরের এই ধূলিখেলা দেখিয়া তাঁহারই কথা মনে পড়ে যিনি মথুরার রাজসিংহাসন তুচ্ছ করিয়া গোবাঁধন-দড়ি-পরা সখাদের জন্য কাঁদিয়া ছিলেন। এই একটি মানুষ দেখিয়াছি যিনি অবস্থার তুঙ্গশৃঙ্গে উঠিয়া কেবল মনের মানুষ খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন। গতবৎসর রামমোহন রায় হলে খগেন্দ্রবাবু (অধ্যাপক) বৈষ্ণব কবিতা সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন, সেই সভায় মাননীয় আশুতোষ চৌধুরী মহাশয়ের সভাপতি হইবার কথা ছিল, তিনি কার্য্যগতিকে উপস্থিত হইতে পারেন নাই। মহারাজা জগদীন্দ্রনাথ উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাকে সভাপতি করিবার প্রস্তাব হইল, কিন্তু তিনি তাঁহার বন্ধুত্বাভিমানী এই দীনলেখককে সভাপতির আসনে একরূপ বলপূর্ব্বক তাহার সমস্ত সঙ্কোচ ও দ্বিধা ভাঙ্গাইয়া বসাইয়া দিলেন। এতাদৃশ ব্যক্তির সান্নিধ্যে আমি লজ্জানত শিরে তাঁহার অনুরোধ পালন করিয়াছিলাম।

(২০)

ভারতী ও বঙ্গদর্শন।

আজ ১২।১৪ বৎসরের কথা, ভারতী তখন শ্রীমতী সরলা দেবীর হাতে ছিল। তখনকার নানাবিধ আন্দোলন ও সভা সমিতির সঙ্গে জড়িত থাকিয়া তিনি পত্রিকাখানির জন্য চিন্তা করিবার অবসর পাইতেন না, আমার উপর প্রায় সমস্ত ভার দিয়া নিশ্চিন্ত ছিলেন। আমি যে সকল প্রবন্ধ নির্ব্বাচন করিতাম ও নিজে লিখিতাম, তাহা কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে "মহতাশ্রমের" পার্শ্বে একখানি দোতালা বাড়ীর উপরে বসিয়া তিনি বেলা ৩টা হইতে ৫॥ টা পর্য্যন্ত সপ্তাহে দুইদিন শুনিতেন; এই বাড়ী হইতে বাবু কেদার নাথ দাস গুপ্ত তাঁহার "ভাণ্ডার" নামক মাসিক পত্র বাহির করিয়াছিলেন। বাড়ীটাতে ভারতীর কাজ কর্ম্মের জন্য একখানি ঘর ছিল, এই ঘরে কোন কোন সময় সহিত্যিক সুহৃদ্বর্গের মিলন হইত। এই খানে শ্রীযুক্ত বিজয় চন্দ্র মজুমদারের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয়। তিনি ভারতী-সম্পাদিকার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। এই ঘরে কেদার বাবু প্রায়ই আসিয়া রবিবাবুর কবিতা আবৃত্তি করিয়া আমার মন বিক্ষিপ্ত করিয়া তুলিতেন বলিয়া আমি সম্পাদিকাকে কহিয়া তাঁহার প্রবেশ মানা করিয়া দিয়াছিলাম। কিন্তু তিনি ছাড়িবার পাত্র নহেন। নানারূপ ফল ও উপদেয় সন্দেশাদির উপঢৌকন লইয়া তিনি ঘরে ঢুকিতেন ও আমাদের আইন-কানুন রদ করিয়া দিতেন।

এত দূরে আসিয়া সম্পাদিকার ভারতীর কাজ করিবার কারণ এই যে, তাঁহার বাড়ী বালিগঞ্জ আমার বাড়ী শ্যামবাজার হইতে বহুদূর; এজন্য প্রথম কয়েক মাস বালিগঞ্জে ঘন ঘন যাতায়াত করার পর বালিগঞ্জ—

যাওয়ার পক্ষে অসুবিধা জানাইয়াছিলাম, এজন্যই এই নূতন বন্দোবস্ত হইয়াছিল।

ভারতী-সম্পাদিকা কাজের ভার প্রায় সমস্তই আমার উপর ছাড়িয়া দিলেও পত্রিকাখানির উপরে তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল। প্রবন্ধ লিখিবার বেশী অবসর পাইতেন না, কিন্তু আয় ব্যয়ের খবরটা তিনি রাখিতেন; এসম্বন্ধে ভার ছিল কেদার বাবুর উপর। সম্পাদিকা নিজে যেটুকু লিখিতেন তাহা চমৎকার হইত।কোন কোন সময় পুস্তক সমালোচনা করিতেন।তিনি অতি অল্প কথায় ভাবের সমাবেশ করিতে জানেন,তাঁহার লেখায় বাক্য-পল্লবও বৃথা কথার আড়ম্বর আদৌ নাই,হঠাৎ ছবির মত সুন্দর দৃশ্য তাঁহার রচনায় জাগিয়া উঠে। যাহাতে তাঁহার এই লিপি-কুশলতায় ভারতীর শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদিত হয়, এজন্য আমি সর্ব্বদা তাঁহাকে তাগাদা করিয়া বিরক্ত করিতাম, এই বিরক্তির ফলে তিনি ক্রমাগতঃ প্রতিশ্রুতি দান করিয়া প্রতিশ্রুতি ভাঙ্গিতেন। কিছু লিখিতে বসিয়াছেন, অমনই রাণী মৃণালিণী আসিলেন, কিম্বা শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী আসিলেন, নিদেনপক্ষে জোঁড়াসাকোর ৫ নং, বা চৌধুরী-বাড়ীর নিমন্ত্রণ ত আসিবেই। এই ভাবে অনেক কবিতা ও প্রবন্ধ অসমাপ্ত থাকিয়া যাইত।

নূতন সাহিত্যিক দলের মধ্যে শ্রীমান মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় বালিগঞ্জের বাড়ীতে সর্ব্বদা যাইতেন। তখন মণি তরুণ বালক। মণিকে যেদিন আমি প্রথম দেখি, সেই দিনই আমি তাহার প্রতিভাদীপ্ত মুখখানি ও সুন্দরমূর্ত্তি দেখিয়া আকৃষ্ট হইয়াছিলাম। মণিলাল সরলাদেবীকে ভয় করিতেন। তাঁহার কয়েকটী কবিতা তিনি গোপনে আনিয়া আমাকে দেখান, তাঁহার আশঙ্কা ছিল সরলাদেবী কবিতা লেখার জন্য তাঁহাকে তিরস্কার করিবেন। সেই সন্তর্পিত, অতি লজ্জিত লেখকের পাণ্ডুলিপির মধ্যে কয়েকটি কবিতা আমার বেশ ভাল বলিয়া মনে হইল। একটি ভারতীতে ছাপাইলাম। সরলা-

দেবী তাহার পর বলিলেন "আপনি করিয়াছেন কি ? ছেলেটার আখের নষ্ট করিতে দাঁড়াইয়াছেন। ইহার পর এ'কে কবিতার রোগে পাইয়া বসিবে" কিন্তু মণির কতকগুলি কবিতা আমি সম্পাদিকাকে পড়িয়া শুনাইলাম! তাঁহার মুখে প্রীতির হাসি ফুটিয়া উঠিল, এবং তিনি উৎসাহের সহিত বলিয়া উঠিলেন "তা আমি আগেই জানিতাম, মণির রচনা শক্তি আছে। কিন্তু সে এখনও বালক, ইহা স্মরণ রাখিবেন।" কিন্তু ইহার পর হইতে প্রায় প্রতিমাসেই মণির কবিতা ভারতীতে প্রকাশিত হইতে লাগিল। আজ শ্রীমান মণিলাল ভারতীর সম্পাদক, তাঁহার রচনার সরল মাধুর্য্য এখন অনেক লেখক অনুকরণ করিতে প্রয়াসী, আমি এই ঘটনায় বিশেষ প্রীত, তাহা বলা বাহুল্য। ভারতীর অন্যতম সম্পাদক সৌরীন্দ্রবাবু কলেজ পড়ার সময় ভবানীপুরের সাহিত্যসমিতিতে বক্তৃতা করিবার জন্য আমাকে প্রায়ই লইয়া যাইতেন, তখন জানিতাম না ইনি সাহিত্যক্ষেত্রে অল্প সময়ের মধ্যে এতটা প্রতিষ্ঠা লাভ করিবেন। সেই সময় প্রিয়দর্শন, সদাপ্রফুল্ল চারু বন্দোপাধ্যায় ভারতীর পতাকার নীচে আসিয়া জুটিয়াছিলেন। এই তরুণের দল এখন লিপি চাতুর্য্যে প্রবীণের দলকে ছাপাইয়া উঠিতে প্রয়াসী। কিন্তু যেদিন ইঁহারা উদ্দাম উৎসাহ লইয়া সবিনয়ে সাহিত্যিক দলের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, সেদিনের কথা মনে পড়িলে আনন্দ হয়।

এই সময় নবপ্রতিষ্ঠিত বঙ্গদর্শনের সঙ্গে ও আমার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক দাঁড়াইয়াছিল। রবিবাবু অনেক সময় বোলপুরে থাকিতেন ; শৈলেশবাবু মাঝে মাঝে কাগজের তাড়া লইয়া আমার কাছে উপস্থিত হইতেন। রবিবাবুর উদ্যোগে বঙ্গদর্শন চালাইবার জন্য ও সাহিত্যিক চর্চ্চার নিমিত্ত আমরা মজুমদার লাইব্রেরীর উপরে একটা সমিতি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলাম।

রবিবাবু যখন অনুপস্থিত থাকিতেন, তখন এই আড্ডায় যতীনবাবু অনেক সময় তাঁহার কীর্ত্তন ও কথকতার নকল শুনাইয়া আমাদিগকে হাসাইতেন। শৈলেশবাবুর নধর-কান্তি আজ আমার চক্ষের সামনে ভাসিতেছে। তাঁহার মুখ হইতে সোজা লাইন নীচের দিকে টানিলে ভুঁড়িটা অন্তত এক ফুট দূরে প্রমাণিত হইত। এই ভুঁড়ি দোলাইয়া হাসি মুখে যখন তিনি উপস্থিত হইতেন, তখন বন্ধুবর্গের আনন্দের সীমা থাকিত না। কি জানি কোন্ অজ্ঞাত কারণে সকলের বিদ্রূপের লক্ষ্য হইতেন শৈলেশবাবু, বোধ হয় তাঁহার অমায়িক চরিত্র ও নিরীহতা এই বিদ্রূপ আমন্ত্রণ করিত; কেহ বা তাঁহার দেহের পরিসর লক্ষ্য করিতেন, কেহ বা তাঁহার বুদ্ধির সূক্ষ্মতা, বিশেষ হিসাব-রক্ষার বন্দোবস্ত লইয়া তাঁহাকে ঠাট্টা করিতেন। শৈলেশবাবু উত্তরদিতে ছাড়িতেন না, তিনি সকল ঠাট্টাতেই আমোদ অনুভব করিতেন; যেগুলি নিতান্ত তীব্রভাবে তাঁহার গায়ের উপর পড়িত তাহাতেও তিনি হাসিতেন। এমন উদারচেতা ভোলা-মহেশ্বর সংসারে কমই আছে। বঙ্গদর্শনের লেখকবর্গকে তিনি মুক্তহস্তে টাকা দিতেন,—অর্থাৎ যখন হাতে টাকা থাকিত। এই ব্যক্তি অদৃষ্টের কি রহস্যে পুস্তকের দোকান খুলিয়াছিলেন জানি না,হিসাব-সম্বন্ধে তাঁহার কাণ্ডজ্ঞান একেবারে ছিল না। বন্ধুদের জন্য টাকা খরচ করিতে তাঁহার মত মুক্ত-হস্ত ব্যক্তি প্রায় দেখা যায় না। ধার দিলে তাঁহার কাছে ফিরিয়া পাওয়া বড় শক্ত ছিল, নিজের হউক, পরের হউক টাকা পাইলে তাহা খরচ করিতে কোন দ্বিধা বোধ করিতেন না, অথচ যাঁহাদের নিকট হইতে ধার করিতেন, তাঁহারা কিছুতেই নির্ম্মম হইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগ করিতে চাহিতেন না। একজনকে আমি জানি, তিনি শৈলেশবাবুকে ৩০০০৲ টাকা ধার দিয়াছিলেন; শৈলেশবাবুর কাছ হইতে কোন ক্রমেই তিনি তাহা আদায় করিতে পারিলেন

না, অথচ মেয়াদ চলিয়া যায়। ঋণদাতার অবস্থাও খুব সম্পন্ন ছিল না,—কিন্তু তথাপি তিনি নানা লোকের উত্তেজনা পাইয়াও টাকার জন্য নালিশ করেন নাই, তিনি যাহা আমাকে বলিয়াছিলেন তাহা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। "শৈলেশ কাহাকেও ঠকাইবার মতলব করে না, পরের উপকারের জন্য সে সর্ব্বদা উদ্যত, তাহার দেব-চরিত্রের প্রতি আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই, তাহার হাতে টাকা না থাকিলে কোথা হইতে দিবে? আমি এরূপ লোককে লাঞ্ছনা করিতে কখনই অগ্রসর হইব না।"

শৈলেশবাবুর "দাদার কাণ্ড" যাঁহারা পড়িয়াছেন তাঁহারা জানেন তাঁহারা গল্প লিখিবার কেমন সুন্দর ক্ষমতা ছিল, তাঁহার "চিত্র-বিচিত্র" অতি চমৎকার পুস্তক। আমার মনে হয়, তাঁহার দাদা শ্রীশ মজুমদার মহাশয় হইতে তাঁহার নিজের লিপি-শক্তি কম ছিল না। ভগবান তাঁহাকে বেশ উচ্চদরের প্রতিভা দিয়াছিলেন। কিন্তু সাহিত্যিক আসরে শৈলেশবাবু এমন নিরীহ ভাবে, এমন বিনীত হইয়া থাকিতেন, যেন তিনি সকলের চেয়ে কত নীচু! এই অনাড়ম্বর ভাবটা তাঁহার চরিত্রটিকে বড় মধুর করিয়া তুলিয়াছিল। একবার শৈলেশবাবু বড় সাহসিকতার কাজ করিয়া ফেলিয়াছিলেন। রবিবাবু বঙ্গদর্শনের সম্পাদক; তাঁহার নামের নীচে শৈলেশ ভায়া নিজের নামটি "সহ-সম্পাদক" বলিয়া ছাপাইয়া ফেলিয়াছিলেন। রবিবাবু হাসিয়া বলিয়াছিলেন—"সহ-সম্পাদক" নহে "দুঃসহ-সম্পাদক"—একথা পূর্ব্বে একবার লিখিয়াছি। আমি তাঁহার ঠাট্টাটি মনে গাঁথিয়া রাখিলাম এবং যখন তখন তাঁহাকে "দুঃসহ-সম্পাদক" বলিয়া পরিহাস করিতাম। শৈলেশবাবু যথারীতি বাহিরে হাসিতেন বটে, কিন্তু ঠাট্টাটি তিনি বেশ আমোদকর বলিয়া বোধ হয় মনে করিতেন না। কারণ এই উপাধি যিনি দিয়াছেন, তাঁহার কথা পাছে এই প্রসঙ্গে প্রকাশ হইয়া পড়ে, এই আশঙ্কায় সভয়ে তিনি কথা অন্য-দিকে পাড়িতে চেষ্টা করিতেন।

একবার শৈলেশবাবুকে নিমন্ত্রণ করিয়া আমিও বড় জব্দ হইয়াছিলাম। যেদিন খাওয়াইবার কথা ছিল তাহার ২।৩ দিন আগে আমি তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া আসিয়াছিলাম। নানা কার্য্যের বাহুল্যে আমি একেবারে সে কথা ভুলিয়া গিয়াছিলাম। সেদিন বেলা ১২টার সময় খাওয়াদাওয়া শেষ করিয়া আমি আমার গল্পের বই "তিনবন্ধুর" প্রুফ দেখিতেছি, এমন সময় দেখিতে পাইলাম 'ধীরকুঞ্জর, গতিমন্থর'' শৈলেশবাবু বাহু এবং দেহ দোলাইতে দোলাইতে আসিতেছেন। গৃহদ্বারে তাঁহাকে দেখিয়াই আমার নিমন্ত্রণের কথা মনে হইল এবং মুখ শুকাইয়া গেল। তখন বাড়ীর সকলেই খাওয়া দাওয়া শেষ হইয়া গিয়াছে। যে কৃষ্ণ দ্রৌপদীর হাঁড়ির একটি শাক কণা লইয়া বিপদে তাঁহার মান রক্ষা করিয়াছিলেন, আতঙ্কিত ভাবে তাঁহাকে স্মরণ করিতে করিতে বলিলাম "এই যে শৈলেশ বাবু, আসুন, এত দেরি হইল যে?" শৈলেশ ভায়া আমার মুখ দেখিয়াই মৌখিক ভদ্রতার মূল্য বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার কাছে গোপন করিতে পারিলাম না। অনেক পীড়াপীড়ি করিয়া বাজারের লুচি-সন্দেশ খাওয়াইয়া বিদায় করিলাম। শৈলেশবাবু ইহার একদিন প্রতিশোধ লইতে চাহিয়া ছিলেন। তাহা আমার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে নাই। *

শৈলেশের সহস্র ত্রুটি থাকা সত্বেও সকলেই তাঁকে ভালবাসিতেন। 'বঙ্গদর্শন' লইয়া রবীন্দ্রবাবুর একটা ক্ষতির কারণ দাঁড়াইয়া ছিল ১৩১১ সনের ১৬ই বৈশাখে তিনি আমাকে লিখিয়াছিলেন—"আপনি বোধ হয় জানেন আমার গ্রন্থের স্বত্ব আমি বোলপুরকে দিয়াছি অথচ অর্থাভাবে আমি ভিক্ষাবৃত্তি করিয়া ফিরিতেছি। কাজের লোকের হাতে পড়িলে এ দুর্দ্দশা হইত না, এইজন্ত এবং দুর্ভাগ্য শৈলেশের আসন্ন দুর্গতি স্মরণ করিয়া আমি কিছু ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছি।"

* এই আখ্যানের এ পর্য্যন্ত ভারতীতে একটি সন্দর্ভাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল।

আমাদের আলোচনা সমিতি সম্বন্ধেও অনেক কাজের ভার শৈলেশের উপর থাকিত, একবার (২১শে বৈশাখ ১৩১১) রবীন্দ্রবাবু লিখিয়াছিলেন. "শৈলেশ Renal colic লইয়া ভুগিতেছে বোধহয় সেইজন্য সমিতির কার্য্য বিবরণ পাঠাইতে পারে নাই, যদিও আমার বিশ্বাস এই colic ধরিবার পূর্ব্বেই সে পাঠাইতে পারিত। কিন্তু শৈলেশকে ত চেনেন। সে পিতৃদত্ত নাম স্বার্থক করিয়াছে। শৈলেশের মতই সে অচল।"

প্রদীপে কবি হেমচন্দ্র সম্বন্ধে আমার একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল, সে প্রবন্ধটি রবীন্দ্রবাবুর বড়ই ভাল লাগিয়াছিল। তিনি বঙ্গদর্শনের সঙ্গে আমার একটা ঘনিষ্ট সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া দিয়াছিলেন। বঙ্গদর্শন, পরিচালনার গুরুতর ভার আমার উপর ছিল—অনেক পত্রে তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বিলাতী ও দেশীয় অনেক কাগজ হইতে সন্দর্ভ সঙ্কলন করিবার জন্য সেগুলি আমার নিকট পাঠাইয়া দিতেন। তাঁহার পত্রগুলির পাতা উল্টাইয়া সেই প্রীতি-সম্বন্ধের পূর্ব্ব স্মৃতি মনে জাগিয়া উঠে—সেই সূত্র একেবারে ছিঁড়িয়া গিয়াছিল,—দীর্ঘকাল তাঁহার সঙ্গে আমার পত্র-ব্যবহার ও দেখা সাক্ষাৎ বন্ধ ছিল ;কিন্তু কখনই আমি তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা হারাই নাই—তাঁহার কৃত রাশি রাশি উপকারের কথা বিস্মৃত হই নাই, তাঁর অপূর্ব্ব সঙ্গ-সুখের লোভ মন হইতে দূর করিয়া ফেলিতে পারি নাই। কোটি কোটি লোকের মধ্য হইতে যাঁহাকে বাছিয়া লওয়া যায়, —যিনি সমগ্র জাতির নিকট ভগবানের এক মহোপহার—তাঁহাকে লইয়া বন্ধুবর্গের শ্লাঘা হইবে—ইহার সহজেই অনুমান করা যায়। কেন যে এই সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল—এ ক্ষতি তাঁহার নহে, সম্পূর্ণ আমার, তথাপি কি কারণে এই ক্ষতি সহ্য করিয়াছিলাম—তাহা পরস্পরের কতকগুলি ভুল ভ্রান্তির ইতিহাস, তাহা না বলাই ভাল। দুই বৎসর হইল, আমি তাঁহাকে মনের আবেগে একখানি চিঠি লিখিয়াছিলাম—কথাগুলি

হৃদয় ছুঁইলে, কবির হৃদয়ে সাড়া পড়িবেই পড়িবে। আমি তাঁহার নিকট হইতে যে উত্তর খানি পাইয়াছিলাম, তাহার কতকাংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

ওঁ শান্তি নিকেতন

বিনয় সম্ভাষণ পূর্ব্বক নিবেদন,

আজ আপনার পত্রখানি পাইয়া আমার মনের একটি ভার নামিয়া গেল। আমার প্রতি আপনার চিত্ত প্রতিকূল, এতদিন এই কথাই মনে জানিতাম। এরূপ বিশ্বাস যে কেবল পীড়াজনক তাহা নহে, ইহা অনিষ্ট-জনক। আমাদের পরস্পরের মধ্যে এই সম্বন্ধ বিকার হইতে আপনি মুক্তিলাভের যে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহাতে আমাকেও মুক্তি দিয়াছেন, সেজন্য আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ রহিলাম। আপনার সহিত পরিচয়ের আরম্ভ হইতেই আমি সর্ব্ব প্রযত্নে আপনার সহিত সৌহার্দ্দ্য স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছি কিন্তু কেমন করিয়া যে বিপরীত ফল ঘটিয়াছিল, তাহা আমার দুগ্রহই জানে। আমি এই জানি আমি কখনই স্বেচ্ছাপূর্ব্বক আপনার ক্ষতি বা বিরুদ্ধতা করি নাই। কিন্তু এ সকল কথা বিচার করিবার আর প্রয়োজন নাই, জীবনের অনেক গ্লানি একে একে মুছিবার আছে, অথচ সময় আছে অল্প—এই যে একটা দাগ মন হইতে মিটিল, সে বড় কম কথা নহে। * * * * * এবার কলিকাতায় গিয়া আপনার সঙ্গে এবং আশুবাবুর সঙ্গে দেখা করিয়া এম,এ পরীক্ষায় বাংলাভাষার ব্যবহার সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

আপনি শরীরে মনে স্বাস্থ্য শান্তিলাভ করুন, অন্তরের সহিত এই কামনা করি। ইতি ১৯শে অগ্রহায়ণ ১৩২৫

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ভগিনী নিবেদিতা।

ভগিনী নিবেদিতা।

এই দীর্ঘকালের মধ্যে আমার আর্থিক ও স্বাস্থ্যগত উন্নতি হইয়াছিল। পুস্তক ও অনেক লিখিয়া ফেলিয়াছিলাম, "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" পুস্তকের দ্বারা আর্থিক অনেক সুবিধা হইয়াছিল, তাহা পূর্ব্বেই লিখিয়াছি। তার পর 'রামায়ণী কথা, সতী, বেহুলা, ধরাদ্রোণ ও কুশধ্বজ, জড়ভরত, ফুল্লরা, সুকথা, প্রভৃতি অনেক পুস্তকই লিখিয়াছিলাম। ইহার প্রত্যেক খানি পুস্তক পাঠ্য হইয়াছিল। অপরাপর পুস্তকেরও বেশ বিক্রয় হইয়াছিল। বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক রিডার নিযুক্ত হইয়া এবং বঙ্গ-সাহিত্য পরিচয় সঙ্কলন করিয়া আমি কয়েক হাজার টাকা পাইয়াছিলাম। পরে সাত বৎসর পূর্ব্বে আমি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক রামতনু লাহিড়ী রিছার্চফেলো নিযুক্ত হইয়াছিলাম,তখন ঐ পদের বেতন ছিল মাসিক ২৫০শত টাকা,এখন ৩৫০টাকা হইয়াছে। আমার হাতে যা টাকা জমিয়াছিল, তদ্বারা কলিকাতার বাড়ী ত্রিতল করিয়াছিলাম, এবং বেহালায় জমি কিনিয়া ত্রিতল বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়াছিলাম। ইহা ছাড়া পুত্রদিগের শিক্ষা ও আর দুটি মেয়ের বিবাহে সেই সঞ্চিত অর্থের প্রায় সমস্তই খরচ করিয়া ফেলিয়াছি। প্রথম বৎসর (১৯০৭ সনে) রিডার হইয়া আমি ইংরেজীতে বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস লিখিতে নিযুক্ত হই। এই পুস্তকখানি সমাধা করিয়া আমি দুইজনকে দেখাইয়াছিলাম। শ্রীযুক্ত কুমুদবন্ধু বসুর নাম পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু বিশেষভাবেউল্লেখযোগ্য মিস্ মারগ্রেট নোবেলের নাম —ইনি "নিবেদিতা" নামেই বঙ্গ-সমাজে পরিচিত। আমাদের কলিকাতার বাড়ীর পার্শ্বেই বোসপাড়া লেনে (এখন 'নিবেদিতা লেন') ইনি একটি

ছোট খাটো দ্বিতল বাড়ীভাড়া করিয়া মেয়েদের জন্য একটি পাঠশালা স্থাপন করিয়াছিলেন। একদিন সকালবেলা তাঁর সঙ্গে দেখা করিয়া পুস্তকখানি তাঁকে দেখাইবার প্রস্তাব করি, তিনি তখনই স্বীকার করি- লেন, "আমি বলিলাম পুস্তকখানি খুব বড়।" "তা হোকনা, আমি যখন বলেছি, তখন দেখে দেব।" এই বলিয়া তিনি হাসিমুখে আমাকে বিদায় করিলেন।

নিবেদিতা রাজনৈতিক চরমপন্থী ছিলেন, আমার সঙ্গে প্রথম প্রথম আলাপের পর তিনি রাজনৈতিক প্রসঙ্গ আমার সঙ্গে একবারেই করিতে চাহিতেন না। আমাকে ভীরু, কাপুরুষ, স্ত্রীলোক হইতেও হীনবল ইত্যাদি বলিয়া গালাগালি দিতেন,—রাজনৈতিক কোন কথা বলিলে ক্রোধের সহিত বলিতেন—"দীনেশবাবু, ওটি আপনার ক্ষেত্র নহে,— আমি আপনার সঙ্গে ওসম্বন্ধে কথা বলিব না।"

কিন্তু তা সত্বেও তিনি অসাধারণ অধ্যবসায়ের :সঙ্গে আমার পুস্তক খানি পড়িতে লাগিলেন। ইংরেজী "ইডিয়ম" সংক্রান্তে ভুল মাঝে মাঝে না পাইতেন, এমন নহে, কিন্তু তিনি মোটের উপর বলিতেন, "আপনার ইংরেজী ভাল"—ভাবের দিক্ দিয়া তাঁহার সঙ্গে আমার সর্ব্বদা তর্কবিতর্ক ও বিরোধ চলিত ;—সে সম্বন্ধে তাঁর মতগুলি এত দৃঢ় ছিল—যে তিনি কোন মতেই প্রতিকূল হইলে আমার মত মানিয়া লইতেন না, হিন্দুসমাজ সংক্রান্ত কথা, অথচ তাঁহারই কথা আমাকে মানিয়া লইতে হইবে, এই দায়ে পড়িলাম। ধনপতি সদাগরের স্ত্রী খুল্লনা ছাগল রাখিতে বনে প্রেরিত হইয়াছিল—এই অপরাধে জ্ঞাতিগণ তাঁহার হাতে খাইবেন না বলিয়া ঘোঁট করিয়া বসিলেন—এক হয় অগ্নি কিংবা বিষ-পরীক্ষা গ্রহণ করিয়া চরিত্রের শুদ্ধতা সর্ব্ব সমক্ষে প্রমাণ কর—নতুবা এক লক্ষ টাকা খেসারৎ দিয়া তাহাকে ঘরে রাখ—অন্যথা আমরা তোমাকে সমাজ-

চ্যুত করিব।" আমি ধনপতির গল্প লিখিতেছিলাম, সুতরাং এ সকল কথা বাদ দেই কি করিয়া? কিন্তু নিবেদিতা জেদ করিয়া বসিলেন, "বাদ দিতেই হবে।" স্ত্রীলোকের জেদ--সে যে ভীষণ তাহা কেমন করিয়া বুঝাইব? তাঁহার যুক্তি এই—"জোর ক'রে তার সতিনী তাকে ছাগল রাখিতে বনে পাঠিয়া দিয়ে তার উপর জুলুম করলে, তাকে ঢেকি-শালে শুইতে দিলে, আধপেটা খাইয়ে চূড়ান্ত কষ্ট দিলে। সামাজিক বিচারপতিগণ এজন্য লাঞ্ছনার কোন শাস্তি না করে, নিপীড়িত নিরপরাধ খুল্লনার উপর উল্টো শাস্তির ব্যবস্থা করলেন, এ কেমন সমাজ? আপনার গল্পে যদি একথা থাকে—তবে পৃথিবীর লোক এ টাকে "কাজির বিচার" ব'লে আপনাদিগকে ঠাট্টা করিবে—'নো' 'নো' 'নো' একথা আপনি রাখতে পারেন না, গল্প হ'তে এটি ছেটে ফেলুন।" আমি বলিলাম—আমাদের দেশের স্ত্রীলোকের চরিত্র-মর্য্যাদার আদর্শ অন্যরূপ—সে মাপ-কাটি বাতাসে নড়ে, তা আপনাদের common sense (সহজ বুদ্ধি) দিয়া বুঝ্‌তে পারবেন না, ধরুন যদি বীণাটির তারে সুর দিয়া বাদক রাখিয়া দেন, আর যদি একটা হাওয়া নড়িয়া গিয়া কোন তারটা একটু শিথিল হয়,—তাহাও সেই বাদক সহ্য করিতে পারেন না—যাবৎ তার কাণে একটুকুও বাধ্‌বে—সে পর্য্যন্ত তিনি রাগ-রাগিনী বাজাবেন না। আমাদের সামাজিক বিধানে স্ত্রীলোক দেবীর ন্যায় পূজা পাইয়া থাকেন —সেই দেবতা সর্ব্বপ্রকার কলঙ্ক ও গ্লানির উপরে থাকিবেন—কোন প্রতিকূল মন্তব্যের লেশমাত্র হইলে তাঁহার স্বামী, পুত্র ও আত্মীয়গণ লজ্জায় মরিয়া যাইতেন, এইজন্য রাম সীতাকে নিরাপরাধ জানিয়াও বনবাস দিয়াছিলেন। এখানে ন্যায় অন্যায়ের প্রশ্ন ওঠেনা,—কৌস্তভমণিতে যদি একটা সূতার তুল্য দাগ লাগে তবে মণিরাজের মূল্য কমিয়া যায়। স্ত্রীলোককে এতটা সখের পোষাকী জিনিষের মত করিয়া রাখা ব্যবহারিক

জীবনের পক্ষে সুবিধাজনক এমন কি স্থায়-সঙ্গত কি না—তাহা আমি জানি না, স্ত্রীলোক যে জহর-ব্রত করিয়া—সতী সাজিয়া—আগুনে পুড়িয়া মরিত, তা ও এই আদর্শ পবিত্রতা রক্ষার জন্য—সিজারের স্ত্রীর সম্বন্ধে কথাটি হইতে পারিবে না,—এই প্রবাদের অনুকূলে আমাদের সামাজিক আদর্শের সৃষ্টি! স্থায়-অস্থায়ের সীমা অনেকটা নীচেকার কথা। এক জাতি যদি কোন একটা জিনিষকে খুব বড় করিয়া দেখে,—এত বড় করিয়া দেখে যে পার্থিব ব্যবহারিক নীতি ততদূর পৌঁছায় না, ঐন্দ্রজালিক রূপ দিয়া দেখে, যাহা ফুঁএর ভর সহ্য করে না,—ভাবের রাজ্যে সে একটা মস্তবড় বাহাদুরী—আপনাদের সমাজে কাটখোট্টা, জীবনযাত্রা চালাইবার পক্ষে সুবিধাজনক ও মোটামুটি স্থায়সঙ্গত, কিন্তু এদেশের কাব্য, জীবন ও সমাজ সমস্তই একটা বিশেষ ভাবমূলক, সেই ভাবের যাদুকাটি হাতে না থাকিলে এই সমাজের মন্দিরে আরাত্রি দেখিবার প্রবেশাধিকার হইবে না।"

এই ভাবে কোন একটা কথা লইয়া তর্ক বাধিত, হয়ত পুস্তকের এক লাইনও পড়া হইল না, দুইদিন তর্ক-যুদ্ধে কাটিয়া যাইত। নিবেদিতা নিজের জেদ বজায় রাখিতে সময়ে সময়ে এতটা বদ্ধপরিকর হইতেন, যে বলিয়া বসিতেন—"দীনেশবাবু ঠিক বল্‌ছি, যদি এই অংশটা পরিবর্ত্তন না করেন, তবে আমি এ পুস্তক আর পড়্‌ব না।" আমি প্রমাদ গণিতাম ও তাঁহার মনোরঞ্জনের জন্য খানিকটা পরিবর্ত্তন করিতাম, নিজের ভাবের সঙ্গে না মিলিলে তিনি থামিয়া যাইতেন, কিছুতেই এগুতে চাহিতেন না, ঠিক হাতীটা পাঁকে পড়িলে যেরূপ হয়,—সেইরূপ কোন একটা অংশে আসিয়া থামিয়া পড়িতেন। এটা ভুলিয়া যাইতেন যে পুস্তকের মতামতের দায়িত্ব আমার—ইংরেজী সংশোধনের ভার তাঁকে দিয়াছি—এইখানে তাঁর স্ত্রীলোকে অনোচিত ব্যবহার লক্ষ্য করিয়াছি।

কোন একটা বিষয়ের ভার লইলে তিনি এটা মনে করিতে পারিতেন না, যে উহা পরের। সেটি সম্পূর্ণ আপনার ভাবিয়া খাটিতেন,—এই ভাবের পরিশ্রম কেহ মূল্য দিয়া ক্রয় করিতে পারে না ; কোন দিন সকাল হইতে রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত তিনি খাটিয়াছেন, ইহার মধ্যে তিনিও আমি ২।৫ মিনিটের জন্য খাইয়া লইয়াছি মাত্র,—এরূপ নিস্বার্থ, আত্মপর ভাব-বিরহিত,প্রতিদান সম্পর্কে, শুধু সম্পূর্ণরূপে উদাসীন নহে, একান্ত বিরোধী কার্য্যে তন্ময় লোক আমি জীবনে বেশী দেখিয়াছি বলিয়া জানিনা। তিনি আমাকে নিষ্কাম কর্ম্মের যে আদর্শ দেখাইয়াছেন, তাহা শুধু গীতায় পড়িয়াছিলাম—তাঁহার মধ্যে এই ভাবটি পূর্ণভাবে পাইয়াছিলাম, আর একজনের মধ্যে পাইয়াছিলাম, তিনিও পাশ্চাত্য জগতের লোক, তাঁহার কথা পরে লিখিব।

ইংরেজীর সংশোধন পুস্তকে অল্পই হইয়াছে—বেশীর ভাগ ভাব-সংশোধন। কবিতা বুঝিবার শক্তি তাঁহার অসামান্য ছিল। শূন্য-পুরাণের শিবসম্বন্ধে একটা ছড়া আমি উদ্ধৃত করিয়াছিলাম, তাহাতে লিখিত আছে—'শিব, তুমি কেন ভিক্ষা করিয়া খাও ? ভিক্ষা বড় হীন-বৃত্তি,কোন দিন কিছু জোটে, আর কোন দিন রিক্ত ভাণ্ডে ফিরিয়া আস, তুমি চাষ করিয়া ধান বোন, তা'হলেই তোমার এ কষ্ট দূর হইবে। হে প্রভু, তুমি কতদিন উলঙ্গ হইয়া অথবা 'কেঁওদা' বাঘের ছাল পরিয়া কাটাইবে ? যদি কাপাস বুনিয়া তুলো তৈরী কর—তবে কাপড় পরিতে পাইয়া কত সুখী হইবে !" এই ভাব-সম্বলিত পয়ারের মধ্যে যে ভারতীয় কোন অপূর্ব্ব প্রেরণা থাকিতে পারে তাহা তো আমার মনেই হয় নাই, কিন্তু তিনি ঐ স্থানটি পড়িয়া একবারে লাফাইয়া উঠিলেন, কেবল "আশ্চর্য্য, আশ্চর্য্য" এই কথাটি বারংবার বলিতে লাগিলেন। আমি বলিলাম, "ভগিনী, এটাতে এমন কি জিনিষ পেয়েছেন, যে দীন দরিদ্র

হঠাৎ রাজ্য পেলে যেরূপ আহ্লাদিত হয়,আপনি সেইরূপ হয়ে পড়েছেন।"
নিবেদিতা সেই কবিতাটি হইতে দৃষ্টি না সরাইয়া,এক হাত দিয়া অপর হাত
চাপিয়া ধরিয়া আনন্দগর্ব্বফুল্ল চোখে কেবলই বলিতে লাগিলেন "ও
দীনেশ বাবু, এটা একটা আশ্চর্য্য জিনিষ।" আমি ভাবিলাম, ক্ষেপা
মেয়ের মাথায় যেন কি হয়েছে। সেই সময় সেখানে আর একজন মেম-
সাহেব ছিলেন, আমি তাঁহার নাম ভুলিয়া গিয়াছি। পরদিন তাঁহাকে
নিরালা পাইয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "নিবেদিতা এই শিবের কবিতায়
এমন আশ্চর্য্য কি পাইয়াছেন, তাহা ত বুঝিতে পারিলাম না। আপনি কি
শুনিয়াছেন?" তিনি বলিলেন "শুনেছি, সাধারণ ভক্ত ও উপাসক
তাঁহাদের দেবতার নিকট সাহায্য চাহিয়া প্রার্থনা করেন "ঠাকুর আমায়
ধন দিন্, যশ, দিন্,মান দিন্, স্বাস্থ্য দিন্"—তাঁহারা কতকি বর প্রার্থনা
করেন। কিন্তু ঐ কবিতায় ভক্ত তাঁর উপাস্যের প্রতি অনুরক্ত হইয়া
নিজকে সম্পূর্ণ ভাবে ভুলিয়া গিয়াছেন,নিজের দুঃখের কথা তাঁর মনে নাই;
ঠাকুরের দুঃখে তাঁর প্রাণ গলিয়া গিয়াছে, ঠাকুরের কষ্ট যাতে নিবারণ হয়,
তাই তাঁর ভাবনার লক্ষ্য হইয়াছে।"

আমি তখন নিবেদিতার মনের ভাব বুঝিতে পারিলাম। গ্রাম্য ছড়া-
গুলি সম্বন্ধে যদি আমি হেলায় অশ্রদ্ধার কথা বলিয়াছি, তবে নিবেদিতার
নিকট গালমন্দ খাইয়াছি। তিনি বলিতেন "বড়বড় লম্বা শব্দ লাগাইয়া
যাঁহারা মহাকবির নাম কিনিয়াছেন, পল্লীগাথার অমার্জ্জিত ভাষার
মধ্যে অনেক সময় তাঁহাদের অপেক্ষা ঢের গভীর ও প্রকৃত কবিত্ব আছে।
আপনি কৃষকগণের গান অবজ্ঞা করিবেন না, তাদের মেঠো সুরে
রাগিণী না থাকিলেও কারুণ্য আছে,—তাঁদের সরল কথায় আভিধানিক
জ্ঞান না থাকিলেও প্রাণ আছে, আর তাঁদের কুঁড়ে ঘরে সোনা-রূপার
থাম না থাকিলে ও আঙিনায় সিউলি ও মল্লিকা ফুলের গাছ আছে।"

বই পড়িবার সময় তিনি আমার প্রতি যে কত মন্তব্য প্রকাশ করিয়া যাইতেন তাহার অনেকগুলিতে আমি বিরক্ত হইতে পারিতাম কিন্তু বিরক্ত হই নাই ; কেননা আমি তাঁহার রুষ্ট কথার মধ্য দিয়া তাঁহার অতি কোমল পুষ্প কোরকের মত সহৃদয়তায় ভরপুর প্রাণটি দেখিতাম। কখন ও বলিতেন, "দীনেশ বাবু, আপনার মত বোকা আমি জগতে আর একটি দেখিনাই ; আপনার নির্ব্বুদ্ধিতা আমি স্ত্রীলোক হলেও আমাকে অবাক্ করে ফেলেছে।" আবার হয়ত পড়িতে পড়িতে আর এক জায়গায় পৌছিয়া বলিতেন "দীনেশ বাবু, আপনি সত্যই একজন প্রধান কবি, আপনার লেখা গদ্য হইলে কি হইবে, আপনার ভাষা প্রকৃত কবির। আপনার সাহিত্যিক শক্তি অপূর্ব্ব।" কখন ও অতিরিক্ত গালাগালি কখন ও অতিরঞ্জিত প্রশংসায় অভিনন্দিত হইয়া আমি উভয়ের প্রতি ভ্রুক্ষেপহীন হইয়া চুপ করিয়া শুনিয়া যাইতাম। কিন্তু বাহিরের কোন লোক আসিলে দুচারটি কথায় আমার যে পরিচয় দিতেন তাহাতে অবশ্য আমি শ্লাঘা বোধ করিতাম। একবার তাঁহার কোন এক ইংরেজ বন্ধু দেখা করিতে আসিলে তিনি আমার পরিচয় দিয়া বলিলেন—"বঙ্গদেশের সামাজিক তত্ত্বইনি যেরূপ জানেন,এই দেশের কুঁড়ে ঘর হইতে রাজ-প্রাসাদ পর্য্যন্ত সকল জায়গার ইতিহাস যাহা উনি ছেঁড়া পুথি-পত্রের মধ্যে কুড়াইয়া পাইয়াছেন—সে বিষয়ে ইহার সমকক্ষ কেউ নাই" ইত্যাদি। ; আমাদের সঙ্গে সর্ব্বদা থাকিতেন গণেন ব্রহ্মচারী, ইহাঁর ভাঙ্গা ইংরেজী লইয়া আমি প্রায়ই ঠাট্টা করিতাম। নিবেদিতা বলিতেন "গণেন ইংরেজীতে ওর মনের ভাব বুঝাইতে পারে, এটুকু আমার স্বীকার করিতেই হইবে, যেটুকু না পারে, হাত মুখের ভঙ্গীতে সেটুকু আর বুঝিতে বাকি থাকে না।" কিন্তু নিবেদিতা বাঙ্গালা বেশ ভাল বুঝিতেন, গণেন তাঁহার ভাষা-জ্ঞানের [illegible]তা প্রতিপন্ন করার মানসেই মাঝে মাঝে

ইংরেজী বলিতেন। নিবেদিতা আমার পুস্তকে বৈষ্ণব কবিতা ও আগমনী গানের প্রশংসা পড়িয়া প্রায়ই আমাকে তাগাদা করিতেন, একজন বৈষ্ণব কীর্ত্তনিয়া আনিয়া তাঁহাকে গান শুনাইতেন। আমি আগমনী-গায়ক একজন বৈষ্ণব ভিখারীকে পথ হইতে ধরিয়া আনিয়া তাঁহাকে গান শুনাইয়াছিলাম। "গিরি, গৌরী আমার এসেছিল" গান শুনিয়া তিনি অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে গায়ককে একটি টাকা পুরস্কার দিয়াছিলেন। কতকদিন তাহার বাড়ীতে অতিথি হইয়া ছিলেন—এলেক্জেণ্ডার নামক এমেরিকা-বাসী বিংশ বর্ষ বয়স্ক এক বালক। ইঁহার অতি অসামান্য প্রতিভা ছিল, এই অল্পবয়সে হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দুসাহিত্যের ভিতরে প্রবেশ করিবার তাঁহার যে শক্তি দেখিয়াছিলাম, তাহা বিদেশীয়ের পক্ষে বিস্ময়কর। নিবেদিতা বলিতেন, এই বালকের লিখিবার ক্ষিপ্রকারিতা লক্ষ্য করা চক্ষুর অপর্য্যাপ্ত আনন্দ। টাইপরাইটার যন্ত্রটা যেন ইহার দ্রুত রচনার তাল সামলাইতে পারেনা।" এলেকজেণ্ডার বিবেকানন্দের জীবন চরিত লিখিয়া ভাবী কর্ম্মঠ ও প্রতিভাশালী জীবনের বহু আশা দিয়া সংসার হইতে সহসা সেই তরুণ বয়সে বিদায় লইয়া গিয়াছেন। নিবেদিতার এক সঙ্গিনী ছিলেন ভগিনী ক্রিশ্চিয়ানা, স্বভাবটি মিশ্রীর মত মিষ্ট,—তাঁহার বাড়ী এমেরিকায়। নিবেদিতা আমার পাণ্ডুলিপি পড়িতে পড়িতে যখন খুসি হইতেন, তখন মাঝে মাঝে বলিতেন", দীনেশ বাবু, আপনার সঙ্গে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আমার মতের ঘোর অনৈক্য। যখন সে দিক দিয়া আপনার কথা ভাবি, তখন আপনার কাপুরুষতা আমাকে শুধু লজ্জা নহে, মর্ম্মপীড়া দান করে, কিন্তু তবুও আমার আপনাকে ভাল লাগে, কেন শুনবেন? আপনি বিনা আড়ম্বরে দেশের জন্য এতটা খেটেছেন ও দেশের উপর এতটা মমতার পরিচয় দিয়েছেন, যে আপনার অজ্ঞাতসারে আপনি প্রকৃত দেশভক্তের স্থানের দাবী করিবার যোগ্যতা রাখেন—এজন্য আপনাকে

আমার ভাল লাগে।" তিনি আমাকে কাপুরুষ বলিয়া প্রায়ই ঠাট্টা করিতেন। একদিন আমি সত্যই কাপুরুষতার পরিচয় দিয়া লজ্জিত হইয়াছিলাম। সেদিন সন্ধ্যাকাল, গণেন, আমি ও নিবেদিতা বাগবাজারের রাস্তা দিয়া গঙ্গার ধারে বেড়াইতে গিয়াছিলাম। আমি ছিলাম আগে, তারপর নিবেদিতা এবং সর্ব্বশেষে গণেন। এমন সময় একটা ষাঁড় ক্ষেপিয়া সিং নাড়িতে নাড়িতে আমার সাম্‌নে ছুটিয়া আসিল। আমি প্রাণভয়ে পাশ কাটিয়া পালাইয়া আত্ম-রক্ষা করিলাম, কিন্তু আমি সরিয়া পড়াতে যে নিবেদিতাকে ষাঁড়ের সিংএর সম্মুখীন করিয়া গেলাম, তা ভাবিয়া দেখিবার আমার অবকাশ হয় নাই। গণেশ তাড়াতাড়ি এগিয়া এসে ষাঁড়টাকে তাড়িয়ে দিলেন; তারপর তিনজনে আবার একত্র হইলাম। তখন নিবেদিতা তীব্র ব্যঙ্গের সুরে হাসিতে হাসিতে বলিলেন— "আপনি পুরুষ জাতির আজ মুখ উজ্জ্বল করেছেন। একটি নিঃসহায়া রমনীকে ষাঁড়ের সামনে ফেলে দিয়া নিজের জীবন রক্ষা করেছেন, অদ্যকার এই কাজটি আপনার একটা কীর্ত্তি-স্তম্ভের মত হইয়া রহিল।" তারপর হাসির ছটা মুখ হইতে চলিয়া গেল, এবং একটু ঝাঁজালো সুরে বলিলেন "দীনেশবাবু আপনার একটা লজ্জা হ'ল না?" আমি কাজটা ভাল করি নাই, সেইজন্য অন্য সময় যেরূপ কথা কাটাকাটি করি, তা না করিয়া চুপ হইয়া রহিলাম। তিনি রাস্তায় যাইতে সাহেবদিগকে গ্রাহ্য করিতেন না; কিন্তু বাঙ্গালীদিগকে খুব সম্মান দেখাইতেন। একদিন তিনি আর আমি ট্রামে যাইতেছিলাম, এমন সময় একজন ইংরেজ আসিয়া তাঁহার গা ঘেঁষিয়া বসিলেন, তিনি এমন তীব্রভাবে চোখ রাঙ্গাইয়া অসন্তোষ জ্ঞাপন করিলেন যে সাহেব অধোমুখে অন্য বেঞ্চিতে যাইয়া বসিলেন। নিবেদিতা আমার কাছে আরও একটু সরিয়া আসিয়া হাসিতে হাসিতে গল্প করিতে লাগিলেন। তিনি ভারতবর্ষের নিকট নিজকে নিবেদন করিয়া দিয়াছিলেন।

ভারতবাসীর সকলকে ভাই বলিয়া বরণ করিয়া লইয়াছিলেন, এইজন্য "ভগিনী নিবেদিতা" নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। এদেশের লোকদিগকে পাশ্চাত্য জগতের লোকেরা ঘৃণার চক্ষে দেখেন, এটি তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না।

যে দিন আমার নিকট তিনি শুনিলেন, খড়দহে একদা ১২০০ নেড়া ও ১০০০ নেড়ী বীরভদ্রের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন, সেই দিন হইতে খড়দহে তাঁহাকে লইয়া যাইবার জন্য আমাকে তাগাদা করিতে লাগিলেন। এই নেড়ানেড়ীরা বৌদ্ধ ভিক্ষু ও ভিক্ষুনী। বৌদ্ধ ধর্ম্মের জয়-পতাকা যখন বঙ্গদেশে হতশ্রী ও লাঞ্ছিত হয় এবং উক্ত ধর্ম্মের পাণ্ডাগণ যখন এতদ্দেশে হইতে পলায়নে-পর হন, তখন বৌদ্ধ ভিক্ষু ও ভিক্ষুনী দুর্দ্দশা ও অধঃপাতের চূড়ান্ত সীমায় নীত হইয়াছিল। বিজয়দৃপ্ত হিন্দু সমাজ ইহাদের প্রতিকূলে একবারে দ্বার বন্ধ করিয়া ফেলেন। এই পতিতের দলটিকে বীরভদ্র প্রভু বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া আশ্রয় দান করেন। যে স্থানটিতে তাহারা শরণ প্রার্থী হয় এবং যে স্থানে দয়াল বৈষ্ণব-প্রভু শরণাগতদিগকে আশ্রয় দান করেন—সেই স্থানটিতে নেড়ানেড়ীদের কৃতজ্ঞতার অভিব্যক্তি স্বরূপ প্রায় ৩৫০ বৎসর যাবৎ একটা বাৎসরিক মেলা বসিয়াছিল। অল্প কয়েক বৎসর যাবৎ এই মেলাটি উঠিয়া গিয়াছে।

একদিন ফাল্গুন মাসের মধ্যাহ্নে নিবেদিতাকে সঙ্গে করিয়া আমি ও গণেন একখানি নৌকায় খড়দহে রওনা হইলাম। আমরা এইরূপ নৌকায় গঙ্গায় আরও দুই তিনবার পরিভ্রমণ করিয়াছি। খাওয়া দাওয়া ১০টার মধ্যে সমাধা করিয়া সন্ধ্যায় বাগবাজারে ফিরিয়াছি। খড়দহে যাওয়ার দিন তাঁর কি আনন্দ! আমাকে বলিলেন, "ও জায়গাটার নাম আমি কি দিয়েছি জানেন?—ওটা হচ্ছে বঙ্গদেশে বৌদ্ধধর্ম্মের সমাধিক্ষেত্র। ওরা মেলাটা তুলিয়া দিলেন কেন? এরূপ একটা ইতিহাস-বিশ্রুত ঘটনার

স্মারক উৎসবটাকে ও এইভাবে মাটি করিয়া ফেলাইতে হয়।" আমরা জলযোগের ব্যবস্থা করিয়া লইয়া গিয়াছিলাম, সে গুলির সদ্ব্যবহার করিলাম। কলিকাতা ছাড়িয়া গেলেই গঙ্গার হাওয়া জঠরানল উস্কিয়ে দেয়। আমরা জেলেদের ডাকিয়া ইলিস মাছ কিনিলাম। বেলা ৩টার সময় খড়দহের ঘাটে পৌঁছিলাম। একজন মেম সাহেব ও সঙ্গে দুই বাঙ্গালী ভদ্রলোককে ঘাটে নৌকা লাগাইতে দেখিয়া কর্ম্ম-হীন পল্লীর লোকেরা কৌতুহলে মরিয়া যাইতেছিলেন। স্ফীতোদর লম্বিতোপবীত গোঁসাইর দল ঘাটে আসিয়া আমাদের দিকে সকৌতুক দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। নিবেদিতা আমাদিগকে পরিচয় দিতে মানা করিয়া দিয়াছিলেন—দর্শকেরা ভাবিয়া ছিলেন, আমরা নৌকা কয়েক মিনিট সেই ঘাটে রাখিয়া পুনরায় চলিয়া যাইব। কিন্তু সত্য অত্যই যখন নিবেদিতা তীরে পদার্পন করিলেন এবং তাঁহার সঙ্গে ঘনিষ্ট ভাবে কথা বলিতে বলিতে আমরা গাঁয়ের ভিতর দিয়া যাইতে লাগিলাম, তখন পঙ্গপালের মত নিত্যানন্দ বংশীয়গণ ও অপরাপর লোকে আমাদের পেছনে পেছনে চলিলেন। এই অপূর্ব্ব শোভা-যাত্রা দেখিয়া নিবেদিতা মুখ টিপিয়া হাসিতে লাগিলেন। অনুসরণ কারীদের মধ্যে কেউ কাসিয়া কাসিয়া মনোযোগ আকর্ষন করিতে লাগিলেন; কেউ লম্বোদরটি হেলাইয়া বক্র দৃষ্টিদ্বারা আমাদিগকে আপ্যায়িত করিলেন, কেউ গামছাখানি দিয়া মুখ মুছিয়া যৎপরোনাস্তি সাহসের সহিত আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয় ইনি কে?" সেই প্রশ্নের উত্তর শুনিবার জন্য যেন তাঁহাদের জীবন মরণের সমাস্যার সমাধান আমি করিব, এই ভাবে সেই বৃহৎ জনতা উদগ্রীব হইয়া আমার দিকে তাকাইতে লাগিলেন। আমি বলিলাম। "উনি কে—উঁহাকেই জিজ্ঞাসা করুন, উনি নিজের পরিচয়টা অপর হইতে নিজেই ভাল দিতে পারিবেন।" নিবেদিতা আমার উত্তর শুনিয়া এমনই গম্ভীর হইয়া গেলেন, যে কায় সাধ্য তাঁহাকে

প্রশ্ন করিতে অগ্রসর হইবে? একটি লোককে জিজ্ঞাসা করিলাম, "শ্যাম-সুন্দরের মন্দির কোথায়?" অমনই দশ বার জন লোক কৃতার্থ হইয়া এক-সঙ্গে উত্তর বলিতে লাগিলেন। কেউ হস্ত প্রসারণ-পূর্ব্বক অঙ্গুলী দিয়া একেবারে উত্তরটি প্রত্যক্ষ দেখাইয়া দিলেন,—কেউ বা "আসুন্ আমাদের সঙ্গে" বলিয়া আমাদের পরিচালকত্বের সমস্ত গৌরবটা আত্মসাৎ করিতে ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। এই আতিথ্যের অতিশয্যে আমরা কৌতুক অনুভব করিতে লাগিলাম। শ্যামসুন্দরের মন্দিরসংলগ্ন নাট-মন্দিরে দাঁড়াইয়া যখন সোপানাবলীর উপর হ্যাটটি খুলিয়া রাখিয়া নিবেদিতা প্রণাম করিলেন, তখন সেই বৃহৎ জনতা মুগ্ধ ও বিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। কেউ হিন্দুধর্ম্ম যে কত বড় তাহা বলিতে যাইয়া বাহুনাড়া দিয়া আস্ফালন করিতে লাগিলেন, কাক বুক গর্ব্বে আধ হাত উঁচু হইয়া যেন ফুলিয়া উঠিল, কেউ বা কোন ধর্ম্মবিদ্বেষী যুবকের অনুপস্থিতির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষন করিয়া "আজ যদি সে এখানে এই দৃশ্য দেখিত, তবে তাহার অসার যুক্তির মূলে কুঠারাঘাত হইত" এবম্বিধ মন্তব্য প্রকাশ-পূর্ব্বক আনন্দোৎফুল্ল চক্ষে শ্রোতৃবর্গের দিকে চাহিয়া তাঁহাদের অনুকূল ঘাড়-নাড়ায় তৃপ্তি বোধ করিতে লাগিলেন। আমি এবং গণেন আমাদের বক্ষে সূত্রাকারে লম্বিত হিন্দুধর্ম্মের গৌরবের শুভ্র-মহিমা প্রকট করিয়া একেবারে মন্দিরের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িলাম। পুরোহিতকে কিছু দক্ষিণা দেওয়াতে তিনি এত আপ্যায়িত হইলেন যে তৎক্ষণাৎ আমাদের অনুরোধে নিত্যানন্দ প্রভুর হস্ত-লিখিত ভাগবত ও তাঁহার ভগ্ন যষ্টি আনিয়া দেখাইলেন, আমরা তাহা লইয়া আসিয়া নিবেদিতাকে সেই মন্দিরের বাহিরে দেখাইলাম। পুঁথি ও লাঠির উদ্দেশ্যে প্রণাম করিয়া তিনি পাঁচটি টাকা দক্ষিণা দিলেন। পুরোহিত আনন্দে গদ্‌গদ্ হইয়া একটি 'শিরোপা' আনিয়া নিবেদিতাকে মাথায় ধারণ করিতে বলিলেন। তখন হ্যাটটি হাতে লইয়া ভগিনী নিজের

শিথিল কবরী ও সিঁথির মূল পর্য্যন্ত জড়াইয়া রক্ত বস্ত্রটি ধারণ করিলেন। উপস্থিত ব্যক্তিরা তখন আনন্দে হরিধ্বনি করিয়া উঠিলেন, এবং একজন অগ্রসর হইয়া বলিলেন "এই শিরোপা (রক্ত বস্ত্র-খণ্ড) অতি মূল্যবান পদার্থ। শ্যামসুন্দরের মন্দিরের এই শিরোপা মাথায় পরিতে পারিলে এক কালে রাজারাও ধন্য হইতেন, আমরা আপনাকে কম গৌরব দিলাম, মনে করিবেন না, এটা একটা মস্ত বড় গৌরব। তবে আপনি কে এইবার পরিচয় দিয়া আমাদের কৌতূহল নিবারণ করুন।" তাঁহার ইঙ্গিতে আমি ও গণেন বলিলাম "ইঁহার অপর পরিচয়ে আপনারা কি চিনিবেন? ইনি জনৈক ইংরেজ মহিলা, হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া রামকৃষ্ণের মঠে আশ্রয় লইয়াছেন।" একজন বলিলেন "তবে কি ইনি নিবেদিতা?" তখন আর গোপন করা চলে না। হিন্দুর দলের কারু কারু চোখে জল আসিল, কেউ বা ভক্তিতে গদগদ কণ্ঠ হইলেন, কেউ বা দুই হাত জোড় করিয়া নিবেদিতাকে নমস্কার করিলেন। নিবেদিতা সবিনয়ে বিদায় চাহিলে পুরোহিত বলিলেন—"সেও কি হয়? প্রসাদ পাইয়া যাইতে হইবে।" খানিক পরে রসগোল্লার এক বিরাট ঠোঙ্গা উপস্থিত হইল, তাহারা নীচু হইতে অজস্র রস বাহকের গায়ে পড়িয়া তাহাকে রসিক করিয়া তুলিয়াছিল। আমরা দুইজনে বেশ উদর পূর্ত্তি করিয়া খাইলাম। ভগিনী একটি খাইয়া অব্যাহতি পাইলেন না, নানারূপ মিশ্রকণ্ঠের অনুরোধ সমবায়ে আপ্যায়িত হইয়া তাঁহাকে আর একটি খাইতে হইল। বেলা শেষে আমরা নেড়ানেড়ির মেলার জায়গাটা দেখিলাম— নিবেদিতা সেইখানে বসিয়া অনেকের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া সেই মেলা সম্বন্ধে কতকগুলি নোট লিখিয়া লইলেন। তাঁহার বিশেষ অনুরোধ ছিল, এই বৌদ্ধধর্ম্মের সমাধি ক্ষেত্র দর্শন সম্বন্ধে আমি একটি সন্দর্ভ লিখিব; তখন তিনি সেই নোট গুলি আমায় ব্যবহার করিতে দেবেন। আর

বহু বৎসর পরে সেই সন্দর্ভ লিখিলাম, কিন্তু সে নোটগুলি আর পাওয়ার কোন সুযোগ হইল না।

সন্ধ্যাকালে ইলিস মাছগুলি নিবেদিতার ভৃত্য রামলালের হাতে দিয়া আমরা বাগবাজারের ঘাটে উঠিয়া সেই ভ্রমণ-বৃত্তান্তের আলোচনা করিতে করিতে যাইতেছি, এমন সময় একটা সাজিতে কতকগুলি মেটে পুতুল লইয়া একটা ফেরীওয়ালা বিক্রয় করিতে যাইতেছে দেখিয়া তিনি তাহাকে ডাকিলেন এবং পুতুলগুলি দেখিয়া আনন্দে একবারে আত্মহারা হইলেন। পুতুল তিনটি এক পয়সায় বিক্রী হয়, হলুদে আর কালো রঙ্গে রঞ্জিত, স্ত্রীমূর্ত্তি মাথায় একটা খোপা ও জগন্নাথের হাতের মত ছোট অর্দ্ধ-সমাপ্ত দুইখানি হাত, সেই হস্তদ্বয় হইতে স্তনদ্বয় বড়, পায়ের জায়গাটা মৃত্তি-কায় গড়া শিবলিঙ্গ অথবা বেতের মোড়ার মত। এরূপ পুতুল তো শত শত অলি গলিতে পাওয়া যায়, বঙ্গের এমন বালক বালিকা বোধ হয় নাই যাহারা এরূপ পুতুলের দশ বিশটা শৈশবে না ভাঙ্গিয়াছে। এই পুতুল হাতে লইয়া "oh most wonderful" (অতীব আশ্চর্য্য) ক্রমা-গত এইরূপ প্রশংসোক্তি করিতে লাগিলেন, আমি বলিলাম "একবারে ক্ষেপে গেলেন না কি ? এ গুলির ভিতরে কি পেয়েছেন যে রাস্তায় দাঁড়াইয়া এরূপ কচ্ছেন ? এখুনি আবার খড়দহের মত এখানে ভিড় জমাবেন, দেখ্ছি।' নিবেদিতা আমার কথায় দৃক্‌পাত না করিয়া কেবল "অতি আশ্চর্য্য, অতি অদ্ভুত, অতি সুন্দর" এইরূপ মন্তব্য উচ্চ কণ্ঠে প্রকাশ করিতে করিতে এক টাকায় সেই সমস্তগুলি পুতুল কিনিয়া রামলালের হাতে দিলেন। তারপর আমি বিদায় লইলাম।

পরদিন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম "পুতুলগুলি লইয়া কাল ওরূপ করেছিলেন কেন ?" তিনি বলিলেন—"আপনিও বুঝবেন না, ওরূপ সুন্দর ও আশ্চর্য্য জিনিষ আমি ভারতবর্ষে দেখি নাই।" এই

বলিয়া অতি লুব্ধ চক্ষে তাহার একটা হাতে করিয়া দেখিতে লাগিলেন। যাহাকে বাড়াইবেন, তাহার মাথা আকাশে না ঠেকাইয়া ছাড়িবেন না। আমি ইহার অর্থ কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।

কিন্তু তিনদিন পরে মেজাজটা একটু পড়িয়া আসিয়াছিল, সেদিন হাসিয়া বলিলেন—"দীনেশ বাবু ওই পুতুল আমার এত ভাল লেগেছে কেন, শুনবেন? ৩০০০ খ্রীঃ পূর্ব্বের অর্থাৎ এখন হইতে প্রায় ৫০০০ বৎসর পূর্ব্বের অনেকগুলি জিনিষ সম্প্রতি ক্রীট দ্বীপ হইতে ডাঃ ইভান্স আবিষ্কার করিয়া বিলাতে লইয়া আসিয়াছেন। আমি এবার বিলাত যাইয়া সেগুলি দেখিয়া আসিয়াছি, সেই সংগ্রহের ভিতর অবিকল এই পুতুলের মত পুতুল দেখিয়া আসিয়াছি।'

নিবেদিতা কালীমন্দির দেখিলেই প্রণাম করিতেন, Mother Kali নামক পুস্তকে রামপ্রসাদের গানের যে বিশ্লেষন করিয়াছেন, তাহা শাক্ত লেখকেরই ভক্তির অর্ঘ্য স্বরূপ। কিন্তু তিনি তাঁহার হৃদয়ের অন্তঃপুরের একটা কথা একদিন আমাকে বলিয়াছিলেন। "আপনি কি সত্যই ভগবানকে 'মা' বলিয়া ডাকিতে পারেন?" আমি বলিলাম "কেন পারব না? তিনি পিতা, তিনি মাতা, এ আমাদের মুখের কথা নহে। মাতৃ স্তন্যপানের সঙ্গে আমরা ভগবানের মাতৃত্ব উপলব্ধি করিয়া বড় হইয়াছি, কালী মন্দিরে যাইয়া যখন মা 'মা' বলিয়া প্রণাম করি—তখন আমরা কপটতার অভিনয় করি না।" তিনি বলিলেন "দেখুন, এই খানে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মনের তফাৎ, আমি কিছুতেই মনে মনে ভগবানের মাতৃভাব উপলব্ধি করিতে পারি না। তাঁহার পিতৃত্বই আমাদের চিরাগত সংস্কার।"

এই সময় অর্থাৎ যখন মৃত্যুর যাত্রী হইয়া তিনি স্যার জগদীশচন্দ্রের সঙ্গে দার্জ্জিলিং যাইবেন, তাহার দুই মাস পূর্ব্বে, তিনি আমার নিকট হইতে

একটি প্রস্তরময় "প্রজ্ঞাপারমিতার" বিগ্রহ চাহিয়া লইয়াছিলেন—আমি বলিয়াছিলাম, "এ মূর্ত্তি আপনাকে দিতে আমি দ্বিধা বোধ করিতেছি, আপনি এটি না নেন—ইহাই আমার ইচ্ছা।" তিনি বলিলেন "আমি আপনার মত ঐতিহাসিকের মুখে দিদিমার গল্প প্রত্যাশা করি না।" একরূপ জোর করিয়া সেই মূর্ত্তি লইয়া গিয়া তাহার পশ্চাৎভাগ একটা কুলঙ্গীর সঙ্গে তিনি গাঁথিয়া ফেলিয়া অতি যত্নে পুষ্প ও ধূপ দীপ দিয়া প্রত্যহ তাঁহার সেবা করিতেন। তাঁহার মৃত্যুর পর ভীত কণ্ঠে ক্রিশ্চিয়ানা বলিলেন, "এ মূর্ত্তি আপনি এখনই লইয়া যাউন, এবং আমাকে রক্ষা করুন, যে দিন হইতে এই মূর্ত্তি এই গৃহে আসিয়াছে, সেইদিন হইতে নিবেদিতার যে কত অশান্তি ঘটিয়াছে তাহা আর কি বলিব? মৃত্যু আসিয়া তাঁহাকে শান্তি দিয়াছে মাত্র।" আমি বলিলাম "কেন? এ মূর্ত্তি তো তিনি স্যার জগদীশচন্দ্রকে দিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা ব্রাহ্ম—তাঁহাকে পাঠাইয়া দিন।" ক্রিশ্চিয়ানা বলিলেন "ব্রাহ্ম হইলে কি হইবে। তাঁহারা কিছুতেই এ মূর্ত্তি নিতে সম্মত নহেন।" ক্রিশ্চিয়ানা এই মূর্ত্তি সম্বন্ধে এরূপ ভয় বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন যে আমি বিগ্রহখানি রাখিবার অন্যত্র ব্যবস্থা করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম।

দারজিলিঙ্গ যাওয়ার কয়েকদিন পূর্ব্বে আমার ইংরাজীতে লিখিত বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের বৃহৎ ইতিহাস প্রকাশিত হইয়া আসিল, আমি তাহার দুই খানি তাঁহাকে দিলাম। ভূমিকায় তাঁহার নাম না প্রকাশ করার জন্য তিনি আমাকে বাধ্য করিয়াছিলেন,—পুস্তক পাইয়া যে তিনি কত রূপে আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা আর কি বলিব।

তাঁহার শেষ কথাগুলি আমার কানে বাজিতেছে। একটু করুণ কণ্ঠে তিনি বলিলেন—"এই বই উপলক্ষে বহুদিন আপনার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশিয়াছি, দুইজনে একত্র হইয়া খাটিয়াছি। এখন কাজ শেষ হইয়া

গিয়াছে, আর বোধ হয় আপনাকে তেমন ঘন ঘন পাইব না। কিন্তু যে সৌহার্দ্দ্যের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা আপনি ভাঙ্গিবেন না, আপনি যদি পূর্ব্ববৎ না আসেন, তবে আমি কষ্ট বোধ করিব।" বস্তুতঃ তাহার ভগিনী জনোচিত আদর আমার নিকট কত মূল্যবান ও প্রীতিকর ছিল, তাহা আর কি লিখিব! যে দিন তাঁহার মৃত্যু-সংবাদ পাইলাম সে দিন সমস্ত বোসপাড়াটা আমার নিকট একটা মহাশূন্যের ন্যায় বোধ হইয়াছিল। বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের অনুশীলন করিয়া তিনি অনেক কবিকেই তাঁহাদের প্রাপ্য প্রশংসা দিতেন—কিন্তু তিনি নিধুবাবুর গানের যত প্রশংসা করিতেন, এত আর কাহারো নহে, রামপ্রসাদ কি চণ্ডীদাসের ও নয়।

কলিন, সি, গ্যালিলাণ্ড এবং জে, ডি, এণ্ডারসন

সৌভাগ্যবশতঃ আমি আমার স্বদেশীয় বন্ধুদের মত—অনেক পদস্থ ও মনস্বী য়ুরোপীয় বন্ধু পাইয়াছি, তাঁহাদের সৌহার্দ্দ্য আমার গৌরবের বিষয় হইয়া আছে। আমার এক অতি হিতৈষী বন্ধু ছিলেন, কলিন,সি,গালিলাণ্ড, তিনি"সিটি অব গ্লাস গো"এবং"লণ্ডন ল্যাঙ্কেসায়ার" বীমা কোম্পানির বড় সাহেব ছিলেন। মাসিক আয় ছয় সাত হাজার টাকা ছিল। কলিকাতা ইংরেজ ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের মধ্যে তাঁর অদ্বিতীয় প্রতিষ্ঠা ছিল। ছোটলাট বাহাদুর যে সভার সভাপতি ছিলেন, স্কট বনিক কুলের সেই সভার পরবর্ত্তী সভাপতি হইয়াছিলেন গালিলাণ্ড সাহেব। তিনি আমাকে সহোদরের মত ভালবাসিতেন, একবার চিঠিতে লিখিয়াছিলেন, "না তা, কিছুতেই হইবে না, আমি তোমাকে 'রায় সাহেব' লিখিতে পারিব না, তা হইলে তুমি পর হইয়া যাইবে।" *

তিনি অবসর গ্রহণ করিয়া বিলাত গিয়াছেন, গত মেলে তাঁর একখানি টাইপ করা চিঠি পাইয়াছি, তাহা এত বড় যে আমার তা পড়িতে প্রায় একঘণ্টা লাগিয়াছে, পত্র একখানি পুস্তিকা বিশেষ,—একজায়গায় লিখিয়াছেন "আমি ৩২ বৎসর ভারতবর্ষে ছিলাম, ইহার মধ্যে বহু ভারতীয় বন্ধু জুটিয়াছিল, কিন্তু গিরিশ ও তাহার মাসতুত ভাই দীনেশের মত এমন অন্তরঙ্গ কেহ হয় নাই।" (†) "তাঁহাদের দেশের জড়বাদী সভ্যতার

---

* No, not "Rai Saheb" that would be foreign to me."

† "I counted, in my 32 years of Indian experience many Indian friends, but there were none like Girish and his cousin Dinesh."

23rd July 1915

MOSTYN HOUSE,
BROOKLANDS AVENUE,
CAMBRIDGE.

প্রিয় ভাই,

অবশেষে আমি যথাসাধ্য কয়েক কথা আপনার গ্রন্থ উপক্রমণিকা স্বরূপ লিখিয়া পাঠাইয়াছি। ভরসা করি যে ইহা আপনার প্রয়োজনের মত [illegible] হইবে। ইহাতে যদি কোন "ভুল চুক" হইয়া থাকে, আপনার ছোট ভাইকে ক্ষমা করিবেন। কাল রাত্রি ১২টা পর্য্যন্ত লিখিয়াছি। আমার এই সামান্য দান আপনার হাতে সমর্পণ করিলাম। মনে করিবেন যে সময়টা খারাপ। আমরা কষ্টে ও আশঙ্কাতে আছি। যাহা হউক, যাহা লিখিয়াছি, বড় ভালবাসিয়া স্নেহের সহিত লিখিয়াছি।

আপনার চিরবন্ধু
J. D. Anderson

ডাঃ জে, ডি এণ্ডারসন সাহেবের লিখিত
বাঙ্গালা চিঠি।

নিন্দা করিয়া এবং আমাদের সাত্ত্বিক সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিতে যাইয়া আমি তাঁহার সঙ্গে বহু বিতর্ক করিয়াছি, তাহার উল্লেখ করিয়া তিনি লিখিয়াছেন—"সে ছিল আমাদের বুদ্ধির তীক্ষ্ণত্ব দেখাইবার এক মহাসমর ক্ষেত্র, কিন্তু সেই যুদ্ধ কি তৃপ্তিদায়ক ছিল! তাহাতে আমরা পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রীতি অর্জ্জন করিতাম। আমি তোমাকে সরল ভাবে বলিতে পারি যে আমা অপেক্ষা তোমার গুণানুরক্ত বন্ধু নাই। (*)সে সকল দিন তখন মহার্ঘ বলিয়া মনে করা হয় নাই, কিন্তু এখন মনে সাধ হয়,সেরূপ জীবন যদি আবার পাইতাম! তার মত সুখকর সময় আমাদের জীবনে বোধ হয় নাই।" "তোমাকে এবং তোমার মত আর কয়েকজন বন্ধু না পাইলে হয়তঃ আমার জীবনের এরূপ সফলতা হইত না, অন্তর থেকে এই কথাগুলি বল্‌ছি,ঠিক জানিও।"(+) আমি রোগের শয্যায় কতদিন এই সহৃদয় বন্ধুকে আমার শয্যার পার্শ্বে পাইয়াছি! এমন উচ্চপদস্থ ব্যক্তির অহংকার বা ইংরেজ সুলভ গর্ব্ব কিছুই ছিল না। ৩২বৎসর ভারতবর্ষে বাস করিয়াও বর্ণ-বৈষম্যের অহংকার তাঁহাকে আদৌ স্পর্শ করিতে পারে নাই, ইহা হইতে তাঁহার খাঁটী মনুষ্যত্ব প্রমাণ করিবার আর কি থাকিতে পারে।

---

* "It was a great battle of wits, at times, but it was all so represhing, and we won each others esteem and regard...I can assure you, that you have no sincerer admirer than myself."

†. "Without you an men like you Dinesh, I would not be where I am today *and that is sure*"

কিন্তু ইহাঁর সঙ্গে তো বহু বৎসরের আলাপ পরিচয় ছিল। কিন্তু যাঁহাকে চোখে দেখি নাই, যাঁহার মুখের কথা কানে শুনি নাই, তিনি কি করিয়া সহোদরাধিক বন্ধু হইতে পারেন? অথচ অবসর প্রাপ্ত সিভিলিয়ান,—চট্টগ্রামের ভূতপূর্ব্ব কমিশনার, কেম্ব্রিজের বাঙ্গলার অধ্যাপক ডাঃ জে, ডি, এণ্ডারসন আমাকে না দেখিয়াও আমার প্রতি এরূপ অনুরক্ত হইয়াছিলেন, যাহার দৃষ্টান্তে পৃথিবীতে বিরল। আমার ইংরেজী বাঙ্গলা বই গুলির সামান্য গুণ ইনি এত বাড়াইয়া দেখিতেন,যে তাঁহার প্রশংসোক্তিতে আমি অনেক সময় লজ্জিত হইয়া পড়িতাম। এণ্ডারসন ১৮৫২ খৃষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন, তিনি যখন শিশু তখন সিপাহী যুদ্ধের হাঙ্গমা হয়। তাঁহার মাতাও তাঁহার শৈশববাস্থয়ই প্রাণত্যাগ করেন। পিতা একটি হিন্দু আয়া ও হ'রে নামক বাঙ্গালী চাকরের উপর তাহার রক্ষণাবেক্ষণের ভার দিয়া মিউটনি সংক্রান্ত কাজে চলিয়া যান। হ'রে তাঁহাকে ভূতের গল্প শুনাইত, তিনি ভয়ে চক্ষু বুজিয়া শুনিতেন কিন্তু নেটের মসারির ভিতরে গেলে মনে করিতেন, ব্যুহের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন, সেখানে ভূত প্রেত প্রবেশ করিতে পারিবে না। প্রায় ৯ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত তিনি বাঙ্গলা ভাষায় কথাবার্ত্তা বলিতেন, ইংরেজী জানিতেন না, একখানি পত্রে তিনি আমাকে লিখিয়াছিলেন যে এই কয়েক বৎসরের প্রভাব জাবনে এটা বেশী হইয়াছিল যে ইংরেজীর উচ্চারণ বাঙ্গালীরা যেভাবে করিয়া থাকে আমি এখন পর্য্যন্তও কোন কোন শব্দ সেই ভাবে উচ্চারণ করিয়া ধরা পড়িয়া যাই। সেই প্রভাব হইতে এখনও সম্পূর্ণ মুক্তি লাভ করিতে পারি নাই। তাঁহার ছাত্র শ্রীযুক্ত ডোনাল্ড ফ্রেজার (এখন রঙ্গপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট) আমাকে লিখিয়াছেন "একবার শিশু এণ্ডার্সনের জ্বর হইয়াছিল, তখন হিন্দু আয়া কালীঘাটে তাঁহাকে লইয়া গিয়া বলি-দেওয়া পাঁঠার রক্তে তাঁহাকে স্নান করাইয়া দিয়াছিল, তাহাতেই নাকি

তাঁহার জ্বর সারিয়া যায়। * এণ্ডার্সনের মত রহস্যভাষাজ্ঞ ব্যক্তি য়ুরোপেও খুব বিরল। তিনি ভারতবর্ষীয় বহু ভাষা জানিতেন; মেচ, টিবেটান, অহমদের ভাষা, আকা ভাষা, টিপ্রাভাষা, প্রভৃতি বহু ভাষায় তাঁর অধিকার ছিল; তাহা ছাড়া সংস্কৃত, হিব্রু গ্রীক, ল্যাটিন, ইটালিয়ান, ফ্রেঞ্চ প্রভৃতিতেও তাঁহার আশ্চর্য্য দখল ছিল। বিলাতী বড় বড় সমস্ত পত্রিকায় তিনি রীতিমত লেখক ছিলেন এবং মৃত্যুর কিছু পূর্ব্বে বাঙ্গলা ভাষা সম্বন্ধে একখানি পুস্তক রচনা করেন। কেম্ব্রিজ ইউনিভার্সিটি আধুনিক ভাষা সংক্রান্ত একটা নূতন সিরিস প্রকাশ করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছেন। এণ্ডার্সনের বাঙ্গলাভাষার বইখানি দিয়া এই সিরিসের মুখপাত করা হইয়াছে। ৬৮ বৎসর বয়সে তিনি "ঘুমের ব্যারামে" আক্রান্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন।

প্রথম পত্র-ব্যবহারের পরই তিনি আমার ইংরেজীতে লিখিত "বঙ্গ-ভাষার ইতিহাস" খানি সম্বন্ধে লিখিলেন "ভারতবর্ষ সংক্রান্ত বিষয়গুলি লইয়া যাঁহারা আলোচনা করিয়া থাকেন, তাঁহারা সকলে গভীর শ্রদ্ধার সহিত আপনার সমক্ষে তাঁহাদের টুপি নামাইতে বাধ্য হইবেন" †

ফ্রেজার সাহেব লিখিয়াছেন, পূর্ব্ববঙ্গের প্রতি তাঁর এতই প্রাণের টান ছিল, যে বিশাল নদনদী-বেষ্টিত ঢাকা প্রভৃতি অঞ্চলের কথা উঠিলে তিনি আর জীবনে তাহা দেখিতে পাইবেন না, এই আক্ষেপে তাঁর চক্ষে জল আসিত। এণ্ডারসন "ব্রহ্মপুত্রের স্নানে"র সময় একবার তেজপুরে ছিলেন, তখন একটি বৃদ্ধব্রাহ্মণ পুরোহিত তাঁহাকে অপরাপর যাত্রীর সঙ্গে স্নান

---

* "He got ill—The Ayah took him to Kalighat, a goat was decapitated, he was smeared with blood, and *Mantras* were recited. He recovered".

†. All students of Indian subjects must take off their hats to you with profound respect."

করাইয়া দিয়াছিল। তিনি বহু কষ্টে একজন চাকরের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলিয়া 'আকা'ভাষা শিখিয়া ফেলিয়াছিলেন। তিনি সরকারের নিকট ঐ ভাষায় পরীক্ষা দিতে আবেদন করেন। সেই ভাষাবিৎ আর কেহ না থাকাতে তিনি নিজেই সরকার কর্ত্তৃক পরীক্ষক পদে নিযুক্ত হইয়া নিজের পরীক্ষা গ্রহণ এবং তদনন্তর পারিতোষিক লাভ করেন। * তিনি বাঙ্গালা ভাষায় এতটা ব্যুৎপন্ন ছিলেন যে একবার নদীয়ার এক বুড় উকিলকে তিনি ভুল বাঙ্গালায় সওয়াল জব করায় অপরাধে জরিমানা করিয়াছিলেন। † তিনি একখানি চিঠিতে লিখিয়াছিলেন"আপনার বই পড়িলে আমার নিজকে ক্ষুদ্র এবং অজ্ঞ বলিয়া মনে হয়। কিন্তু ইন্দুর ও সিংহকে সাহায্য করিয়াছিল —এটি জান্‌বেন, অন্ততঃ আমি আপনার বইএর প্রচারের পক্ষে কিছু সাহায্য করিতে পারিব!" ‡

* "When he had learnt this language, he reported to Government his desire to take an examination in it. Government asked him to name an examiner. He replied there was no one to examine. So he was told to set himself an Examination paper. He snbmitted such a paper to Government. It was approved. He then answered it and corrected it and had a *viva voce* with an Aka and passed himself. Then he drew his reward. Such was his story. I do not vouch for its accuracy or my memory of exact details."

† "In Nadia he fined an old pleader for careless Bengali in pleading."

পূর্ব্বোক্ত সমস্ত কথাই আমরা ব্রেণ্ডার সাহেবের পত্র হইতে উদ্ধৃত করিলাম।

‡ "Your book makes me feel humble and ignorant. But the mouse helped the lion, you know, and I may at least be able to make your work known over here."

আমার "মধ্য-যুগের বঙ্গীয় বৈষ্ণব সাহিত্য" নামক ইংরাজী পুস্তকের পাণ্ডুলিপি তাঁহাকে দেখিতে পাঠাইয়াছিলাম। তখন ঘোর যুদ্ধানলের আহুতি-স্বরূপ ইংরেজ পরিবারের বহু পুষ্পতুল্য সুকুমার জীবন যুদ্ধক্ষেত্রে উৎসর্গীকৃত হইতেছিল। এণ্ডার্সনের এক পুত্র যুদ্ধে নিহত হন, এবং অপরাপরেরা রণক্ষেত্রে ছিলেন। আমার পাণ্ডুলিপি পাইয়া তিনি লিখিলেন, "যদি অবস্থাচক্রে আমার সাহসে কুলায়, তবে এই বইখানির একটি ছোট ভূমিকা আমি লিখিব—সেই ভূমিকায় বুঝাইতে চেষ্টা করিব—কিরূপ আপনার সমস্ত পুস্তকের একজন রীতিমত পাঠক মনে করেন যে এই বই খানি শুধু কলিকাতায় নহে, লণ্ডনে এবং প্যারিশে, অক্সফোর্ড ও ক্যাম্ব্রিজে সর্ব্বত্র অধীত হওয়ার জিনিষ হইয়াছে। আমি এই পুস্তক অত্যন্ত আনন্দের সহিত পাঠ করিয়াছি ও করিতেছি, ইহা হইতে অনেক অনেক শিক্ষা লাভ করিয়াছি এবং আদ্যন্ত অনুরাগের সঙ্গে পড়িয়াছি। যে ভয়ানক সময়ে বহির্দ্বারে একটু কড়া নাড়িলে, কোন চিঠি আসিলে—আশঙ্কায় প্রাণ কাঁপিয়া উঠে, যখন ভয়ানক দুঃখ ও ভয়ে আমরা আভিভূত হইয়া আছি, এই সময়েও আপনার এই চমৎকার পাণ্ডুলিপি পড়িয়া সান্ত্বনা ও আনন্দ লাভ করিতেছি, ইহা দ্বারাই বুঝিতে পারেন, আপনার বইখানির বিষয় ও রচনা পদ্ধতি কিরূপ উৎকৃষ্ট হইয়াছে। আমি আপনার অতি চমৎকার বইখানি ফিরিয়া পড়িবার ব্যস্ততায় এই পত্র খানি অত্যন্ত তাড়াতাড়িতে সারিলাম।" †

† I propose to send with it, if circumstances leave me the courage to write it, a short preface explaining why in the judgment of a very old student of all your works, your book should be read not only in Calcutta but in London and Paris and Oxford and Cambridge.

আমার লেখার প্রতি তাঁর এতই অনুরাগ ছিল যে ইংরেজী বাঙ্গালা যাহা কিছু লিখিতাম, তারই অশেষ সুখ্যাতি করিতেন। প্রীতির রঙ্গিন চসমা পরিয়া তিনি আমার লেখা গুলি পাঠ করিতেন,সেই প্রীতিই আমার সামান্য রচনার সৌন্দর্য্য আবিষ্কারের যাদু-কাঠি ছিল; শুধু আমার ইংরেজী বই নয়, বাঙ্গলা লেখা গুলিও আদ্যন্ত অতি মনোযোগের সহিত পাঠ করিতেন; মন্ত্রচিত্র সতী পড়িয়া লিখিয়াছিলেন—"আমার সব চাইতে একটি বিষয় খুব ভাল লেগেছে, ফরাসী লেখক জুলে লিমেটার যেরূপ প্রাচীনতম কথা-গুলি ও সেমিটক জাতীয় পৌরানিক কাহিনী নূতন সাজে সাজাইয়া বাহির করিয়াছেন, আপনি ও অবিকল সেই ভাবে প্রাচীন উপকথা গুলির সৌন্দর্য্যে বিমুগ্ধ হইয়া লিখিয়াছেন। সেই প্রাচীন কথা-সাহিত্য যে সর্ব্বসময়ে চিন্তাক্লিষ্ট মানব-চিত্তকে সান্ত্বনা দেওয়ার ক্ষমতা রাখে, তৎসম্বন্ধে উক্ত ফরাসী লেখকের মতই আপনার সরল বিশ্বাস। লিমেটারের ন্যায় রহস্য-প্রিয়তা ও আপনার লেখার বিশেষ একটা গুণ; যে স্থানে আপনি তরুণ-বয়স্কা দেবীদের আড়ম্বর প্রিয়তা, ও সতীর রুদ্রাক্ষ বলয় ও বল্কল-বাসের প্রতি অবজ্ঞা বর্ণনা করিয়াছেন, সে জায়গাটি আমার চমৎকার লাগিয়াছে। আপনি কি জানেন যে প্রশান্ত মহা-সাগরের দ্বীপপুঞ্জের সুন্দরী মেয়েরা এখনও অতি মনোরম বল্কল-

I have read it and am reading it with great delight and profit and very real sympathy. Think how great must be the charm of your topic and treatment when in this fearful year of anxiety and sorrow, the reading of your delightful Ms. has given me rest and refreshment at a time when every post, every knock at the door may bring us sorrow. I write this in frantic hurry in order

বাস পরিয়া থাকেন ? সে গুলি তাহাদেরে চমৎকার মানায় !" * আমার নীলমাণিক নামক গল্পের বইখানি পড়িয়া তিনি ১৬ পৃষ্ঠার এক চিঠি লিখিয়াছিলেন তাহাতে প্রশংসার অবধি ছিল না। তিনি মনে করিতেন, নীলমানিকে আমি আমার নিজের চরিত্রের প্রতিচ্ছায়া দিয়াছি। † ঐ পুস্তকের বিবৃত সমালোচনা করিয়া এক জায়গায় লিখিয়াছিলেন, "সুন্দরী, জেদপরায়ণা দুর্ভাগা এবং বিপথগামিনী রাণী চরিত্রের শেষ অংশের মত করুণ এবং মর্ম্মস্পর্শী লেখা আমি বহুদিন পড়ি নাই। ‡

to go back to your most interesting and fascinating pages."

* But what interests me most is the fact that you retell the story in exactly the same fashion as Jules Lematre tells the ancient legends of classical antiquity and of the Semetic East, with a pious delight and belief in their charm and beauty, and power to give solace to the poor puzzled mortals. Like M. Lematre your tale has the additional delight of humour. That is a very delightful passage in which your little goddesses shew off their jewels and lough at Sati's bark-dress and *rudraksa* bracelet and do you know that in the Pacific islands the pretty girls still wear the most lovely bark-dresses which are extremely becoming ?"

† "There is an element of self-portraiture in your very vivid picture of Nilmanik."

‡ As for poor little Rani, wiiful, beautiful erring, unhappy, that scene of the poor girl's death is one of the most touching and significant things I have read for many a long day."

একদা নিউনহাম কলেজের দুই শত মহিলার নিকট তিনি আমার "সতী" গল্পটী পড়িয়া তাঁহার ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, এবং 'এসিয়াটীক কোয়রটারলি, পত্রিকায় ঐ পুস্তকের বিস্তৃত সমালোচনা করিয়া আমার একটি জীবনী প্রকাশিত করিয়াছিলেন। বিলাত-প্রত্যাগত অনেক ভদ্র লোকের নিকট শুনিয়াছি, তিনি আমার সম্বন্ধে সকলের নিকট এত উচ্চ প্রশংসা করিতেন, যে তাঁহার শ্রোতৃবর্গ আমার সম্বন্ধে তাঁহার মন্তব্যের খুব বেশী একটা মূল্য দিতে চাহিতেন না, তাঁহাকে আমার পক্ষপাতী বলিয়া ঠিক করিয়া লইয়াছিলেন।

আমাকে তিনি বহু পত্র লিখিয়াছেন, তাহার অর্দ্ধেকের বেশী হারাইয়া গিয়াছে। আর যাহা আছে, তাহা আমি বাঁধাই করিয়া রাখিয়া দিয়াছি, তাহা প্রায় ছয় শত পৃষ্ঠা হইবে। এই সকল পত্রে রাজনীতি, ভাষাতত্ত্ব ও ধর্ম্মসম্বন্ধীয় নানারূপ আলোচনা আছে। একবার ইউরোপীয় নীতি-মূলক ধর্ম্ম ও আমাদের ভক্তিবাদ নিয়া তাঁহার সঙ্গে আমার খুব বিতর্ক চলিয়াছিল। ন্যায়-অন্যায়ের তুলাদণ্ড ধরিয়া তিনি ঐশ্বরীক বিধানের সত্তা নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলেন, কিন্তু ন্যায়ান্যায় ও ধর্ম্মাধর্ম্মের উর্দ্ধে যে একটা ভগবৎ লীলার জগৎ আছে, নীতিজ্ঞের সূক্ষ্ম বিচারে যাহা আয়ত্ব করা যায় না, যাহা সম্পূর্ণ নির্ভর-শীল ভক্তের একান্ত আশ্রয় ও সান্ত্বনার চরম স্থল—সেইটি তিনি স্বীকার করিতে চান নাই, অথচ প্রতিপক্ষের মতের উপর তাঁহার যথেষ্ট শ্রদ্ধা ছিল। বঙ্গভাষা তিনি প্রাকৃত হইতে উদ্ভূত একথা স্বীকার করেন নাই,—তাঁহার বিশ্বাস ছিল আর্য্য-উপনিবেশের পূর্ব্বে এদেশে তিব্বত-ব্রহ্মদেশীয় ভাষামূলক এক প্রকার অনার্য্য ভাষা প্রচলিত ছিল, সেই মূল ভাষার উপর প্রথম প্রাকৃত তৎপরে সংস্কৃত ভাষার অভিধান আসিয়া অধিকার করিয়া বসিয়াছে। এই বিষয়ে বাঙ্গলা ভাষা ও ফরাসী ভাষা তিনি একরূপ বলিয়া মনে করিতেন। ফরাসী ভাষা গ্যালিক ভাষার

ভিত্তির উপর ল্যাটীন ভাষার আভিধানিক ঐশ্বর্য্যে রূপান্তরিত হইয়াছে। তিনি মনে করিতেন বদো, মেচ, কাছাড়ি ও মণিপুরী ভাষার চিহ্ন যদিও বাঙ্গলা ভাষায় এখন ততটা দেখা যায় না—যেহেতু প্রাকৃত-অভিধান অগস্ত্যমুনির ন্যায় সেই পুরাতন অনার্য্য ভাষাটাকে একেবারে গণ্ডূষ করিয়া গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে—তথাপি খুব সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে অনুধাবন করিয়া দেখিলে বঙ্গলা ভাষায় সেই অনার্য্য ভাষার সুরটি পাওয়া যাইতে পারে,। এই সংমিশ্রনে বাঙ্গলা ভাষা তাহার অসামান্য ক্ষিপ্রগতি, কোমলতা ও সর্ব্বতোমুখী প্রকাশ-শক্তি অর্জ্জন করিয়াছে। তিনি 'বদো' ভাষা হইতে অনেক উদাহরণ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে উক্ত ভাষায় প্রচলিত বহুল অসমাপিকা ক্রিয়ার ভঙ্গীটি এখন ও বঙ্গভাষার ভিত্তি মূলে প্রাপ্ত হওয়া যায়,—উদাহরণ স্থলে তিনি এই ছত্রটি উদ্ধৃত করিয়াছিলেন, "আমি তোমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া বলিয়া দিয়া আসিব।"—অসমপিকা ক্রিয়া-বহুল এই প্রকার কথার বিন্যাশ সংস্কৃত বা প্রাকৃতে দৃষ্ট হয় না; 'বদো' প্রভৃতি ভাষায় এই ভাবের রচনা পাওয়া যায়। তিনি হিন্দী ও ইংরেজীতে শব্দের উপর জোর দেওয়াটা ঐ ভাষাগুলির বিশেষ লক্ষণ মনে করিতেন —এবং ফরাসী ও বাঙ্গলায় একটা পূর্ণ বাক্যাংশের উপর জোর দেওয়ার প্রণালীর প্রতি বিশেষ ভাবে ইঙ্গিত করিয়াছিলেন। ঐ word-stress এবং phrasal accent এতদুভয়ের লক্ষণ লইয়া তিনি অনেক দীর্ঘ চিঠি আমায় লিখিয়াছিলেন।

বস্তুতঃ তাঁহার চিঠি গুলি এত বিভিন্ন বিষয় লইয়া গবেষনার উপাদান প্রদান করিতেছে, যে সেগুলি প্রবন্ধাকারে মুদ্রিত হওয়ার যোগ্য—সেগুলি একজন আজন্ম সাহিত্য-সেবীর সরল প্রাণের উপহার—অসাধারণ পাণ্ডিত্যের নিদর্শন. এবং তাহার সহৃদয়তা ও সৌহার্দ্দ্যের খনি-স্বরূপ—হাতের লেখাগুলি ঠিক মুক্তার ন্যায়। আমি ভুল করিলে তিনি সহৃদয়তার

কৌশলে আমাকে কি ভাবে সংশোধন করিয়া দিতেন, তাঁহার একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি। আমি কয়েকবার তাঁহার নিকট লাল কালীতে চিঠি লিখিয়াছিলাম বোধ হয় চিঠি-পত্রে লালকালী ব্যবহার ইংরেজী কায়দা-বিরুদ্ধ। আমাকে তাহা স্পষ্ট করিয়া বলিতে তিনি সঙ্কোচ বোধ করিতে-ছিলেন, অথচ আমি যখন ক্রমাগতই লাল কালী চালাইতেছিলাম, তখন আমাকে উৎসাহ দেওয়া কিছুতেই তাঁহার পোষাইতেছিল না—এটা বুঝিতে পারিলাম। তিনি একখানি চিঠি এই ভাবে শুরু করিলেন, "লাল কালীতে লিখিলাম, ক্ষমা করিবেন, কি করিব? ছেলেদের খাতা সংশোধন করিতে-ছিলাম, একটি ছেলে আমার কালো কালীর দোয়াতটা লইয়া পলাইয়াছে।"*

তাঁহার সঙ্গে পত্রব্যবহারের এক বৎসর পরে তিনি আমাকে একখানি চিঠিতে লিখিলেন—"আমি আপনাকে আর "মিষ্টার সেন" বলিয়া সম্বোধন করিতে চাই না "মিষ্টার" কথাটা ছাড়িয়া দিতে চাই, আপনি কি বলেন? আপনি ও আমাকে আপনার প্রবৃত্তি হইলে শুধু "এণ্ডারসন" বলিয়া সম্বোধন করিবেন।" † পরে তিনি চিঠি গুলিতে "ভাই আমার" কথাটা বাঙ্গলায় লিখিয়া ইংরেজীতে আর সব কথা লিখিতেন। কখনও কখনও ইংরেজী পত্রের নিম্নে এণ্ডারসন না লিখিয়া "ইন্দ্রসিংহ" লিখিতেন। আমি একবার লিখিয়াছিলাম, আপনি 'ইন্দ্র সিংহ' না লিখিয়া "ইন্দ্র সেন" লিখুন না কেন? তাহা হইলে আপনি ঠিক আমাদের আত্মীয় হইয়া দাঁড়াইবেন, তা ছাড়া Anderson এর son এর সঙ্গে "সিংহ" অপেক্ষা "সেনের" সাদৃশ্য বেশী। ইহার পর হইতে তিনি পত্রে "ইন্দ্রসেন" বলিয়া অনেকবার স্বাক্ষর করিয়াছিলেন।

---

* "Excuse red ink! I have been correcting exercises and one of the children has carried off the black ink-pot."

† "*May I drop calling you "Mr. Sen" and will you, if you like, call me 'Anderson' without 'Mr.?*"

আমি তাঁহাকে যে সকল চিঠি লিখিতাম, তাহার প্রশংসা তিনি অনেকের কাছে করিতেন। ডাঃ তারাপুরওলার কাছে একখানি চিঠিতে আমার পত্রগুলি তাঁর নিকট কিরূপ ভাল লাগে তাহা লিখিয়াছিলেন, আমাকে একবার লিখিয়াছিলেন—"আপনাকে আমি কখনও চর্ম্মচক্ষে দেখি নাই, কিন্তু এইটি আমার সান্ত্বনা যে অনেক সময় মুখের কথায় লোককে যা বুঝা যায়, চিঠিপত্রে তার চাইতে ঢের বেশী বুঝা যায়। আমি নিশ্চয়ই একটা বড় ভুল করিয়াছি যদি আপনার সম্বন্ধে আমার ধারণা ঠিক না হইয়া থাকে; আমি আপনার চিঠি পত্র পড়িয়া সর্ব্বদা মনে করিয়া থাকি, যে আপনি একজন অতি উৎকৃষ্ট সহৃদয় ব্যক্তি।" * তাঁহার প্রীতি আমার সমস্ত ক্ষুদ্রতার উপর খুব বড় রংএ ফলাইয়া দিয়াছিল। তাঁহার এক পুত্র যুদ্ধে মৃত হন, আমি সান্ত্বনা দিয়া একখানি চিঠি লিখিয়াছিলাম, উত্তরে তিনি লিখিয়াছিলেন "পত্রের গোড়াতেই আমি বলিতে চাই—এটি অত্যন্ত আন্তরিক এবং সত্য বলিয়া গ্রহণ করিবেন, যে পৃথিবীর সমস্ত স্থান হইতে আমাদের বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়দের নিকট হইতে সান্ত্বনা-সূচক চিঠি পাইয়াছি, কিন্তু কাহারও চিঠিতে আপনার কথাগুলির অপেক্ষা আমরা বেশী সান্ত্বনা ও আন্তরিকতা পাই নাই।" †

---

* "It has always been something of a consolation to me for not having met you in the flesh that often a man's written style in his letters tells his temperament and character even better than his spoken words, and I am very much mistaken if my unseen friend Dinesh is not one of the kindest and best of men."

† "In the first place let me tell you. with the greatest earnestness and truly that of all the kind messages of sympathy and regret which has reached us from friends and relatives in all parts of the world, none has moved and comforted us more than your affectionate words."

আমি সমস্ত শোক দুঃখ বাসি ফুলের মত সরাইয়া ভগবানের শ্রীচরণ-পদ্মে ভক্তি ও নির্ভরের নূতন ডালি উপহার দিতে তাঁহাকে বলিয়াছিলাম।

তাঁহার শত শত পত্র হইতে আর বেশী কিছু উদ্ধৃত করিব না। তিনি সিলেট—হবিগঞ্জে প্রথম দাম্পত্য জীবন কি ভাবে কাটাইয়াছিলেন, খোয়াই (ক্ষেমঙ্করী) নদীর সংশ্রবে কতরূপ কবিত্বময় ভাবের উচ্ছাসে তাঁহার মন ভরপুর হইত, তাহা একখানি চিঠিতে অতি সুন্দর ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন। ক্রমাগত দুই মেলে আমার চিঠি না পাইলে তিনি সহোদরের ন্যায় উৎকণ্ঠিত হইতেন, আমার চিঠি জার্ম্মান ক্রুজারে নষ্ট করিয়া ফেলিল কিম্বা আমি হঠাৎ অসুখ করিয়া বসিলাম, এইরূপ নানারূপ দুশ্চিন্তাতুর হইয়া তিনি কত কি লিখিতেন! আমার স্নায়বীর দুর্ব্বলতা কিসে ভাল হইবে, সাত সমুদ্র তের নদী দূরে বসিয়া ব্যস্ত হইয়া তিনি সেই চিন্তা করিতেন,—শারিরীক ব্যায়াম কি ভাবে করা দরকার, কত বৈজ্ঞানিক মত খুঁজিয়া খুঁজিয়া সেই উপদেশ বাহির করিতেন এবং শরীর ও বয়সের উপযোগী ব্যবস্থা করিয়া পাঠাইতেন। গত ১৯২০ সালের ২৪এ নবেম্বর সাড়ে ছয়টার সময় তিনি স্বর্গীয় হইয়াছেন। পুত্র-শোক ও অতিরিক্ত খাটুনিতে তাহাঁর শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। যুদ্ধের উপলক্ষে বহু ভাষায় অধিকার থাকার দরুণ, গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে অনুবাদ-কার্য্যে বেগার খাটাইয়া ভগ্ন স্বাস্থ্যের যে টুকু ভাঙ্গিতে বাকী ছিল তাহার উপর শেষ আঘাত দিয়াছিলেন। অবশ্য স্বদেশে-প্রেম তাঁহাকে এই কার্য্য প্রণোদিত করিয়াছিল। অনেক ইংরেজ যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিয়াছেন, তিনিও সেই যুদ্ধের জন্য খাটিয়াই প্রাণ দিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার য়ুরোপীয় বন্ধু বান্ধব ও সাহিত্যিক সুহৃদ্বর্গ এক বাক্যে বলিয়াছিলেন, যে বঙ্গদেশের—বঙ্গসাহিত্যের এরূপ প্রীতি-মূলক, এরূপ

গৌরবাত্মক এবং এরূপ বিজ্ঞজনোচিত সমালোচনা করিবার লোক বিলাতে আর কেহ নাই। যে দিন তাঁহার মৃত্যু সংবাদ শুনিয়াছিলাম, সে দিন আমি নিদারুণ পীড়ায় শয্যাগত,সেই দিন মনের উপর দিয়া যে ঝড় বহিয়া গিয়াছিল তাহার বেগ এখন ও থামে নাই। এখনও বিলাতী মেল আসিলে এণ্ডার্সনের পত্র না দেখিয়া হঠাৎ মনের প্রফুল্লতা সমস্ত চলিয়া যায়, নূতন বই প্রকাশিত হইলে তাঁহার কথা মনে পড়িয়া কান্না পায়।

তিনি আমাকে অনেক গুলি চিঠি বাঙ্গলায় লিখিয়াছিলেন,তাহার বেশীর ভাগ বন্ধুবান্ধবেরা লইয়া গিয়াছেন, একখানি নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি।

২৩শে জুলাই ১৯১৫

মষ্টিন হাউস, ব্রুকল্যাণ্ড এ্যাভিনিউ, কেম্ব্রিজ—

প্রিয় ভাই,

অবশেষে আমি যথাসাধ্য কএক কথা আপনার জন্য উপক্রমণিকা স্বরূপ লিখিয়া উঠিয়াছি। ভরসা করি ইহা আপনার প্রয়োজনের মত হইবে। ইহাতে যদি কোন "ভুল চুক" থাকে, আপনার বুড়ো ভাইকে ক্ষমা করিবেন। কাল রাত্রি ১২টা পর্য্যন্ত লিখিয়াছি। আমার এই সামান্য দান আপনার হাতে সমর্পন করিলাম। মনে করিবেন যে সময়টা খারাপ। আমরা কষ্টে ও আশঙ্কাতে আছি। যাহা হউক, যাহা লিখিয়াছি, যৎপরোনাস্তি স্নেহের সহিত লিখিয়াছি।

আপনার চির বন্ধু
J, D, Anderson.

তিনি অনেকবার আমায় লিখিয়াছেন "সমস্ত পৃথিবীময় আপনার ইংরেজী পুস্তক গুলির অনুরক্ত এত লোক আছেন যে তাঁহাদের খবর আপনি কিছুই জানেন না।" এক সাহেব এরিওপ্ল্যানে আকাশে ভ্রমণ করায় সময় আমার পুস্তক পড়িয়া প্রীত হইয়াছিলেন-এবং এণ্ডারসনের

নিকট চিঠি লিখিয়া আমার সন্ধান লইয়াছিলেন – সে চিঠি তিনি আমার নিকট পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। আর একবার আমার অসুখের সংবাদ শুনিয়া লিখিয়াছিলেন—"আপনি সাবধানে থাকিবেন, বাঙ্গলাদেশে দুইটী দীনেশ নাই, পৃথিবীময় আপনার বন্ধু আছেন, আপনি যাঁহাদেরে জানেন তাঁহাদের চাইতে বেশী। তাঁদের সকলের জন্য আপনি আপনার জীবনটাকে যত্ন করিবেন, আমাদের সকলে নিকট আপনার জীবনের মূল্য খুব বেশী জানিবেন।" *

ভালবাসা একটা অসীম সামিগ্রী, ইহার চোখে পড়িলে কিছুই ক্ষুদ্র থাকে না। এণ্ডার্সন তাঁহার অসামন্য ভালবাসা দিয়া আমার মত সামান্য লোককে বাড়াইয়া গিয়াছেন। মরিবার একবৎসর পূর্ব্বে কেম্ব্রিজ ইউনিভার্সিটি এণ্ডারসনকে 'ডিলিট' উপাধি প্রধান করিয়াছিলেন'। এই উপাধি পাইয়া তিনি আমাকে লিখিয়াছিলেন "আমা অপেক্ষা আপনি এই উপাধি পাওয়ার যোগ্যতর।"

---

* "You must be carefui of yourself. There are not two Dineshes in all Bengal and for the sake of your friends all over the world more in number than yon know, you must take care of a life that is very valuable to us."

ইংরেজীতে লিখিত বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস।

আমি ১৯০৭ সনে ইংরেজীতে 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের' ইতিহাস রচনা করি। যাঁহারা এই বই দেখেন নাই, তাঁহাদের অনেকে মনে করিয়া থাকেন ইহা আমার 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' নামক বাঙ্গলা গ্রন্থের ইংরেজী তর্জ্জমা। এই ধারণা একেবারে ভুল। দুই পুস্তকের বিষয়গত সাদৃশ্য অবশ্যই আছে, কিন্তু ইংরেজী বই সম্পূর্ণ নূতই প্রণালীতে লেখা। ইহার বিষয়-বিভাগ ও আলোচনা প্রণালী সম্পূর্ণ নূতন। তাহা ছাড়া অনেক নূতন কথা এই পুস্তকে সন্নিবেশ করা হইয়াছে যাহা 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে' নাই। 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' যখন লিখিতে আরম্ভ করি, তখন আমি ২১।২২ বৎসরের নব-যুবক, আর ইংরেজী বই আমি আমার ৪০ বৎসর বয়সে লিখিতে সুরু করিয়াছিলাম। সুতরাং ইংরেজী পুস্তকের বিষয় নির্ব্বাচনাদিতে কতকটা পরিণত বয়সের অভিজ্ঞতার পরিচয় থাকিবার কথা।

এই পুস্তক প্রকাশিত হওয়ার পরে য়ুরোপের বিখ্যাত পত্রিকা সমূহে যে সকল সমালোচনা প্রকাশিত হয়—তাহা আমার পক্ষে খুব শ্লাঘনীয় হইয়াছিল। ইহার পূর্ব্বে সার জর্জ্জ গ্রিয়ারসন আমাকে লিখিয়াছিলেন, "বিলাতের টাইমস পত্রিকায় যদি আপনার কোন পুস্তকের সমালোচনা তিনটি ছত্রেও হয়, তবে সেটি একটা মস্ত বড় গৌরবের কারণ হইবে।" কিন্তু সেই সুবিখ্যাত টাইমস পত্রিকায় আমার শুধু এই বহীর নয়, মদ্‌রচিত অপরাপর অনেক পুস্তকেরই সুদীর্ঘ অনুকূল সমালোচনা বাহির

হইয়াছে, তাহার কোন কোনটী পূর্ণ দুই স্তম্ভ ব্যাপক এবং অপরাপর গুলির অধিকাংশই এক স্তম্ভের উপর। টাইমস লিখিয়াছিলেন, "ইংরেজী লিখিত পঞ্চাশ খানি ভ্রমণ বৃত্তান্ত পাঠ করিলে হিন্দুদের সম্বন্ধে যে জ্ঞান জন্মে, এই এক খানি পুস্তক পাঠে তদপেক্ষা অধিকতর অভিজ্ঞতা জন্মিবে, লোটির ত্রিবাঙ্কুরের মন্দির সম্বন্ধীয় কৌতূহল-প্রদ গ্রন্থ এবং মঃ সেভ্রিলনের হিন্দুধর্ম্মের সম্বন্ধীয় বিরাট পল্লবগ্রাহিতা এই অনাড়ম্বর হিন্দুলেখকের পুস্তকে নিকট একান্ত হীন-প্রভ বলিয়া মনে হয়।" * সুপ্রসিদ্ধ এথিনিয়ম পত্রিকার মতে, "বঙ্গ সাহিত্যর মধ্য-যুগ সম্বন্ধে গ্রন্থকার যে সকল তত্ত্ব দিয়াছেন, তাহা তাঁহার সময়কার অথবা কোন সময়ের কোন পুস্তকে প্রদত্ত হয়র নাই" † এবং স্পেকটেটর বলেন "বোধ হয় যে পরিশ্রম ও বিদ্যার ফলে এই পুস্তক বিরচিত হইয়াছে, তাহা অন্য কোন জীবিত গ্রন্থকারের নাই।' ‡ এইরূপ অতিশয়োক্তি পূর্ণ কত যে সুদীর্ঘ সমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছিল,

---

* "He tells more about the Hindu mind than we can gather from 50 volumes of impressions of travel by Europeans. Loti's picturesque account of Travancore temples,and even M.Chevrillon's synthesis of much browsing on Hindu scriptures seem faint records by the side of this unassnming tale of Hindu Literature." Time's Literary Supplement, June 20, 1912.

† "In the middle age he has done more for the history of his national Language and Literature than any other writer of his own or indeed any time. Athenium,March 16,1912

‡ "Perhaps no other men living has the learning and happy industry for the task he has successfully accomplished" Spectator, June 12, 1912

তাহার সংখ্যা নাই। ফরাসী 'রিভিউ এসিয়াটিক' পত্রিকায়' ডেন্মার্কের বিজ্ঞজনে অবদি রয়েল ইন ষ্টিটিউট ফর ট্যাল নামক মাসিক পত্রে এবং জারমেনির ডিউটসি রাওস্যা প্রভৃতি য়ুরোপের সর্ব্ব প্রধান পত্রিকা-সমূহ পুস্তক খানিকে বিশেষ ভাবে অভিনন্দিত করিয়াছিলেন। এই সকল সমালোচনার আর একটি প্রধান বিশেষত্ব এই ছিল যে য়ুরোপের যাঁহারা প্রাচ্য বিদ্যার শিরোভূষণ তাঁহারই এই সকল সমালোচনা লিখিয়াছিলেন। হল্যাণ্ডের সমালোচক ডাঃ কারণ (Dr Kern) তাৎকালিক প্রাচ্য প্রত্নতাত্ত্বিকদিগের মধ্যে পুজনীয় ছিলেন। ইঁহার সম্মানের জন্য সমস্ত য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ একসময়ে যে বিরাট অভিনন্দন পুস্তক সকলন করিয়া উপহার দিয়াছিলেন, তাহা সংস্কৃত নামে অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন, সেই পুস্তক খানির নাম "কর্ণপুজা"। ইনি আমার বই খানির অষ্টপৃষ্ঠা ব্যাপক দীর্ঘ সমালোচনা প্রকাশ করিয়াছিলেন। জারমনিতে সর্ব্বপ্রধান সংস্কৃত-বিৎ পণ্ডিত ওল্ডেনবারগ সমালোচনা করিয়াছিলেন, এবং ফরাসী দেশের রয়েল এসিয়াটীক সোসাইটীর সভাপতি সেনার্ট এবং উদীয়মান প্রাচ্য-তাত্ত্বিক জুলে ব্লক সুদীর্ঘ প্রশংশোক্তি পূর্ণ সমালোচনা লিখিয়াছিলেন। বিলাতের রয়েল এসিয়াটীক সোসাইটীর জারনালে প্রবীন ঐতিহাসিক এইচ বিভারেজের সমালোচনা প্রকাশিত হয়, এবং ইণ্ডিয়ান এণ্টিকোয়ারী পত্রিকায় আমার সমালোচনা করিয়াছিলেন হাইকোর্টের ভুতপূর্ব্বক বিচারপতি এবং অধুনাতন প্রত্ন-তাত্ত্বিকগণের মধ্যে বিশিষ্ট লেখক পারজিটার। ইহা ছাড়া শিল্পাচার্য্য ই, বি, হাবেল, ঐতিহাসিক ভিন্সেণ্ট স্মিথ, য়ুরোপীয় কলাশিল্পের অগ্রণী রথেনষ্টাইন, প্রত্নতত্ত্ববিৎ র‍্যাপসন, বারনেট, হুলজ, ব্লুমহার্ডট, প্রেসেডেন্সী কলেজের ভূতপূর্ব্বে অধ্যক্ষ বৃদ্ধ টনি, আমাদের প্রিয় বিচারপতি তন্ত্র-রত্নাকর উড্রোফ প্রভৃতি কত লেখক যে আমাব পুস্তকের বিশেষ সুখ্যাতি করিয়া দীর্ঘ পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা

আমার এখন সমস্ত মনে নাই। চট্টগ্রামের ভূতপূর্ব্ব কমিসনর প্রসিদ্ধ লেখক এফ, এস ক্রাইন মহোদয় লিখিয়াছিলেন "আপনার পুস্তক একটি মনুমেণ্ট, আমি অতিশয় আনন্দ সহকারে এই পুস্তক পড়িতেছি, আমি যে সকল তত্ত্ব জানিতাম না, তাহা ইহা হইতে শিখিতেছি।" *

য়ুরোপের সুবিখ্যাত চিত্র-শিল্পী রথেনষ্টাইন আমার পুস্তক পড়িয়া অযাচিত ভাবে আমাকে সুদীর্ঘ প্রশংসাপূর্ণ পত্র লিখিয়া আপ্যায়িত করেন, তিনি আমার সমস্ত বই গুলিই ভাল করিয়া পড়িয়াছিলেন এবং উচ্ছ্বাসিত কবিত্বময় ভাষায় লিখিয়াছিলেম "আপনার পুস্তক একখানি যাদু কার্পেটের ন্যায়, ইহাতে চড়িয়া আমি যেন আপনার প্রিয় দেশটি আবার প্রত্যক্ষ করিয়া আসিলাম। আপনার বই পড়িতে পড়িতে আমার মনে হইল যেন আমি মন্দিরের আরতি ঘণ্টা শুনিতে পাইতেছি, গঙ্গার ঘাটে নৌকারূঢ়া রমণীগণের কলধ্বনি যেন আবার আমার কর্ণে প্রবেশ করিতেছে। যদিও আপনি ইংরেজী ভাষায় লিখিয়াছেন, কিন্তু ইংরেজী ভাষার ভিতর দিয়া আপনার হিন্দু হৃদয়ের সমস্ত ভক্তি এমনই আশ্চর্য্য রূপে প্রকাশ পাইয়াছে যে আপনার লেখার গুণে আপনার দেশ আমাব চোখের সামনে যেন একখানি জীবন্ত চিত্রের ন্যায় জাগিয়া উঠিয়াছে।'

সার জর্জ্জ গ্রিয়ারসন আমার প্রত্যেকখানি পুস্তকের শুধু অশেষ গুণানুবাদ সম্বলিত পত্র আমাকে লিখিয়া ক্ষান্ত হন নাই, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে তজ্জন্য বিশেষ ভাবে ধন্যবাদ দিয়া পত্র লিখিয়াছেন।

---

* "Monumental work, I have been revelling in the book which taught me much of which I was ignorant"

শ্রীযুক্ত সিল্‌ভান লিভি মহাশয় এখন প্রাচ্যতাত্ত্বিকদের শীর্ষস্থানীয়, তিনি আমার পুস্তকগুলির যে গুণানুবাদ করেন, তাহা যে কোন গ্রন্থকারের পক্ষে শ্লাঘা ও গৌরবের সামগ্রী হইতে পারিত। তিনি ইংরেজীতে লিখিত বঙ্গ ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসখানি পাইয়াই যে পত্রখানি লিখেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। *

"আপনার পুস্তকখানি এই সপ্তাহ হ'তে পড়িতে আরম্ভ করিয়াছি, আরম্ভ করিয়া ছাড়িতে পারিতেছি না। কোন প্রশংসাই ইহার পক্ষে অত্যুক্তি হইবে না। ইহা চিন্তামণি—এবং রত্নাকর তুল্য, ইহাতে জীবন ও বিজ্ঞান পূর্ণ মাত্রায় পাওয়া যাইতেছে। ভারতবর্ষ সম্বন্ধীয় কোনও পুস্তকই আপনার পুস্তকের সঙ্গে তুলনা হয় না। বই পড়িতে পড়িতে

* "I have began this very week, and I cannot leave it off, I cannot give you praises enongh. Your work is a Chintamani, a Ratnakar, full of science and of life. No book about India would I compare with yours. It seems as if I were wandering through your beautiful country and through the heart of your people. Never did I find such a realistic sense of literature ; literary works with you are no dead writing, but living beings, where the spirit of generations breathes freely, widely, embodied for a time in their author, expanded afterwords in the multitude of readers and hearers. Pundit and peasant Yogi and Raja mix together in a Shakespearian way —should I say too "a-la Sudraka" on the stage you have built up. I am eager to send you my sympathy, nay to express you my admiration.

মনে হইল—আমি আপনাদের সুন্দর দেশের ভিতর দিয়া, আপনার দেশীয় লোকদের হৃদয়ের অন্তঃস্থলে পৌঁছিতেছি। আপনার পুস্তকের মত কোন পুস্তকেই এমন জীবন্ত সাংসারিক ও সাহিত্যিক চিত্র আমি পাই নাই। আপনার দেশের সাহিত্যে আপনার নিকট মৃত নহে,—ইহা যেন জীবন্তভাবে পরিপূর্ণ। বহুযুগের ভাব ও আদর্শ ক্ষণ-কালের জন্য গ্রন্থকার-বিশেষে অভিব্যক্ত হইয়া পরিশেষে পাঠক ও শ্রোতৃ-বর্গের মধ্যে কিরূপে ছড়াইয়া পড়ে—আপনার পুস্তক তাহারই আলেখ্য। পণ্ডিত এবং কৃষক, যোগী এবং রাজা আপনার সৃষ্ট রঙ্গমঞ্চে সেক্সপীয়র-সৃষ্ট জগতের মত মিলিত হইয়াছেন। আমি আপনাকে আমার আন্তরিক প্রীতি, শুধু তাহা নহে, হৃদয়ের উচ্ছ্বাস জানাইতে—ব্যস্ত হইয়াছি।"

(2) One can not praise too highly the work of Mr. Sen. A profound and original erudition has been associated with vivid imagination ··· The historian, though relying on his documents, has the temperament of an Epic poet. He has likewise inherited the lyrical genius of his race. His enthusiastic sympathy vibrates through all his pages......... The appreciation of life, so rare in our book-knowledge, runs throughout the work. One reads these, thousand pages with a sustained interest ; one loses sight of the enormous labour which it presupposes ; one easily steps into the treasure of information which it presents. (Translated from French for the Bengali, April 18, 1912)

১৯১৩ খ্রীঃ জানুয়ারী মাসে সিল্‌ভান লেভি পুস্তক খানির একটি দীর্ঘ সমালোচনা করেন তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত হইতেছে—

—"মিষ্টার সেনের পক্ষে কোন প্রশংসাই অত্যুক্তি হইবে না। তাঁহার মৌলিক এবং গভীর পণ্ডিত্য সুস্পষ্ট কল্পনা শক্তির সহযোগী হইয়াছে। যদিও তিনি তাঁহার প্রস্তুত উপকরণরাশি লইয়া ঐতিসিকের পন্থাবলম্বী হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহার চিত্তটি মহাকাব্য লেখকদের মত রহিয়া গিয়াছে। তাঁহার জাতীয় চরিত্রের বিশেষত্ব গীতি-কবির প্রতিভাও তিনি উত্তরাধিকার-সূত্রে পাইয়াছেন। তাঁহার উচ্ছ্বসিত সহৃদয়তা পুস্তকের সর্ব্বত্র ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিয়াছে। আমাদের আধুনিক পুস্তকগুলিতে মানবজীবনের প্রীতিমূলক জ্ঞান, অত্যন্ত বিরল, কিন্তু এই পুস্তক খানি আদ্যন্ত সেই সহৃদয়তায় অনুপ্রাণিত। পাঠক এই এক সহস্র পৃষ্ঠাব্যাপক পুস্তক খানি আগাগোড়া কৌতূহলের সহিত পড়িবেন। যে বিরাট পরিশ্রমের ফলে পুস্তক খানি রচিত হইয়াছে—রচনার সরসতা গুণে পাঠকের চক্ষে তাহা এড়াইয়া যাইবে—বহুতত্ত্বের যে ভাণ্ডার গ্রন্থকারমুক্ত করিয়াছেন, তাহার ভিতরে পাঠক অনায়াস লব্ধ-প্রবেশ পাইবেন।"

আমার প্রতিবৎসরই ২৫০ হইতে ৩০০ পৃষ্ঠার একখানি ইংরেজী বই—মৌলিক সন্ধান করিয়া লিখিতে হয়, রামতনুলাহিড়ী ফেলোসিপের এই সর্ত্ত। এই ভাবে ৭ খানি বই লেখা হইয়াছে। তার মধ্যে চার খানি ছাপা হইয়া গিয়াছে। প্রকাশিত পুস্তকের প্রত্যেক খানিই বিলাতের প্রসিদ্ধ প্রাচ্যবিদ্যায় পারদর্শী পণ্ডিতগণ সুচক্ষে দেখিয়াছেন। এই সূত্রে অনেক বড় লেখকের সঙ্গে আমার সর্ব্বদা পত্রব্যবহার-জনিত ঘনিষ্টতা হইয়াছে। বিলাতের বড় বড় গ্রন্থকারগণ তাঁহাদের গ্রন্থে আমার পুস্তক হইতে মতামত উদ্ধৃত করিয়া এই সামান্য লেখকের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন। হ্যাভেলের শিল্পকলা সম্বন্ধীয় নানা পুস্তকে, Every man's

Library Series এর সম্পাদক Earnest Rhys কৃত গ্রন্থাবলীতে ভিন্সেণ্ট স্মিথের প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে,ম্যাকনিকোলের ভারতীয় ধর্ম্ম সম্বন্ধে পুস্তকে, আণ্ডারউড, ফারকুহার, কুমার স্বামীর এবং অপরাপর বিবিধ গ্রন্থকারগণের পুস্তক ও প্রবন্ধে আমার ইংরেজী পুস্তক হইতে নানা অংশ উদ্ধৃত হইয়াছে।

আমার পুস্তকগুলির য়ুরোপীয় সমালোচনা এত অধিক হইয়াছে, যে তাহা হইতে অংশ বিশেষে উঠাইয়া দেখাইতে হইলেও একখানি বড় পুস্তক হইয়া পড়ে। বাং ১৩১৯ সনের ১৯এ তারিখে আমেরিকা 508 W. High Street urbana Illinois. হইতে কবিবর রবীন্দ্র ঠাকুর মহাশয় আমাকে লিখিয়াছিলেন, "আমার মনে হয় ইংলণ্ডে আপনার লেখা ছাপিবার চেষ্টা করা উচিত.কারণ, সেখানে আপনার ইংরেজী গ্রন্থটি প্রচুর সমাদর লাভ করিয়াছে। যে কেহ পড়িয়াছে সকলেই বিশেষভাবে প্রশংসা করিয়াছে। অথচ ছাপা কদর্য্য এবং ছাপার ভুল অপর্য্যাপ্ত। যাহা হউক, সেখানে যখন আপনার আসন প্রস্তুত হইয়াছে, তখন এ দেশের দিকে না তাকাইয়া সেই দিকেই চেষ্টা করা কর্ত্তব্য হইবে।"

১৯১২ সনে বড় লাট হার্ডিং সাহেব বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কনভোকসনে আমার পুস্তকগুলির বিশেষ সুখ্যাতি করেন এবং ১৯১৬ সনের নবেম্বর মাসে রমেশভবনের ভিত্তি স্থাপনোপলক্ষে লর্ড কারমাইকেল ও আমাকে প্রকাশ্য ভাবে প্রশংসা করিয়া উৎসাহিত করিয়াছিলেন। বিলাতে এবং দেশে এই পুস্তকগুলি লেখার ফলে আমি অনেক সম্মানিত বন্ধু লাভ করিয়াছি, সার জর্জ্জ গ্রীয়ারসন, পারজিটার, রদেনষ্টাইন, হ্যাভেল, ব্লুমেরক, বেভারেজ, টাইমস পত্রিকার সহ-সম্পাদক ব্রাউন প্রভৃতি বহু সহৃদয় ইউরোপীয় পণ্ডিত এখন আমার মাননীয় বন্ধুর মধ্যে গণ্য। বঙ্গীয় লাট সাহেবের প্রাইভেট সেক্রেটারী

ওয়লে সাহেব আমার "Folk Literature of Bengal" পুস্তকের ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন এবং বঙ্গদেশ এবং বঙ্গ সাহিত্যের প্রত্নতাত্ত্বিক নানা সমস্যা লইয়া আমি অনেক বৎসর যাবৎ ঢাকা-বিশ্ব বিদ্যালয়ের ষ্ট্যাপলটন সাহেবের সঙ্গে বহু সংখ্যক সুদীর্ঘ পত্রে নানা রূপ তর্ক বিতর্ক চালাইয়া আসিয়াছি।

পুস্তকের এই অধ্যায়টা অযথা বড় হইয়া গেল। কিন্তু পাঠক সম্প্রদায় মনে রাখিবেন, এই প্রশংসোক্তি লইয়া যদি আমি মুহূর্ত্তের জন্যও স্বীয় গৌরব বৃদ্ধি করিবার কামনা করিয়া থাকি, তবে আমার মত কৃপাপাত্র আর নাই।

আমি শুধু এইটুকু বলিতে চাই, যদি ভগবানের প্রতি নির্ভর করিয়া নিঃস্বার্থভাবে হিতকামী হইয়া কার্য্যকরা যায়, তাহা কখনই বিফল হয় না। আমি পূর্ব্বের অধ্যায় গুলিতে লিখিয়াছি—এই বঙ্গভাষার সেবাব্রত যখন গ্রহণ করিয়াছিলাম, তখন আমার মাথায় উপর পুষ্পবৃষ্টি হইতেছিল না, চতুর্দ্দিক হইতে আত্মীয় ও সুহৃদ-বর্গ আমারই হিত ইচ্ছা করিয়া হাত বাড়াইয়াছিলেন—আমাকে এই পথে অগ্রসর হইতে বারণ করিতে। আমি তাঁহাদের শুভাকাঙ্ক্ষাপ্রসূত কোমল বাঁধার প্রতিকূলতা করিয়া দৃঢ়ভাবে আমার লক্ষ্য অনুসরণ করিয়াছিলাম। রবিবাবুর প্রতিভা দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছি, তাঁহার ন্যায় কবিগণ ভগবানের আশীষ-মাল্য পরিয়াই পৃথিবীতে আসিয়াছেন—ইঁহাদের কবিতা দেবীভারতীর নৃত্য-কলা; যাহা লিখিয়াছেন তাহাই পৃথিবী কান পাতিয়া শুনিতেছে। গীতাঞ্জলীর মত ক্ষুদ্র একখানি পুস্তক সাহিত্য-জগতকে বিস্ময়-বিমুগ্ধ করিয়া ফেলিয়াছে।

আমি তো এই সকল ভাগ্যধরের মত প্রতিভার শ্রী কপালে পরিয়া আসি নাই—আমি এমন দুর্লভ আনন্দদানের শক্তি পাই নাই।

আমার যাহা ছিল ও আছে, তাহা সকলেই পাইতে পারেন,—কোন লক্ষ্য স্থির করিয়া তাহার পশ্চাৎ মুখ-রজ্জু বিমুক্ত অশ্বের ন্যায় দিক্‌ বিদিক বিবেচনা না করিয়া ছুটিয়া যাওয়া—কোদাল-হস্ত পুষ্করণী-খনন-শীল রৌদ্র- বৃষ্টি-হিম অগ্রাহ্যকারী কুলির মত খাটিয়া যাওয়া। সে খাটুনি যে আমি খাটিয়াছি, তাহা কেহ সন্দেহ করিবেন না। আমার লিখিত শুধু ইংরেজী পুস্তকগুলি দেখিয়া একজন সিনেটের 'ফেলো' প্রকাশ্য ভাবে সভায় দাঁড়াইয়া বলিয়াছিলেন, 'দীনেশবাবুর প্রকাশিত রচনার আয়তন দেখিলে ভয় হয়।' স্বয়ং স্যার আশুতোষ এক সভায় বলিয়াছিলেন, দীনেশবাবুর অপর্য্যাপ্ত লেখায় আমাদের বিশ্ব বিদ্যালয়ের মুদ্রাযন্ত্রালয় ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে।" বহু খাটুনির ফল আমার লেখা। বঙ্গ-সাহিত্যের ক্ষেত্রে আমি মজুর ও কুলির খাটুনি খাটিতেছি। এই পরিশ্রমের ফল ভগবান আমাকে কিছু দিয়াছেন, সুতরাং আমি কর্ম্ম-ফল-সম্বন্ধে একটুকুও সন্দিহান হই নাই। এই নির্ভর ও পরিশ্রমের পরিণাম সম্বন্ধে যদি আমার এই লেখা একটী মাত্র তরুণ যুবককেও কর্ম্মে উদ্বোধিত করিতে পারে, লক্ষ্য অনুসরণ করিবার পথে দৃঢ় সংকল্পারূঢ় করিতে পারে, তবে এই যে প্রশংসোক্তির কিছু কিছু উদ্ধৃত করিয়াছি—তাহা সার্থক হইবে, নিজ হাতে নিজ জয়ডঙ্কা বাজাইবার অপরাধের বিড়ম্বনা হইতে মুক্তি পাইব।

দ্বিতীয়তঃ বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাস লিখিয়া যদি আমি এই ভাষায় বিন্দুমাত্র ও উপকার করিয়া থাকি,—তবে আমার সমস্ত প্রাণান্ত খাটুনির যা কিছু পুরস্কার পাইয়াছি, তাহা খোয়াইতে আমি কিঞ্চিন্মাত্রও দ্বিধা বোধ করিব না। "বঙ্গভাষার ও সাহিত্যের" যশঃ অটুট থাকুক, আমি ভগবানের নিকট এ প্রার্থনা করি না। আজ যাহারা বাঙ্গলায় এম, এ উপাধি লাভ করিয়াছেন ও করিতে যাইবেন, তাঁহারা যেন নূতন তত্ত্ব

আবিষ্কার করিয়া আমার পুস্তকগুলিকে হীনশ্রী করিয়া ফেলেন, তা হ'লেই আমার সমস্ত শ্রম সার্থক হইবে। যদি আমার সামান্য পুস্তকগুলি সেই সেই বিষয়ে দীর্ঘকাল আদর্শ পুস্তক হইয়া থাকে—তাহা অপেক্ষা বঙ্গ সাহিত্য-সেবীর অপবাদ আর কি হইতে পারে? ভাবী লেখকগণের চেষ্টায় যেন আমাদের অতি আদরের ভাষার ইতিহাস শতগুণ উজ্জ্বল হইয়া উঠে এবং আমার সামান্য গ্রন্থাবলী নিষ্প্রভ করিয়া ফেলে। তা হইলে যে মজুর প্রথম উদ্যমের ইট সুরকি জোগাইয়াছে—তাঁহার আনন্দের সীমা থাকিবে না। সে শুভ দিন কি আমি দেখিয়া যাইতে পারিব?

———

(২৩)

অপরাপর বন্ধু ও প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণ।

বহুবৎসর হইল, একদিন সাহিত্য-পরিষদের সভায় বসিয়া আছি—তখন এই সভা শ্যামপুকুরের ষ্ট্রীটের মুখে ডাইন দিকে কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটের উপর বসিত। এমন সময় ফড়িংএর মত শীর্ণ দেহ—অতি সামান্য সার্ট গায়ে, একটী ভদ্রলোক আসিয়া আমার পার্শ্বে বসিয়া বঙ্গভাষা সম্বন্ধে আমাকে নানা কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন; মুখে খোঁচা খোঁচা ছোট ছোট দাড়ি, বোধ হয় খেউরি হইবার অবকাশ হয় নাই, কিন্তু আমার মনে হইল পয়সা জুটে নাই,—ইঁহার সঙ্গে আমি অনেকটা আমার নিজ অহঙ্কার বজায় রাখিয়া কথা বলিতে লাগিলাম, অর্থাৎ অতি সংক্ষেপে, কারণ ইঁহাকে আমি কোন নগণ্য ব্যক্তি মনে করিয়াছিলাম। এই সময় টাকির জমিদার প্রসিদ্ধ যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় তাঁহার ল্যাণ্ডো হইতে অবতরণ করিলেন—ইনি দ্বিপ্রহরের সময়ও ঠাণ্ডা লাগার ভয়ে গাড়ীর দরজা আঁটীয়া বন্ধ করিয়া চলা ফেরা করেন,—যতীন্দ্র বাবুর দেহটী বেশ একটু স্থূল,—কিন্তু মূর্ত্তি অতি সুদর্শন, বন্ধুবান্ধবের আনন্দ-দীপ,চোখে সোনার চসমা মুখের গৌরবর্ণকে যেন আর একটু মনোরম করিয়াছে, ভুঁড়িটি একটু দোলাইয়া তিনি গৃহে প্রবেশপূর্ব্বক, আমার পার্শ্ববর্ত্তী সেই অতি দীন বেশী লোকটিকে দেখিয়া গর্ব্ব-প্রীতি ফুল্ল নেত্রে অভিবাদন

করিয়া হাত ধরিয়া লইয়া গিয়া সভাপতির আসনের নিকটবর্তী একটা ভাল জায়গায়,—ভদ্র লোকটীর নানাভাবে এড়াইবার চেষ্টা সত্বেও,—যেন একটু জোর করিয়াই বসাইলেন। আমি বিস্ময়ের সঙ্গে একজনকে জিজ্ঞাসা করিলাম "ইনি কে?" শুনিলাম, ইনিই প্রফুল্লচন্দ্র রায়—অধুনা 'স্যার' উপাধিতে ভূষিত। রাসায়ণ বিদ্যা ইঁহাকে আশ্রয় করিয়া জগতে আরও কতকটা উন্নতি লাভ করিয়াছেন। এই জগন্মান্য ব্যক্তির মুখের দিকে তাকাইয়া দেখিলাম তাঁহার অনাড়ম্বর এমন কি দীন বেশ সত্বেও চক্ষু দুটি হইতে যেন প্রতিভা জ্বলিতেছে। রসায়ণ বিদ্যা লইয়াই তো ইঁহার জগতে গৌরব, কিন্তু তিনি ইতিহাস এবং সাহিত্যের ও অনুরাগী, তাহা শেষে জানিতে পারিলাম। হিন্দু-সমাজ সম্বন্ধে ইঁহার মহাপ্রাণ একান্ত অধীর ভাবে ব্যথিত, দুর্ব্বাসার মত ভ্রুকটী-কুটিল মুখে ইনি সমাজিক প্রতারকদিগকে কখনও কখনও গালিমন্দ দিয়া থাকেন—তাহা যে কত ব্যথা ও কত মমতার পরিচায়ক তাহা গোড়ামিতে অন্ধ হইয়া অনেকে বুঝিতে পারেন না। ইঁহার দান-শীলতা—গল্পের ন্যায়, সমস্ত আয়ই প্রায় বিলাইয়া দেন। জাতীয় চেষ্টায়—ধনাগমের পথ ইনিই বাঙ্গালীকে প্রথম বুঝাইয়াছেন। রসায়ণ শাস্ত্র-চর্চ্চার তুঙ্গ শৃঙ্গে বসিয়া ইনি ধ্যানী বুদ্ধের মত থাকেন নাই—ইনি ব্যবসায়ের দ্বারা জাতীয় শ্রীবৃদ্ধিকল্পে যে প্রেরণা দিতেছেন—তাহাতে ইঁহাকেই আমরা বর্ত্তমানে কালের উপযোগী একজন আদর্শ জননায়ক বলিয়া বরণ করিতে পারি। ইনি আমার ইংরেজী 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে' বইখানি এমন ভাল করিয়া পড়িয়াছেন, বোধ হয় খুব অল্প বাঙ্গালীই সেরূপ ধৈর্য্য সহকারে বইখানির আলোচনা করার সুবিধা পাইয়াছেন। একদিন প্রেসিডেন্সি কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ জেমস সাহেবের কক্ষে বসিয়া উক্ত সাহেবের নিকট আমার পুস্তক হইতে এত কথা মুখে

মুখে উদ্ধৃত করিয়া বলিতে লাগিলেন যে আমি আশ্চর্য্য হইয়া গেলাম যে তাঁহার ছাত্র-সুলভ অধ্যয়নের স্বভাবটি এখনও বজায় আছে।

এই সময়ে আর একটি লোকের সঙ্গে আমার পরিচয় হইয়াছিল, এখনও তাঁহার কথা মনে পড়িলে চক্ষে জল আসে। হায় কবি রজনী সেন! আমার কাঁটাপুকুরের বাড়ীতে এমন অতিথি আর পাইব না। কত রাত্রি দুইটা পর্য্যন্ত যে ইনি কোকিল-কণ্ঠে গান করিয়া মুগ্ধ শ্রোতৃবর্গের খাওয়া দাওয়া বন্ধ করিয়াছেন! যিনি যেখানে বসিতেন, তিনি সেই খানেই ছবির মতন বসিয়া থাকিতেন—তাঁর কথা কত বলিব! তাঁহার গান গুলি তো এখনও আছে, পাড়াগাঁয়ে কোকিলের ডাক পাপিয়ার গান যেমন অহরহ শুনা যায়,—রজনী সেনের গান শোনা ও তেমনই সুলভ, কিন্তু যে ভক্তিতে "হে বিশ্ব-বিপদ-হন্তা, দাঁড়াও রুধিয়া পন্থা, তব শ্রীচরণতলে নিয়ে যাও মোর মত্ত বসনা গুছায়ে" তিনি উন্মত্তের মত, সুরলহরীর ঐন্দ্রজালিক মোহ সৃষ্টি করিয়া গাইতেন, সে ভক্তি আর কোথায় পাইব? আমার বাড়ীতে একটা হারমোনিয়াম, এখনও আছে, যাহা রজনী সেনের হাতে পড়িয়া তাঁহার স্পর্শ সুখে অধীর ভাবে ভগবানকে যেন ডাকিয়া কথা শুনাইত,—"ভাবি ছেড়ে গেছ, ফিরে চেয়ে দেখি, এক পা ও ফিরে যাও নি" প্রভৃতি গানের কবিমুখোচ্চারিত সুরটি এখনও যেন স্বপ্নোত্থিতের মত শুনিতে পাই। রজনী তর্ক-যুদ্ধ ভাল বাসিতেন না, গাহিয়া গাহিয়া কণ্ঠ রোগের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, যখন সেই কণ্ঠ ডাক্তারগণ নিষ্ঠুর ভাবে কাটিয়া দিলেন, তখন কোকিলের কাকলী একেবারে বন্ধ হইয়া গেল—ছিন্ন কণ্ঠ কোকিলকে কলিকাতায় হাসপাতালে দেখিয়া যে কষ্ট বোধ করিয়াছি—তাহা ভাষায় ব্যক্ত হইবার নহে। প্রাণটা ছিল তাঁর শিশুর মত কোমল। একদিন এক ভদ্রলোক ঈশ্বরের অস্তিত্বের বিরুদ্ধে অনেক যুক্তি দেখাইয়া বাহাদুরী

কান্তকবি রজনীকান্ত।

লইতেছিলেন ; সতী যেরূপ শিবনিন্দা শুনিয়া অসহিষ্ণু হইয়াছিলেন—সেই দিন রজনীর মুখে সেইরূপ নির্ম্মম আঘাত পাওয়ার ভাব দেখিয়াছিলাম। সেই তর্ক-শাস্ত্রের বাহাদুর রজনীর মুখের ভাব দেখিয়াই তর্ক চালাইবার সাহস পাইলেন না কোন অকথিত ত্রাস ও লজ্জায় ভাবে চুপ করিয়া গেলেন। রজনীবাবুর গান শুনিবার জন্য একদা মহারাজ যতীন্দ্র মোহন ঠাকুর আমাকে চিঠি লিখিয়া সময় ঠিক করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। সে দিন সন্ধ্যা ছয়টা হইতে রাত্রি প্রায় দশটা পর্য্যন্ত মাহারাজ-প্রাসাদে আমরা তাঁহার গান শুনিয়াছিলাম। মহারাজ নির্দ্দিষ্ট সময়ে আহারাদি করিতেন, কখনই প্রায় ব্যতিক্রমে হইত না। কিন্তু সে দিন সময় অতিক্রম হইয়া গিয়াছিল।

মৃত্যুর কয়েক মাস পূর্ব্বে রজনী একদিন আমার বাড়ীতে আসিয়াছিলেন, তখন তাঁহার কণ্ঠস্বর বসিয়া গিয়াছে ; কথা চাপা, যেন গলায় বাহির হইতেছিল না, বুঝিলাম গলায় ক্যান্সার হইয়াছে। তিনি বলিলেন, "গুরুদাস লাইব্রেরী আমার বাণী ও কল্যাণীর কাপি রাইট ৪০০৲ টাকা মূল্যে কিনিবেন, কিন্তু আমাকে তাঁরা চেনেন না, আপনি যদি আমার সঙ্গে আসেন, তবে টাকাটা এখনই পাইতে পারি।" আমি বলিলাম "আমার জ্বর হইয়াছে, উঠিবার সাধ্য নাই। হরিদাসবাবুকে চিঠি দিতেছি, আমার হাতের লেখা তাঁরা চেনেন, চিঠি পাইলেই টাকা দেবেন।" শুনিলাম চিঠি লইয়া গিয়া তিনি টাকা পাইয়াছিলেন।

ব্রাহ্ম-সমাজের শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের সঙ্গে আমার বহুদিনের আলাপ ছিল। এপর্য্যন্ত তাঁহার মত, উদার, মনস্বী ও ধর্ম্ম-পরায়ণ ব্যক্তি আমি দেখি নাই, বলিলেই চলে। তিনি বাগ্মী ও সুলেখক ছিলেন, এ সকল তো তাঁর জীবনের চাল-চিত্র মাত্র, কিন্তু তাঁহার জীবন ও চরিত্র ছিল—একটা বড় আদর্শ। সমাজের গোড়া হইয়া অন্ধ কুসংস্কারাপন্ন বুড় বাপ

মায়ের কথা বলিতে যাইয়া কোন্ ব্রাহ্ম শাস্ত্রীমহাশয়ের মত এরূপ ব্যাকুলতা দেখাইয়াছেন! তাঁহাদিগকে যে তিনি ত্যাগ করিয়া কষ্ট দিয়াছেন, সে কথা শেলের মত তাঁর হৃদয়ে বিঁধিয়াছিল, তাঁহার মাতা যে তাঁর শৈশবে পীড়া হওয়ার দরুন ঠাকুর দেবতার কাছে ধন্না দিয়া বুকের উপরে গরম ধুনচি রাখিয়া ফোস্কা তুলিয়া ফেলিয়াছিলেন—সেই কুসংস্কারের চরম কাহিনী বলিতে যাইয়া আর কোন্ ব্রাহ্ম অশ্রুসিক্ত হইতে পারিতেন!—সমাজের গণ্ডীর বাইরে রামকৃষ্ণ পরমহংসের কথা তিনি যেরূপ শ্রদ্ধার সহিত বলিতেন,—জুয়োজিকাল গার্ডেনে সিংহ দেখিতে পাইবেন—মায়ের বাহণ' সিংহ দেখিবেন শিশুর মতন পরমহংসদেব সেই কথা বলিতে বলিতে 'মা মা' বলিয়া সমাধি প্রাপ্ত হইলেন—এরূপ শ্রদ্ধার সহিত কোন ব্রাহ্ম এই সকল কুসংস্কারের পায় অর্ঘ্য দিতে প্রস্তুত হইতেন? ব্রাহ্মমন্দিরে মেয়ে লোকের বাহুল্য দেখিয়া পরমহংসদেব শাস্ত্রীকে বলিয়াছিলেন—"তোরা এসকল কি করিয়াছিস্, চারাগাছ পুতেই ছাগল লাগিয়েছিস্, ধর্ম্মটা যে একবারে সাবাড় হয়ে যাবে!" এই কথা বলিতে বলিতে শাস্ত্রী মহাশয় হাসিয়া খুন হইতেন,—কোন্ ব্রাহ্মের এ কথা বলিতে গিয়া মুখ রাগে রাঙ্গিয়া না উঠিবে? এইটি ছিল তাঁর বিশেষত্ব! তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মের জন্য সব ছাড়িয়াছিলেন, কিন্তু উদারতাটি ছাড়েন নাই, অন্যান্য সমাজের যাহা ভাল তাহা উপলব্ধি করিবার ক্ষমতাটি ছাড়েন নাই। যিনি পিতা-মাতা স্ত্রী—সকলের প্রতিকূলে ধর্ম্মত্যাগী হইয়াছিলেন, তাঁহার পক্ষে যে এই উদারতা রক্ষা করা কত বড় মহত্বের পরিচায়ক তাহা আর কি বলিব? তিনি 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' প্রকাশের পর আমার সম্বন্ধে যে উচ্চ গুণানুবাদ করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার প্রবন্ধাবলীর মধ্যে প্রকাশিত হইয়াছে, আমি রোগেরশয্যায় পড়িয়া সেই মন্তব্য পাঠে মনে মনে তাঁহাকে প্রণতি জানাইয়াছিলাম। আমরা উভয়ে সহযোগে বহুদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য প্রশ্ন

I will never be able to forget you. In spite of your occasional eccentricities you are a wonder. More when we meet.

Very affly yours

Rajani Kanta [illegible]

Rajshahi.

4/3/08

গ্রন্থকারের নিকট কবি রজনীকান্তের লিখিত চিঠির অংশ।

করিতে নিযুক্ত ছিলাম। যাঁহারা বৃদ্ধ সহযোগী হইতেন, তাঁহাদের কাজটা আমিই করিয়া দিতাম এবং একটা স্বাক্ষর লইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রশ্ন পাঠাইয়া দিতাম। কিন্তু আমি সেইরূপ সমস্ত কাজ করিবার ভার নিজে লইতে ইচ্ছুক হইলেও তিনি রুগ্ন অবস্থায়ও কখনও তাহাতে সম্মত হইতেন না, তাঁহার অংশ তিনি তৈরী করিয়া দিতেন। যে বৎসর হইতে তিনি উহা পরিবেন না, বুঝিলেন, সেইবার পদত্যাগ করিলেন। এই সততা সংসারে দুর্লভ! একদিন আমি বলিলাম,"নমঃ শূদ্রেরা পাছে ছেলে মেয়ের সঙ্গে বিবাহের প্রস্তাব করে—এই আশঙ্কায়, ব্রাহ্মসমাজের লোকেরা তাঁহাদের মধ্যে ধর্ম্ম প্রচার করিতে সাহসী হইতেছেন না, পাদ্রীরা তাঁহাদের মধ্যে অনেককে খ্রীষ্টান করিয়া ফেলিতেছেন।" তিনি শুনিয়া অত্যন্ত ক্ষোভ ও দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন—"যে সকল দরজা খুলিয়া দিব বলিয়া হিন্দুসমাজের রুদ্ধ গৃহ ত্যাগ করিলাম, ইহাঁরা সেই সকল দরজা আটকাইতেছেন।" তাঁহাকে আমি ব্রাহ্মসমাজের লোক বলিয়া মনে করি নাই, পুকুরে থাকিয়া যেরূপ পদ্ম-কুসুম সর্ব্বদা ঊর্দ্ধে আলোকের দিকে চাহিয়া থাকে, সেইরূপ তিনি ব্রাহ্ম সমাজকে অবলম্বন করিয়া সেই ভগবানের দিকে চাহিয়াছিলেন, যিনি কোন এক সমাজের আরাধ্য নহেন, সর্ব্ব সমাজের একমাত্র নমস্য। শাস্ত্রী মহাশয়ের কন্যা হেমলতা ম্যাট্রিকুলেসনে বাঙ্গলার পরীক্ষক ছিলেন—সেই সূত্রে আমাকে তাঁহাদের বাড়ীতে মাঝে মাঝে যাইতে হইত, যখনই যাইতাম,তখনই শাস্ত্রী মহাশয়ে কথাবার্ত্তা শুনিয়া তাঁহার প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিয়া আসিতাম।

এই পুস্তক অতিরিক্ত বড় হইয়া চলিল। আরো বহুলোকের কথা বলিতে ইচ্ছা হইতেছে, কিন্তু জায়গায় কুলাইতেছে না। সুকবি অক্ষয় বড়াল আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। এ জগতে কেহ তাঁহার শত্রু ছিল না।

সুরেশ সমাজপতি মহাশয় আমার কাছে নিজের একটা দুর্ভাগ্যের কথা বলিতেন, তাঁহার সকল সাহিত্যিক বন্ধুই প্রথম প্রথম তাঁর খুব পক্ষপাতী থাকিতেন—কিন্তু শেষে সেই বন্ধুত্বটি রক্ষা করিতে পারিতেন না। এরূপ হইবার কারণ কি জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিতেন "আমার স্পষ্টবাদিতা, "সাহিত্যের" নিরপেক্ষ সমালোচনা, কাহারও মন যোগাইবার মত করিয়া আমি কথা কহিতে জানি না।" এই 'স্পষ্টবাদী' ব্যক্তির যে স্বল্পসংখ্যক স্থায়ী বন্ধু ছিলেন, তন্মধ্যে বড়াল কবি একজন। কি ভাবে তাঁহার হৃদয় মৃত্যুকে জয় করিয়া জীবনের পরপার পর্য্যন্ত একনিষ্ঠতা রক্ষা করিতে পারিয়াছিল, তাহা তাঁহার বহুসংখ্যক কবিতায় দেখিতে পাওয়া যায়, সে গুলি তাঁহার স্ত্রীর সম্বন্ধে লেখা। বড়াল কবি জীবন-মরণের সঙ্গী,যাঁহারা এই গৌরমূর্ত্তি ভট্টাচার্য্যের মত উদার ঔদার্য্যপূর্ণ হাস্য-মুখ বন্ধুকে জানিতেন, তাঁহারা আমার কথা গুলি নিশ্চয়ই সমর্থন করিবেন। কবি দেবেন্দ্র ছিলেন, কবিতার রাজা, অন্য কবিদের দুদশটা কবিতা বাদ দিলে আসে যায় না, বড় বড় কবিরও সব রচনা ভাল উৎরায় না—সমস্ত কবিতাতেই কিছু প্রতিভার ছাপ থাকে না, নামের জোরে দশটা ভাল সামগ্রীর সঙ্গে দুটো খারাপ মালও বিকাইয়া যায়। নেংড়া আমের ঝুড়িতে পাইকার দুইচারটা মুর্শিদাবাদী বানরমুখো কালো আমও চালাইয়া দেয়। কিন্তু দেবেন্দ্র কবির প্রতিটি কবিতা—প্রতিটি ছত্র হইতে অসামান্য শক্তির চিহ্ন ফুটিয়া বাহির হইতেছে। তাঁহার যে কোন কবিতা পড়িলেই মনে হইবে ইহা প্রকৃত কবির লেখা,—তীক্ষ্ণ সৌন্দর্য্য বোধ, হৃদয়ের ভাব প্রবণতা, পল্লীলক্ষ্মীর অলক্তরঞ্জিত পদাঙ্ক দেবী-ভারতীর আঙ্গিনায় যেন ঝলমল করিতেছে। এইসকল গুণ—তাঁহার স্বকীয় প্রতিভার ছাপ—প্রত্যেকটি ছত্রে বিরাজ করিতেছে, তাহা ভুল করিবার যো নাই। দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহার কথাবার্ত্তায় এই কবিত্ব কিছুই ধরা পড়িত না। কথা-

গুলি ছিল এলোমেলো রকমের,—একটা ঔদাসিন্ত, সংসার ও বিষয় বুদ্ধির ত্রুটি কোথাও কোথাও ধরা পড়িয়া যাইত। কবি কবিতার মধ্যেই ফুটিয়া উঠিতেন, বাহিরে যেন ধরা দিতেন না। কিন্তু আমার সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পরিচয় বেশী ঘনিষ্ট ছিল না, আমি তাঁহাকে অল্প সময়ের জন্য পাইয়াছিলাম—এই জন্য বোধ হয় সামান্য পরিচয়ে তিনি নিজকে আমার নিকট পূর্ণ ভাবে প্রকাশ করিতে সংকোচ বোধ করিয়াছিলেন।

কিন্তু কবি দ্বিজেন্দ্রলাল সভায় বসিয়া তাহার হাসির গান সুরু করিয়া দিলে সমস্ত দিকের কল-কোলাহল চুপ হইয়া যাইত। দেহ ছিল তাঁর কতকটা স্থূল, মাথায় বেশ বড় রকমের টাক—গৌরবর্ণ মুখ-চোখ আনন্দময়,—আদবেই বহুভাষী নন, বরং বহু জনতা দেখিলে চুপটি করিয়া এক কোণে বসিয়া থাকিতেন, কিন্তু তাহার প্রতিভার এই সলজ্জ ভাবটা অন্তরঙ্গের কাছে একবারে ভাঙ্গিয়া যাইত। যখন তিনি নিজের হাসির গান গাইতেন, তখন তাঁহার রচিত প্রত্যেকটি শব্দ যেন মুর্ত্তিমান হইয়া আসরে হাসির তরঙ্গ তুলিয়া দিত। সন্তোষের প্রমথনাথ রায়-চৌধুরী মহাশয়ের বাড়ীতে প্রায়ই সন্ধ্যার পর আমাদের মিলন হইত, তখন তিনি গান গাওয়ার সময় হাত ও মুখের এ রকম কায়দা করিতেন, যেন হঠাৎ গানের সুরটা কথাবার্ত্তার সুরে পরিণত হইয়া যাইত। সংগীতের এই গদ্যে অনুবাদ এত দ্রুত হইত, যে তাহাতেই হাস্য-রসটা খুব বেশী জমিয়া যাইত। ধরুন, বুড় বুড়ির গানে "বুড় বুড়ি দুজনাতে মনের মিলে সুখে থাকত" হইতে "পাড়ার লোকে পুলিস ডাকত" পর্য্যন্ত বেশ হাস্যরসোদ্দীপক কাতর কণ্ঠে বুড় বুড়ীর দাম্পত্যের এই বিরোধের দিকটা গাহিয়া যাইতেন, এই ঝগড়াটার দুঃখে যেন কবি অতিশয় ব্যথিত, তাঁহার কণ্ঠ স্বরে সেই করুণার ভাব জাগাইয়া—চোখে-মুখে বিষণ্ণতা প্রকট করিয়া যখন তিনি গাইতেন— তখন তো আমরা হাসির উচ্চ শব্দে তাঁহাকে

অভিনন্দিত করিয়া গান শুনিয়াছি। কিন্তু হঠাৎ যেন তিনি রাগিয়া গিয়া গান বন্ধ করিয়া ফেলিলেন, "একদিন" পর্য্যন্তও কণ্ঠ স্বরটা গানের মতই থাকিল তার পর "ধত্তর" কথাটা আর গান নয়, সত্য—সত্যই যেন কবি রাগিয়া গিয়া চোটের সহিত "ধত্তর" কথাটা বলিয়া গানটা থামাইয়া দিলেন তারপর "ব'লে। বুড় কোথায় গেল চলে।" আবার গানের সুরে আরম্ভ হইল। মধ্যের"ধত্তর" শব্দটা বৈরাগ্য-ব্যঞ্জক নিছক গদ্য; ঐ কথাটা ক্রোধের ভাবে উচ্চারণ করিবার সময় তাঁর ভুরু দুটি সত্য সত্যই কুঞ্চিত হইত এবং মুখখানি বিরক্তি ও কুটিলতার ভাব ধারণ করিত। তাঁহার অপেক্ষা ঢের মিষ্ট স্বরে এই সকল গান অপর গায়কেরা গাহিয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহার মত এই সকল গানের কথা, সেমিকলন দিয়া গাহিয়া কেহই সেরূপ প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন না,—রঙ্গরসের দেবীকে শ্রোতৃবর্গের সাক্ষাতে তেমন করিয়া আনায়ন করিতে পারেন না। একদিন তাঁহার বাড়ীতে তিনি আমার নিকট তাঁহার পুত্র দিলীপের সঙ্গে নাচিয়া নাচিয়া "আমরা ইরান দেশের কাজী"এই গানটি গাহিয়াছিলেন,—দিলীপ ছিলেন তখন ৯।১০ বৎসর বয়স্ক, পিতা-পুত্রের গান যা শুনিয়াছিলাম, নৃত্য যা দেখিয়াছিলাম, আমার মনের মধ্যে তার একখানি ফটোগ্রাফ রহিয়া গিয়াছে, এতদিনেও মুছিয়া যায় নাই। আর একদিন নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের কন্যা বিবাহের উপলক্ষে দ্বিজেন্দ্রবাবু উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাঁহার পার্শ্বে ছিলেন রায়সাহেব হারাণ চন্দ্র রক্ষিত,—যেরূপ দুই একটা কথাবার্ত্তা হইতেছিল, তাহাতে গতিক ভাল না বুঝিয়া রায়সাহেব-মহাশয়কে হাতে ধরিয়া আমার বাড়ীতে উঠাইয়া আনিলাম। দিলীপবাবু এখন বিলাতে গিয়াছেন—তাঁহার সম্বন্ধে এণ্ডার্স'ন সাহেব আমাকে অনেক প্রশংসার কথা লিখিয়াছিলেন, সে পত্রখানি আমার কাছে আছে।

আমার কাঁটাপুকুরের বাড়ীর প্রতিবেশী ছিলেন নাট্যাচার্য্য গিরীশচন্দ্র

ঘোষ। বোসপাড়া লেনে তিনি বসিয়া তাকিয়া ঠেস দিয়া থাকিতেন,যেন নগাধিরাজ। শেষ বয়সে পরমহংস দেবের কথা পাইলে তিনি আর কোন কথা বলিতেন না। তিনি কতবার আমাদের বাড়ীতে আসিয়াছেন, নাটক দেখিতে যাইতে অনুরোধ করিয়াছেন, আমি সে অনুরোধ প্রতিপালন করিতে পারি নাই। রঙ্গ-মঞ্চের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকিয়া তিনি যেন নিজে একটু লজ্জিত থাকিতেন। একদিন তিনি আমাকে সত্য সত্যই বলিয়া ছিলেন, "দীনেশবাবু, আপনারা কি আমাকে ঘৃণা করেন?' আমি বলিয়াছিলাম, "সে কি কথা? আপনি নাট্য-রাজা, সাহিত্যের রাজা—এখন ভক্তির রাজা—আপনাকে সকলেই শ্রদ্ধা করিয় থাকেন।" কিন্তু মনে মনে তিনি লজ্জিত থাকিতেন। সভা সমিতিতে যাইতে বড়ই কুণ্ঠিত হইতেন।

তাঁহার সহচর সহ-কর্ম্মী ছিলেন অমৃত বসু—এখন তিনি বৃদ্ধ, দীর্ঘ চুলগুলির সব সাদা, মুখশ্রী একখানি শাণিত তরবারীর মত। বাঙ্গলা বক্তৃতায় যেন বৈদ্যুতিক আলো খেলে—তাঁহার প্রহসনগুলি বড় দুঃখের হাসি, সে হাসির উপাদান শুধু অশ্রু—সেই নাটকগুলি বিয়োগান্ত কাব্য অপেক্ষা ও করুণ—উহারা তীব্র কশাঘাতের ছলে অমৃত-প্রলেপ,—ডাক্তারের ছুরি, কাটিয়া ফেলায় সত্য, কিন্তু আরাম করিবার জন্য। কথাবার্ত্তা, বক্তৃতায় ইনি ধুরন্ধর, ভাষায় বাণীর মুখরতা ও কবিতার ছন্দ।

আমার বাড়ীর কাছে একজন শীর্ণকায় শ্যামাঙ্গ ব্যক্তি মাঝে মাঝে ঝড়ের মতন চলিয়া যাইতেন। আমি কখনও তাঁহার সঙ্গে দুই একটি মাত্র কথা বলিবার সুযোগ পাইয়াছি মাত্র। তিনি বঙ্গদেশের কালবৈশাখী, প্রচণ্ড ঝটিকা—বাবু শিশিরকুমার ঘোষ। ইনি যে ক্ষেত্রে যখন গিয়াছেন সেই ক্ষেত্রে জন-সাধারনকে যেন উড়াইয়া লইয়া গিয়াছেন

—রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ইনি তুবড়ির আগুণ, কিন্তু যখন ভক্তি-ক্ষেত্রে নামিলেন, তখন সেই ঝটিকা অশ্রুজলে মিসিয়া সাইক্লোনের আকার ধারণ করিল। অমিয়-নিমাই চরিত, কালাচাঁদ গীতা, নরোত্তম জীবনী বন্যার মত বঙ্গীয় গৃহস্থকে ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে। একজন লেখক বাইরণ সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন "He came and went like a shooting star, dazzling and perplexing" শিশিরবাবুর সম্বন্ধেও এই কথা বলা যাইতে পারে।

রবীন্দ্রবাবুর পরে সাহিত্যের সিংহাসন কাহার অধিকারে আসিবে—জানি না, কিন্তু শরৎচন্দ্র বোধ হয় পারিবেন না। তাঁহার প্রতিভার যে পরিচয় আমরা পাইয়াছিলাম,তাহা আমাদিগকে চমৎকৃত করিয়া দিয়াছিল। সর্ব্ব প্রথমে আমরাই তাঁহাকে প্রকাশ্য ভাবে অভিনন্দন করিয়াছিলাম; তাঁহার "রামের সুমতি" ছোট হইলেও বাঙ্গালা সাহিত্যে তাঁহার জোড়া নাই, তাহার "পণ্ডিত মশাই" "চন্দ্রনাথ", "বিন্দুর ছেলে","স্বামী" প্রভৃতি বহু পুস্তকে তিনি অপূর্ব্ব শক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন। পল্লী হইতে আসিয়া তিনি সহরে জয়ধ্বজা উড়াইয়াছিলেন—আমরা ছোট বেলায় যে শুনিয়াছিলাম "বন হতে এল টিয়া। সোনার মুকুট মাথায় দিয়া।" সেই ভাবেই আমরা তাহাকে বরণ-ডালা লইয়া অভিনন্দন করিয়াছিলাম—তাঁহার চরিত্রটিও প্রথম-মিলনের সময় সাহিত্য সমাজে একটা অপূর্ব্ব মহিমাজাল বিস্তার করিয়াছিল। যশ-মানের দিকে একবারে লক্ষ্য ছিলনা, তাঁহার সম্বন্ধে খুব প্রশংসার সমালোচনা হইলেও তিনি একান্ত উদাসীনের মত থাকিতেন, তাহা পড়িয়া দেখিবার প্রবৃত্তিও তাঁহার হইত না। একবার আমার বেহালার বাড়ীতে কৃষ্ণ বন্দোপাধ্যায় মহাশয় কোন এক রমনীর প্রতি চাবাগিচার লোকদের অত্যাচারের কথা বলিতে ছিলেন, হঠাৎ শরৎচন্দ্র বুক হাতে চাপিয়া সাশ্রু চক্ষে হাত

বাড়াইয়া বলিলেন "আমি সহ্য করিতে পারিতেছি না"—তখন তাহার সুকোমল চিত্ত-বৃত্তির যে পরিচয় পাইয়াছিলাম, তাহাতে বুঝিয়াছিলাম, ইনি হৃদয়বান্, এরূপ লোক সচরাচর দেখা যায় না! আর এক দিন শুনিলাম শরৎ বাবু তাঁহার একটা পোষা কুকুর হারাইয়া সারাদিন কলিকাতার অলি-গলীতে 'হায় হায়' করিয়া বেড়াইতেছেন,তখনও বুঝিয়াছিলাম—ইনি ঠিক সাধারণ লোকের মত নহেন, যাহাকে লোকে "কবি" "দেওয়ানা" প্রভৃতি সংজ্ঞা দিয়াছেন, ইনি খাটী সেই জাতীয়।

কিন্তু সহরে রোগ তাঁকে পাইয়া বসিয়াছে। এমন যে শিউলীফুলের গাছ, যাহা অজস্র উপহার দিয়া শত শত ভক্তের সাজি ভর্ত্তি করিয়া দেয়, তাকেও যদি কেউ কালে অকালে "ফুল দাও, ফুল দাও" বলিয়া ধরে, তবে কি সে তাহার কোমল উপঢৌকন বেশী দিতে পারে? অসময়ে ফুলের জন্য পীড়াপীড়ি করিয়া লাঠি দিয়া আঘাত করিলেও সে পাতা ছাড়া কিছু দিতে পারে না। একগোষ্টি পত্রিকা-সম্পাদক ও প্রকাশকের দল তাঁহাকে উপন্যাসের জন্য এমনই আকড়াইয়া ধরিয়াছেন—যে শরৎ বাবু অনন্যোপায় হইয়া মাসিকের মধ্যে অনেক আগাছা ও দুর্ব্বাঘাস ছাড়াইতেছেন। তাঁহার শেষ কয়েক খানি পুস্তকে রবিবাবুকে নকল করিতে যাইয়া তিনি একরূপ নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছেন; রবিবাবুর সেই অপূর্ব্ব কবিত্বের দীপ্তি তাহাতে নাই—কিন্তু আছে দুর্নীতির বীভৎসতা; এমন কি শ্রীকান্তের ভ্রমণের পূর্ব্বভাগ, যাহা বঙ্গভাষার এক অদ্বিতীয় কীর্ত্তি স্বরূপ গণ্য হইবার যোগ্য—তাহার শেষ কয়েক ভাগ তিনি ফেণাইয়া এমন দীর্ঘ করিয়া তুলিয়াছেন, যে যাহা ক্ষীর হইয়া সুরু হইয়াছিল—তাহা প্রায় ঘোলে দাঁড়াইয়াছে। যাহা হউক আজকাল আর ইনি পরের মন্তব্যে তেমন উদাসীন নহেন, এজন্য অনেক সঙ্কুচিত হইয়া লিখিলাম।

---

(২৫)

বেহালায়

আমার মধ্যম পুত্র অরুণ এই সময় (১৯১৫) এম, এ পাশ করিয়া আমাকে চিঠি লিখিলেন, তিনি আমার সহিত বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিতে চাহেন। ইহার পূর্ব্বে তাহার বিবাহ হইয়াছিল এবং কিরূপ পড়াশুনা ছাড়িয়া দিয়া ৩০৲ টাকা বেতনে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। আমি দেখিলাম যাঁহারা সংসারের ভার লইবেন, তাঁহাদের কেহ অনিচ্ছুক,কেহ অপারগ, সুতরাং কলিকাতার কাছে কোন একটা পল্লীতে বাড়ী করিয়া কাঁটাপুকুরের বাড়ীর ভাড়া পাইলে সংসার খরচটা আমার অভাবে ও কতক পরিমাণ চলিয়া যাইবে—এইরূপ চিন্তা করিয়া বাড়ী করিবার জন্য নানা স্থান দেখিতে লাগিলাম। বেহালাই পছন্দ হইল; সেখানে বহু ব্রাহ্মণের বাস, ট্রাম আছে, জলের কল আছে, হাই স্কুল, মহাকালী পাঠশালা, ছাত্রবৃত্তি স্কুল, এবং দুইটি বাজার আছে। যে যায়গাটা পছন্দ করিলাম, তা অনেকটা আমার সুয়াপুরের বাগান বাটিকার মত। চারিদিকে গাছের নিকুঞ্জ,—আম, জাম, কাঁঠাল, নারিকেল, লিচু—সমস্ত ফলবান তরুর চারু সমাহার,—গুবাক-পংক্তিতে সজ্জিত;—একটি বাঁধা-ঘাট নির্ম্মল নীল-সলিলা বাপী; সেই সুন্দর স্থানটি দেখিয়া আমার দেশের বাড়ী মনে পড়িল। কিন্তু আমি সেই সময়েই উহা

কিনিলাম না। ভাদ্র, আশ্বিন, কার্ত্তিক এই তিনটি মাস রোজ যাতায়াত করিয়া দেখিলাম, কাহারও জ্বর হইল না;—ব্রাহ্মণ-ভদ্রলোকদের চেহারা বেশ হৃষ্ট পুষ্ট দেখিলাম,—সুতরাং ম্যালেরিয়ার অপবাদ অনেকটা বাজে কথা বলিয়া বোধ হইল।

বহুদিন কলিকাতায় বাস করিয়া পল্লীজীবনের আনন্দ নূতন বোধ হইল। কৃষ্ণদা, (কৃষ্ণ মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়) পথের লোকদের নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়ান। তিনি এতদূর আত্মীয়তা দেখাইলেন যে দুদিনের মধ্যে আমি তাঁহার ছোট বড় সকল ছেলে মেয়ের "কাকা বাবু" হইয়া পড়িলাম। আশুবাবুরা কয়েক ভাই আমায় নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইলেন, এবং এতটা আত্মীয়তা দেখাইতে লাগিলেন যে আমি মুগ্ধ হইলাম। অক্ষয় বাবুর শুভ্রকেশ ও স্ফীতোদর,—যেন আমার কতকালের চেনা, দুদিনের মধ্যে গলায় গলায় ভাব হইল এবং দুর্গাপ্রসন্ন বাবুর মাতা ঠিক মায়ের মত এত স্নেহ দেখাইতে লাগিলেন যে আমি তাঁহাকে মা বলিয়া ডাকিলাম। হুকা হাতে লইয়া সপ্ততিবর্ষ বয়স্ক বৃদ্ধ গণেশ বাবু আমার সঙ্গে সঙ্গে বেড়াইতেন এবং জ্যেষ্ঠ সহদরের মত আমায় স্নেহ দেখাইতে লাগিলেন। দেখিলাম ইহাঁরা ঠিক কলিকাতার বন্ধুদের মত নহেন। তাঁহাদের বান্ধবতা মুখের কুশলবার্ত্তাতেই শেষ, এঁরা কিন্তু স্নেহে দান ও প্রতিদান—উভয়ের জন্যই লালায়িত। হরিদাস হালদার মহাশয়ের দ্বারা আমি সেই জমিটা কিনিবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম। এই হরিদাস হালদার এক অদ্ভুত জীব। বয়স আমার সমতুল্যই হইবে। নধরকান্তি,একান্ত নির্ব্বিরোধ—ঝগড়া দেখিলে সে স্থান ত্যাগ করেন; সর্ব্বদা তামাক খান, হুকা হাতে বাজার করেন,হুকা হাতে রাস্তায় বেড়ান; হুকাহাতে দাওয়ায় বসিয়া থাকেন, নারদের সঙ্গে তার বীনার যে সম্বন্ধ, হুকার সঙ্গে ইহাঁর তাহাই, এমন নিকর্ম্মা লোক বিরল,

শৈত্য অভাব। একদিন আমি বলিলাম "আপনাদের অনেকগুলি নারকেল গাছ আছে, কতক কতক ফল বিক্রয় করিয়া ফেলিলেও তো কিছু হয়—কষ্টে থাকেন,এতেও তো কিছু সুবিধা হতে পারে।"খানিকক্ষণ আমার মুখের দিকে তাকাইয়া থাকিয়া কথা বলিতে যাইয়া কণ্ঠ অশ্রুরুদ্ধ হইল, অনেক কষ্টে মুখ হইতে কথা বহির্গত হইল, তখন খুব বড় দুই জোড়া গোঁপের মধ্য হইতে একটা বড় রকমের হাঁ বাহির করিয়া চোখের জল মুছিতে মুছিতে বলিলেন—"আমি কালীহালদারের ছেলে, আমাকে আপনি নারকেল বেচতে বল্‌ছেন! হায় রে হায়!"পরবৎসর সপরিবার কাশী গিয়াছিলাম। হরিদাস হালদার ছিলেন আমার সঙ্গী। একদিন আড়া সের মাংস বাজার হইতে আনিয়া দেখি, খোকা (কিরণ) আর আড়াই সের আনিয়াছেন, মোটে ৫।৬টি প্রাণী, এত মাংস দিয়া কি হইবে? আমি বলিলাম তিলভাণ্ডেশ্বরের কাছে কায়স্থ বাড়ী আছে, ইহাঁরা আমাদের সঙ্গে আত্মীয়তা করিতে চাহেন—এঁদের বাড়ীতে ২॥০ সের মাংস তত্ত্ব করা যাক্। হরিদাস হালদার আড় হইয়া পড়িলেন,—"সে হইতেই পারে না।" আমি বলিলাম "এই আড়াই সের আপনাকে খাইতে হবে।" "সে দেখা যাবে" বলিয়া হরিদাস খুব জোরে হুকা টানিতে লাগিলেন। রান্না হইল, বৈকালের জন্য একটুকরা মাংসও হরিদাস রাখিতে দিলেন না,—পাঁচসের মাংসই রান্না হইল এবং এই দামোদর-কল্প ব্রাহ্মণ ভুঁড়ির উপরকার কাপড়ের বাঁধটা একটু শিথিল করিয়া দিয়, তাল তাল মাংস খাইয়া, একাই আড়াই সের নিঃশেষ করিয়া বিষম এক উদ্গার উঠাইয়া ঢক্ ঢক্ করিয়া—গেলাসটাকে অগ্রাহ্য করিয়া—একটা বড় ঘটির জল নিঃশেষ করিয়া—ব্রাহ্মণের নিষিদ্ধ দিবা-নিদ্রার জন্য হুকার তামাক, টিকার-ছাই প্রভৃতির-নিকটস্থ একটা তক্তাপোষে হাত পা ছড়াইয়া দিয়া শুইয়া পড়িলেন এবং তাড়কাসুরের ন্যায় নাসারন্ধ্র হইতে এক উৎকট

আওয়াজ বাহির করিতে লগিলেন। আমরা ভাবিলাম "আজ অতি-সার হইয়াই মরবে, না হয় পেট ফুলে দমবন্ধ হইয়া কাশী প্রাপ্ত হইবে—বরাং ভাল, কাশীতে মরিয়া একবারে নির্ব্বাণ মুক্তি পাইবে।" সন্ধ্যার সময় সেই নাসারন্ধ্র সমুত্থিত-বিপুল মেঘগর্জ্জন থামিয়া গেল। বৌমা সবে সন্ধ্যেবাতি জ্বালাইয়া রান্নাবান্নার ব্যবস্থাতে মনোযোগী হইয়াছেন, ইহার মধ্যে হরিদাস হালদার উপস্থিত হইয়া বলিলেন "মাংসগুলি খাইয়া-ছিলাম, কিন্তু ভাত ত বেশী খাই নাই—বেশ ক্ষুধা হইয়াছে। রান্নার আয়োজনটা শীঘ্র করিয়া ফেলুন।"

হরিদাস এখন আর তেমন খাইতে পারেন না, ভুঁড়িটাও অনেক সংবরণ করিয়াছেন।

আমি বেহালায় বাড়ী করিয়া পল্লীবাসী হইলাম। গণেশবাবু কত বিষয়ে আমাকে কত রকম সাহায্য করিয়াছেন; দুর্গাপ্রসন্ন বাবু, কৃষ্ণ বাবু এঁদের সঙ্গে একত্র বেশ দিন কাটাইয়াছি;—আমার পুকুরের ধারে চাঁপা-গাছে অজস্র চাঁপা ফুটিত, মনে হইত যেন ঝাঁকে ঝাঁকে হলুদ পাখী গাছটির শাখায় শাখায় পাতার আড়ালে আড়ালে বসিয়া আছে,—আম ও গুবাক গাছ গুলির ফাঁক দিয়া যখন প্রাতঃ সূর্য্য তাঁর আলোর শর সন্ধান করিতেন, তখন বাগান বাটিকাটি যেন পুলকে কাঁপিয়া উঠিত। শেষ রাত্রে ঘুম ভাঙ্গিলে 'কোকিল' 'চোখ গেলরে' 'বউকথা কও' এর কলরব শুনিয়া মনে হইত যেন রাজ-রাজেশ্বরের ঘুম ভাঙ্গিবার জন্য বন্দীরা বন্দনা করিতেছে। আমি বাগানটি খুব পরিষ্কার রাখিয়াছিলাম—ছয় বিঘার মধ্যে একটা খড় কুটো পড়িতে দেয় নাই। কলিকাতা হইতে আমার সাহিত্যিক বন্ধুরা প্রায়ই যাইতেন,—জলধর সেন, অক্ষয় বড়াল, মণিলাল গাঙ্গুলী, প্রমথ নাথ রায় চৌধুরী, রসময় লাহা, গগনেন্দ্র, অবনীন্দ্র সমরেন্দ্র, সুধীন্দ্র, করুণা নিধান, কুমুদ রঞ্জন মল্লিক, কালিদাস রায়,

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়, বসন্ত-রঞ্জন, হেমেন্দ্র কুমার রায়, প্রেমাঙ্কুর, হরিদাস চট্টোপাধ্যায়, দেবেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য, শিশির কুমার, প্রভৃতি বন্ধুরা দয়া করিয়া পায়ের ধুলা দিতেন, আহারাদি করিতেন, জলধর দা বেহালা গেলেই পুকুরে খুব সাঁতরাইয়া আমোদ করিতেন, গরম গরম পরেটা ফরমাইস দিতেন। বাড়ীটি পরিষ্কার রাখিতে আমাকে অনেক খরচ করিতে হইত। তিনটা বাহিরের লোক বাড়ী ঝাঁটদিত। একদিন বেহালায় বড় ঝড় হইয়া গেল। রাস্তা ঘাট সমস্ত ভাঙ্গা ডালেও পাতায় ভর্ত্তি হইয়া বেহালায় তিন ফিট আবর্জ্জনা জমিয়া গেল। আমার বাড়ীতে গাছ বিস্তর; ঝড় একটু কমিয়া গেলে আমি তিনটি ঝি ও তিনটি চাকর, এবং রাঁধুনি ঠাকুর এদের প্রত্যেকের হাতে একটা করিয়া ঝাঁটা দিলাম এবং আধ ঘণ্টার মধ্যে বাড়ী সাফ করিয়া ফেলিতে বলিয়া দিলাম। তাঁরা মেয়ে পুরুষে একত্র হইয়া খুব স্ফূর্ত্তির সঙ্গে বাগান সাফ করিয়া ফেলিল। আধ ঘণ্টা পরে আকাশ নির্ম্মল হইল, গাছের ডালে কোকিল ডাকিতে লাগিল, পুকুরের নীল জল আবার স্থির হইয়া গেল, চাঁপা গাছের ডাল হতে দুই একটি করিয়া ফুল পড়িতে লাগিল,—এত ফুল যে ঝড়েও সমস্ত গুলি নিঃশেষ করিতে পারে নাই। ছয় বিঘায় বাগানে একটি পাতা রহিল না। বেহালার বন্ধুরা আসিলেন,তাঁরা জিজ্ঞাসা করিলেন "সে কি? আপনার এখানে যে একটি ও পাতা পড়ে নাই?—সমস্ত পল্লীটি যে ডালপাতার নীচে পড়িয়া গেছে!" আমি বলিলাম "কই, দেখ্‌তে পাচ্ছেন, এখানে ত ডালপাতা কিছুই নাই" তখন তাঁহারা অদ্ভুত অদ্ভুত অনেক জল্পনা আরম্ভ করিতে লাগিলেন। কেউ বলিলেন "পূর্ব্ব দিকে নারকেল গাছগুলির মাথার উপর দিয়া ঝড় চলিয়া গেছে, নীচেকার গাছে, ঝড় পায় নাই।"একজন বলিলেন—"ঝড় বোধ হয় এই বাড়ী পর্য্যন্ত এসে থেমে গেছে, যেমন বৃষ্টি কোন কোন জায়গায় এসে থেমে যায়, তা

তো প্রত্যক্ষ দেখ্‌তে পাওয়া যায়।" আর একজন বলিলেন "তেতালা বাড়ীটা সামনে থাকাতে ঝড় প্রতিহত হইয়া এগুতে পারে নাই"; কেউ বল্লেন "ঝড় পাতাগুলি উড়াইয়া নিয়া রাস্তায় ফেলেছে—বাগানটি তাই পরিষ্কার রয়েছে।" কিন্তু কেউ বল্লেন না "এতগুলি চাকর বাকর রহিয়াছে, ইহারা সাফ করিয়া ফেলিয়াছে।"

বস্তুতঃ মানুষের চেষ্টায় যে জঙ্গল সাফ হইতে পারে, বেহালার লোকের যেন এ ধারণা নাই। ডোবাগুলি অপরিস্কার, তাহা সাফ করিবার প্রবৃত্তি নাই; বেশ বিদ্বান, বুদ্ধিমান ব্যক্তি, যদি বলেন তাঁকে "আপনার বাড়ীর কাছে জঙ্গল রেখেছেন কেন?" উত্তরে বলবেন "আরে ম'শয়,ও কি আবার জঙ্গল? যদি দশ বৎসর পূর্ব্বে আস্‌তেন,তবে দেখ্‌তেন দুচারটা বন-বরা ছুটে আসছে।" গ্রামে সাপ আছে কিনা জিজ্ঞাসা করিলে বলেন"সাপ?কই সাপ,আমাদের গ্রামে সাপ টাপ নেই।"তার পর দিন এক দিন এক সাপ দেখাইয়া দেওয়া হ'ল। তখন বল্লেন "ওটা'হেলে' ও আবার সাপ! ওটা কেঁচো,ছেলেরা লেজ ধরে টেনে খেলা করে, ও আবার সাপ!" তার পর একটা প্রকাণ্ড সাপ দেখাইলাম—উত্তরে শুনিলাম "কিছু ভয় করবেন না, মহাশয়, ওটা দাঁড়া সাপ, বিষ নাই, দেখতেই ভয়ানক, বড় নিরীহ harmless।" তারপর সত্য সত্যই এক দিন একটা বড় গোখ্‌রার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। গ্রামবাসী এক জনকে বলিলাম—"এটাকে কি বল্‌বেন?" তিনি দাঁতে জিভ কাটিয়া বলিলেন "মহাশয় এটা বাস্তু, ইহাকে না উস্কাইলে কোন অনিষ্ট করে না, এঁরা বাড়ীর লক্ষ্মী" গ্রামে কাহাকেও সাপে কামড়াইয়াছে কি না তাহা জিজ্ঞাসা করিলে দুই হাত নাড়া দিয়া "না,না, সেটি আমাদের গ্রামে কখন ও হয় না"বলিতে থাকেন; কিন্তু একদিন একটি সাপে কাটার খবর পাওয়া গেল, তখন কপালে আঙ্গুল ঠেকাইয়া বলিলেন"ও সব নিয়তি"পাঁচ বছরের ছেলে হইতে আশী বছরের

বুড়, যাহাকে সাপে কাটার কথা বলিবেন, তাহারই একমাত্র অদ্বিতীয় উত্তর "নিয়তি"। বস্তুতঃ"নিয়তি" পল্লীগ্রামের সম্বন্ধীয় সমস্ত প্রশ্নের একমাত্র উত্তর। ডোবা জঙ্গল, সাপ, ম্যালেরিয়া সকল সমাস্যার এক সমাধান 'নিয়তি' ঐ কথাটি উচ্চারণ করিলেই সমস্ত দায়িত্ব হইতে খালাস। বাড়ীর এত কাছে চৌরঙ্গীর বড় বড় রাস্তা, বড় বড় বাড়ী হইতে পুরুষ-কারের জয়কেতু পৃথিবী-জয়ের দুর্জ্জয় স্পর্দ্ধা ও প্রতিষ্ঠার বার্তা ঘোষণা করিতেছে, আর চার মাইল দূরে বেহালা আপনাকে নিয়তির হাতে নিঃসহায় ভাবে ছাড়িয়া দিয়া বর্শী দিয়া মাছ ধরা, দাবা, তাস ও পাশা খেলা দ্বারা মহামূল্য সময়ের শিরে বজ্রাঘাত করিতেছে। ম্যালেরিয়া বেহালায় থাকে মাত্র তিনটি মাস, ভাদ্র, আশ্বিন, কার্ত্তিক কিন্তু অপর সময় কলিকাতা হইতে স্বাস্থ্য ভাল ; ম্যালেরিয়া কোন বছর হয়, কোন বছর হয় না। সেই ম্যালেরিয়াই বা দোষ কি দিব ? আমার প্রতিবেশী ৺ মনোহর পণ্ডিত মহাশয় ৭৫ বছর বয়সে একটা অতি অঘন্য ডোবায় প্রাতঃকালে নামিতেন, ঘন গুল্মের জঞ্জালগুলি সাফ করিতে। ১২টার সময় ডাঙ্গায় উঠিয়া আহারাদি করিয়া আবার সেই কার্য্যে নিযুক্ত হইতেন, রাত্রি ৮ টার সময় উঠিতেন, এই ভাবে দিন রাত্রি সেই অতি বিকট ডোবায় সাত দিন ক্রমাগত পড়িয়া থাকার পর তাঁহার জ্বর হইল। আমি দেখিতে গেলে বলিলেন 'পাজি জায়গা—একটু জল গায়ে পড়েছে, কি জ্বর হয়েছে।" অনেক সময় দেখিয়াছি, সকালে জ্বর হইয়াছে, দুপুরে অল্প অল্প জ্বর আছে,—তাই লইয়া বিনা ছাতায় বকের মত পুকুর পাড়ে বসিয়া কোন ব্রাহ্মণ বর্শী জলে ফেলিয়া ধ্যানী বুদ্ধের মত স্থির হইয়া আছেন, অনাবৃত মাথায় বিন্দু বিন্দু বৃষ্টি পড়িতেছে, তাহাতে গ্রাহ্য নাই। সাবধান থাকিলে জ্বর হয় না। আর সকলই ভাল ;—মাছ, দুধ, সন্দেশ, ফল সস্তা ও সব সময় পাওয়া যায়। ডাক্তার-

কবিরাজের সংখ্যা ও যথেষ্ট। গ্রাম্য সুখের অবধি নাই। আহার করিতে বসিয়া প্রায়ই দেখিতাম, হরিহরের মাতা, কৃষ্ণদা কিম্বা অপর কোন ব্রাহ্মণ-বাড়ী হইতে ব্যঞ্জনাদি আসিয়াছে। মেয়েরা ঘোমটায় অর্দ্ধেক মুখ ঢাকিয়া আমাদের সঙ্গে কথা বলিতেন, যে স্নেহ-বান্ধবতা কলিকাতায় শুষ্ক ভদ্রতায় পর্য্যবসিত, সেই স্নেহ-বান্ধবতার পল্লী লক্ষ্মী, মুখে ঢল ঢল। এই গ্রাম্য জীবনের জন্য কলিকাতায় থাকিয়া প্রাণ হাঁপিয়া উঠিত। তার পর রঞ্জন বিলাস বাবু আসিয়া বাড়ী করিলেন, বৃদ্ধ হইলেও স্ফূর্ত্তি কি? ছোট ছোট মেয়েদের খোপা খুলিয়া দেওয়া, তিন বছরের বালিকাকে বিয়ে করিবার ভয় দেখান, এস্রাজ হাতে করিয়া ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের মধ্যে ঢুকিয়া নৃত্য করিতে করিতে কীর্ত্তন গান করা, এদিকে আশু বাড়ুযোর বাড়ীতে পল্লীরাজনীতির কূট বিশ্লেষণ, গণেশবাবু, দুর্গাপ্রসন্ন বাবুর একনিষ্ঠ সততা ও আন্তরিক সাহায্য,— অক্ষয়বাবুর প্রাণ খোলা হাসি ও কৃষ্ণদার আদর আপ্যায়ন—অপর দিকে কোকিল, 'বউ কথাকও'এর ডাক, ফুল্ল সন্ধ্যা-মালতী, চাঁপা ও গন্ধরাজের সুবাস ও বকুল ও সিউলি গাছ হইতে অপর্য্যাপ্ত পুষ্প-বৃষ্টি, আমার বাড়ীর সেই ঐন্দ্রজালিক শোভামণ্ডিত পুকুর-পাড়টি,—হরিসভার বাৎসরিক উৎসব, মাল্লাদিগের রাস ও মেলা, কৈবর্ত্তদের ঘেটুর গান—এই সমস্ত গ্রাম্য আনন্দ আমার চিত্তকে জোর করিয়া দখল করিয়া লইয়াছিল। কলিকাতা হইতে রোজ রাত্রে বেহালার ফিরিবার পথে মাথার উপর নীল পদ্মের মত নীলাকাশ যেন বিকাশিত হইয়া উঠিত, সেই নীলের মধ্যে শ্বেত চন্দনানুরঞ্জনের ন্যায় চন্দ্রলেখা ও নক্ষত্ররাজি ফুটিয়া উঠিত। আমি ট্রামে বসিয়া সেই শোভা দেখিতাম ও "চন্দন চর্চ্চিত নীল-কলেবর পীত-বসন বন-মালী" প্রভৃতি জয়দেবী কবিতা আবৃত্তি করিতাম। এই পল্লী সুখা-নুভবের সময় আমার 'মুক্তাচুরি' 'রাগরঙ্গ' 'রাখালের রাজগী' 'কানুপরিবাদ'

ও 'শ্যামলী খোঁজা' লেখা হইয়াছিল, 'নীলমানিক' লেখা হইয়াছিল, ফোক লিটারেচার' বই তৈরী হইয়াছিল, এগুলির সমস্তই পল্লীপ্রসঙ্গ লইয়া।

আমাদের পাড়ায় একটা জিনিষের সঙ্গে আমার কিছুতেই ঐক্য হইত না! সেটা অনারেবল সুরেন্দ্র নাথ রায় মহাশয়ের সঙ্গে বিরোধ। ইনি সাউথ সুবারবণ মিউনিসিপালিটির সভাপতি এবং কাউন্সেলের ডিপুটি চেয়ারম্যান। মূর্ত্তিটি সুন্দর। অর্দ্ধপক্ক দাড়ি আবক্ষ-লম্বিত, ঋষির মত কতকটা যেন গাম্ভীর্য্যের আভাস দিতেছে। গৌর বর্ণ, ক্ষীণ, দেহ, মাঝে মাঝে বাতরোগে কষ্ট পান, কর্ম্মঠতার বিরাম নাই। বেঙ্গল লেজিসলেটীভ কাউন্সিলে ইনি চুপ করিয়া থাকেন নাই, দেশের অনেক কাজ করিয়াছেন, ইংরেজীতে বড় বড় বই লিখিয়াছেন—ঐশ্বর্য্যের তুঙ্গ শৃঙ্গ বসিয়া আছেন, কিন্তু বেহালায় পল্লীলক্ষ্মী যখন নিকটবর্ত্তী মহানগরীতে পদাঙ্ক স্থাপন করিতে যাইয়া একপা মাত্র বাড়াইয়াছেন, তখন ইনি যেন 'তিষ্ঠ' বলিয়া তাঁহাকে স্বীয় গ্রামে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। সুরেন্দ্র-বাবুর প্রসাদে বেহালায় ট্রাম হইয়াছে, জলের কল হইয়াছে; বোধ হয় শীঘ্রই বৈদ্যুতিক আলো হইবে। তাঁহার চেষ্টায় বাজার ও হাই স্কুলের শ্রীবৃদ্ধি। ইনি শত্রুর সহিত শত্রুতা করেন না, অন্যায়কারীকে জব্দ করিবার চেষ্টা নাই, তাঁহার চরিত্রের ভূষণ ক্ষমা। কিন্তু একটু নিরীহ স্বভাবের সুবিধা পাইয়া বেহালার এক দল লোক ইহাঁর বিরোধী, নানারূপে ইহাকে আক্রমণ করিতেছেন। এই গ্রাম্য দলাদালি হইতে সর্ব্বদা দূরে থাকিয়াছি। কাহার পিতামহ কুটীরে বাস করিতেন, সুতরাং পৌত্র অনাদিকাল হইতে বড় মানুষ নহেন; কাহার পুত্রের বিবাহে কে নিজে না আসিয়া কবে তাঁহার আত্মীয় স্বজন পাঠাইয়া নিমন্ত্রণ করতঃ কাহাকে অভূতপূর্ব্ব অপমান করিয়াছেন; কাহার বাড়ীতে কে না যাইয়া তাঁহার আলৌকিক বীরত্বের পরিচয় দিয়াছেন; কোন দিন কে পক্ষপাত

করিয়া কাহার পক্ষে ভোট দিয়াছিলেন, পল্লী-রেজিষ্টারী খুঁজিয়া এই সকল দেখার আমার কোন দরকারই নাই। আমি ক্রমাগত সাত পুরুষ এক গ্রামে থাকিয়া পল্লী-বিরোধ উত্তরাধিকার-সূত্রে পাই নাই, সুতরাং সে সকল বুক ঠোকাঠুকি ও আস্ফালনের মধ্যে আমি ছিলাম না। কিন্তু সুরেন-বাবু ও তাঁহার ভ্রাতাদের সুন্দর সৌম্য স্নিগ্ধ মূর্ত্তি দেখিয়া প্রীত হইয়াছি, তাঁহাদের অজস্র স্নেহ পাইয়া ধন্য হইয়াছি, তাঁহারা যে গ্রামের সকলের অপেক্ষা বড়, তাহা বুঝিয়াছি, শুধু ধনে মানে শিক্ষা দীক্ষায় নহে—সত্যবাদিতায়, ক্ষমায়, নৈতিকচরিত্রে ও তাঁহার বড়। ঐশ্বর্য্যবান হইয়াও তিনি বেহালা ছাড়িয়া কলিকাতায় প্রলুব্ধ হন নাই—তিনি দেশ-ভক্ত, ইহা বুঝাইতে দ্বিতীয় প্রমাণের প্রয়োজন হইবে না।

বেহালা হইতে প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়িয়া আমার তৃতীয় পুত্র বিনয় বি এ পরীক্ষায় প্রথম হইয়াছে এবং বেহালার স্কুল হইতে আমার চতুর্থ পুত্র বিনোদ ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় ১৫৲ টাকা বৃত্তি লাভ করিয়াছে। বেহালা হইতে আমার জামাতা তমোনাশ দাস বাঙ্গলা ও ইতিহাসে এই দুই পরীক্ষায় এম, এ, পাশ করিয়াছেন, সুতরাং বেহালার স্মৃতি আমার নিকট প্রীতিকর। দুই বৎসর হইল আমার মধ্যমা কন্যা ফুলবালা দেবী ৬ টি অপগণ্ড শিশু রাখিয়া জলপাইগুড়ি জেলায় ইনফ্লুয়েঞ্জা হইয়া প্রাণ-ত্যাগ করিয়াছে, সেই ঘোর অশুভ বার্ত্তা যে দিন বেহালায় শুনিয়াছিলাম, সেদিন বেহালার প্রতিবেশী রমণীরা আমার স্ত্রীকে সান্ত্বনা দিতে আসিয়াছিলেন। সে শুধু মৌখিক ভদ্রতা নহে, কলিকাতার বন্ধুত্ব ঘোষণা হইতে তাহার কত তফাৎ!

বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সঙ্গে সম্পর্ক

১৮০৫ অব্দে আমি বি এ পরীক্ষায় বাঙ্গলা পরীক্ষক হইবার জন্য আরজী করিয়াছিলাম। তখন পণ্ডিত রজনীকান্ত গুপ্তের মৃত্যু হয়। তাঁহার সঙ্গে আমার অনেক দিনের পরিচয় ছিল। কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয়ের পরে পূর্ব্ববঙ্গের লেখকগণের মধ্যে তিনিই অগ্রনী ছিলেন। গৌরবর্ণ দীর্ঘ কান্তি, মুখখানি গোল ছন্দ, কপালের উর্দ্ধে ছোট একটী আঁচিল,তাহা মুখখানির লাবণ্য যেন বাড়াইয়া দিয়াছিল, দাগটি দেখিয়া আমরা হাফেজের "আগর আঁ তুরক সিরাজি"আওড়াইয়া তাঁহাকে প্রথম দিন অভিনন্দন করিয়াছিলাম, আমি রাজা বাগানের বাড়ীতে থাকিতে তিনি কয়েকবার আমায় দেখিতে আসিয়াছিলেন, পূর্ব্ববঙ্গের জলধর, দীনেশবসু ও পণ্ডিত রজনীকান্ত গুপ্ত তিনটি লেখকই কানে একটু খাটো ছিলেন, ইহাঁদের মধ্যে গুপ্ত মহাশয়ের শ্রবন শক্তিটা একটু বেশী দুর্ব্বল ছিল, কিন্তু ঠিক কানের গোড়ায় ঢাক পিটাইতে হইত না। হৃদয়টি ছিল তাঁর সরলতার খনি এবং হাতের অক্ষর ছিল চোখ ভুলানো। রায় উমাকান্ত দাস বাহাদুর (ত্রিপুরার রাজমন্ত্রি) ছিলেন রজনী বাবুর জ্যেষ্ঠ সহোদর। কিন্তু রজনী বাবু কখনই নিজের নামের পশ্চাতে তাঁহাদের কৌলিক 'দাস' উপাধি ব্যবহার করিতেন না,শুধু 'গুপ্ত'

লিখিতেন। এইস্থানে জলধর বাবুর সম্বন্ধে একটি কথা লিখিব, ইনি হিমালয়ে গোপ-বধূর ভাণ্ডের দুগ্ধ পানের চিত্র দিয়া আমাদিগকে ভাবাইয়া তুলিয়াছিলেন, এখন উপন্যাসগুলি দিয়া আমাদিগকে কাঁদাইয়া ছাড়িতেছেন।

৵ রজনী পণ্ডিত মহাশয়ের মৃত্যুর পর আমি বিশ্ব-বিদ্যালয়ে পরীক্ষকের পদ প্রার্থী হই। তখন আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ভাইস চেন্সালার, বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন আইনের খসড়া তখনও প্রস্তুত হয় নাই, এন্ট্রেন্স পরীক্ষা তখনও ম্যাট্রিকুলেসনে পরিণত হয় নাই। ভাবিলাম একবার ভাইস চ্যান্সলারের সঙ্গে দেখা করিয়া আসি, তখন আমি ১৭ নং শ্যাম-পুকুর লেনে থাকি। শনিবার দিন, বেলা ৮ টার সময় ভবানীপুরে উপস্থিত হইয়া একখানি কার্ড পাঠাইলাম। এখন ইনি দোতলার যে ঘরটায় লোকজনের সঙ্গে সাক্ষাৎকার করেন, তখন সে ঘরে বসিতেন না,সেই ঘরের সংলগ্ন উপরের লম্বা ঘরটায় বসিতেন। আমি তাঁহার নিকট দাঁড়াইবা মাত্র তিনি বলিলেন "আপনি তো ১৭ নং শ্যামপুকুর লেনে থাকেন?" আমি "বলিলাম কি করিয়া জানেন?"—"কেন? আপনি যে আরজী করেছেন, তার নীচে তো ঠিকানা আছে।" আমি বলিলাম "সে আরজি তো আফিসে আছে।"—তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "আরজীতে যা লেখা আছে,তা বুঝি আর কারু মনে থাকতে পারে না?" আমি একটু আশ্চর্য্য হইলাম,কত লোক তো কত আবেদন করিয়া থাকে, কিন্তু একজন আবেদন-কারীর বাড়ীর নম্বর শুদ্ধ ঠিকানাটি মনে করিয়া রাখা সহজ নয়। ইহার পরে তিনি বলিলেন,"আমার কাছে এসে খুব ভাল করেছেন।"না হইলে পরীক্ষকের পদটি পেতেন না!"আমি বলিলাম"আমার আসা না আসায় দাবীর তারতম্য কি করে হয়েছে?"তিনি আবার হাসতে হাসতে বল্লেন, "কি করে হয়েছে? তবে শুনুন, আপনার বন্ধু বান্ধবেরা

ও সিণ্ডিকেটের গণ্য মান্য সদস্য গণের কেউ কেউ আপনার কাজ না হওয়ার জন্য বেশ একটি ফন্দী এঁটেছিলেন; তা ভ্যাস্ত হয়ে গেল। আপনার দাবী যে সবকার চাইতে ভাল, এটা তো আর কেউ প্রতিবাদ করতে পারেননিকো, আপনি গ্রাজুয়েট, বাঙ্গলার এত বড় খানি বই লিখে প্রাণপাত করেছেন,—গভর্ণমেণ্ট আপনাকে বিশেষ বৃত্তি দিয়েছেন, সে বিষয়ে তো আর কথাটি চলে না। কিন্তু তাঁরা আপনার কথা তুল্‌তে বলে উঠলেন, আপনার মাথা একবারে খারাপ হয়ে গেছে, এমন কি আপনি লোক চিন্‌তে পারেন না—লেখা পড়ার শক্তি একবারে হারিয়েছেন ও বিছানায় থেকে উঠতে পারেন না। যা হউক এখন আপনাকেত নিজের চোখে দেখলুম, এবার জবাব দিতে পারব। তাই বল্‌ছিলুম, আপনি না এলে আপনাকে কাজ দেওয়ার পক্ষে মুস্কিল হত, এবার অপনার কোন ভয় নাই।" আমি কৃতজ্ঞ চিত্তে তাঁকে প্রণাম করিয়া, চলিয়া আসিলাম। তার পর পরীক্ষক হইয়া কাজ করিলাম, কিন্তু তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে খুব কমই গিয়াছি। বিজয়া-দশমীর দিন ভবানীপুরে গিয়া প্রণাম করিয়া আসিয়াছি। ইহার পর একদিন শুনিলাম, বিশ্ববিদ্যালয় আমাকে "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" সম্বন্ধে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য রিডার নিযুক্ত করিয়াছেন। আমি ইহার বিন্দুবিসর্গও জানিতাম না। এই সম্মান বড় কম নহে, কারণ ইহার পূর্ব্বে অন্য কোন বাঙ্গালী এ পদ পান নাই। পৃথিবীর জোড়া যাঁহাদের নাম, এমন সকল বড় বড় সাহেব রিডার হইয়াছিলেন। শুনিলাম, সিণ্ডিকেটে একটা আপত্তির তুফান উঠিয়াছিল। কেউ বলিয়াছিলেন, বাঙ্গলা ভাষায় গৌরব এত বড় নহে যে তজ্জন্য একটা রিডারের সৃষ্টি হইতে পারে। কেউ বলিয়াছিলেন, দীনেশবাবু অপরাপর রিডারের তুলনায় নগন্য ব্যক্তি। কিন্তু ভাইসচেন্সালর নিজে যেটি বুঝেন তা বুঝাইয়া দেওয়ার তার অদ্ভুত ক্ষমতা আছে—তিনি নাকি শেষে

বলিয়াছিলেন, "I know my man" "যিনি যে কাজের যোগ্য আমি তাঁকে সেই কাজ দিই।"

তাঁহার সহিত দেখা করিয়া বলিলাম,'ইংরেজী অনেক দিন লিখি নাই, লিখ্‌তে পারবে তো?' তিনি বলিলেন 'ঠিক পারবেন!'

এই একটা কথায় যেন আমার মধ্যে তড়িৎ শক্তি সঞ্চারিত হইল। আমি ভাবিলাম, অপর সকলে ত এভাবে কাজ করেন না, তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিতেন, 'তুমি এ কাজ পারবে কি?' কিন্তু আমার একটি ছত্র ইংরেজী লেখা না দেখে তিনি বিশ্বাস করিলেন 'আমি পারব' প্রতিবাদীদিগকে নিরস্ত করিয়া দিলেন এবং আমাকে স্বীয় শক্তিতে সন্দিহান দেখিয়া অভয় দিয়া বলিলেন 'ঠিক পারবেন।'

আমি আমার দেবতার নিকট প্রার্থনা করিয়া বলিলাম 'হে ঠাকুর, আমি যেন ইঁহার কথার গৌরব রাখিতে পারি,ইনি পরম বিশ্বাসে প্রতিকূল ব্যক্তিদিগকে নিরস্ত করিয়া এ কাজের ভার আমাকে দিয়েছেন, ইঁহাকে যেন আমার জন্য বিদ্রূপ না শুনিতে হয়!'

আমি এক সময়ে ক্লাসে ইংরেজী ভাল লিখিতে পারিতাম বলিয়া খ্যাতি ছিল, কিন্তু বহু বৎসর ত শুধু বাঙ্গলাই লিখিয়া আসিয়াছি; এখন যে এত গুলি ইংরেজী বই লিখিরাছি—তাহা আমার স্বপ্নের অগোচর ছিল। ইঁহারাই উৎসাহ আমার লেখনীকে শক্তি দান করিয়াছে, আমার বই যখন বিলাতে আদৃত হইল, বড় বড় য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণের প্রশংসা লাভ করিল, তখন আমি ভগবানকে ধন্যবাদ দিলাম, "হে ঈশ্বর, আমার নিয়োগ-কর্ত্তার মান রাখিয়াছ, আমি কাজে বিফল হইলে যে শ্লেষ ও টীট্‌কারী পড়িত,তাহাতে আমি অপদস্ত হইতাম না—কিন্তু ইনি একটু অপ্রস্তুত হইতেন।" তারপর একদিন রোগের শয্যায় পড়িয়াছিলাম, হঠাৎ একদা প্রাতে ধর্ম্মপদের অনুবাদক চারু বাবু

আমায় বলিয়া গেলেন, আমি ইউনিভার্সিটির 'ফেলো' হইয়াছি। অযাচিত ভাবে আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় আমাকে এই সম্মান প্রদান করিয়াছেন! যতই তাঁহার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশিবার সুবিধা হইল, ততই ইঁহার 'মধ্যাহ্ণ-ভাস্কর-সম' প্রতিভা আমার চক্ষে জাজ্জ্বল্যমান হইয়া উঠিল। সিনেটে বহুসংখ্যক উচ্চ পদস্থ মনস্বী সাহেব ও বাঙ্গালী সদস্য একত্র হইয়া ইঁহার প্রতিপক্ষতা করিয়াছেন, কেহ কেহ এক ঘণ্টা দেড় ঘণ্টা বক্তৃতা করিয়া তাঁহার প্রতিপাদ্য বিষয়টীকে এমনই দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত করিয়াছেন,যে মনে হইত, সেই সকল যুক্তির বিরুদ্ধে আর কি কথা থাকিতে পারে? হয়ত ইংরেজ-বাঙ্গালী একত্র হইয়া তিন চারি ঘণ্টা কাল সেই প্রতিপাদ্য বিষয়টিকে একবারে লৌহস্তম্ভের মত দৃঢ় করিয়া ফেলিলেন; কিন্তু শেষে যখন আশুতোষ উঠিলেন, ১৫ মিনিট কাল তাঁর গভীর কণ্ঠের উচ্চারিত শব্দের গোলাগুলি প্রক্ষিপ্ত হইয়া পূর্ব্ব-পক্ষকে ধূম্রাচ্ছাদিত করিয়া ফেলিল, এবং শেষে উপসংহারে ইঁহার সিদ্ধান্ত বিদ্যুতের মত এমনই স্পষ্ট,এমনই আশ্চর্য্যরূপ উদ্দীপনার ভাষায় প্রকাশিত হইল, যে ৬০।৭০ জন সদস্য সম্বলিত সভা একবারে স্তব্ধ হইয়া দেখিলেন, যে প্রতিপক্ষের যুক্তি-হর্ম্ম্য-শিরে একবারে বজ্রপাত হইয়া তাহা চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া ফেলিয়াছে। এম, এ পরীক্ষার অধ্যাপনার ভার বড় বড় কলেজ হইতে তুলিয়া নিয়া যে দিন বিশ্ববিদ্যালয় স্বয়ং গ্রহণ করিলেন, সে দিন কি ভীষণ প্রতিবাদের ঝটিকাই না উত্থিত হইয়াছিল! ৩৫টী ধারা লইয়া কয়েক মাস ব্যাপিয়া সিনেট সভায় বাদানুবাদ হইয়াছিল—রেগুলেশন পরিবর্ত্তনের কত প্রস্তাব কতবার হইয়াছে—এই বিরাট দ্বন্দ্বযুদ্ধে কুরুক্ষেত্র-কাণ্ড হইয়া গিয়াছে, কিন্তু এই সমস্ত তর্কবিতর্কে ভগবৎ দত্ত ক্ষমতার বলে অদ্বিতীয় সারথী বিশ্ববিদ্যালয়ের রথ চালাইয়া আসিয়াছেন। যাঁহারা বুদ্ধির প্রখরতায় অন্যত্র দিগ্বিজয়ী, তাঁহারা ইঁহার প্রতিভালোকের কাছে

দিবা-প্রদীপবৎ হইয়া গিয়াছেন ; কোন সাহেব বা কোন বাঙ্গালী ইঁহার নিকট উঁচু মাথায় দাঁড়াইতে পারেন নাই।

ইনি স্বদেশী ভাবের উপর শিক্ষার ভিত্তি গড়িয়া দিয়াছেন—সিনেট-সিণ্ডিকেট এখন বাঙ্গালীর আয়ত্ত। ইনি দেশীয় পরিচ্ছদকে সম্মানিত করিয়াছেন, বড় বড় সাহেবের পার্শ্বে বাঙ্গালী সদস্যেরা ধুতি চাদর পরিয়া সিনেট সভা অলঙ্কৃত করেন। অধ্যাপকগণ বিদেশী সাজ সজ্জা একরূপ ত্যাগ করিয়াছেন। ইনি সমস্ত ভারতের পণ্ডিত মণ্ডলীকে বিশ্ব-বিদ্যালয়ে আহ্বান করিয়া আমাদের বিদ্যাগারকে এক মহা জাতীয়-কেন্দ্রে পরিণত করিয়াছেন। বৌদ্ধ স্তূপাকৃতি টুপি পরা তির্ব্বতীয় লামা, বিচিত্র বর্ণে অনুরঞ্জিত পাগড়ী পরিহিত মারহাটা, স্ফীতোজ্জ্বল গণ্ড তীব্র চক্ষু জাপানি ও চিনেসাহেব, গৈরিক রঞ্জিত আলখাল্লা পরিহিত সিংহলী ভিক্ষু, নেকটাই ও হ্যাটধারী ইউরোপীয় পণ্ডিত,—স্বর্ণপ'াড় দীপ্ত উত্তরীয় গায়ে মাদ্রাজী, কত ভিন্ন বর্ণ, কত ভিন্ন দেশীয় পণ্ডিত আজ আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়কে বিভূষিত করিতেছেন—পঞ্চতল সৌধ আকাশভেদী জয় পতাকা তুলিয়া এই বিভিন্নদেশী অধ্যাপক মণ্ডলী অলঙ্কৃত হইয়া আজ বাঙ্গালী প্রতিভাকে ভারতবর্ষে সমুজ্জ্বল করিয়া দেখাইতেছে। ডাঃ বেণীমাধব বড়ুয়ার 'আজীবক শ্রেণী' সম্বন্ধীয় গ্রন্থ, অধ্যাপক বিজয়চন্দ্র মজুমদারের "বঙ্গভাষার ইতিহাস" ডাঃ ইয়ামোকামার বৌদ্ধধর্ম্ম সংক্রান্ত গ্রন্থ এবং অপরাপর অধ্যাপককের মৌলিক গবেষণা—প্রাচ্য প্রত্নতাত্বিক রাজ্যে যুগান্তর উপস্থিত করিতেছে,—পোষ্ট গ্রাজুয়েটের কাজ অব্যাহত ভাবে চলিলে অচিরে প্রাচ্য জ্ঞানের যে দীপ এই গোলদীঘির বিদ্যামন্দিরের চূড়ায় জ্বলিবে, তাহা সমস্ত জগতের দিগ্‌দর্শনী হইবে। বিলাতের টাইমস্ পত্রিকায় কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত সম্প্রতি যে সকল প্রবন্ধ প্রকাশিত হইতেছে, এবং স্যারজর্জ্জ গ্রিয়ারসন, ব্লুলে ব্লক, প্রভৃতি পণ্ডিত মণ্ডলী

এই বিদ্যালয়ের সুখ্যাতি করিয়া যে সকল চিঠিপত্র লিখিতেছেন, তাহাতে আমাদের বিদ্যাশালার নবজাগরণে প্রাচ্য বিদ্যার আলো-কেন্দ্র যে প্রতীচ্য হইতে পুনরায় প্রাচ্যে প্রবর্ত্তিত হইবে, তাহার ভবিষ্যদ্বাণী আছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সেই গৌরব সম্মুখে রাখিয়া অগ্রসর হইতেছেন। সার আশুতোষের গ্রাজুয়েটের দল অক্ষৌহিণীর সেনার ন্যায় বঙ্গদেশের হাট মাঠ বাট ছাইয়া ফেলিতেছেন। গ্রাজুয়েটের সংখ্যা বাঙ্গালাদেশে বাড়িয়া গিয়াছে—ইহাই কাহারও কাহারও আক্ষেপের বিষয় হইয়াছে। ভারতের অন্যান্য প্রদেশে নূতন রেগুলেসনের ফলে পরীক্ষায় পাশের সংখ্যা অত্যন্ত কমিয়া গিয়াছে। কিন্তু সেই রেগুলেসনের বলেই স্যার আশুতোষ এদেশের পক্ষে অন্যরূপ বিধান করিতে পারিয়াছেন। দেশের শিক্ষাশক্তি এ দেশে কল্যাণকারী হইয়া আমাদিগকে আশ্বস্ত করিয়াছে। বজ্র ধ্বংসের জন্য আরোপিত হইতে পারে, কিন্তু সেই বজ্র ব্যবহারের গুণে আবার রক্ষার উপাদানও হইয়া থাকে। আজ উচ্চশিক্ষা বাঙ্গালা দেশের দেশের প্রতি পল্লীর মুখ উজ্জ্বল করিয়াছে। জনসাধারণের মধ্যে এই যে উচ্চ-শিক্ষার স্রোত অবাধভাবে বহিয়া গিয়া এ দেশের সভ্যতাকে শ্রীবৃদ্ধি-সম্পন্ন করিতেছে—এই মহাদান আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের। প্রাইমারী শিক্ষার বিস্তৃতি অপেক্ষাও এই উচ্চ শিক্ষার বিস্তৃতিতে এ দেশ লাভবান হইয়াছে। ব্যবহারিক জীবনের দারিদ্র্য ঘুচাইবার স্থান সরস্বতীর মন্দির নহে, আমগাছের নীচে যাইয়া রেল কল প্রত্যাশা করা বৃথা। কিন্তু ব্যবহারিক শিক্ষাও উচ্চ শিক্ষার অন্তর্গত করা যায়; অর্থাভাব না হইলে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই সকল দরজা খুলিয়া রাখার ব্যবস্থা অনায়াসে হইতে পারে। ভবিষ্যতে যদি ভারতের নেতৃত্ব করিবার লোকের দরকার হয়, তাহা হইলে এই উচ্চ শিক্ষার গুণেই বঙ্গদেশ হইতে যত লোক আমরা সরবরাহ করিতে পারিব, অন্য কোন প্রদেশই

তাহা পারিবে না। মাড়োয়ারীর ধন দৌলত ও ব্যবসায়ের বুদ্ধি তাহাকে নেতৃত্ব পদ দেবে না,—ভারতীয় উন্নতির পথে বাঙ্গালীই বড় থাকিবে। আমাদের অর্থের অভিমান নাই, কিন্তু বিদ্যা-বুদ্ধি ও শিক্ষার অভিমান আছে। বাঙ্গালী যে জন্য শ্রেষ্ঠ, সেই একমাত্র পথরোধ করিলে বাঙ্গালার গৌরবকে কণ্ঠ চাপা দিয়া মারিয়া ফেলিবার ব্যবস্থা হইবে। এই একটি পথ তৈরী হইয়াছে, বাঙ্গালীর আর কোন পথ নাই, অপরাপর পথ আবিষ্কার করিবার চেষ্টা আমরা অবশ্য করিব, কিন্তু তাই বলিয়া যে একটি বৃহৎ পথ খোলা আছে, যাহা এখনও যশ মান ও ক্ষমতার দিকে বাঙ্গালীর পক্ষে রাজপথ হইয়া আছে - সেটিকে প্রতিরোধ করা কি আত্মহত্যা হইবে না? সেই পথে লইয়া যাইবার পক্ষে স্যার আশুতোষ ভিন্ন দ্বিতীয় ব্যক্তি নাই। তিনি মানুষ, সুতরাং তাঁহার কোন দোষ নাই, একথা বলা যায় না। কিন্তু যে ব্যক্তি মহাসমুদ্রের পাড়ে আসিয়া শুধু জলের লবনত্ব খুঁজিয়া নাসিকা কুঞ্চন করে,—হিমাদ্রি দেখিতে আসিয়া তাহার পাদমূলের কাঁকরের নিন্দা করিয়াই চলিয়া যায়, তাহার গুণগ্রাহিতার প্রশংসা আমরা করিতে পারিব না। যিনি বিষয়-নিস্পৃহ যোগীর ন্যায় অসামান্য ত্যাগের দ্বারা—স্বীয় অতুল্য মহাশক্তির প্রয়োগে—আমাদের বিশ্ব-বিদ্যালয়কে জগতের চক্ষে সমুজ্জ্বল করিতেছেন, তাঁহাকে লাঞ্ছিত করিয়া যাঁহারা ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থ ও অভিমানের প্রবৃদ্ধি করিতেছেন, তাঁহারা মিত্র বলিয়া পরিচয় দিলেও আমরা তাঁহাদিগকে মিত্র বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না। বিশ্বাসের জায়গায় আমাদের অবিশ্বাস আসিয়াছে।

এই সুবিস্তৃত শিক্ষার ভিত্তিতে বাঙ্গালীর ভবিষ্যৎ যে ভাবে গড়িয়া উঠিতেছে, ভারতবর্ষের অন্যত্র তাহার আশা করা অসম্ভব।

যে অক্লান্ত কর্ম্মী মহাজন বিনিদ্র চক্ষে, অশ্রান্ত হস্তে, অকুণ্ঠিতচিত্তে—জাতীয় জীবনের ক্ষেত্রে উর্ব্বর করিবার জন্য হলচালনা করিতেছেন,

তাঁহার চর্ম্ম মশকদংশনে ব্যথা অনুভব করে না, তাঁহার চিত্ত প্রতিকূলতায় অধিকতর দৃঢ় সংকল্পারূঢ় হয়, বিরুদ্ধ অবস্থায় আরো যুযুৎসু হইয়া উঠে। এই মানুষটিকে আমি যেরূপ দেখিলাম, এরূপ আর একটি দেখি নাই, ইহা অত্যুক্তি নহে।

মুখুজ্যা মহাশয়ের সঙ্গে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অনেক বিষয়ে সাদৃশ্য আছে। ইহাঁর প্রবল ব্যক্তিত্বের দরুণ দয়া-গুণটি কতকটা আড়াল পড়িয়াছে সত্য, কিন্তু পর্ব্বতরাজের আড়ালে সুরধুনী খেলা করিতেছেন, এবিষয়ে যেমন সন্দেহ নাই—দৃঢ় পুরুষোচিত মহিমামণ্ডিত আশু-চরিত্রের নিগূঢ় স্থানে যে দ্রবময়ী গঙ্গার ধারার ন্যায় দয়ার স্রোতস্বিনী বহিয়া যাইতেছে—যাঁহারা তাহাকে জানেন—তাঁহারা সেটি শতবার লক্ষ্য করিয়াছেন। একদা একটি ছাত্র ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিতেছিল, বাঙ্গালা পরীক্ষার দিন জ্বর হওয়াতে পরীক্ষা দিতে পারিল না। সে নিতান্ত গরীব, আশুবাবুর নিকট যাইয়া কাঁদিয়াই আকুল, তাহার এক নিরুপায়া বিধবা মাতাকে জমিদার আশা দিয়াছেন, ম্যাটিকুলেসন পাশ হইলে ছেলেটিকে একটা চাকুরী দেবেন। সে পরীক্ষায় ফেল হইলে মাতা-পুত্র উপবাস করিয়া প্রাণত্যাগ করিবে। এ অবস্থায় আশুবাবু কি করিতে পারেন? যে পরীক্ষা দেয় নাই, তাকে কি করিয়া পাশ করানো যায়? ছেলেটি সম্ভব অসম্ভব অবস্থার সম্বন্ধে কোন কথা বলিল না, সে যুক্তি তর্ক মানিল না, কাঁদিয়াই আকুল—সে কান্না নিরাশ্রয়ের কান্না, শোকার্ত্তের কান্না, তাহা আশুবাবুর প্রাণ ছুঁইল, অমনই উপায় হইল। তিনি বলিলেন "বস্, ভাব্‌তে হবে না, তুমি আই. এ পরীক্ষার বাঙ্গালা পেপার যেদিন হবে, সেদিন পরীক্ষা দিতে ব'সে যেও।" ম্যাট্রিক এবং 'আই' এর, বাঙ্গালা প্রশ্ন অনেকটা একরূপ, শেষোক্ত পরীক্ষা একটু শক্ত, এই মাত্র প্রভেদ, কিন্তু উভয় পরীক্ষায়ই কোন পুস্তক হইতে প্রশ্ন হয় না, শুধু রচনার কৃতিত্ব দেখাইতে

হয়। ইহার বিরুদ্ধে কেহ দাঁড়াইলেন না, যে হেতু জ্বরের জন্য ছেলেটি পরীক্ষা দিতে পারে নাই এবং সেই ত্রুটি সংশোধন জন্য সে কঠিনতর পরীক্ষার সম্মুখীন হইতে প্রস্তুত। এই যে উপায়টি আশুবাবুর মাথায় এসেছিল -তাহা তাহার গভীর দয়ার দ্বারা প্রবর্ত্তিত। তিনি "আহা" "উহু" প্রভৃতি সহৃদয়তা ব্যঞ্জক কথা বলিয়া আর্ত্তকে সান্ত্বনা করেন না, তাঁহার দয়াবৃত্তি কার্য্যকরী, সম্পূর্ণ শক্তি প্রয়োগ করিয়া তিনি বিপন্নকে উদ্ধার করেন। আমি নিজে জীবনে তাহা বহু বার অনুভব করিয়াছি। আমার এক পদস্থ বন্ধু একবার বিপদে পড়িয়া আশুবাবুর চেষ্টায় অব্যাহতি পান। তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন—"ইনি যে ভাবে আমাকে রক্ষা করিয়াছেন, যে নিঃস্বার্থ ও অক্লান্ত শ্রম স্বীকার করিয়া আমার পক্ষ সমর্থন করিয়াছেন; আমার পিতা তাহার অপেক্ষা বেশী করিতে পারিতেন না।" অথচ সেই ব্যক্তির সঙ্গে আশুবাবুর কোনই সম্বন্ধ ছিল না। লোকের কষ্টের কথা শুনিলে তাঁহার চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হয়, এবং যদি কোন অভাব-গ্রস্ত ব্যক্তির উপকার করিতে না পারেন, তবে লজ্জিত হন;যেন বঙ্গদেশের যাবতীয় দুঃখীর দুঃখ নিবারণের দায় তাঁহারই। আমাদের দেশের ভদ্র-পরিবারদের দুঃখের সম দুঃখী ব্যক্তি ইঁহার মত এদেশে আর কেহ নাই। কত শত লোককে তিনি যে কতভাবে উপকার করিয়াছেন, তাহার সীমা সংখ্যা নাই। ম্যাট্রিকুলেসন পরীক্ষার "ফি" বাড়াইবার কথা লইয়া তাঁহার শত্রুর দল তাঁহাকে নানারূপে আক্রমণ করিয়াছিলেন, কিন্তু ছাত্রদের প্রকৃত হিতৈষী ও ব্যথিত তাঁহার মত তাঁহাদের কেহই নহেন। তিনি দেখাইয়াছিলেন, একটি ছাত্র আজ কালকার দিনে ৩০০৲ শত টাকার নীচে বাৎসরিক খরচ নির্ব্বাহ করিতে পারে না, সেই জায়গায় মাত্র ৫৲ টাকা বাড়াইলে ৩০৫৲ টাকা হয়। ডাক্তারেরা 'ফি' বাড়াইয়াছেন, কলেজে স্কুলে মাসে মাসে ছাত্রগণ বেশী

'ফি' দিতেছে, সমস্ত জিনিষ পত্র বেশী দামে কেনা হইতেছে, এই সময়ে বৎসরে একবার মাত্র ৫৲ টাকা দিলে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় টিকিতে পারে, এই ৫৲ টাকা প্রতি ছাত্র দিলে আমাদের ১½ লক্ষ টাকা আয় বাড়িয়া যায়, নতুবা বিশ্ববিদ্যালয় চলিবে না। তিনি শুধু এই প্রস্তাব করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন না, চাঁদা তুলিয়া একটা ফণ্ড সৃষ্টি করিবার উদ্যোগে ছিলেন, যাহাতে নিতান্ত অসমর্থ ছাত্রকে সাহায্য করা যাইতে পারিত। এই প্রস্তাবটি বাতিল করার দরুণ বিশ্ববিদ্যালয় আজ টলমল। ছাত্রদের প্রতি সহানুভূতি নহে, বিশ্ববিদ্যালয়কে ধ্বংসের মুখে দেওয়ার জন্য কেহ কেহ কোমড় কাছিয়া লাগিয়া গিয়াছেন। যাঁহারা আমাদিগকে শিক্ষা-সংকোচ করিতে বলিতেছেন, তাঁহারা সিংহকে মূষিক হইয়া বাঁচিয়া থাকার উপদেশ দিতেছেন। আমার বিবেচনায় ঐরূপ জীবন না থাকাই ভাল।

হিব্রু, গ্রীক, কেমিষ্ট্রী-বিজ্ঞান প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্ব বিভাগের উন্নতির জন্য স্যার আশুতোষের যে ভবিষ্যদ্দৃষ্টি আছে, সেই সেই বিষয়ের বিশেষজ্ঞগণেরও তাহা নাই। জাতি গঠন করিবার আদর্শ সমক্ষে রাখিয়া ইনি বিশ্ববিদ্যালয়ের কাণ্ডার চালাইতেছেন। আমরা তাঁহার উদ্দেশ্যরূপ মহারথের নগণ্য চক্র মাত্র। তের চৌদ্দ বৎসর যাবৎ আমি ইহাঁকে বাঙ্গালায় এম এ. পরীক্ষার সৃষ্টি করিতে অনুরোধ করিয়া আসিতেছিলাম, প্রতি বারই ইনি উপেক্ষার ভাবে আমার অনুরোধ এড়াইয়া গিয়াছেন। কিন্তু তিন বৎসর হইল তিনি নিজে আমাকে ডাকিয়া বলিলেন "এইবার বাঙ্গালায় এম এ, পরীক্ষার ব্যবস্থা করিব, আসুন, নিয়মগুলির খসড়া তৈরী করি।" তখন একটু হাসিয়া বলিলেন, "আপনি তো বাঙ্গালায় এম, এ পরীক্ষার জন্য আমায় বহুদিন ধোরে ক্রমাগত অনুরোধ করেছেন, আপনি ভেবেছিলেন, আমি একবারে উদাসীন।

তা নয়, দীনেশবাবু, তোড়জোর নেই, কি নিয়ে কাজ কর্‌ব, শেষে একটা কাণ্ড ক'রে ব'সে ব্যাকুব বন্‌ব ? এই কয় বৎসর ধ'রে আমি আপনাকে দিয়া "বঙ্গ সাহিত্য পরিচয়" সঙ্কলন করাইয়াছি, ইংরেজীতে বঙ্গ সাহিত্যের ইতিহাস লিখাইয়াছি, বৈষ্ণব সাহিত্যের ইতিহাস, গ্রাম্য কথা-সাহিত্যের ইতিহাস প্রভৃতি কত বই লিখাইয়াছি, রামতনু লাহিড়ী রিচার্চ্চ ফেলো-সিপের সৃষ্টি করিয়াছি, দাসগুপ্ত, বিজয়বাবু প্রভৃতি অধ্যাপকগণের দ্বারা বঙ্গভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে বই তৈরী করাইয়াছি—কোন একটা উদ্দেশ্য ছাড়া এই সকল করিয়াছি কি ? এম, এ পরীক্ষা হইবে, কি পড়াব ? তার তো একটা ব্যবস্থা আগে ক'রে ফেলে তবে তো কাজে হাত দেব ! আপনারা চেঁচামিচি করেছেন, ততক্ষণ আমি জমি তৈরী করে নিয়েছি।" তখন বুঝিলাম আমরা জগন্নাথের রথের চাকা,—শুধু ঘুরে গিয়েছি মাত্র, যাঁহার মতলবে ঘুরেছি, তা নিজেরাই জানতে পারি নাই। এই জন্যই বঙ্গেশ্বর কারমাইকেল সাহেব সত্যই বলিয়াছিলেন "কোন এক বিরাট বিষয় কল্পনা করিবার শক্তি যেরূপ স্যার আশুতোষের আছে, তেমনই সেই কল্পনা কার্য্যে পরিণত করিবার যোগ্য কর্ম্ম-শক্তিও ইঁহার আছে।" এই দুই গুণের সমন্বয় সংসারে বড় দুর্ল্লভ।

সমুদ্রের মত প্রকাণ্ড আশ্রয় পাইলে যেরূপ যমুনা, কাবেরী, গোদাবরী তাহার দিকে আপনা আপনি ছুটিয়া আসে, ধূর্জ্জটী তাঁর জটা খুলিয়া গঙ্গাধারাকে ও ছাড়িয়া দেন—সেই আশ্রয়ের ভরসায় ;—সেইরূপ পালিত, ঘোষ ও খয়ড়া প্রভৃতি নানাদিক্ হইতে—এই কম্মবীরের আশ্রয়ে মুক্ত-স্রোতে অজস্র দান আসিয়া পড়িয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে তাহা ছুটিয়া আসে নাই, তাহাদের লক্ষ্য আশুতোষ। এমন কি, ইঁহারই দৃক্‌পাত শিবজটা হইতেও কুটিল মিণ্টো প্রভৃতি লাটের কোষাগার হইতে নিক্রান্ত হইয়া কয়েকটি ধারা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

আশুবাবুর একাধিপত্যে কেহ কেহ বিরক্ত, এই একাধিপত্য জাতীয় গৌরব-ব্যঞ্জক। ব্যক্তিগত ভাবে আশুবাবুর একটি ভিন্ন ভোট নেই, এই আধিপত্য গায়ের জোরের নহে, "বুদ্ধির্যস্য বলং তস্য"—বিষ্ণু শর্ম্মার সময় কিম্বা তাঁহারও পূর্ব্ব হইতে অনাদিকাল হইতে এই বল স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে, ইহা পশুরাজের আধিপত্য নহে, ইহা নররাজের আধিপত্য, ইহা পৈত্রিক দাবী কিম্বা তোপ-কামাণের দ্বারা সমর্থিত বাহুবল নহে—ইহা ভগবৎ দত্ত তিলক-লিপির জোরে দাঁড়ায়। ক্রমোয়েল, নেপোলিয়ান, গ্লাডষ্টোন, লয়েডজর্জ্জ ইহাঁরা সাম্যবাদীদের মধ্যে সিংহাসন পাইয়াছেন—আশুবাবুর সেই সিংহাসন। ইহাঁর মত কর্ম্মবীর আমি দেখি নাই। সাম্যতন্ত্রবাদীদের ইহাতে আপশোষের কোন কারণ নাই। স্যার আশুতোষ বিশ্ববিদ্যালয়ের সংক্রান্ত বিষয়-গুলি এত জানেন, তাঁহার ভবিষ্যৎ দৃষ্টি এত তীক্ষ্ণ, তিনি এরূপ সর্ব্বতো-ভাবে উচ্চ শিক্ষার হিতকামী, এরূপ ত্যাগপরায়ণ ও নিঃস্বার্থ, যে অপর কোন বাঙ্গালীর শিক্ষা দীক্ষা প্রভৃতি ইহার সমকক্ষ নহে। ইহাঁকে বাদ দিয়া অপেক্ষাকৃত অল্প শক্তি-সম্পন্ন ব্যক্তির নায়কত্ব কি আমাদের কল্যাণকর হইবে? শুনিলাম হাইকোর্টে আশুবাবু আর দুই জন সহকারী জজ লইয়া একবার এজলাসে বসিয়াছিলেন। তিন জনে ৮০৩ খানি রায় একবৎসরে লিখিয়াছিলেন, তার মধ্যে ৮০০ খানি লিখিয়াছিলেন আশুবাবু, আর দুই জনে লিখিয়াছিলেন তিন খানি। অবশ্য অনেকেই জানেন যে আশুবাবুর রায় গুলি প্রায়ই খুব পাণ্ডিত্য পূর্ণ এবং সুদীর্ঘ। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "এরূপ কেন হইল?" তাঁহার এক বন্ধু উত্তরে বলিলেন 'সেরূপ পৃথিবীতে সর্ব্বদা হয়ে থাকে, কেউ সংসারে সর্ব্বদা শ্রম করে, কেউ বিশ্রাম করে;" হাইকোর্টে আশুবাবু কর্ম্মঠতা অপরিসীম, বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি যেরূপ কাজ করেন তাহা ৩।৪ জন সাহেব একত্র

হইয়া পারিবেন কি না সন্দেহ। প্রতি মাসে বহুসংখ্যক সভা—সিনেট, সিণ্ডিকেট, ফ্যাকালটি, বোর্ড, পোষ্ট গ্রাজুয়েট সমিতি ত আছেই তা ছাড়া প্রশ্ন করা পরীক্ষা করা, প্রভৃতি শত শত কাজ। প্রত্যেক সভার তিনি কাণ্ডারী, সর্ব্বে সর্ব্বা, অপরেরা চাল-চিত্র,—কবি কেন লঙ্কাধিপের যে দশমুখ কুড়ি হস্ত কল্পনা করিয়াছিলেন - ইহার বিরাট কার্য্যশীলতা দেখিলে কতকটা অনুমান করা যায়। এই জন্য বলিয়াছি এরূপ কর্ম্মবীর আমি দেখি নাই। তিনি বেঞ্চ হইতে বারে নামিলে মাসে ৫০,০০০, টাকা উপার্জ্জন করিতে পারেন, তিনি তাঁহার এই বহুমূল্য শ্রম বিশ্ববিদ্যালয়কে বিনামূল্যে বিলাইয়া দিতেছেন, এরূপ ত্যাগীই বা কে? যখন এত করিয়াও কেবল প্রতিকূলতা, বিদ্রোহ, আক্রমণ ও মিথ্যা অভিযোগ সহিতে হইয়াছে, শাসনের তুঙ্গ শৃঙ্গ সিমলা শৈল হইতে যখন এত করিয়া ও নির্য্যাতন চোখ-রাঙ্গানী সহ্য করিয়াছেন, অন্য হইলে ত তখন ধিক্কার দিয়া কাজ কর্ম্ম গুটাইয়া ফেলিত, এই ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো ব্যাপার হইতে ঘৃণায় সরিয়া বসিত। কিন্তু আশু সে শর্ম্মাই নহেন। এমতাবস্থায়ও তাঁহার নিকট যাইয়া শুনিয়াছি "কোন ভয় নাই, আমরা তো খাটিব এই সর্ত্তে এসেছি, ফল যা হবে, হোক না, দম্‌বার কারণ নেই, শেষ পর্য্যন্ত খেটে মরব।" তখন মনে হয়েছে গীতার "কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন" শ্লোকটি বিরাট গুম্ফ ও তেজো দৃপ্ত বপু লইয়া যেন আমার চক্ষের সাম্‌নে মূর্ত্তি ধরিয়া দাঁড়াইয়াছে।

কয়েক মাস হইল, মুখোপাধ্যায় মহাশয় লালগোলার রাজার নিমন্ত্রণে তথাকার স্কুল পরিদর্শন করিতে গিয়াছিলেন। আমি তাঁহার সঙ্গে গিয়াছিলাম, সেখানে যাইয়া রাজা যোগীন্দ্র নারায়ণের যে সাত্ত্বিক মহিমা-মণ্ডিত মূর্ত্তি দেখিলাম, তাহাতে প্রাচীন হিন্দুরাজার আদর্শটি চক্ষে পড়িল। লালগোলা ষ্টেশনে ভোর পাঁচটায় পৌঁছিয়া দেখি, গেরুয়া রঙ্গের একটি

সামান্য রকমের বৈরাগীর আলখাল্লা পরিয়া নগ্নপদে রাজাবাহাদুর আমাদের প্রতীক্ষা করিতেছেন. তখন তিনি চাতুর্মাস্য করিতেছিলেন, অর্থাৎ সন্ধ্যায় একবার সামান্য আহার করিতেন, সারাদিন কিছু খাইতেন না ; নিরামিষ খাওয়া, কিন্তু তাহার মধ্যে আম, কমলানেবু প্রভৃতি সমস্ত সুখাদ্য ফল ভগবানকে বহুবৎসর ধরিয়া নিবেদন করিয়া বসিয়া আছেন, সুতরাং অতি কঠোর জীবনই যাপন করেন,—"ভাল না খাইবে,আর ভাল না পরিবে" মহাপ্রভুর এই উপদেশ যেন মূর্ত্তি ধরিয়া আমাকে দেখা দিল। কিন্তু নিজের প্রতি যিনি এইরূপ কঠোর বিধান করিয়াছেন, অপর সম্বন্ধে তাঁহার মুক্তহস্তে ভোজনের ব্যবস্থা। তথাকার দরিদ্র ও অতিথি মাত্রই তাহা স্বীকার করিয়া থাকেন। লালগোলাধিপের মুক্ত-হস্ত দানের কথা বাঙ্গলাদেশে সকলেই জানেন। সাহিত্য পরিষদে বোধ হয় ইনি ৫০,০০০, টাকা দিয়াছেন। সেদিন বহরমপুর হাঁসপাতালের জন্য লক্ষ টাকা দিয়াছেন। শত শত গ্রন্থকারকে ইনি আর্থিক সাহায্য দান করিয়াছেন, তাঁহার এই অজস্র দান হইতে বর্ত্তমান লেখকও বঞ্চিত হন নাই। আমার 'বেহুলা' 'গৃহশ্রী' ও'ওপারের আলো'এই তিন খানি বহীব প্রথম সংস্করণের ছাপার সমস্ত খরচ ইনি বহন করিয়াছিলেন।

কিন্তু যাঁহার টাকা থাকে, তিনিই দান করিতে পারেন, অনেক সময় তাহা প্রতিষ্ঠালাভের উপায় হয়। কিন্তু রাজাবাহাদুরকে তথায় যাইয়া যাহা দেখিলাম, তাহা জীবনে ভুলিব না। তিনি শতাধিক কুড়ানো ছেলেকে আশ্রয় দিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে বামুন হইতে সুরু করিয়া মুসলমান ও মুচি প্রভৃতি সর্ব্বশ্রেণীর অনাথবালক আছে। ইহাদিগকে তিনি ভাল ধুতি শাড়ী. নানারূপ ছিটের কাপড়, সতরঞ্চী, সুজনী, কারপেট প্রভৃতি বুনাইতে শিখাইয়াছেন, ইহাঁরা হাতীর দাঁতের উপর কাজ করিতে শিখিতেছে। এই উদ্দেশ্যে মুজাপুর, বহরমপুর প্রভৃতি স্থান হইতে তিনি

কারিগর আনাইয়া ছেলেদের শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছেন। রাজা বাহাদুরের একটি প্রেশ আছে, এই সকল অনাথ বালকই' তথায় কম্পোজিটারের কাজ শিখিতেছে, তাঁহার হাই-স্কুলে ইহাঁরা পড়িতে পায়। সুতরাং প্রতিটি ছেলের যথেষ্ট গুণপনা আছে। এই কুড়ানো ছেলেদেরে তিনি এরূপ শিক্ষা দিয়াছেন, যে কলিকাতা সহরে আসিলে ইহাদিগের জীবিকা অর্জ্জনের বিলক্ষণ সুবিধা হইতে পারে। কিন্তু রাজা বাহাদুর ইহাদিগকে সমস্ত কাজ শিখাইয়াও অভিমানী হইতে দেন নাই। কোন ব্যক্তি লালগোলা হইতে অন্যত্র গেলে এই সকল ছেলেরা মোট বহিয়া ষ্টেসনে লইয়া যায়। সন্ধ্যাকালে দেখিলাম রাজা বহাদুর এই ছেলেগুলি লইয়া মজলিস বসাইয়া দিলেন। তিনি ইহাদের অনেককে উৎকৃষ্ট রূপ গান বাজনা শিখাইয়াছেন, ইহাঁদের কেহ কেহ নর্ত্তকী সাজিয়া সুন্দররূপ নাচিতে ও গাইতে লাগিল। রাজাবাহাদুর নিজের অবজ্ঞাত অনাথ প্রজাদের লইয়া এই ভাবে একদিকে কর্ম্মক্ষেত্র, অপর দিকে উৎসবের সৃষ্টি করিয়াছেন।

যদিও নিজে সংযমী ও কঠোররূপে ব্রাহ্মণ্য ব্রত পালন করেন, তথাপি তিনি নিম্নতম শ্রেনীর হিন্দু কি মুসলমান প্রভৃতি জাতিকে আদৌ ঘৃণা করেন না, এই উপবাসশীল ব্রত নিরত ব্রাহ্মণকে আমি মুচি ও মুসলমান ছেলেদিগের গায় হাতদিয়া আদর করিতে দেখিলাম। ছোটখাট শ্রাদ্ধাদি ব্যাপারে তিনি এই কুড়াণো ছেলেদের মধ্য হইতে বাছিয়া ব্রাহ্মণ বালক দিগকে খাওয়াইয়া পদ্ধতিটি রক্ষা করেন। ভোর ৫টা হইতে রাত্রি ১০টা পর্য্যন্ত আমরা ছিলাম, এই সময়টা রাজা বাহাদুর উপবাসী ছিলেন, বয়স ৭২, আনন্দময়, একবারও বসিতে দেখিয়াছি ব'লিয়া মনে পড়েনা। তাঁহার শিল্প-বিদ্যালয় শ্রীরামপুর বিদ্যালয় হইতে নানা গুণে শ্রেষ্ঠ, কিন্তু তাহার ঘোষণা নাই; ইনি একান্ত আড়ম্বরহীন ও

সর্ব্বদা দেশের কল্যাণ লইয়া ব্যস্ত। তাঁহার হাই স্কুলের বোর্ডিংএ ছাত্রদের মাত্র ৫৲ টাকা দিতে হয়, প্রতিটি ছাত্রের পাছে, আর ও ঢের লাগে—তাহা রাজ-সংসার হইতে দেওয়া হয়। বস্তুতঃ লালগোলায় 'রাজা' দেখিলাম না,—রাজর্ষি দেখিয়া চোখ ভুলিয়া গেল।

পুস্তক বড় হইয়া গেল, আমার শত শত বন্ধুবান্ধবের অনেকের কথাই লিখিতে পারিলাম না। বিশ্ববিদ্যালয়ের বহুবন্ধু,—কাহাকে ছাড়িয়া কাহার কথা লিখিব। কৃষ্ণকীর্ত্তনের সম্পাদক বসন্ত রঞ্জনের নাম সর্ব্বাগ্রে মনে আসে, তাঁহার শুভ্র দাড়ীর চুলগুলি যেরূপ কুটিল, মনটি তদনুপাতে সরল; যদি ও প্রাচীন পুঁথির চর্চ্চা করেন, নবীন জগতের সঙ্গেও বিলক্ষণ যোগ রাখিয়াছেন। বহুবৎসর হইল স্ত্রী-বিয়োগ হইয়াছে, কিন্তু এখন ও সেই শোকে রাত্রে ঘুম হয় না,—স্ত্রীর প্রসঙ্গ তুলিলেই চক্ষের কোণে অশ্রু দেখা দেয়। বসন্ত বাবুর মত অমায়িক বন্ধু বিরল, দরকার হইলে বন্ধুর উপকারার্থ শারীরিক ও মানসিক নানারূপ কষ্ট স্বীকার করিতে ইনি প্রস্তুত; নিরামিষ ভোজী কিন্তু মাছের ভাল ব্যাঞ্জন হইলে সেইদিকে লোলুপ দৃষ্টিপাত করিতে দেখিয়াছি। স্ত্রীর শোকেই নিরামিষ খান, তিনি বাঁচিয়া থাকিলে বোধ হয় তাঁহার চুড়ির নিক্কন সংযোগে মৎস্যের রান্না ইনি অবহেলা করিতে পারিতেন না, হস্তের সেই মধুর শব্দ সহকারে পরিবেশন হইলে এখনও খাইয়া তৃপ্ত হইতেন। পুরুষ হইয়া ও তাঁহার এই বৈধব্যযোগ ললাট লিপি।

বিশ্ববিদ্যালয়ে সতীশ বিদ্যাভূষণ মহাশয়কে হারাইয়া প্রকৃতই দুঃখিত হইয়াছি, এরূপ সরল, উদার, মধুর প্রকৃতি, পণ্ডিত-শিরোমণি দুর্ল্লভ। ডাক্তার ভাণ্ডারকার তাঁহার সুরঞ্জিত পাগড়ি লইয়া মধুর হাস্যে ও নানারূপ স্নেহোক্তির আপ্যায়ন দ্বারা বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের জায়গাটা দখল করিয়া বসিয়াছেন। কিন্তু রাজেন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের তুলনা নাই,

ইনি পণ্ডিতোচিত সাজসজ্জার খড় কুটোর মধ্যে জলন্ত অগ্নি; বামুন-পণ্ডিত বলিয়া ইহাঁকে উপেক্ষা করা চলে না। ইহাকে রাগাইলে ইহাঁর পণ্ডিতী মুক্ত কচ্ছ মল্লবেশে পরিনত হয়, এবং রাগের কলম শাণিত তরবারীর আকার ধারণ করে, এত বড় জেদী লোক বিলাত ফের্ত্তাদের মধ্যে ও দুর্ল্লভ, কিন্তু যাঁহারা ইহাঁর বন্ধুত্বের অভিমানী তাঁহারা জানেন,—ইহার প্রাণটি ভীমনাগের সন্দেশের মত মিষ্ট। আমাদের প্রিয় শ্যামা প্রসাদের বুকটা যেমন চওড়া, প্রাণটাও তেমনি গড়ের মাঠের মত খোলা। এখন যাহারা সিণ্ডিকেট ও সিনেটের তরুণ সদস্য তাঁহাদের মধ্যে মন্মথরায় ও প্রমথ বন্দ্যোপাধ্যায় বন্ধুদ্বয় নানাগুণে আমাদিগকে চমৎকৃত করিয়াছেন, প্রথমটি তাঁহার সদাশয়তায় ও দ্বিতীয়টি তাঁহার জলন্ত প্রতিভায়। আর একজনের নাম স্বতঃই এই সঙ্গে মনে হয়, কিন্তু শুনিলাম সিঁড়ি হইতে পা পিছলিয়া পড়িয়া তাঁহার মাথার আঘাত লাগিয়াছে, তাহাতে তাহার স্মৃতি-ভ্রংশ হইয়াছে। রেজিষ্ট্রার মিঃ জ্ঞানঘোষ এবং কণ্ট্রোলার রায় বাহাদুর অবিনাশ চন্দ্র—কে বেশী ভালমানুষ, আড়াআড়ি করিয়া তাঁহাই প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা পাইতেছেন। কাহার সৌজন্ত বেশী তাহা এখন ও সুধীমণ্ডলী মীমাংসা করিতে পারেন নাই।

শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় অতি নম্র, বিনয়ী, ও সাধু চরিত্রের লোক, কিন্তু ইহার ভিতরে যে অনন্ত সাধারণ কর্মঠতা ও সঙ্কল্পের দৃঢ়তা আছে, তাহা "বঙ্গবাণী" পত্রিকার প্রকাশের চেষ্টায় বুঝিয়াছি। ইনি যে বিষয়ে হাত দিবেন, তাহা গড়িয়া তুলিবেন—এটি আমি ভবিষ্যৎবাণী করিতেছি—সঙ্কল্পের পেছনে পেছনে ইহার অনাড়ম্বর অথচ অক্লান্ত অধ্যবসায় আছে, অল্পভাষী—কিন্তু যেটুকু বলেন, তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্ত হইতে বিরাট প্রযত্ন। মৎস্য ধরিবার চেষ্টায় নিরত বড় বাজারের দোকান-দর্শী, অঙ্কশাস্ত্রের মহাপণ্ডিত শীর্ণকায়, মহা-

চতুর, মহাপ্রাজ্ঞ সতীশ বাবু মহাশয়কে নমস্কার জানাইতেছি। যাঁহারা বাঙ্গলায় এম,এ পাশ করিয়াছেন,তাঁহাদের মধ্যে বিশ্বপতি চৌধুরী সাহিত্য-জগতের উদীয়মান প্রতিভা। গানে, চিত্রাঙ্কনে, সমালোচনায়, কবিতা-রচনায় ও গল্পলেখায় ইহার যে শক্তির পরিচয় পাইতেছি, তাহা হরিদ্বারের গঙ্গার ন্যায় সূক্ষ্মস্রোতা হইলে শুভযোগ সমন্বয়ে কালে কল্লোলিনী স্রোত-স্বতীতে পরিণত হইতে পারে, আশা করি আমার এই ভবিষ্যবাণী সফল হইবে।

আর জায়গায় কুলাইল না, তথাপি নবীন বয়সে প্রবীণ বুদ্ধি সম্পন্ন,—গম্ভীর প্রকৃতি, অনড় কর্ম্মব্রতী হরিদাস চট্টোপাধ্যায়, মুক্তহস্ত বদান্যবর দেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, স্নিগ্ধ অমায়িক ব্রজেন্দ্রমোহন দত্ত, এবং প্রাতঃ সেফালিকাশায়ী শিশির-কণার মত নম্রতা ও সৌজন্যের প্রতিমূর্ত্তি শিশির কুমার মিত্র—বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রকাশকগণে উদ্দেশ্যে প্রীতি নমস্কার জানাইয়া, পুস্তকখানি সাঙ্গ করিতেছি। আর একজনের কথা মনে পড়িতেছে, মুখের কথায় তুবড়ীর আগুন, লেখনীর সম্পদে অসামান্য, বাগ্দেবীর প্রসাদে কল্পতরু সম; রহস্যের তিক্ত-মধুর আমলকী, গুণগ্রাহিতায় নেংড়া আম,—সামাজিক তত্ত্ব বিদ্রূপের কণ্টকাবৃত বেল, - কোন ফল তোমার কাছে না পাওয়া যায়? প্রাচীন ধর্ম্ম ও আচার পদ্ধতির তুমি ঘুন, কিন্তু হইলে কি হইবে? কি অভাবে, পাঁচকড়ি, তোমার ক্ষুরধার প্রতিভা ভোতা হইয়া গেল? আমাদের উক্তিতে যদি রাগ কর—তবে বুঝিব তুমি আর শোধরাইবে না—একবারে hopeless. তোমার প্রতিভা-সুন্দরীকে নানা সাজে সাজাইয়া ভগবান কেন সেই সুন্দরীর কপাল হইতে সিন্দূরের দাগ মুছিয়া ফেলিয়াছেন, তাহা জানি না, সে সৌন্দর্য্য দেখিলে ভয় হয়। কিন্তু আলাপে—গল্পে—আপ্যায়নে—মিষ্ট ব্যবহারে তোমার ব্যভিচারী প্রতিভাকে না ভালবাসিয়া থাকা যায় না।

সাহিত্য-জগতের এক কোণে মধুর বিনয়ে নিজেকে আবৃত করিয়া যতীন্দ্রনাথ পাল উপন্যাস লিখিয়া যাইতেছেন। তাঁহার লেখনীই বেশী ক্ষিপ্র কি মুদ্রাযন্ত্রই বেশী ক্ষিপ্র—তাহা জানি না। এত লিখিলে যাহা হয়, তাহাই হইতেছে—"এক পাড়া কুঁদুলী" ছাড়া আর কোন একখানি পুস্তক তেমন উৎরাইল না। আরও কত বন্ধু রহিয়া গেলেন, তাঁহাদের নাম উল্লেখ করিতে পারিলাম না, কিন্তু তাই বলিয়া বর্ত্তমান লেখক তাঁহাদের গুণের আদরে ও বন্ধুত্বের অভিমানে কাহার ও অপেক্ষা পশ্চাৎপদ নহে। বন্ধুবর ঐতিহাসিক নিখিলনাথ, যাঁহার চোখ দুটি দেখিলে মনে পড়ে "একি হরি একি দেখি। ঘুমে ঢুলু ঢুলু দুটি আঁখি।" তিনি তাঁহার রচিত অধিকাংশ পুস্তক পুলিস কমিসনার কর্ত্তৃক নিষিদ্ধ হওয়াতে পক্ষচ্ছিন্ন জাটায়ুবৎ হইয়া আছেন।

নবদ্বীপের বিদগ্ধ জননী সভার মহামহোপাধ্যায়গণ আমাকে 'কবি-শেখর' এবং ভারতীয় ধর্ম্ম মহামণ্ডল আমাকে 'প্রত্নতত্ত্বভূষণ' উপাধি দিয়াছিলেন। এ বৎসর বিশ্ব বিদ্যালয় আমাকে "ডি, লিট" এবং গভর্ণমেণ্ট "রায় বাহাদুর" উপাধি দিয়াছেন, কিন্তু এবৎসরের ভগবৎদত্ত সমস্ত সুখ বিষ মিশ্রিত হইয়া আমার নিকট উপস্থিত হইয়াছে। নানা রূপ পারিবারিক বিপদে আমি ভবিষ্যৎ অন্ধকার দেখিতেছি। এই সকল বিপদ দিয়া ভগবান এই দুর্ব্বলের বল পরীক্ষা করিতেছেন। তিনি বল না দিলে আমি কিরূপে নিজেকে রক্ষা করিব ?

সম্পূর্ণ